গ্রীক দেবতা আপোলো

আপোলো শিল্পের দেবতা, সৌন্দর্য্যের দেবতা, সূর্য্যের দেবতা।   তাঁহার শাসনে সিংহটানা সূর্য্যের রথ চলিতেছে।

U. RAY & SONS.

তৃতীয় বর্ষ বৈশাখ, ১৩২২ প্রথম সংখ্যা

বর্ষ গেল, বর্ষ এল।

বর্ষ গেল বর্ষ এল, গ্রীষ্ম এলেন বাড়ী—
পৃথ্বী এলেন চক্র দিয়ে এক বছরের পাড়ী।
সত্যিকালের এই পৃথিবী বয়স কেবা জানে,
লক্ষ হাজার বছর ধ'রে চল্‌ছে একই টানে।
আপন তালে আকাশ পথে আপনি চলে বেগে,
গ্রীষ্মকালের তপ্তরোদে বর্ষাকালের মেঘে ;
শরৎকালের কান্নাহাসি হাল্কা বাদল হাওয়া,
কুয়াশা-ঘেরা পর্দ্দাফেলে হিমের আসা যাওয়া—
শীতের শেষে রিক্ত বেশে শূন্য করে ঝুলি,
তার প্রতিশোধ ফুলে ফলে বসন্তে লয় তুলি।
না জানি কোন্ নেশার ঝোঁকে যুগ্‌যুগান্ত ধ'রে
ছয়টি ঋতুর দ্বারে দ্বারে পাগল হ'য়ে ঘোরে!
না জানি কোন্ ঘূর্ণীপাকে দিনের পরে দিন
এমন ক'রে ঘোরায় তারে নিদ্রাবিরামহীন!
কাঁটায় কাঁটায় নিয়ম রাখে লক্ষযুগের প্রথা
না জানি তার চাল চলনের হিসাব রাখে কোথা!

কুবলয়াশ্ব।

[চৈত্র মাসের সন্দেশে বলা হইয়াছে :—

পাতালকেতু নামে এক দৈত্য গালব মুনির আশ্রমে উৎপাত করিত। গালব মুনি শত্রুজিতের পুত্র ঋতধ্বজকে একটি আশ্চর্য্য ঘোড়া দিয়া বলিলেন "এই ঘোড়ার নাম কুবলয়। তুমি ইহার উপর চড়িয়া সেই দৈত্যকে বধ কর।" গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসুর কন্যা মদালসা পাতালে সেই দৈত্যের পুরীতে বন্দিনী ছিলেন। ঋতধ্বজ দৈত্যকে মারিয়া মদালসাকে বিবাহ করিলেন। ইহারপর ঋতধ্বজের নাম হইল কুবলয়াশ্ব।

পাতালকেতুর ভাই তালকেতু মুনি সাজিয়া কুবলয়াশ্বকে ফাঁকি দিয়া তাঁহার গলার হার চাহিয়া লইল—এবং সেই হার রাজবাড়ীতে দেখাইয়া বলিল, "রাজপুত্রকে দানবে মারিয়াছে! মৃত্যুর সময় তিনি এই হার আমায় দিয়া বাড়ীতে সংবাদ দিতে বলিয়াছেন।" এই কথা শুনিয়া মদালসা দুঃখে প্রাণত্যাগ করিলেন।]

কুবলয়াশ্ব সেই মুনিবেশধারী দুষ্ট দানবের আশ্রম হইতে ফিরিয়া আসিলে সকলে কিরূপ আশ্চর্য্য আর আহ্লাদিত হইল, তাহা বুঝিতেই পার। কিন্তু মদালসার মৃত্যুর কথা শুনিয়া কুবলয়াশ্বের প্রাণে বড়ই কষ্ট হইল। তিনি সেই দুঃখ ভুলিবার জন্য বন্ধুদিগের সহিত মিশিয়া নানারূপ আমোদ প্রমোদে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

সেই সময়ে নাগরাজ অশ্বতরের দুইটি পুত্র ব্রাহ্মণের বেশে তাঁহার সঙ্গে আমোদ প্রমোদ করিতে আসিতেন। ইঁহাদের কথাবার্ত্তা তাঁহার বড় ভাল লাগিত। এইরূপে তাঁহাদের সহিত কুবলায়শ্বের এমনি বন্ধুতা হইয়া গেল যে, পরস্পরকে ছাড়িয়া থাকিতে আর তাঁহাদের কিছুতেই ভাল লাগিত না। নাগপুত্রেরা সমস্ত দিন কুবলয়াশ্বের নিকটে কাটাইয়া রাত্রে গৃহে যাইতে বড়ই কষ্ট বোধ করিতেন, আর কোন প্রকারে রাত্রিটি কাটাইয়া প্রভাত হইবামাত্রই পুনরায় কুবলয়াশ্বের নিকট চলিয়া আসিতেন।

একদিন নাগরাজ অশ্বতর তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "বাবা, এখন ত আর তোমাদিগকে দিনের বেলায় পাতালে দেখিতে পাই না ; রাত্রিটি কোন মতে এখানে কাটাইয়া, প্রভাত হইতেই তোমরা পৃথিবীতে চলিয়া যাও। ঐ স্থানটার প্রতি তোমাদের এত অনুরাগ কেমন করিয়া হইল ?" নাগপুত্রেরা বলিলেন, "বাবা, আমরা মহারাজ শত্রুজিতের পুত্র ঋতধ্বজকে বড়ই ভাল বাসি ; তাঁহাকে না দেখিয়া থাকিতে আমাদের নিতান্ত কষ্ট হয়, তাই প্রভাতে উঠিয়া প্রত্যহ তাঁহার নিকট চলিয়া যাই। বাবা, এমন সুন্দর এমন সরল, এমন ধার্ম্মিক, এমন মিষ্টভাষী লোক আর এজগতে নাই।"

এ কথায় নাগরাজ বলিলেন, "বাছা, এমন মহৎ লোকের সহিত তোমাদের বন্ধুতা হইয়াছে, আর তাঁহার নিকটে তোমরা এত সুখ পাইতেছ,—তোমরা কি তাঁহার সুখের জন্য কিছু করিয়াছ ?" নাগপুত্রেরা বলিলেন, "বাবা, তাঁহার ত কোন বস্তুরই অভাব নাই ; এমন মহৎ লোকের যোগ্য কি আছে, যাহা দিয়া তাঁহাকে সুখী করিতে পারি ? তাঁহার কোন কষ্ট দূর করিতে পারিলে আমরা নিশ্চয়ই করিতাম। তাঁহার স্ত্রী মদালসার মৃত্যুই তাঁহার একমাত্র কষ্টের কারণ, সেই মদালসাকে আমরা কোথা হইতে আনিয়া দিব ?"

কিন্তু এ কাজটি যতই কঠিন হউক না কেন, ইহা যে একেবারেই অসাধ্য, নাগরাজ তাহা মনে করিলেন না। তিনি অবিলম্বে হিমালয় পর্ব্বতের প্লক্ষাবতরণ নামক তীর্থে গিয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। সে তপস্যা এমনই চমৎকার হইয়াছিল, আর তখন যে নাগরাজ সরস্বতীর স্তব করিয়াছিলেন, তাহা সরস্বতীর এত ভাল লাগিয়াছিল যে, তিনি আর সেখানে না আসিয়া থাকিতে পারিলেন না।

সরস্বতী আসিয়া বলিলেন, "হে অশ্বতর ! আমি তোমাকে বরদান করিব ; বল, তোমার কি লইতে ইচ্ছা হয় ?" অশ্বতর অমনি করযোড়ে বলিলেন, "মা, যদি কৃপা হইয়া থাকে, তবে আমাকে আর আমার ভাই কম্বলকে সঙ্গীতে অসাধারণ পণ্ডিত করিয়া দিন্ !" এ কথায় সরস্বতী "তথাস্তু" বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলে অশ্বতর আর কম্বল দু ভাই তৎক্ষণাৎ সঙ্গীত শক্তি লাভ করত অপরূপ তানলয় সহকারে বীণা বাজাইয়া মহাদেবের স্তব গান আরম্ভ করিলেন। অনেক দিন এইরূপ সঙ্গীত আর স্তবের পর, মহাদেবকেও তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে বর দিতে আসিতে হইল। তখন দুই ভাই তাঁহার পদতলে পড়িয়া এই বর প্রার্থনা করিলেন যে, "কুবলয়াশ্বের স্ত্রী মদালসা যেমন বয়সে, যেমন বেশে, যেমন শরীরে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন অবিকল সেই মূর্ত্তিতে, পূর্ব্বজন্মের সকল কথা স্মরণে রাখিয়া পুনরায় অশ্বতরের গৃহে জন্মলাভ করুন।"

মহাদেব কহিলেন, "তাহাই হউক ! অশ্বতর শ্রাদ্ধ করিতে বসিলে তাঁহার মধ্যম ফণা হইতে মদালসা অবিকল তাঁহার পূর্ব্বের শরীর লইয়া বাহির হইবেন।"

কি আনন্দের কথাই হইল ! ইহাব পর দু ভাই পাতালে চলিয়া আসিতে আর তিল মাত্রও বিলম্ব করিলেন না। সেখানে আসিয়া অশ্বতর একটি নির্জ্জন স্থানে চুপি চুপি শ্রাদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে, মহাদেবের কথামত মদালসা তাঁহার মধ্যম ফণা হইতে

মদালসার পুনর্জীবন।

বাহির হইয়া আসিলেন। অবিকল সেই মদালসা, কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, যেন দু দিনের জন্য কুবলয়াশ্বের নিকট হইতে পাতালে বেড়াইতে আসিয়াছেন। এ ব্যাপারে কেবল অশ্বতরই উপস্থিত ছিলেন, আর কেহ ইহা দেখিলও না, এ বিষয়ে কোন কথা জানিতেও পারিল না। তখন নাগরাজ কয়েকটি বুদ্ধিমতী মিষ্টভাষিণী সখী সঙ্গে দিয়া মদালসাকে একটি সুন্দর ঘরে লুকাইয়া রাখিলেন।

তারপর সন্ধ্যাকালে নাগপুত্রেরা দু ভাই কুবলয়াশ্বের নিকট হইতে ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহারাও অবশ্য এ ব্যাপারের কিছুই জানেন না। নাগরাজ অন্যান্য দিনের ন্যায় সে দিনও তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিয়া কহিলেন, "বৎসগণ, সেই রাজপুত্রকে একদিন আমার নিকট আনিলে না ?"

পরদিন নাগপুত্রেরা কুবলয়াশ্বের নিকট গিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "বন্ধু, আমার পিতা তোমাকে দেখিবার জন্য বড়ই উৎসুক হইয়াছেন, একটিবার আমাদের ঘরে চল।" একথায় কুবলয়াশ্ব সম্মত হইলে তিন জনে মিলিয়া তখনই পাতালে যাত্রা করিলেন। কুবলয়াশ্ব কিন্তু জানেন না যে তাঁহাকে পাতালে যাইতে হইবে, বা তাঁহার বন্ধুগণ নাগপুত্র। তিনি জানেন, উঁহারা ব্রাহ্মণকুমার। গোমতী নদীতে আসিয়া নাগপুত্রেরা তাহার জলে নামিতে গেলেন ; কুবলয়াশ্ব ভাবিলেন, গোমতীর পর পারে ব্রাহ্মণকুমারদের বাড়ী। এমন সময় নাগপুত্রেরা হঠাৎ তাঁহাকে লইয়া পাতালে প্রবেশ করিলেন। ইহাতে কুবলয়াশ্ব ভয় পাইলেন না, কেন না, সে স্থান তাঁহার দেখিতে বাকি নাই। যাহা হউক, সে বারে তিনি দানবের বাড়ীই দেখিয়াছিলেন, এবারে সাপের দেশটি তাঁহার নিকট যারপর নাই আশ্চর্য্য এবং সুন্দর বোধ হইল। তাঁহার বন্ধুদ্বয়ও ততক্ষণে ব্রাহ্মণের বেশ ছাড়িয়া নিজের রূপ ধারণ করিয়াছেন। সেরূপ যে ঠিক কি প্রকার, তাহা আমি বলিতে পারি না। সে সকল সাপের ফণার কথা লেখা আছে ; স্বস্তিক চিহ্ন* এবং মণিরও উল্লেখ দেখা যায়। অথচ মানুষের মত তাহাদের হাত পা, বেশ ভূষা, কাণে কুণ্ডল, গলায় হার।

যাহা হউক, নাগপুত্রেরা কুবলয়াশ্বকে অবিলম্বেই তাহাদের পিতার নিকট নিয়া উপস্থিত করিলেন, সেখানে সেরূপ অবস্থায় যেমন কথাবার্ত্তা প্রণাম আশীর্ব্বাদাদির প্রথা আছে, সকলই হইয়া গেল। এত পথ চলিয়া আসাতে সকলেই ক্লান্ত, সুতরাং অতঃপর স্নানাহার পূর্ব্বক সুস্থ হওয়া হওয়া হইল প্রথম কাজ।

* সাপের ফণায় যে 'চক্র' থাকে।

আহারান্তে বিশ্রামের পর, নাগরাজ আর কুবলয়াশ্বের অনেক কথাবার্ত্তা হইল। শেষে নাগরাজ বলিলেন, "বাছা, তুমি আমার পুত্রগণের বন্ধু, সুতরাং আমার পুত্রেরই তুল্য। আমারও তোমার প্রতি অতিশয় স্নেহ হইয়াছে। আমার বড় ইচ্ছা হয় যে, আমার পুত্রেরা যেমন আমার নিকট যাহা ইচ্ছা চাহিয়া লয়, তুমিও সেইরূপ কিছু চাহিয়া লও।" কুবলয়াশ্ব বলিলেন "আপনার আশীর্ব্বাদে আমার কোন বস্তুরই অভাব নাই, সুতরাং আমি কি চাহিব? আমি যে আপনাকে দেখিলাম, আপনার পায়ের ধূলা পাইলাম, ইহার উপর আর আমার কিছুই চাহিবার নাই।"

অশ্বতর কহিলেন, "বাবা, তোমার মনে কি কোন কষ্ট আছে? তাহার কথাই না হয় আমাকে বল, আমি সাধ্যমত তাহা নিবারণের চেষ্টা করিব।" একথায় নাগপুত্রেরা বলিলেন, "মদালসার মৃত্যুতে ইঁহার বড়ই কষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তাহা ত আর দূর হইবার নহে।"

অশ্বতর বলিলেন, "অবশ্য, মরা মানুষকে আর কি করিয়া বাঁচান যাইবে? তবে মন্ত্র বলে তাহারও মায়া মূর্ত্তি আনিয়া দেখাইতে পারি!" ইহা শুনিয়া কুবলয়াশ্ব নিতান্ত ব্যস্ত ভাবে বলিলেন, "যদি তাহা সম্ভব হয়, তবে দয়া করিয়া একবার তাহাই দেখান!"

অশ্বতর বলিলেন, "এই কথা? আচ্ছা, তবে দেখাইতেছি। কিন্তু মনে রাখিও, ইহা মায়া।" তারপর অশ্বতর খুব গম্ভীর ভাবে বসিয়া বিড়্ বিড়্ করিতে লাগিলেন, যেন কতই মন্ত্র তন্ত্র আওড়াইতেছেন। ততক্ষণে তাঁহার ইঙ্গিত অনুসারে মদালসাকে আনিয়া সেখানে উপস্থিত করা হইল। সকলে ভাবিল, মন্ত্রের কি জোর! কুবলয়াশ্বও জানেন, উহা মন্ত্রেরই কাজ, মায়ার মূর্ত্তি। তথাপি তাঁহার এত আনন্দ হইল যে তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না।

তারপর যখন অশ্বতর বলিলেন যে, উহা মায়া নহে বাস্তবিকই মদালসা, তখন না জানি ব্যাপার খানা কিরূপ হইয়াছিল! কুবলয়াশ্ব পাতালেই মদালসাকে পাইয়াছিলেন, এখন সেই পাতালেই তাঁহাকে আবার পাইয়া মহানন্দে তাঁহাকে লইয়া গৃহে ফিরিলেন। সেখানে অবশ্য ইহা লইয়া খুবই আনন্দ আর উৎসবাদি হইল।

জিম্মী।

এর পর জেম্‌স্‌কে অনেক দিন জ্বরে ভুগতে হল। তখন বিছানায় পড়ে পড়ে প্রায়ই সে ভাবত যে এরপর সে কি করবে। জাহাজে চড়ার ইচ্ছাটা তখনও একেবারে দূর হয় নি, আবার মাঝে মাঝে উকীল হওয়ার কথাও মনে হত। কিন্তু সকলের উপরে তার এই চিন্তাটাই জাগত যে একবার একটা ভাল ইস্কুলে ঢুকে লেখা পড়া শিখতে হবে। ভাগ্যক্রমে দু একজন ভাল ভাল লোকের সঙ্গেও এরপর জেম্‌সের দেখা হল, সুতরাং তার মতলব ঠিক করে নিতে আর বেশী দেরী হল না।

জেম্‌স্‌দের গ্রাম থেকে মাইল দশেক দূরে চেষ্টার বলে একটা সহরে 'গিউগা সেমিনারী' নামে একটি প্রসিদ্ধ স্কুল ছিল। জ্বর থেকে উঠেই জেম্‌স্ সেই স্কুলে গিয়ে ভর্ত্তি হওয়ার চেষ্টা দেখতে লাগল। গরীবের চেষ্টা আর তেমন একটা ব্যাপারই বা কি। চৌত্রিশটি টাকার যোগাড় হল, তাইতেই জেম্‌সের মনে আনন্দের সীমা নাই। টাকা না থাকলেই বা কি হয়? গায় জোর আছে, টাকা রোজগার করে নিবে। ধান কাটা, র‍্যাঁদা ঠেলা, এসব কাজ সর্ব্বত্রই মিলে। পোষাক এক সূট হলে মন্দ ছিল না, বিশেষতঃ যখন সহুরে ইস্কুলে পড়তে যেতে হবে। জেম্‌সের একটি বই সূট নাই তারও পেন্টালূনটি ছ আঙুল খাটো আর হাঁটুর কাছে ছেঁড়া। যা হোক্ এখন আর নূতন পোষাক করার সুবিধা নাই, কাজেই এই পুরাণো খাটো পোষাকটিই মা সেলাই করে দিলেন।

এই পোষাকটি পরে, চৌত্রিশটি টাকা পকেটে আর বাসনের বোঝা মাথায় নিয়ে জেম্‌স্ ইস্কুলে রওয়ানা হল। সঙ্গে তার দুটি মাসতুত ভাই উইলিয়ম্ আর হেনরী বয়্‌ন্‌টন্ (Boynton)। সকলেরই প্রায় একই রকমের সাজ পোষাক, আর মাথায় বোঝা।

এই বেশেই তারা গিয়ে গিউগা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ব্রাঞ্চ্ সাহেবের নিকট উপস্থিত হল। সাহেব একটি বুড়ী মেমের বাড়ীতে তাদের থাকবার বন্দোবস্ত করে, তিন জনকে স্কুলে ভর্ত্তি করে নিলেন। গোড়া থেকেই জেম্‌স্ খুব মনোযোগ দিয়ে পড়া শুনা করতে লাগল। স্কুলের লোকদের একথা বুঝতে বেশী দেরী হল না যে, এই পাড়াগেঁয়ে ছেলেটির মাথায় সাধারণ লোকের চেয়ে ঢের বেশী বুদ্ধি আছে। ক্লাশে ব্যাকরণ নিয়ে তর্ক করে সে ব্রাঞ্চ সাহেবকে থতমত খাইয়ে দিত, স্কুলের আলোচনা সভায় তার বক্তৃতা শুনে সকলে অবাক্ হয়ে যেত।

এদিকে আবার যখন বই রেখে দিয়ে সে লোকের বাড়ী কাজ করতে যেত, তখন তারা ভাবত যে ছেলেমানুষ হয়ে এত কাজ কি ক'রে করে। তিন ভাই মিলে একদিন এক চাষার ধান কাটতে গেল। চাষা তার ক্ষেতের মধ্যে আরো কয়েকটা ষণ্ডা মজুরের কাছে তাদের পৌঁছিয়ে দিয়ে বল্ল, "এই ছোকরারা তোমাদের সাহায্য করবে।" খানিক বাদে সেই 'ছোকরাদের' কাজ দেখে সে মজুরগুলোকে গাল দিতে লাগল —"বেটারা! এই ছোকরাদের কাছে তোরা হেরে গেলি!"

এসব কথা বাড়িয়ে বলবার জায়গা আমার নাই। জেম্‌স্ এই স্কুলে তিন বছর ছিল, এর মধ্যে কিছুদিন মাষ্টারীও করেছে। প্রথমে মাষ্টারী জোটাতে গিয়ে তার ভারী মুস্কিল হয়ে ছিল। তার চেহারা দেখেই ইস্কুলের কর্ত্তারা বলেন, "ছেলে মানুষকে দিয়ে আমরা কি করব? তুমি পারবে না।" অনেক কষ্টে শেষে যদিও একটি ইস্কুল জুটল, তার ছেলেগুলি এমনি দুষ্টু যে কোন মাষ্টার এসে তাদের জ্বালায় টিকতে পারে না। কিন্তু জেম্‌স্‌কে পেয়ে তারা বড়ই খুসী হল, আর অল্প দিনের ভিতরেই তাদের 'দুষ্টু' নাম ঘুচে গেল।

এমনি করে ইস্কুলে পড়িয়ে আর নানান্ জায়গায় খেটে জেম্‌স্ কিছু টাকা সঞ্চয় করে নিল। সে এর আগেই ঠিক করে রেখেছে যে এই টাকা নিয়ে সে কলেজে ভর্ত্তি হবে। তখন তার বয়স উনিশ বৎসর। এই বয়সে, ১৮৫১ সালের জুলাই মাসের শেষ দিনে, সে হিরাম নগরের কলেজে ভর্ত্তি হতে গেল।

কলেজের অধ্যক্ষেরা সভায় বসেছেন, এমন সময় জেম্‌স্ জড়সড় হয়ে এসে তাঁদের নমস্কার করে বল্ল, "আমি লেখাপড়া শিখবার আশায় আপনাদের কাছে এসেছি।"

সভাপতি মহাশয় জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি এই কলেজে ভর্ত্তি হতে চাও?"

জেম্‌স্ বল্ল, "আজ্ঞে হাঁ, যদি খেটে খরচ চালাতে পারি।"

"তুমি বুঝি গরীব?"

"আজ্ঞে হাঁ; কিন্তু আমি খাটতে পারি। আপনাদের ঘণ্টা বাজাবার কি ঘর ঝাঁট দিবার কাজটা যদি পাই, তবে আমার অনেক সাহায্য হবে।"

জেম্‌সের কথাবার্ত্তায় তার বুদ্ধি আর আগ্রহের পরিচয় পেয়ে সকলেরই তার উপর দয়া হল। তাঁরা তখনই স্থির করলেন যে এর জন্য যা কিছু সম্ভব করা হবে। একজন সভ্য তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি যে ঘণ্টা বাজাবার আর ঘর ঝাঁট দিবার কাজ চালাতে পারবে, তা কি করে জানব?"

জেম্‌স্ বল্ল, "দুই সপ্তাহ আমাকে পরীক্ষা করে দেখুন; আমি যদি এর মধ্যে আপনাদের খুসী করতে না পারি, তবে অমনি চলে যাব।"

এ কথায় আর দ্বিরুক্তি না করে তখনি তাকে ঘণ্টা বাজাবার আর ঝাঁট দিবার কাজে নিযুক্ত করা হল। আর অবশ্যি, সে কাজ সে খুব ভাল করেই করেছিল। কাজেই সে সেই পদে পাকা হয়ে গেল। মনে ক'রো না যে তাই বলে তাকে কেউ ঘৃণা করত; তার মতন এমন সকলের প্রিয় আর একটি লোক সে কলেজে ছিল না। পড়া শুনায়ও যে সে কারুর চেয়ে কম ছিল না, তার যথেষ্ট প্রমাণ এই যে, এক বৎসর যেতে না যেতেই তাকে সহকারী শিক্ষকের পদে তুলে দেওয়া হল। সে তখন কলেজে পড়ত, আবার পড়াত, আবার কলেজের শেষে ছুতরের কাজ করত। ছুতরও বলত যে জেম্‌স্‌কে না হলে তার কাজ চলে না। তখন থেকেই লোকে বলত যে জেম্‌স্ একদিন বড় লোক হবে। তিন বৎসর পরে যখন জেম্‌সের সেই বিদ্যালয় ছাড়বার সময় হল, তখন অধ্যক্ষেরা একবাক্যে স্থির করলেন যে অতঃপর তাকে সেখানকার অধ্যাপক করা হবে। এই তিন বৎসরে সে সাধারণ লোকের ছয় বৎসরের পড়া শেষ করেছিল।

এর পর আর আমার কিছু বলবার নাই। আমরা জিম্মীকে জেম্‌স্ হতে দেখলাম, তারপর সে কলেজের পড়া শেষ করে হিরামের অধ্যাপক হল। এখন আর সে জিম্মীও নয়, জেম্‌স্‌ও নয়, এখন সে অধ্যাপক গার্‌ফীল্ড্; আর কিছুদিন বাদে আবার অধ্যাপক গার্‌ফীল্ড্ আমেরিকার দেশপতি হবেন। বুদ্ধি, চেষ্টা, আর ধর্ম্মে মতি থাকলে কি না হতে পারে?

জানোয়ার ডাক্তার।

একজন লোক শিকার করতে গিয়েছিল, বনের ভিতরেই তার রাত হয়ে গেল। তখন সে আর বাড়ী ফিরবার পথ না পেয়ে, একটা গাছে উঠে বসে রইল। খানিক বাদে সেখানে একটা প্রকাণ্ড সাপ এসে একটা হাতীকে ধরে গিলে ফেল্ল। হাতী খেয়ে তার পেট এমনি ভারী হল যে আর সে ভাল করে চলতেই পারে না। তখন সে অনেক কষ্টে একটা গাছের কাছে গিয়ে তার একটুখানি ছাল খুঁটে খেল, আর অমনি দেখা গেল যে, হাতী টাতী সব হজম হয়ে তার পেট আবার কমে গিয়েছে।

পরদিন সকালে শিকারী গাছ থেকে নেমেই সেই গাছের খানিকটা ছাল চেঁছে নিল। তারপর বাড়ী ফিরে চাকরকে বল্ল, "একটা পাঁটা কিনে আন!" রাত্রে সেই পাঁটা

রেঁধে, তার সবটাই সে একলা খেয়ে, তারপর সেই গাছের ছাল একটু খেয়ে শুয়ে রইল। পরদিন সকালে চাকর এসে দেখে যে শিকারীর হাড়, মাংস, নাড়ি ভুঁড়ি সব হজম হয়ে গেছে, খালি চামড়াখানি আর চুলগুলো পড়ে আছে!

এক গৃহস্থের ছেলেকে সাপে কামড়িয়ে ছিল। গৃহস্থের একটি পোষা নেউল সেই সাপটাকে মেরে ওষুদ আনতে চলে গেল। গৃহস্থ তখন বাড়ী ছিল না, সে বাড়ী ফিরে দেখল তার ছেলেটি মরে রয়েছে, নেউলটি কোথায় পালিয়ে গেছে। তা দেখে সে ভাবল যে নিশ্চয় নেউলেরই এই কাজ, নইলে সে পালাবে কেন? এমন সময় সেই নেউলটি ওষুদ নিয়ে ফিরে এল, কিন্তু গৃহস্থ সে কথা বুঝতে না পেরে লাঠি দিয়ে তাকে মেরে ফেল্ল। তারপর সে দেখল যে নেউলের মুখে একখানা কিসের শিকড়। ছেলের বিছানার কাছে যে একটা সাপ মরে আছে, তাও তখন তার চখে পড়ল। তখন সে মাথায় হাত দিয়ে ভাবল, "হায় হায়! কি করলাম? আমার ছেলেকে বোধ হয় সাপেই কামড়িয়েছে, নেউল তাকে বাঁচাবার জন্য ঐ ওষুদ নিয়ে এসেছে!" সত্যি সত্যিই, সেই শিকড়টুকু বেটে ছেলেটির মুখে দিতে মাত্র সে উঠে বসল।

এ সব গল্প। রূপ কথার ভিতরে অনেক জন্তুর ওষুদ জানার কথা শুনতে পাওয়া যায়। সাপ, শুক পাখী, কোলা ব্যাঙ্, এরা সকলেই সময় বিশেষে ডাক্তার হয়ে বসে। বেজী যে সাপের ওষুদ জানে, একথা আজও অনেকে বিশ্বাস করে।

কুকুরের পেটভার হলে নাকি সে ঘাস চিবিয়ে খায়। আমি কুকুরকে ঘাস খেতে দেখেছি, কিন্তু তখন তার পেট ভার হয়েছিল কি না, আর ঘাস খেয়ে সে বেয়ারাম সারল কি না, একথা জিজ্ঞাসা করতে আমার মনে ছিল না।

যাহোক, কুকুরের ডাক্তারির বিষয়ে এর চেয়ে ঢের ভাল প্রমাণ আছে। কাউণ্ট্ ম্যাটি অতি প্রসিদ্ধ লোক, তিনি অনেক ওষুদ আবিস্কার করেছেন। তাঁর একটা

পুস্তকে আমি পড়েছি যে তিনি একটা কুকুরের কাছ থেকে একটা ভাল ওষুদের সন্ধান পান। কুকুরটার গা ময় ঘা ছিল; সে রোজ গিয়ে একটা গাছের পাতা চিবিয়ে খেত। তারপর সাহেব পরীক্ষা করে দেখলেন যে সেই গাছের পাতা ঘায়ের খুব ভাল ওষুদ।

আর একবার কোন ইংরাজি কাগজে আমি একটা প্রকাণ্ড মাকড়ষা আর একটা কোলা ব্যাঙের যুদ্ধের কথা পড়েছিলাম। মাকড়ষাটা অতি ভয়ঙ্কর ছিল; সে সব মাকড়ষায় পাখী ধরে খায়। এক সাহেব একদিন দেখলেন যে একটা কোলা ব্যাঙের সঙ্গে সেটার যুদ্ধ লেগেছে। মাকড়ষাটার ভয়ানক বিষ, কিন্তু ব্যাঙ্ তার কামড়কে গ্রাহ্য করছে না। সে খালি যুদ্ধ করতে করতে এক একবার গিয়ে একটা গাছের পাতা খেয়ে আসছে। এমনি করে সে মাকড়ষার কয়েকটা পা ছিঁড়ে দিল। তখন সাহেবের হঠাৎ মনে হল যে, ঐ গাছের পাতা খেয়ে বোধ হয় ব্যাংটা বিষের জ্বালা দূর করে। এ কথার পরীক্ষা করবার জন্য সাহেব সেই গাছটা ছিঁড়ে ফেলে দেখতে লাগলেন এরপর ব্যাংটা কি করে। ব্যাংটা যুদ্ধ করতে করতে আবার ছুটে এসে যখন দেখল, সে গাছটা নাই, তখন বেচারা বিষের জ্বালায় অস্থির হয়ে অবশের মত পড়ে রইল; আর তার যুদ্ধ করার শক্তি হল না।

এতে জানোয়ারদের ওষুদ জানার কথা প্রমাণ হয় কি না, সে কথা ভেবে আমাদের দরকার নাই; কিন্তু অনেক জানোয়ার যে ওষুদের মর্ম্ম বোঝে, এর পরিচয় তাদের কাজেই পাওয়া যায়। একবার একটা কুকুরের পা ভেঙ্গে যায়, এক ডাক্তার তাতে পটি বেঁধে ওষুদ লাগিয়ে সারিয়ে দেন। তারপর একদিন ডাক্তার দেখলেন যে সেই কুকুর আরেকটা কুকুরকে নিয়ে তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে, সেটারও একটা পা ভাঙ্গা।

একটি ভদ্রলোক আমাকে একটা বানরের গল্প বলেছিলেন, সে একটা হাসপাতালের কাছে থাকত। হাসপাতালে রোজ ডাক্তার আসেন, রোগীরা গিয়ে তাঁকে হাত দেখায়, বানরটা তার সবই দেখে নিয়েছে। তারপর একদিন আর আর রোগীর সঙ্গে সেও গিয়ে ডাক্তার বাবুর সামনে তার হাতখানি বাড়িয়ে দিল। ডাক্তার বাবু দেখলেন, সত্যি সত্যি তার অসুখ হয়েছে!

আর এক ডাক্তার সাহেবের পোষা বানরের গল্প পড়েছিলাম, সেটা রোজ দেখত সাহেব একটা টেবিলের উপরে মড়া রেখে অস্ত্র দিয়ে কাটেন। তারপর আরেক দিন সাহেব সেই টেবিলের কাছে আসতেই বানরটা তাঁকে তার উপর চিৎ করে ফেলে চেপে ধরল। সে এমনি বেজায় ষণ্ডা বানর যে সাহেব কিছুতেই তার হাত ছাড়িয়ে টেবিল

থেকে উঠতে পারলেন না। টেবিলের কাছেই সাহেবের অস্ত্রের ব্যাগ; বানরটা

ক্রমাগতই হাত বাড়িয়ে সেইটে আনবার চেষ্টা করছে, কিন্তু অল্পের জন্য নাগাল পাচ্ছে না। বেগতিক দেখে সাহেব চ্যাঁচাতে লাগলেন, আর তা শুনে লোকজন ছুটে এসে তাঁকে বাঁচাল, নইলে সে দিন বানর দেখে নিত, তাঁর পেটের ভিতরে কি আছে!

কুকুর যে তার ঘা চাটে, সেও এক রকম ডাক্তারি বলতে হবে। আমাদের কুকুর ছানাটার কানে ঘা হয়েছিল; তার মা রোজ বসে সেই ঘা চাটত। অবশ্য আমরাও ওষুদ দিতাম। তাতেই ঘা সারল, না, চাটাতে সারল, সে কথা বলতে পারি না।

বাঘের ঘা হলে নাকি, সে নানান জিনিস নিয়ে তার ভিতর গুঁজতে থাকে, আর তাই নাকি তার ঘা সারেও না। এটা ডাক্তারির সামিল কিনা, সে কথা বলা একটু শক্ত। আর কাঁচ পোকা যে হুল ফুটিয়ে আরশুলাকে অবশ করে, তাকেও ডাক্তারি না বলে বরং ডাকাতি বলাই ভাল।

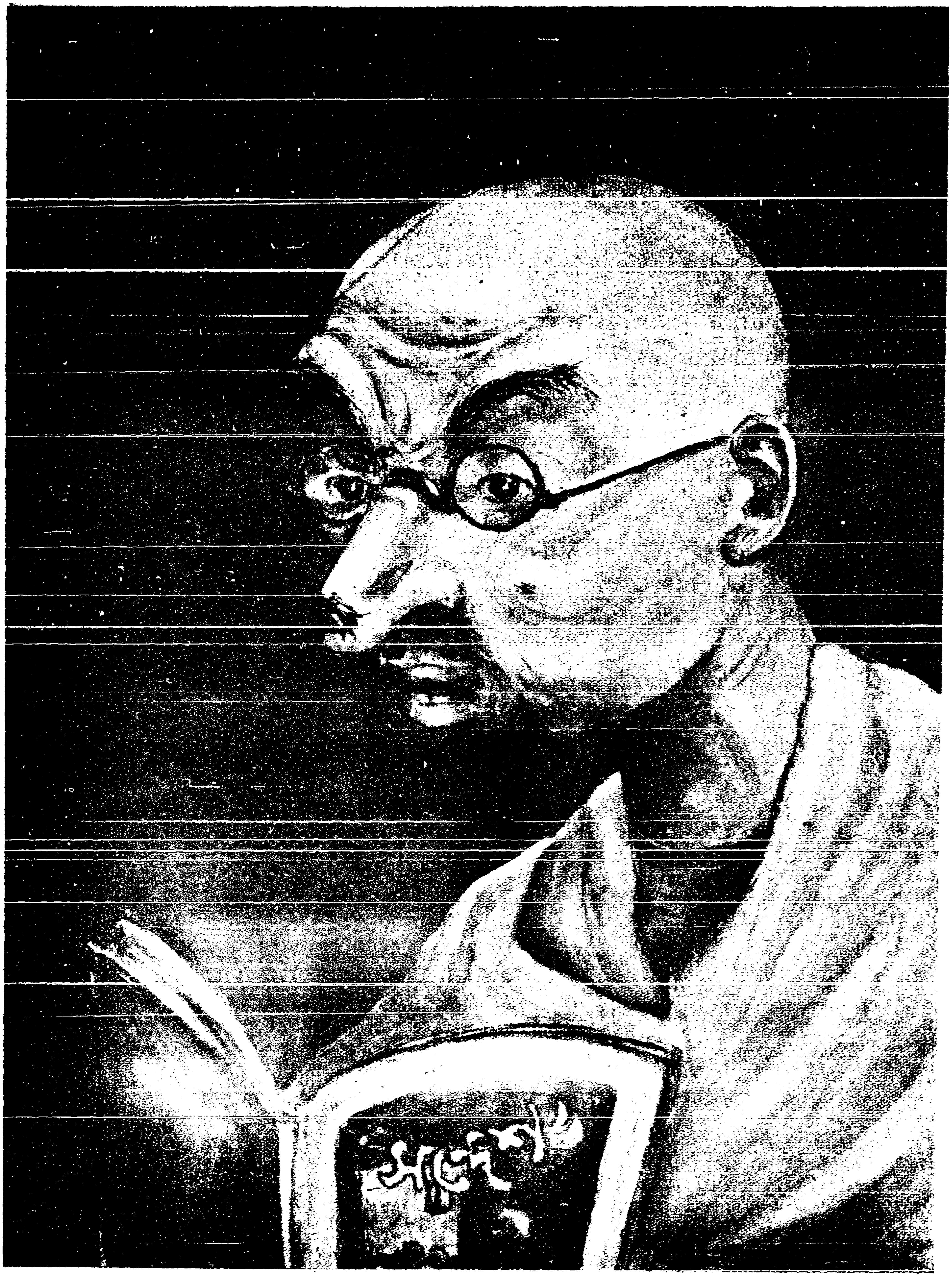

সন্দেশের গন্ধে বুঝি দৌড়ে এলে মাছি? কেন ভন্ ভন্ হাড় জ্বালাতন ছেড়ে দেওনা বাঁচি!
নাকের গোড়ায় সুড়্‌সুড়ি দাও শেষটা দিবে ফাঁকি? সুযোগ বুঝে সুড়ুৎ ক'রে হুল ফোটাবে নাকি?

নূতন বৎসর।

'নূতন বছর! নূতন বছর!' সবাই হাঁকে সকাল সাঁঝে,
আজ্‌কে আমার সূর্য্যি মামার মুখটি জাগে মনের মাঝে।
মুস্কিলাসান্ করলে মামা, উস্কিয়ে তার আগুন খানি,
ইস্কুলেতে লাগ্‌ল তালা, থাম্‌ল সাধের পড়ার ঘানি।

একজামিনের বিষম ঠেলা চুক্‌ল রে ভাই, ঘুচ্‌ল জ্বালা,
নূতন সালের নূতন তালে হো'ক্ তবে আজ 'হকীর' পালা।
কোন্‌খানে কোন্ মেজের কোণে, কলম কানে, চস্‌মা নাকে,
বিরামহারা কোন্ বেচারা দেখেন কাগজ, ভয় কি তাঁকে?

অঙ্কে দিবেন হকীর গোলা, শঙ্কা ত নাই তাহার তরে,
তঙ্কা হাজার মিলুক তাঁহার, ডঙ্কা মেরে চলুন ঘরে।
দিনেক যদি জোটেন খেলায় সাঁঝের বেলায় মাঠের মাঝে,
'গোল্লা' পেয়ে ঝোল্লা ভরে আবার না হয় যাবেন কাজে!

আয় তবে আয়, নবীন বরষ! মলয় বায়ের দোলায় দুলে,
আয় সঘনে গগন বেয়ে, পাগ্‌লা ঝড়ের পালটি তুলে।
আয় বাঙ্গালার বিপুল মাঠে, শ্যামল ধানের ঢেউ খেলিয়ে,
আয়রে সুখের ছুটির দিনে, আম কাঁটালের খবর নিয়ে!

আয় দুলিয়ে তালের পাখা, আয় বিছিয়ে শীতল ছায়া,
পাখীর নীড়ে চাঁদের হাটে আয় জাগিয়ে মায়ের মায়া।
তাতুক না মাঠ, ফাটুক না কাঠ, ছুটুক না ঘাম নদীর মত,
জয় হে তোমার, নূতন বছর! তোমার যে গুণ, গাইব কত?

পুরাণ বছর মলিন মুখে যায় সকলের বালাই নিয়ে,
ঘুচ্‌ল কি ভাই মনের কালী সেই বুড়োকে বিদায় দিয়ে?
নূতন সালে নূতন বলে, নূতন আশায়, নূতন সাজে,
আয় দয়ালের নাম লয়ে ভাই, যাই সকলে যে যার কাজে!

গুপী গাইন।

[চৈত্রের সন্দেশে লেখা হয়েছে—

'গুপী গাইন' বলে একটি লোক ছিল, সে একটা গান জান্‌ত। সে এমনই গাইত, যে তার গানের চোটে অস্থির হয়ে গাঁয়ের লোকেরা তাকে তাড়া কর্‌ল। সে বেচারা গাঁ থেকে পালিয়ে গিয়ে বনের মধ্যে তার গলা ভাঁজ্‌ত।

সেই গ্রামে 'বাঘা বাইন' বলে আরেকটি লোক ছিল, সেও খুব ঢোল বাজাতে পার্‌ত। তারও বাজনার চোটে গাঁয়ের লোক অস্থির হয়ে, তাকে দিল গাঁ থেকে তাড়িয়ে। সে বেচারিও বনে গিয়ে তার ঢোল বাজাত।

একদিন "গুপী গাইন" আর 'বাঘা বাইনে' দেখা হল, আর তারা ঠিক কর্‌ল যে রাজামশাইকে গিয়ে তাদের গান বাজনা শুনাবে।]

গুপীর আর বাঘার মনে এখন খুবই আনন্দ, তারা রাজাকে গান শোনাতে যাবে। দুজনে হাসতে হাসতে আর নাচতে নাচতে এক প্রকাণ্ড নদীর ধারে এসে উপস্থিত হল; সেই নদী পার হয়ে রাজবাড়ী যেতে হয়।

নদীতে খেয়া আছে, কিন্তু নেয়ে পয়সা চায়! বেচারারা বন থেকে এসেছে, পয়সা কোথায় পাবে? তারা বল্ল, "ভাই, আমাদের কাছে ত পয়সা টয়সা নাই, আমরা না হয় তোমাদের গেয়ে বাজিয়ে শোনাব; আমাদের পার করে দাও।" তাতে খেয়ার চরণদারেরা খুব খুসী হয়ে নেয়েকে বল্ল, "আমরা চাঁদা করে এদের পয়সা দিব, তুমি এদের তুলে নাও।"

বাঘার ঢোলকটি দেখেই নেয়ের ও তার বাজনা শুনতে ভারী সাধ হয়েছিল, কাজেই সে একথায় আর কোন আপত্তি করল না। গুপীকে আর বাঘাকে তুলে নিয়ে নৌকা ছেড়ে দেওয়া হল। নৌকা ভরা লোক, বসে বাজাবার জায়গা কোথায় হবে? অনেক কষ্টে সকলের মাঝখানে খানিকটা জায়গা হতে হতে নৌকাও নদীর মাঝখানে এসে পড়ল। তারপর খানিক একটু গুণগুণিয়ে গুপী গান ধরল, বাঘা তার ঢোলকে লাঠি লাগাল, আর অমনি নৌকা শুদ্ধ সকল লোক বিষম চমকে গিয়ে গড়াগড়ি আর জড়াজড়ি করে দিল নৌকা খানাকে উল্টে।

তখন ত আর বিপদের অন্তই নাই। ভাগ্যিস বাঘার ঢোলটি এত বড় ছিল, তাই আঁকড়ে ধরে দুজনার প্রাণ রক্ষা হল। কিন্তু তাদের আর রাজবাড়ী যাওয়া ঘটল না। তারা সারাদিন সেই নদীর স্রোতে ভেসে ভেসে শেষে সন্ধ্যা বেলায় এক ভীষণ বনের

ভিতরে গিয়ে কূলে ঠেকল। সে বনে দিনের বেলায় গেলেই ভয়ে প্রাণ উড়ে যায়, রাত্রির ত আর কথাই নাই। তখন বাঘা বল্ল, "গুপী দা' বড়ই ত বিষম দেখ্ছি! এখন কি করি বল ত!" গুপী বল্ল, "করব আর কি? আমি গাইব, তুমি বাজাবে! নিতান্তই যখন বাঘে খাবে, তখন আমাদের বিদ্যেটা তাকে না দেখিয়ে ছাড়ি কেন?"

বাঘা বল্ল, "ঠিক বলেছ দাদা! মরতে হয় ত ওস্তাদলোকের মতন মরি; পাড়াগেঁয়ে ভূতের মত মরতে রাজী নই!"

এই বলে দুজনায় সেই ভিজা কাপড়েই প্রাণ খুলে গান বাজনা সুরু করল। বাঘার ঢোলটি সেদিন কি না ভিজে ছিল, তাইতে তার আওয়াজটি হয়েছিল যার পর নাই গম্ভীর। আর গুপীও ভাবছিল, এই তার শেষ গান, কাজেই তার গলার আওয়াজটিও খুবই গম্ভীর হয়েছিল। সে গান যে কি জমাট হয়েছিল, সে আর কি বলব? এক ঘণ্টা দু ঘণ্টা করে দুপুর রাত হয়ে গেল, তবু তাদের সে গান থামছেই না।

এমন সময় তাদের দুজনারই মনে হল যেন, চার দিকে একটা কি কাণ্ড হচ্ছে। ঝাপসা ঝাপসা, কালো কালো, এই বড় বড় কি যেন সব গাছের উপর থেকে উঁকি মারতে লেগেছে; তাদের চোখগুলো জ্বলছে, যেন আগুনের ভাঁটা, দাঁতগুলো বেরুচ্ছে যেন মূলোর সার! তা দেখে তখনই আপনা হতে বাঘার বাজনা থেমে গেল; তার সঙ্গে সঙ্গে দুজনার হাত পা গুটিয়ে, পিঠ বেঁকে, ঘাড় বসে, চোখ বেরিয়ে, মুখ হাঁ করে এল। তাদের গায় এমনি কাঁপুনি আর দাঁতে এমনি ঠক্ঠকি ধরে গেল যে আর তাদের ছুটে পালাবারও যো রইল না।

ভূতগুলি কিন্তু তাদের কিছু করল না। তারা তাদের গান বাজনা শুনে ভারী খুসী হয়ে এসেছে, তাদের রাজার ছেলের বিয়েতে গুপীর আর বাঘার বায়না করতে। গান থামতে দেখে তারা নাকি সুরে বল্ল, "থাম্লি কেন বাপ? বাজা, বাজা, বাজা!"

একথায় গুপীর আর বাঘার একটু সাহস হল; তারা ভাবল, "এ ত মন্দ মজা নয়, তবে একটু গেয়েই দেখিনা।" এই বলে যেই তারা আবার গান ধরেছে, অমনি ভূতেরা একজন দুজন করে গাছ থেকে নেমে এসে তাদের ঘিরে নাচতে লাগল।

সে যে কি কারখানা হয়েছিল, সে কি না দেখলে বুঝবার যো আছে? গুপী আর বাঘা তাদের জীবনে আর কখনো এমন সমজ্জদারের দেখা পায় নি। সে রাত এমনি ভাবেই কেটে গেল। ভোর হলে ত আর ভূতেদের বাইরে থাকবার যো নাই, কাজেই তার একটু আগে তারা বল্ল, "চল্ বাবা, মোদের গোদার বেটার বে'তে! তোদের খুসী করে দিব।"

গুপী বল্ল, “আমরা যে রাজবাড়ী যাব!” ভূতেরা বল্ল, “সে যাবি এখন, আগে মোদের বাড়ী একটু গান বাজনা শুনিয়ে যা! তোদের খুসী করে দিব।” কাজেই তখন তারা দু জনে ঢোল নিয়ে ভূতেদের বাড়ী চল্ল। সেখানে গান বাজনা যা হল, সে আর বলে কাজ নাই। তারপর তাদের বিদায় করবার সময় ভূতেরা বল্ল, “তোরা কি চাস?”

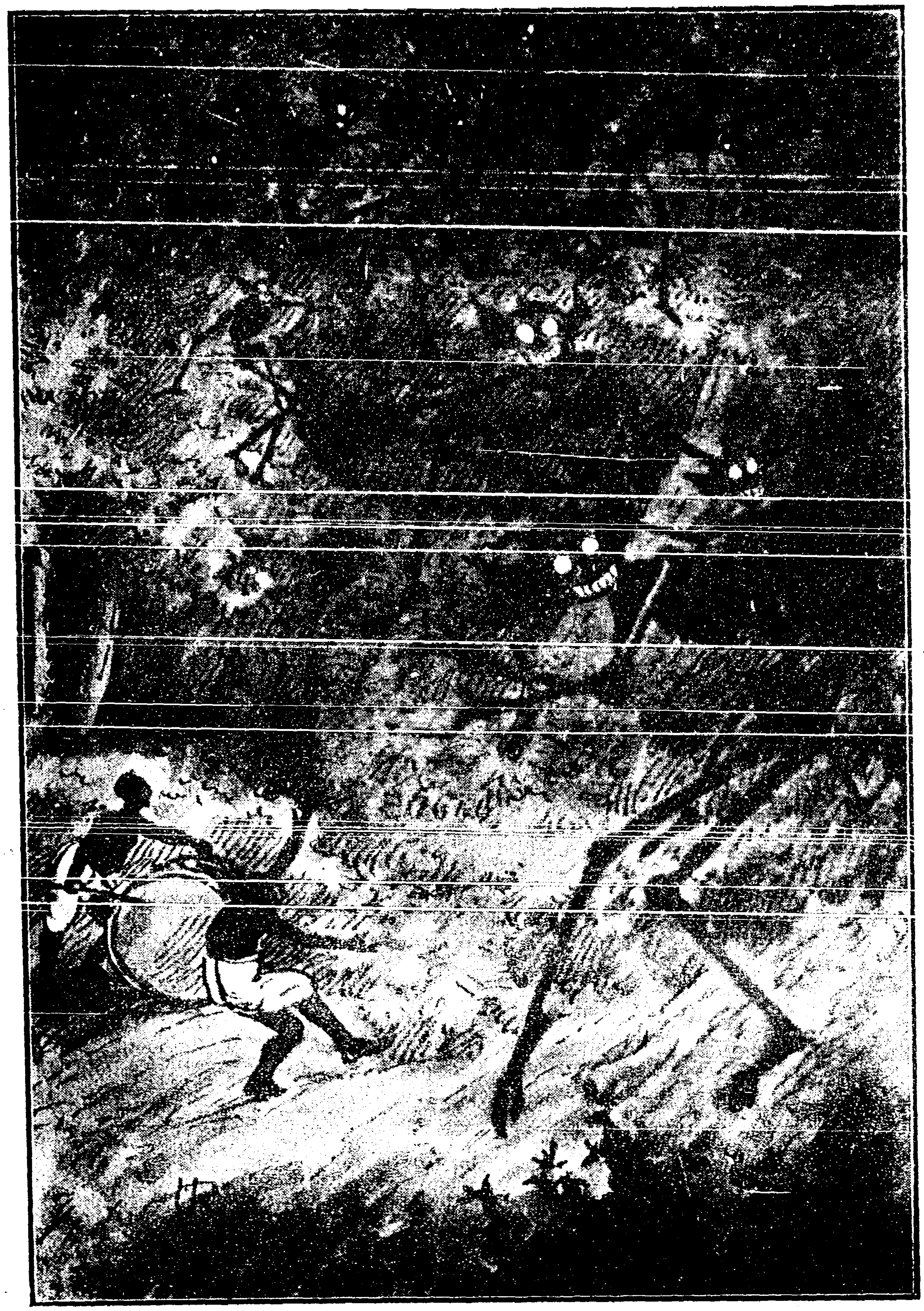

গুপী বল্ল, “আমরা এই চাই যে আমরা যেন গেয়ে বাজিয়ে সকলকে খুসী করতে পারি!” ভূতেরা বল্ল, “তাই হবে; তোদের গান বাজনা শুনলে আর সে গান শেষ হওয়ার আগে কেউ সেখান থেকে উঠে যেতে পারবে না। আর কি চাস?”

গুপী বল্ল, “আর এই চাই যে, আমাদের যেন খাওয়া পরার কষ্ট না হয়।” এ কথায় ভূতেরা তাদের একটি থলে দিয়ে বল্ল, “তোরা যখন যা খেতে বা পরতে চাস, এই থলের ভিতরে হাত দিলেই তা পাবি। আর কি চাস?”

গুপী বল্ল, “আর কি চাইব, তা ত বুঝতে পারছি না!” তখন ভূতেরা হাসতে হাসতে তাদের দু জনকে দু যোড়া জুতা এনে দিয়ে বল্ল, “এই জুতা পায় দিয়ে তোরা যেখানে যেতে চাইবি, অমনি সেখানে গিয়ে হাজির হবি।”

তখন ত আর কোন ভাবনাই রইল না। গুপী আর বাঘা ভূতেদের কাছে বিদায় হয়ে, সেই জুতা পায়ে দিয়েই বল্ল, "তবে আমরা এখন রাজ বাড়ী যাব!" অমনি সেই ভীষণ বন কোথায় যেন মিলিয়ে গেল; গুপী আর বাঘা দেখল, তারা দু জন একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এত বড় আর এমন সুন্দর বাড়ী তারা তাদের জীবনে কখনো দেখেনি। তারা তখনই বুঝতে পারল যে, এ রাজবাড়ী!

কিন্তু এর মধ্যে ভারী একটা মুস্কিল হল। রাজ বাড়ীর ফটকে যমদূতের মত কতগুলো দরোয়ান দাঁড়িয়ে ছিল, তারা গুপী আর বাঘাকে সেই ঢাল নিয়ে আসতে দেখেই দাঁত খিঁচিয়ে বল্ল, "এইয়ো! কাঁহা যাতা হ্যায়?" গুপী থতমত খেয়ে বল্ল, "বাবা, আমরা রাজা মশাইকে গান শোনাতে এসেছি!" তাতে দরোয়ান গুলো আরো বিষম চটে গিয়ে লাঠি দেখিয়ে বল্ল, "ভাগো হিঁয়াসে!" গুপীও তখন নাক সিট্‌কিয়ে বল্ল "ঈস্! আমরা ত রাজার কাছে যাবই!" বল্‌তেই অমনি সেই জুতার গুণে, তারা তৎক্ষণাৎ গিয়ে রাজা মশাইয়ের সামনে উপস্থিত হল।

ক্রমশঃ

ডুবুরী।

জলের তলায় ডুব দিয়ে যাদের কাজ কর্‌তে হয়, তাদের বলে ডুবুরী। লোকে যে সকল দামী মুক্তা দিয়ে গহনা বানায় সেই মুক্তাগুলি জন্মায় সমুদ্রের নীচে এক জাতীয় ঝিনুকের মধ্যে। ঝিনুক থেকে এক রকম রস বেরিয়ে খোলার মধ্যে ফোড়ার মত হ'য়ে জমে থাকে—তাকে আমরা বলি "মুক্তা"। সব চেয়ে বড় আর ভাল যে সব মুক্তা, সেগুলি জন্মায় এক রকম পোকার উৎপাতে। সেই পোকার কেমন বদ্ অভ্যাস, সে সুবিধা পেলেই ঝিনুকের খোলার মধ্যে ঢুকে ঝিনুক বেচারাকে অস্থির করে তোলে। ঝিনুকও তখন বেশ ক'রে রস ঢেলে দিয়ে তাকে জীয়ন্ত কবর দিয়ে রাখে। সেই পোকার কবরগুলিকে ডুবুরীরা সমুদ্রের তলা থেকে কুড়িয়ে আনে, আর সৌখিন লোকে হাজার হাজার টাকা দিয়ে সেগুলি কিনে যত্ন ক'রে তুলে রাখে!

যে সব মুক্তা অল্পজলে থাকে ডুবুরীরা কেবল সেইগুলিকেই আন্‌তে পারে—কারণ, বড়-জোর দেড়শ' হাতের বেশী এ পর্য্যন্ত কোন ডুবুরীই নামতে পারেনি। এমন অনেক ডুবুরী আছে যারা শুধু একটা পাথর-বাঁধা দড়ি নিয়ে দম বন্ধ ক'রে প্রায় দেড় মিনিট কি দু মিনিট ৩০।৪০ হাত জলের নীচে থাক্‌তে পারে। কিন্তু আজ কালকার ডুবুরীরা এক রকম অদ্ভুত পোষাক প'রে জলে নামে। ছবিতে দেখ, ডুবুরীর পিঠে একটা দড়ি বাঁধা; তাই টেনে ডুবুরি উপরের লোকদের ইশারা করে আর তারা তাকে উঠায় নামায়। ডুবুরীর মাথায় একটা লোহার মুখোস্—তাতে পুরু কাঁচের জানালা বসান, তাই দিয়ে সে দেখ্‌তে পায়—আর টুপির আগায় একটা নল, তা দিয়ে উপর থেকে বাতাস আসে, তবে সে নিশ্বাস ফেল্‌তে পারে। পোষাকটি এমন যে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কোনখান্ দিয়ে এক ফোঁটাও জল ঢুক্‌তে পারে না। ডুবুরীদের পায়ে প্রকাণ্ড ভারি শীসার জুতো আর পিঠেও শীসার বোঝা। জলের নীচে কাজ করার বিপদ অনেক রকম! প্রথম ভয় এই যে যদি পোষাকের মধ্যে কোন রকমে জল ঢুক্‌তে পারে তবে ডুবুরীকে পিষে থ্যাৎলা ক'রে ফেল্‌বে। পোষাকটিকে সমস্তক্ষণ বাতাস দিয়ে ফুটবলের মত পাম্প্ ক'রে রাখ্‌তে হয়—তা হ'লেই ডুবুরী আর জলের চাপ টের পায় না। ঐ জোরে-পাম্প্-করা বাতাস

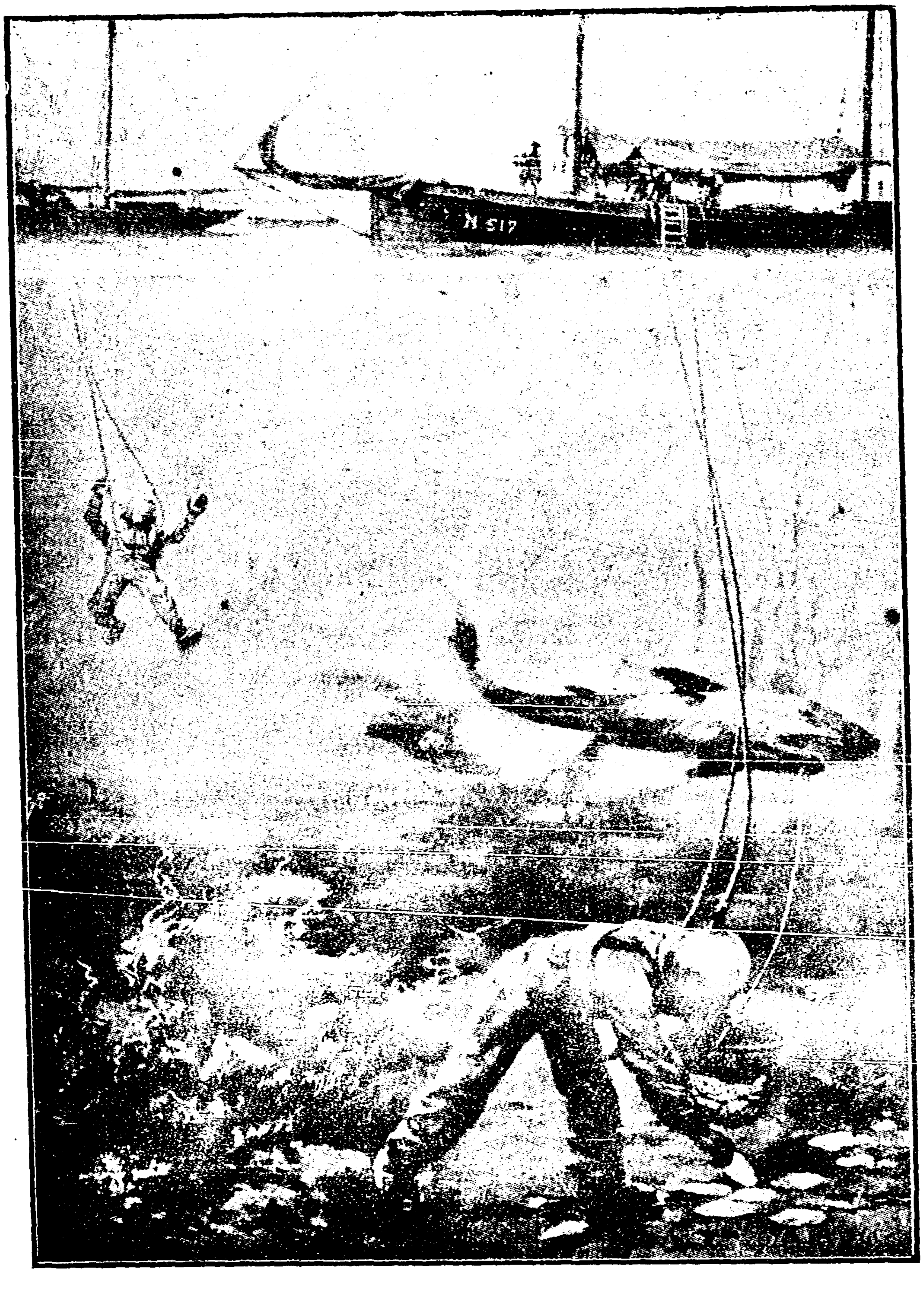

যখন পোষাকের মধ্যে ঢোকে তখন ডুবুরীর গায়ের সমস্ত রক্ত আর রস বোতলে-পোরা সোডাওয়াটারের মত সেই বাতাস শুষে নেয়। এ অবস্থায় যদি তাকে হঠাৎ উপরে টেনে তোল, তবে সোডার বোতল খুল্‌লে যা হয় তার শরীরের মধ্যে তেম্‌নি একটা কাণ্ড চল্‌তে থাকে। এই রকমে কত লোক মারা গেছে। সেই জন্য তুল্‌বার সময়ে খুব সাবধানে আস্তে আস্তে দড়ি টান্‌তে হয় আর মাঝে মাঝে থামাতে হয়। যদি পোষাকটি ভাল ক'রে এঁটে পরা না হয়, আর শীসার বোঝাটি কোন রকম খুলে যায় তবে ডুবুরি তৎক্ষণাৎ বিদ্যুতের মত ছিট্‌কিয়ে উপরে ভেসে উঠ্‌বে; তাতেও তার হাড় গোড় চূরমার হয়ে যেতে পারে। এসব ছাড়া হাঙ্গর বা অন্য জল জন্তুর ভয় ত আছেই। ডুবুরীরা হাঙ্গরের চাইতেও ভয় করে 'অক্টোপাস্'কে। গত বছরে সন্দেশে এ জন্তুর কথা বলা হ'য়েছে। পিটার স্নেল্ একজন নামজাদা ডুবুরী ছিল। সে একবার জলে নাম্‌তেই একটা প্রকাণ্ড 'অক্টোপাস্' শুঁড়ের মত আট পা বাড়িয়ে তাকে জড়িয়ে ধর্‌ল। ভয়ে স্নেল্ পাগলের মত ছুরি চালাতে চালাতে তার দড়ি ধ'রে প্রাণ-পণে টান্‌তে লাগ্‌ল। অনেক টানাটানির পর যখন তাকে প্রায় আদমরা অবস্থায় উপরে তোলা হ'ল, তখনও জানোয়ারটার কয়েকটা কাটা পা তার গায় লেগে ছিল! তার ওজন প্রায় আধ মণ!

আর একটি জিনিষ আছে, যাকে ডুবুরি দিয়ে কুড়িয়ে এনে লোকে তার ব্যবসা করে। তাকে আমরা বলি 'স্পঞ্জ' (Sponge)—সেই যে ফুঁটোওয়ালা নরম জিনিষ,

যাতে জল শুষে নেয় আবার চাপ দিলে জল বেরিয়ে যায়। স্পঞ্জ জিনিষটা এক রকম অদ্ভুত জলজন্তুর খোলস বা কঙ্কাল বা বাসা—যা ইচ্ছা বল্‌তে পার! সমুদ্রের তলায় স্পঞ্জের দল সার বেঁধে মাটি আঁক্‌ড়িয়ে প'ড়ে থাকে ডুবুরীরা তাকে সেখান থেকে ছিনিয়ে আনে।

রাউল নামে একজন লোক স্পঞ্জ্‌ তুলবার জন্য এক রকম ডুবুরী গাড়ী তৈরী ক'রেছেন। দুজন ডুবুরী তার মধ্যে স্বচ্ছন্দে বস্‌তে পারে। স্পঞ্জ্‌ দেখ্‌বার জন্য গাড়ীর সাম্‌নে একটা উজ্জ্বল আলো থাকে। গাড়ীর নীচে চাকা আর পিছনে দুটা দাঁড়, তাতেই তার চলাফিরা চলে। আর সাম্‌নে ডাণ্ডার আগায় ঐ যে একটা হাঁ-করা মতন জিনিষ আছে—ঐটা দিয়ে স্পঞ্জ্‌ আঁক্‌ড়ে আনে।

আজকাল ডুবুরীর পোষাকের নানারকম উন্নতি হ'য়েছে—কোনটার পিঠে বাতাসের বন্দোবস্ত, তার আলাধা নল লাগে না, কোনটার মধ্যে টেলিফোনের কল, উপরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চলে—আর কোনটার এমন সুবিধা আছে যে ডুবুরী ইচ্ছা কর্‌লে কারও সাহায্য ছাড়াই উপরে উঠ্‌তে পারে।

চন্দ্র আর সূর্য্য।

ছেলেবেলায় শুনিতাম, চাঁদ আর সূর্য্য নাকি দুই ভাই,—আর তাঁহারা নাকি আমাদের মামা হন। এখনো আমরা চাঁদা মামা আর সূর্য্যি মামার কথা শুনিতে পাই। ইঁহারা যদি আমাদের মামা, তবে ইঁহাদের মা অবশ্য আমাদের দিদিমা। কিন্তু সে দিদিমা যে কোথায় থাকেন, কাহার মেয়ে, কোন্ ঘরের বৌ, তাহার কথা কিছুই শুনিতে পাই নাই।

যাহা হউক, তাঁহার সম্বন্ধে একটা খবর জানা গিয়াছে; একদিন নাকি তিনি সূর্য্যি মামার উপর ভারী চটিয়াছিলেন। সেদিন কাহাদের বাড়ীতে যেন মামাদের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। নিমন্ত্রণে যাইবার সময় দিদিমা তাঁহাদিগকে বলিলেন, "বাছা, তোমরা সেখানে গিয়া যাহা কিছু খাইবে, আঙ্গুলের আগায় করিয়া তাহার কিছু কিছু নমুনা আনিতে ভুলিও না।" নিমন্ত্রণ খাইতে খাইতে সেকথা সূর্য্যি মামা ভুলিয়া গেলেন, কিন্তু চাঁদা মামা ভুলিলেন না। খাওয়াদাওয়ার পর সূর্য্যি মামা আঁচাইয়া ফেলিলেন, আর চাঁদা মামা এঁটো হাতেই বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। তারপর যখন দিদিমা খাবার জিনিষের নমুনা দেখিতে চাহিলেন, তখন সূর্য্যি মামার শুধু মাথা চুলকানই সার হইল। চাঁদা মামার এঁটো হাত, তাহাতে সে ভোজের ডাল তরকারী, মিঠাই মণ্ডা সকলই লাগিয়া রহিয়াছে, সুতরাং তাঁহার নমুনা দেখাইতে কোন মুস্কিলই হইল না। তখন দিদিমা খুসী হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "বাবা, তুমি ঠাণ্ডা জায়গায় আরামে থাক!" আর সূর্য্যি মামাকে শাপ দিলেন, "তুমি বিষম তাপে জ্বালাতন হও।"

আমি শুধু গল্পটিই বলিলাম, ইহার প্রমাণ আমি দিতে পারিব না। একজন খুব বুড়া মানুষ একথা আমাকে বলিয়াছিল। তখন আমি খুবই ছোট ছিলাম; কথায় কথায় প্রমাণ খুঁজিবার বাতিক আমার তখনও হয় নাই। তবে, চন্দ্র যে ঠাণ্ডায় থাকেন, আর সূর্য্য তাপে সারা হন, তাহা ত প্রত্যক্ষই দেখিতেছ।

আমি বলিলাম, দিদিমার পরিচয় পাই নাই। একথা কতক ঠিক, সম্পূর্ণ ঠিক নহে। চন্দ্র ও সূর্য্যের মা যে একজন নহে, ইহা আমাদের পুরাণে স্পষ্টই দেখা যায়। সূর্য্য হইলেন অদিতি আর কশ্যপের পুত্র, এজন্য তাঁহার দুই নাম আদিত্য আর কাশ্যপেয়। ইহা হইতে একটি দিদিমার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু চন্দ্র

ইঁহাদের সন্তান নহেন, তিনি সমুদ্রমন্থনের সময় জল হইতে উঠিয়াছিলেন, তাই তিনি 'ক্ষীরোদার্ণবসম্ভব।'

চন্দ্র যে 'ক্ষীরোদার্ণব সম্ভব', এই কথাটার ভিতরে একটুখানি সত্য আছে। এখনকার পণ্ডিতেরাও বলেন যে চন্দ্র এই পৃথিবীর ভিতর হইতে বাহির হইয়াছিল। তবে দেখিতেছি, চাঁদের মাতা আমাদের এই পৃথিবী।

আর পৃথিবীর জন্ম সূর্য্য হইতে, এ কথাও পণ্ডিতেরা বলেন, সুতরাং সূর্য্য পৃথিবীর পিতা, আর চন্দ্রের—দাদামহাশয়। বাস্তবিক আমরা যে ইঁহাদিগকে মামা বলি, এ কাজটি ঠিক নয়। কেন না, পৃথিবী ত আমাদেরও 'মাতা বসুন্ধরা', সুতরাং চন্দ্র আমাদের দাদা, আর সূর্য্য দাদা মহাশয়। বাঃ! 'চাঁদা দাদা'! শুনিতে কেমন লাগে?

মামাই হউন, আর দাদাই হউন, ইঁহারা আমাদের নিতান্তই আপনার লোক; ইঁহাদিগকে ছাড়িয়া আমাদের কাজ চলে না। সূর্য্য নিভিলে আমরা এখনই মরিয়া যাইব। চন্দ্র গেলে আমাদের খুকুমণিদের তুলনা কোথায় পাইব? উহাদের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জোয়ার ভাঁটা যাইবে, দিন রাত যাইবে, পাঁজি পুঁথি সব যাইবে।

অবিচার করা আমার অভিপ্রায় নহে, কিন্তু তথাপি একথা মানিতে হয় যে সূর্য্যের চেয়ে চন্দ্রকেই আমাদের লাগে ভাল। বোধ হয় চিরকালই লোকে চাঁদকে অধিক পছন্দ করিয়া আসিয়াছে। হয় ত উহার গতি বিধিই আগে ভাল করিয়া বুঝিয়াছিল, তাই বোধ হয় ক্রিয়া কলাপ অধিকাংশই চাঁদের হিসাবে হয়।

তাই বলিয়া সূর্য্য তুচ্ছ করিবার বস্তু নয়। আমাদের প্রাচীন ঋষিরা সূর্য্যকে বড়ই ভক্তি করিতেন। আমাদের পাঁঞ্জিকায় উভয়েরই প্রায় তুল্য সম্মান দেখা যায়, কেন না, তাহার হিসাবে উভয়েরই সমান প্রয়োজন।

'দিনের' হিসাব আমরা সূর্য্য হইতে পাইয়াছি, আর বোধ হয় উহাই আমাদের প্রথম সময়ের হিসাব। 'মাস' আসিয়াছে চাঁদ হইতে; 'মাস্' শব্দের অর্থই 'চাঁদ'। চাঁদের যে আশ্চর্য্যরূপ হ্রাস বৃদ্ধি হয়, এ ব্যাপার লোকের চক্ষে না পড়িয়াই থাকিতে পারে না। ইহা হইতেই লোকে গণিতে শিখিল,—পোনের দিনে 'পক্ষ,' ত্রিশ দিনে 'মাস'। এ হিসাবটি লোকের খুবই কাজে লাগিল। মাঝিরা ইহা দ্বারা জোয়ার ভাঁটার তাল রাখিতে লাগিল। তাহারা বুঝিল, অষ্টমীতে জোয়ার মন্দা হয়, পূর্ণিমা অমাবস্যায় বাড়ে। তখন ঝড় বৃষ্টিরও সম্ভাবনা হয়, 'বেতো' রোগীর হাত পাও কন্ কন্ করে।

আমাদের পূজা পার্ব্বণ প্রায়ই চাঁদের হিসাবে হয়, আর গ্রীষ্ম বর্ষাদি স্বাভাবিক ব্যাপার ঘটে সূর্য্যের হিসাবে। এই ঋতু পরিবর্ত্তনের ব্যাপার হইতেই আমরা বৎসরের হিসাব পাইয়াছি। চাষবাসের সকল কাজ এই ঋতু পরিবর্ত্তনের উপর নির্ভর করে, কাজেই ইহার প্রতি লোকের নজর না রাখিলে চলে না। ইহা হইতেই ক্রমে বৎসরটি ধরা পড়িল, কেন না, সকলেই বুঝিল যে ঠিক এক বৎসর পরে পরে এই সকল ঋতু আবার ফিরিয়া আসে। দিন বড় হয়, রাত ছোট হয়, আবার রাত বাড়ে, দিন কমে; সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্য উত্তর হইতে দক্ষিণে আনা গোনা করে, আর তাহার ভিতর দিয়া কেমন করিয়া শীত গ্রীষ্ম রোদ বৃষ্টির পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে।

শীতের পরে যে দিন, দিন রাত ঠিক সমান হয়, সেই দিন হইতে লোকে বৎসর গণিতে আরম্ভ করিয়া দেখিল যে ৩৬৫ দিন অন্তে আবার শীতের পর সমান দিবারাত্রির দিনটি ফিরিয়া আসে, মাঝখানে, বর্ষা শেষে, আর একটি সমান দিবারাত্রির দিন পাওয়া যায়। এই হিসাবটি টের পাওয়ায় কাজের বড়ই সুবিধা হইল।

দেখা গেল যে, চাঁদের আর সূর্য্যের, উভয়ের হিসাব রাখারই খুব দরকার; সুতরাং লোকে এই দুইটি হিসাব মিলাইয়া লইতে চেষ্টা করিল। সেই হইতে আমরা বলিতে শিখিলাম, 'বারো মাসে এক বৎসর'। আসলে কিন্তু বারো মাসে ঠিক এক বৎসর নহে। দুই পক্ষে, অর্থাৎ ৩০ দিনে, একটি মাস ধরিলে বারো মাসে ৩৬০ দিন হয়; কিন্তু বৎসরের পরিমাণ ৩৬৫ দিন। সুতরাং এ দুটি হিসাবে অবিকল মিল রাখা কঠিন কাজ।

তোমরা জান যে আমাদের মাসগুলি সকল স্থলে ত্রিশ দিনে হয় না, কম বেশী আছে। আসলে এগুলি এক একটি 'রাশির' স্থিতি কাল। সূর্য্য এক এক মাসে আকাশের যে স্থানে থাকেন, তাহাই এক একটি 'রাশি'। বারো মাসে তিনি এইরূপ বারোটি রাশির ভিতর দিয়া ঘুরিয়া আসেন। এক এক রাশিতে তাঁহার যে কয়দিন থাকা হয়, তাহাকেই মোটের উপর একটি মাস ধরিয়া দুই হিসাবের কতক মিল রাখা হইতেছে। ইহাতে কয়েক বৎসর পর পর চাঁদের হিসাবে একটি মাস বাড়িয়া যায়; সেই মাসটিকে সে হিসাব হইতে বাদ দিয়া আবার দুই হিসাব মিলান হয়।।

সৎমেয়ে।

এক সৎমা আর তার দুই ঝগড়াটে মেয়ে ছাড়া লক্ষ্মীর আর কেউ ছিল না। লক্ষ্মী তার সৎমাকে বড্ড ভালবাসত, সর্ব্বদা তাঁর কাছে থাকত, আবার সৎমাও তাকে তাঁর নিজের মেয়েদের চাইতে বেশী ভালবাস্‌তেন, কারণ লক্ষ্মী দেখতে যেমন সুন্দর তার স্বভাবটিও তেমনি মিষ্টি। সৎমার মেয়ে দুটো হতভাগার একশেষ, তাদের কেন এটা সহ্য হবে ? তারা কেবল লক্ষ্মীকে কষ্ট দিত আর তাকে হাবী ব'লে ডাক্‌ত।

একদিন লক্ষ্মী বাড়ী ছিল না, এমন সময় সেই দুষ্টু মেয়ে দুটো তাদের মার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে তাঁকে এক ধাক্কা দিয়ে উনানের মধ্যে ফেলে দিল। তার মা পুড়ে মারা গেলেন। তখন মেয়ে দুটো ধরা পড়বার ভয়ে তাঁকে লুকিয়ে ফেল্‌ল। লক্ষ্মী বাড়ী ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করলে তারা বল্ল "মা কোথা গেছেন আমরা জানি না"। লক্ষ্মীর মনে কিন্তু কেমন সন্দেহ হ'ল।

তারপর একদিন বোন দুটো করল কি বাইরের উঠানে খড়ের গাদার মধ্যে কুড়িটা ছুঁচ্ ফেলে দিয়ে লক্ষ্মীকে বল্ল—"দেখ্ হাবী সন্ধ্যের মধ্যে যদি তুই ছুঁচ্‌গুলো খুঁজে বের করে এই টেবিলটার উপরে সাজিয়ে না রাখিস্ তাহলে তোকে মেরে ফেল্‌ব।" এই বলে দুই বোন বেরিয়ে গেল।

লক্ষ্মী বেচারি ঘরে বসে কেঁদে কেঁদে চোখ্ ফুলিয়ে ফেল্‌ল। এমন সময় ঘরে একটা বিড়াল এসে লক্ষ্মীকে বল্‌ল—"তুমি কেন কাঁদছ ? তোমার কি হয়েছে ?" লক্ষ্মী তাকে সব কথা বল্ল।

বিড়াল বল্ল—"তুমি চুপ করে বসে থাক আর কেঁদ না, আমি ছুঁচ্ খুঁজে এনে দিচ্ছি।" বিড়াল তখনি ছুঁচ্‌গুলো এনে লক্ষ্মীকে দিয়ে বল্ল—"আমি যা বলছি তা মন দিয়ে শুন—আমি তোমার মা। তোমার বোনেরা আমাকে মেরে ফেলেছিল, কিন্তু তুমি তাদের কোন অনিষ্ট করো না। তাদের কোন বিপদ হলে প্রাণপণে তাদের বাঁচাতে চেষ্টা করো। তাতে পরে তোমার খুব ভাল হবে।" এই বলে বিড়ালটা হঠাৎ কোথা চলে গেল।

সন্ধ্যার সময় বোনেরা বাড়ী ফিরে যখন দেখ্‌ল লক্ষ্মী ছুঁচ্ বের করে টেবিলে রেখেছে তখন তারা ভাবল নিশ্চয় হাবীকে কেউ এসে সাহায্য করেছে।

তারপর একদিন দুষ্টু বোন দুটো সেই যে বাড়ী ছেড়ে বেরুল আর ফির্‌ল না। তারা রাত্রেও বাড়ী এল না দেখে লক্ষ্মী তাদের সন্ধানে বের হলো। একে তাকে

জিজ্ঞাসা করে, এদিকে সেদিকে খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে সে এক যাদুকরী ডাইনীর বাড়ীতে উপস্থিত হ'ল।

এখন সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে, লক্ষ্মী দরজায় ঘা দিয়ে বল্ল—"কে আছ গো, দরজা খোল,—আমাকে একটু আশ্রয় দাও।"

ডাইনী বুড়ী বল্ল—"বাইরে ঠাণ্ডা! এই শীতের রাত্রে কি আশ্রয় না দিয়ে পারি—এসো ভিতরে। খানিক আগে আরো দুটি মেয়ে এসেছে, আমার মনে হয় হয়তো বা তুমি তাদেরই কেউ হবে।"

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর বুড়ী বল্ল—"তোমরা উপরে ঐ ডান দিকের ঘরটায় গিয়ে শোও।" তারপর যখন তার নিজের মেয়ে তিনটি শুতে চল্ল তখন লক্ষ্মী দেখ্‌ল যে বুড়ী তাদের গলায় ফিতে বেঁধে দিয়ে তাদের বল্ল—"তোরা ওদের সঙ্গে শুস্‌নে—বাঁ দিকের ঘরটায় শুয়ে থাক্।" এই কথা শুনে লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি তার বোনদের নিয়ে বাঁ দিকের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। বুড়ীর মেয়েরা যখন দেখ্‌ল বাঁ দিকের ঘরে অতিথ তিনটি শুয়েছে, তখন তারা আর কি করে? ডান দিকের ঘরে গিয়ে শুয়ে রইল।

রাত্রে যখন বুড়ীর মেয়েরা ঘুমিয়েছে তখন লক্ষ্মী আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে তাদের গলার ফিতে খুলে এনে তার বোনদের আর নিজের গলায় বেঁধে রাখল। খানিক পরেই সে শুন্‌তে পেল বুড়ী তার ছেলেকে বল্‌ছে—"যা, এখন ঐ যে মেয়ে তিনটে ডানদিকের ঘরে শুয়ে আছে তাদের মেরে আয়।"

ছেলে বল্ল—"মা, এ তিন জনকে ছেড়েই দাও না।" তা শুনে ডাইনী বুড়ী তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে তাকে গাল দিতে লাগ্‌ল। ছেলেটা তখন মায়ের ভয়ে লম্বা একটা ছুরি নিয়ে ডান পাশের ঘরে গিয়ে তিনটি মেয়েকেই কেটে ফেল্ল।

লক্ষ্মী যখন দেখল ডাইনী বুড়ী আর তার ছেলে ঘুমিয়ে পড়েছে তখন তার বোনদের জাগিয়ে সব কথা বল্ল। তখন আর কথাটি নাই তাড়াতাড়ি উঠে বুড়ীর বাড়ী ছেড়ে লক্ষ্মীর সঙ্গে তারা ছুটে ছুটে একটা সাঁকোর কাছে গিয়ে উপস্থিত। সাঁকোটার নাম ছিল "খুনীর সাঁকো"; যে খুনী সে কখনও এই সাঁকো পার হতে পারে না। সাঁকোর কাছে এসেই বোন দুটি থম্‌কে দাঁড়াল, সাধ্য নাই যে এক পাও এগিয়ে যায়।

লক্ষ্মী তখন বল্ল—"এখন সত্যি সত্যি জান্‌তে পার্‌লাম যে তোমরাই মাকে মেরেছ—তা না হলে খুনীর সাঁকো পার হতে পারছ না কেন?" এই বলে লক্ষ্মী

কাঁধে করে দুই বোনকে নিয়ে সাঁকো পার হয়ে গেল। ঠিক এই সময়ে ডাইনী বুড়ীও ওপাড়ে এসে উপস্থিত।

কিন্তু তারও সাধ্যি নেই যে "খুনীর সাঁকো" পার হয়। সে ওপার থেকে লক্ষ্মীকে গাল দিয়ে, বাড়ী ফিরে গেল।

ক্রমশ

আবোল তাবোল।

ওই আমাদের পাগ্‌লা জগাই, নিত্যি হেথায় আসে ;
আপন মনে গুন্‌গুনিয়ে মুচ্‌কি হাসি হাসে।
চল্‌তে গিয়ে হঠাৎ যেন থমক লেগে থামে,
তড়াক্‌ ক'রে লাফিয়ে যায় ডাইনে থেকে বামে।
ভীষণ রোখে হাত গুটিয়ে সাম্‌লে নিয়ে কোঁছা,
"এইয়ো" ব'লে ক্ষ্যাপার মত শূন্যে মারে খোঁচা।
চেঁচিয়ে বলে "ফাঁদ পেতেছ ? জগাই কি তায় পড়ে !
সাত জার্ম্মান জগাই একা তবুও জগাই লড়ে।"
উৎসাহেতে গরম হ'য়ে তিড়িং তিড়িং নাচে,
কখনও যায় সাম্‌নে তেড়ে কখনও যায় পাছে।

এলোপাতাড়ি ছাতার বাড়ি চর্কীবাজির মত !
চক্ষু বুজে ধুপুস্ ধাপুস্ কায়দা খেলায় কত !
লাফের চোটে হাঁপিয়ে ওঠে গায়েতে ঘাম ঝরে
"তুড়ুম" ক'রে মাটির পরে লম্বা হ'য়ে পড়ে।
গড়াগড়ি চেঁচায় খালি চোখ্‌টি ক'রে ঘোলা,
"জগাই মোলো,—এইসা বড় কামানের এক গোলা" !
এইনা ব'লে মিনিট খানেক ছট্‌ফটিয়ে খুব
মড়ার মত শক্ত হ'য়ে একেবারে চুপ।
তার পরেতে সটান্ ব'সে চুল্‌কে খানিক মাথা
পকেট থেকে বেরুল তার হিসেব লেখার খাতা ;
লিখ্‌ল তাতে "ওরে জগাই, ভীষণ লড়াই হ'লো
তুই ব্যাটাকে খতম ক'রে জগাই দাদা মোলো।
আর দুটো লোক কৈ যে গেল, ভয়েতে দেশছাড়া—
তিন জার্ম্মান জখম হল জগাই গেল মারা"।

বিলাতে শিখ সৈন্য।

আমাদের দেশ থেকে অনেক শিখ সৈন্য ইউরোপে যুদ্ধ করতে গেছে। এদের একজন তার বাপকে এই চিঠিখানা লিখেছে ঃ—

গুরুজীর জয়,—বাবা সাহেব সুবাদার শ্রীযুত সুন্দরসিংহের শ্রীচরণে তাঁহার পুত্র সওয়ার সম্পূরণ সিংহের নিবেদন। আমি ভাল আছি, গুরুজী আপনাকে কুশলে রাখুন। আপনার পত্র পাইয়া আমার মন খুসী হইল। আমার জন্য ভাবিবেন না। ভারী যুদ্ধ হইয়াছে। গুরুর কৃপায় আমার প্রাণ যায় নাই। আমরা সমুদ্রের ধারে আছি। আমাদের পূর্ব্বদিকে জর্ম্মানরা প্রায় হিন্দুস্থান অবধি ছাইয়া রহিয়াছে। ইংরাজ আর অন্য জাতিরা দলে দলে তাহাদের সঙ্গে লড়িতেছে ; উহারা যে মুল্লুক চাহিয়াছিল, আর সেখানে যাইতে পারে না।

আমাদের সামনে আসিয়া বোমা ফাটিল ; মাটির দেওয়াল ভাঙ্গিয়া দিল ; আমরা যে খানার ভিতরে থাকি তাহা প্রায় বুজাইয়া ফেলিল। বোমা গায় লাগিল না, তাহার

হাওয়াতেই শার্দ্দূল সিং মরিয়া গেল। তারপর অসংখ্য জর্ম্মান আসিল ; আমরা তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিলাম। দু একজন খানার ভিতরে পড়িল। খানার বাহিরে তাহাদের লাসের উপর লাস পড়িয়া ঢিপি হইয়া গেল, তাহার উপর দিয়া আমাদের আর দেখিবার যো রহিল না। রাত্রে তাহারা আবার আসিয়া বিজলীতে আসমান ঝল্‌সাইয়া ফেলিল ; সে তাহাদের একরকম ভেল্কী। আমরা আবার তাহাদের সকলকে মারিয়া ফেলিলাম। উহাদের বহুৎ রকমের কল আছে, তাহাতে বড় হুন্নর খেলাইয়াছে। নহিলে তারা শিখদের সমান নহে। সঙ্গিনে উহাদের হাত কম চলে, আর উহাদের চলন ভারী। উহারা প্রায়ই ভয় করে না।

ফেস্তুসা নামের গ্রামে আমি অনেক দিন ছিলাম; সেখানে লড়াই খুব বেশী। সেখানে একটা গাছ আছে, সেই গাছে হরেক জাতের সিপাহীর টুকরা বোমার চোটে হাওয়ায় উড়িয়া আসিয়া ঝুলিতে থাকে। হিন্দুস্থানী পাগড়ী আর সাহেবদের টুপী আর বুট সব সেখানে আছে।

এদেশের মেম সাহেবেরা মুখে কাপড় দেয় না ; বুড়ীরাও না ছোটরাও না। এদের কেমন দস্তুর, এতে দোষ ভাবে না। এরা বোমাকে ডরায় না। আমাদের পিছনে দুজনে গরু চরায়, সেখানে বোমা ফাটে, তাহাতে ডরায় না। ব্রৌন্ সাহেব তাহাদিগকে সরাইয়া দিবার জন্য আমাকে পাঠাইলেন। তাহারা আমার বুলি বুঝিল না। আমি আমার রায়ফল্ তুলিয়া দেখাইলাম ; নাথা .নাড়িয়া বলিলাম 'বুম্-বুম্'। তখন তাহারা 'মার্সি, মার্সি', বলিয়া ভাগিয়া গেল। সহরে গেলে তাহারা আমাদিগকে ফুল আর ছোট ছোট নিশান দেয়, তামাক আনিয়া দেয়। খালসার দস্তুর তাহারা জানে না।

আপনি মুল্লুকের কথা লিখিতে বলিয়াছেন। মুল্লুক বেশ ভাল। বড় আন্ধার। বৃষ্টি ছাড়া দিন যায় না। সূর্য্য মেঘের পিছনে লুকান থাকে। বরফ পাহাড়ে না পড়িয়া আমাদের পায়ের নীচে আসিয়া হাজির হয়, তারপর জল হইয়া যায়।

এ মুল্লুকে বয়েল দিয়া চাষ করে না, ঘোড়া জোড়ে। এ ঘোড়া খুব উঁচা ; পায় লম্বা লোম আছে। ফসল কেমন হয় জানি না ; এখন ফসলের সময় নহে।

বাদসা কালাপানি পার হইয়া হিন্দুস্থানের লোকদিগকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। ছোট বড় সকলের সঙ্গে তিনি কথা কহিলেন। আমি খানায় ছিলাম, আমার ভাগ্যে তাঁহাকে দেখা হয় নাই। আমি শুনিয়াছি, ভগবান যদিও তাহাকে মস্‌নন্দে তুলিয়াছেন, তবু তিনি গরীবকে দূরে রাখেন না। সাহেবদের বড় দিনে তিনি সকল সিপাহীকে এক একটি বকসিস্ দিয়াছিলেন।

গল্প স্বল্প।

হাতী যদি পড়ে যায়, তবে যে খুবই হাসির কথা হয়, তাতে ভুল নাই। আর বানর যদি পড়ে যায়, তবে সেটা যে আরো হাসির কথা হবে তাও সকলেই জানে। একবার একটা বানরকে আমি তিন তলার উপর থেকে উঠানে পড়তে দেখেছিলাম ; সে প্রায় ৩০ বছরের কথা। আজও সেই ঘটনার কথা মনে হলে আমি হাসি রাখতে পারি না।

এমন ঠ্যাটা বানর খুব কমই দেখেছি। বেটা প্রায়ই আমাদের রান্না ঘরে বেগুন খেতে আসত। তাড়া করলে যে পালাবে, সে তেমন লোকই ছিল না। আমার লাঠির ক্ষমতা ঠিক ক ফুট ক ইঞ্চি অবধি চলে, তা সে খুব ভাল করেই এঁচে নিয়েছিল। ঠিক ততদূর গিয়ে, রান্না ঘরের চালে (রান্না ঘরটি ছিল দোতলার ছাতের উপরে, খোলা দিয়ে তৈরী) বসে সে আমাকে ভ্যাঙ্চাত। তখন আমার কেমন রাগ হত, বুঝতেই পার !

এর মধ্যে একদিন বিকালে সে আমাদের রান্না ঘরে এসেছে, আর আমি লাঠি নিয়ে তাড়া করতেই লাফিয়ে গিয়ে চালে উঠেছে। সেদিন কে একটা বাঁশ নিয়ে সেই চালের উপরে রেখে দিয়েছিল ; বাঁশটার আধখানা চাল থেকে বেরিয়ে আছে। বানর চালে উঠেই এক লাফে গিয়েছে তার উপর বসতে ; আর অমনি বাঁশ টাশ শুদ্ধ হুড়মুড় করে,—সে যে কি কাণ্ড হল, কি বলব ? আমার জন্মে আমি আর কোন

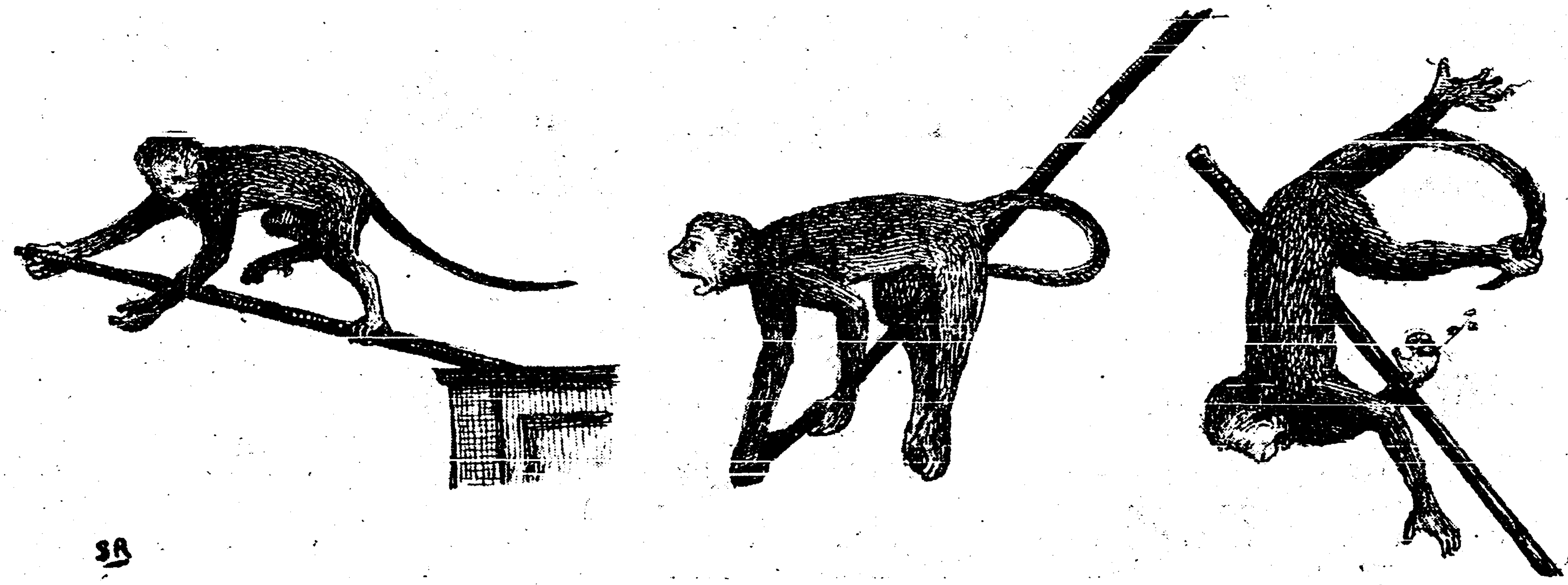

মানুষ বা জানোয়ারকে এমন চমকাতে দেখিনি। আর, পড়ে যেতে যেতে মাথা ঠিক

রেখে নিজেকে বাঁচাবার জন্য এত রকম চেষ্টা করা যেতে পারে তাও এর আগে আমি জানতাম না। দেয়াল, মাকড়ষার জাল, ঝুল, কাগজ, যা কিছু তখন তার হাতের কাছে পেল, তাই সে আঁকড়ে ধরতে চার হাতে চেষ্টা করল। কিন্তু কপালের লেখা কি তাতে ঘোচে? আমরা সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ধড়াস্ করে তার শব্দ শুনতে পেলাম, আর ভাবলাম বেচারার হাড়গোড় সব গুঁড়ো হয়ে গেছে। কিন্তু উঠানে গিয়ে আর তাকে দেখতে পেলাম না। সে পড়েছিল কতকগুলো টিন আর চটের উপরে, তাইতে তার গায় আঁচড়টিও লাগতে পায়নি, সে গা ঝেড়ে উঠে তখনি চম্পট দিয়েছে। এর মিনিট দু তিন পরেই তাকে একটা তাল গাছের উপরে দেখতে পেলাম; ভারী নিশ্চিন্ত, যেন তার বিশেষ কিছুই হয়নি।

ধাঁধা।

১। বৈশাখেতে বছর বছর দেখ্‌তে পাবে তারে
দেখ্‌বে আবার শ্রাবণ মাসে বৃষ্টি জলধারে।
দেখ্‌বে তারে রবির গায়ে দেখ্‌বে তারে পূবে
দেখ্‌বে তারে বনবাদাড়ে ডোবার জলে ডুবে।
মিথ্যা খোঁজ আকাশ পাতাল মিথ্যা খোঁজ ঘরে
অমাবস্যার বাইরে গিয়ে খুঁজ্‌বে ভাল ক'রে।

২। ছুচল্ মাথা ঠোঁটটি কাটা হেঁট মুখেতে চলে,
কালা পানির ধারে এসে মুণ্ডু ডোবায় জলে।

৩। হাঁকরা মুখ জিভ্ লক্ লক্ ঠোঁটের উপর দড়ি,
ক্যাঁক্ ক'রে ভাই কামড় দিবে ঠ্যাঙের গোড়ায় ধরি।

চোখের ধাঁধা।

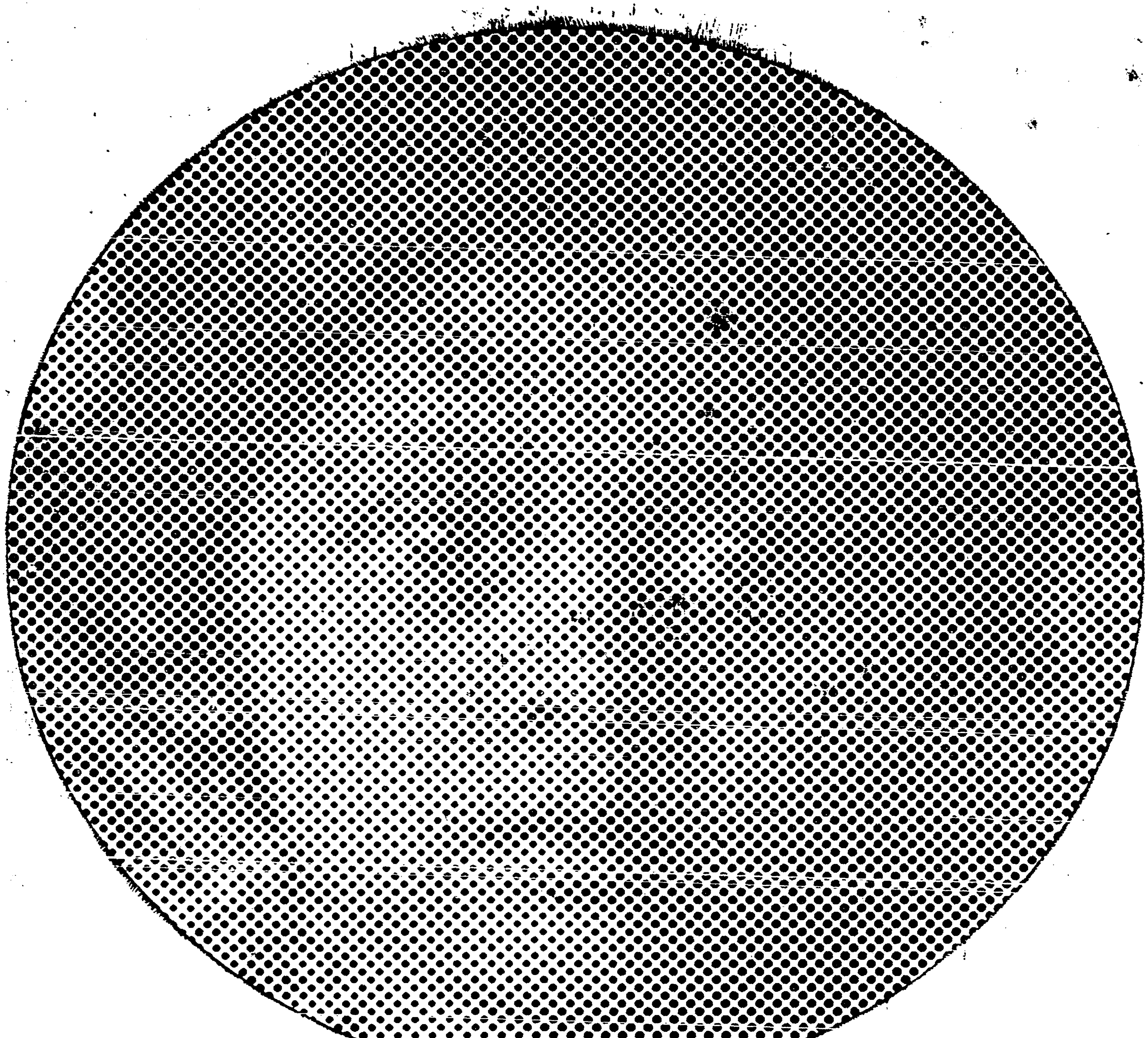

একটু দুরে গিয়ে দেখ এটা কি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

ধ্রুবের তপস্যা।

U. Ray & Sons.

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

সন্দেশ

তৃতীয় বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২ | দ্বিতীয় সংখ্যা

ছুটি !

ছুটি ! ছুটি ! ছুটি !
মনের খুসী রয়না মনে হেসেই লুটোপুটি ।
ঘুচ্‌ল এবার পড়ার তাড়া অঙ্ক কাটাকুটি
দেখ্‌ব না আর পণ্ডিতের ঐ রক্ত আঁখি দুটি ।
আর যাব না স্কুলের পানে নিত্য গুটি গুটি
এখন থেকে কেবল খেলা কেবল ছুটোছুটি ।
পাড়ার লোকের ঘুম ছুটিয়ে আয়রে সবাই জুটি
গ্রীষ্মকালের দুপুর রোদে গাছের ডালে উঠি ।
আয়রে সবাই হল্লা ক'রে হরেক মজা লুটি
একদিন নয় দুইদিন নয় দুই দুই মাস ছুটি !

ধ্রুব।

সে যে কত কালের কথা, তাহা আমি জানি না। সেই অতি প্রাচীন কালে আমাদের দেশে উত্তানপাদ নামে এক রাজা ছিলেন। উত্তানপাদের দুই রাণী ছিলেন, একটির নাম সুনীতি, আর একটির নাম সুরুচি।

সুনীতি বড় লক্ষ্মী মেয়ে ছিলেন, কিন্তু সুরুচি ছিলেন ঠিক তাহার উল্টা, আর সুনীতিকে তিনি প্রাণ ভরিয়া হিংসা করিতেন। রাজা সেই সুরুচিকে এতই ভাল বাসিতেন, যে তাঁহার কথা না রাখিয়া থাকিতে পারিতেন না। সুরুচি তাঁহার নিকট সুনীতির নামে কত মিথ্যা কথাই বলিতেন, তিনি ভাবিতেন, তাহার সকলই বুঝি সত্য। শেষে রাজা একদিন সুরুচির কথায় সুনীতিকে রাজপুরী হইতে বাহির করিয়া দিলেন।

দুঃখিনী সুনীতি তখন আর কি করেন? মুনিদের তপোবনে গিয়া আশ্রয় লওয়া ভিন্ন তাঁহার আর উপায় রহিল না। সেইখানে কয়েক দিন পরেই তাঁহার একটি খোকা হইল, তাহার নাম হইল ধ্রুব। তখন হইতে ধ্রুবকে লইয়া তিনি মুনিদের আশ্রমেই থাকেন। খোকাটি ক্রমে বড় হইতে লাগিল। সে মুনিকুমারদের সঙ্গে খেলা করে, মুনিদের হোম তপস্যা দেখে আর তাঁহাদের মুখে ভগবানের নাম শুনে। এইরূপে শিশুকালেই তাহার প্রাণে ভগবানের প্রতি ভক্তি জন্মিল।

এমনি করিয়া দিন যায়। ক্রমে ধ্রুবের বয়স চারি পাঁচ বৎসর হইয়াছে। ইহার মধ্যে সে একদিন শুনিল যে সে রাজার পুত্র, মহারাজ উত্তানপাদ তাহার পিতা। একথা শুনিবামাত্র পিতাকে দেখিবার জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইল। সে ভাবিল, 'আমি এখনই পিতাকে দেখিতে যাইব।'

রাজা উত্তানপাদ সিংহাসনে বসিয়া আছেন, সুরুচি তাঁহার নিকটেই দাঁড়াইয়া, সুরুচির পুত্র উত্তম রাজার কোলে। এমন সময় ধ্রুব সেখানে আসিয়া তাঁহার কোলে উঠিবার জন্য তাহার ছোট হাত দুখানি বাড়াইয়া দিল। রাজারও হয় ত তাহাকে কোলে লইতে খুবই ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু সুরুচির সাক্ষাতে তিনি ছেলেটিকে আদর দেখাইতে সাহস পাইলেন না। তখন সুরুচি বিষম ভ্রুকুটি করিয়া নিতান্ত কর্কশ ভাবে ধ্রুবকে বলিলেন, "ছেলের আস্পর্দ্ধা দেখ! এত কষ্ট কেন করিতেছিস বাছা? জানিস না কি যে তুই সুনীতির ছেলে? উনি তোর পিতা হইলে কি হয়? আমি ত তোর মা নই। রাজাসনে বসা তোর কপালে নাই, সে শুধু আমার ছেলেরই জন্য।"

ধ্রুবের প্রাণে এই নিষ্ঠুর কথাগুলি বড়ই লাগিল। সে আর এক মুহূর্ত্তও সেখানে বিলম্ব না করিয়া, ঠোঁট দুখানি ফুলাইয়া মার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। মা তাহার কাঁদ কাঁদ মুখ আর ছল ছল চোখ দুটি দেখিবামাত্র তাহাকে কোলে লইয়া, তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে বাবা ? কেহ কি তোমাকে কিছু বলিয়াছে ?"

ধ্রুব কহিল, "মা আমি বাবার কোলে উঠিতে গিয়াছিলাম, সৎমা বলিলেন, আমি তোমার ছেলে বলিয়া নাকি তাঁহার কোলে উঠিতে পাইব না ; আমার নাকি কপালে নাই।"

ধ্রুব দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে এই কথাগুলি বলিল ; তাহা শুনিয়া সুনীতির যে কি কষ্ট হইল তাহা লিখিয়া বুঝাইবার সাধ্য নাই। তিনি কোন মতে চোখের জল থামাইয়া ধ্রুবকে বলিলেন, "বাবা, সুরুচি সত্যই বলিয়াছে। তোমার কপাল মন্দ, তাই তুমি আমার মত অভাগিনীর পুত্র হইয়াছ। তোমার কপাল ভাল হইলে কেহ তোমাকে এমন কথা বলিতে পারিত না। রাজার আসনে বসা, ভাল ভাল হাতী ঘোড়ায় চড়া, এ সকল যাহার পুণ্য আছে তাহার ভাগ্যেই জোটে। সুরুচির ছেলে উত্তম অন্য জন্মে অনেক পুণ্য করিয়াছিল, তাই এখন সে রাজার কোলে বসিতে পায়। তুমি কর নাই তাই তুমি তাঁহার কোলে বসিতে পাইলে না। সুরুচির কথায় যদি তোমার দুঃখ হইয়া থাকে, তবে যাহাতে তোমার খুব পুণ্য হয় সেইরূপ কাজ কর, তাহা হইলেই তোমার কপাল ভাল হইয়া যাইবে।"

ধ্রুব কহিল, "মা, আমার মনে যে বড়ই লাগিয়াছে, তোমার কথায় ত আমার দুঃখ যাইতেছে না। আমি এমন কাজ করিব, যাহাতে সকলের চেয়ে যে ভাল, তাহার চেয়েও ভাল স্থান পাইতে পারি। তোমার ছেলে যে আমি, আমার তেজ তুমি দেখ। বাবার যাহা আছে, সবই উত্তমের হউক, অন্যের দেওয়া আমি কিছু চাহি না। আমি নিজে এমন জায়গা দেখিয়া লইব যে, বাবাও তাহা পান নাই।"

এই বলিয়াই ধ্রুব ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তারপরে একমনে পথ চলিতে চলিতে সে বনের ভিতরে এক স্থানে আসিয়া দেখিল যে, সেখানে সাত জন মুনি কুশাসনে বসিয়া আছেন। সে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া বলিল, "আমি উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব, আমার মার নাম সুনীতি। আমি মনে বড় কষ্ট পাইয়া আপনাদের নিকটে আসিয়াছি।" মুনিগণ বলিলেন, "বাছা, তুমি চারি পাঁচ বৎসরের বালক, তোমার মনে

আবার কি কষ্ট হইল?” ধ্রুব কহিল, “আমার বিমাতা আমাকে কটু কথা কহিয়াছেন, তাই আমার মনে কষ্ট হইয়াছে।”

ধ্রুবের নিকট সকল কথা শুনিয়া মুনিরা বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, “আচ্ছা বাছা, এখন তুমি কি চাহ? আমরা তোমার কি সাহায্য করিতে পারি?” ধ্রুব কহিল, “আমি সেই স্থান পাইতে চাহি, যাহা অন্য কেহ পায় নাই। সে স্থান কি করিয়া পাইব, আপনারা তাহা আমাকে বলিয়া দিন।” মুনিগণ বলিলেন, “যিনি সকলের বড়, যাহা কিছু আছে সকলই যাঁহার, তুমি সেই হরিকে ডাক, তাহা হইলেই তুমি সে স্থান পাইবে।”

ধ্রুব কহিল, “কি করিয়া তাঁহাকে ডাকিলে তিনি খুসী হইবেন তাহা ত আমি জানি না, তাহা আমাকে বলিয়া দিন।” মুনিরা বলিলেন, “আর কিছুরই কথা ভাবিবে না, কেবল তাঁহারই কথা ভাবিবে, আর শুধু বলিবে, ‘তুমি সকলের, তোমাকে কেহ জানিতে পারে না, তুমি সকলই জান, তোমাকে নমস্কার!’ ইহাতেই তিনি তুষ্ট হইবেন। তোমার পিতামহ মনু এইরূপেই তাঁহাকে তুষ্ট করিয়াছিলেন।”

তখন ধ্রুব সেই মুনিদিগকে প্রণাম করিয়া মনের আনন্দে সেখান হইতে যমুনার তীরে মধুবন নামক বনে গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে গিয়া সে দিন রাত একমনে এমনি ব্যাকুল ভাবে হরিনাম করিতে লাগিল যে, আর কেহ কখনও তেমন করিয়া তাঁহাকে ডাকিতে পারে নাই। সেই আশ্চর্য্য তপস্যা দেখিয়া দেবতারা ভয় পাইলেন, পৃথিবী কাঁপিল, সাগর উছলিয়া উঠিল।

ইন্দ্র ভাবিলেন, না জানি এই বালক এমন তপস্যা করিয়া কি বিপদ ঘটাইবে। তখন তিনি আর কতগুলি দেবতার সহিত মিলিয়া ধ্রুবের তপস্যা ভাঙ্গিবার আয়োজন করিলেন। একজন দেবতা সুনীতির বেশে, ‘হায় বাছা’ ‘হায় বাছা’ বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া ধ্রুবকে বলিল, “বাবা, কত আশা করিয়া তোমাকে পাইয়াছি। দুঃখিনীর ধন, আমার যে বাছা আর কেহ নাই, আমাকে কি এমন করিয়া ফেলিয়া আসিতে হয়? তুমি যদি তপস্যা না ছাড়, তবে আমি তোমার সম্মুখেই মরিয়া যাইব।”

কিন্তু ধ্রুবের মন তখন হরির ধ্যানেই মজিয়াছিল, সে সকল কপট কান্না শুনিয়াও শুনিল না। তখন সেই দুষ্ট দেবতা “বাবা গো! কি ভয়ানক রাক্ষস আসিয়াছে! পালাও, পালাও!” বলিতে বলিতে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

অমনি কোথা হইতে ভীষণ রাক্ষসগণ দলে দলে মার্ মার্, কাট কাট শব্দে ধ্রুবকে খাইতে আসিল। সঙ্গে সঙ্গে শত শত শিয়াল ডাকিয়া উঠিল। রাক্ষসেরাও তাহাদের

সিংহের মত, উটের মত, কুমীরের মত মুখ দিয়া আগুন ফুকিতে ফুকিতে কতই গর্জ্জন করিল, শেল শূল, মুষল মুদ্গর কতই ঘুরাইল, আর দাঁত খিঁচাইল; ধ্রুব তাহা টেরও পাইল না।

এইরূপে যখন ধ্রুবের তপস্যা ভাঙ্গিবার সকল চেষ্টাই বিফল হইল, তখন দেবতারা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে শ্রীহরির নিকটে আসিয়া বলিলেন, "হে প্রভু, আমাদিগকে রক্ষা করুন! উত্তানপাদের পুত্র, অতি ভীষণ তপস্যা আরম্ভ করিয়াছে, না জানি আমাদের কাহার কাজটি কাড়িয়া নিবে! শীঘ্র উহার তপস্যা থামাইয়া দিন।"

শ্রীহরি বলিলেন, "তোমাদের কোন ভয় নাই। ধ্রুব কি চাহে, আমি তাহা জানি। তাহার বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া আমি তাহার তপস্যা শেষ করিয়া দিতেছি।" তারপর তিনি সেই মধুবন আলো করিয়া ধ্রুবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "ধ্রুব! তোমার মঙ্গল হউক। আমি তোমার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া বর দিতে আসিয়াছি; তুমি কি চাহ?"

তখন ধ্রুব চক্ষু মেলিয়া সেই সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ দেবতাকে সম্মুখে দেখিয়া যারপরনাই আনন্দিত হইল, ভয়ও পাইল। সে অমনি তাঁহার পায় লুটাইয়া বলিল, "আমি ত জানিনা, কি করিয়া আপনার স্তব করিতে হয়; আমাকে তাহা শিখাইয়া দিন।" বলিতে বলিতেই শ্রীহরির কৃপায় তাহার জ্ঞান হইল। তখন সে প্রাণ ভরিয়া অতি মধুর বাক্যে শ্রীহরির স্তব করিতে করিতে বলিল, "বিমাতা আমাকে ধমকাইয়া বলিয়াছেন যে তাঁহার পুত্র নহি বলিয়া আমি রাজাসনে বসিতে পাইব না। হে প্রভু, আমি আপনার নিকট এমন স্থান চাই যে তাহা সংসারের সকল স্থানের চেয়ে ভাল।"

শ্রীহরি বলিলেন, "ধ্রুব, তুমি তাহাই পাইবে। চন্দ্র, সূর্য্য, বুধ, বৃহস্পতি,—সকলের উপরে তোমার স্থান হইল। তোমার মাতাও তারা হইয়া তোমার নিকটে থাকিবেন।"

সেই অবধি শ্রীহরির বরে ধ্রুব আকাশে ধ্রুব তারা হইয়া সংসারচক্র ঘুরাইতেছে, এইরূপ আমাদের পুরাণে লেখা।

গুপী গাইন।

রাজবাড়ীর অন্দর মহলে রাজা মশায় ঘুমিয়ে আছেন, রাণী তাঁর মাথার কাছে বসে তাঁকে হাওয়া করছেন, এমন সময় কথা নাই বার্ত্তা নাই,—গুপী আর বাঘা সেই সর্ব্বনেশে ঢোল নিয়ে হঠাৎ গিয়ে সেখানে উপস্থিত হল। জুতার এমনি গুণ, দরজা জানালা সব বন্ধ রয়েছে, তাতে তাদের একটুও আটকায় নি। কিন্তু আসবার বেলা

আটকাক আর নাই আটকাক, আসবার পরে খুবই আটকাল। রাণী তাদের দেখে বিষম ভয় পেয়ে, এক চীৎকার দিয়ে তখনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন; রাজা মশায় লাফিয়ে উঠে পাগলের মত ছুটাছুটি করতে লাগলেন; রাজবাড়ীময় হুলস্থূল পড়ে গেল; সিপুই সান্ত্রী সব খাঁড়া ঢাল নিয়ে ছুটে এল।

বেগতিক দেখে গুপী আর বাঘার মাথায় গোল লেগে গেল। তারা যদি তখন শুধু বলে 'আমরা এখান থেকে অমুক জায়গায় চলে যাব', তবেই তাদের জুতার গুণে সকল ল্যাঠা চুকে যায়। কিন্তু সে কথা তাদের মনেই হল না। তারা গেল ছুটে পালাতে, আর দু পা যেতে না যেতেই বেচারারা মারটা যে খেল! জুতা, লাঠি, চাবুক, কীল, চড়, কানমলা, কিছুই তাদের বাকি রইল না। শেষে রাজা মশাই হুকুম দিলেন, "বেটাদের নিয়ে তিন দিন হাজতে ফেলে রাখ। তারপর বিচার করে, হয় এদের মাথা কাটব, না হয় শূলে দিব, না হয় কুত্তা দিয়ে খাওয়াব।"

হায় গুপী! হায় বাঘা! বেচারারা এসেছিল রাজাকে গান শুনিয়ে কতই বকসিস পাবে ভেবে, তার মধ্যে এ কি বিপদ? পিয়াদারা তাদের হাত বেঁধে মারতে মারতে একটা অন্ধকার ঘরে নিয়ে ফেলে রাখল। সেখানে পড়ে বেচারারা এক দিন আর গায়ের ব্যাথায় নড়তে চড়তে পারল না। তাতে তেমন দুঃখ ছিল না, কিন্তু বাঘার ঢোলটি যে গেল, সেই হল সর্ব্বনাশের কথা! বাঘা বুক মাথা চাপড়িয়ে ভেউ ভেউ করে কাঁদছে, আর বলছে, "ও গুপী দা!—ওঃ-ওঃ হ-হ-হ-হ-অ-অ! আরে ও গুপী দা! মার খেলাম, প্রাণ যাবে, তাতে দুঃখু নেই,—কিন্তু দাদা, আমার ঢোলকটি যে গেল!"

গুপীর কিন্তু ততক্ষণে মাথা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। সে বাঘার গায় মাথায় হাত বুলিয়ে বল্ল, "ভয় কি দাদা? ঢোল গিয়েছে,—জুতা আর থলে ত আছে! আমরা নিতান্ত

বেকুব, তাই এতগুলো মার খেলাম। যা হোক, যা হবার হয়ে গিয়েছে, এখন এর ভিতর থেকে একটু মজা করে নিতে হবে।" বাঘা এ কথায় একটু শান্ত হয়ে বল্ল, "কি মজা করবে দাদা?" গুপী বল্ল, "আগে ত খাবার মজাটা করে নিই, তারপর অন্য মজার কথা ভেবে দেখ্‌ব এখন।"

এই বলে সে সেই ভূতের দেওয়া থলির ভিতরে হাত দিয়ে বল্ল, "দাও ত দেখি, এক হাঁড়ি পোলাও!" অমনি একটা সুগন্ধ যে বেরুল! তেমন পোলাও রাজারাও সচরাচর খেতে পান না। আর সে কি বিশাল হাঁড়ি! গুপী কি সেটা থলির ভিতর থেকে তুলে আনতে পারে? যা হোক কোন মতে সেটাকে বার করে এনে, তারপর থলিকে বল্ল, "ভাজা, ব্যঞ্জন, চাটনি, মিঠাই, দৈ, রাবড়ি, সরবৎ!—শীগ্গির শীগ্গির দাও!" দেখতে দেখতে খাবার জিনিসে আর সোনা রূপার বাসনে ঘর ভরে গেল। দুজন লোকে আর কত খাবে? সে অপূর্ব্ব খাবার খেয়ে তাদের গায়ের ব্যথা কোথায় চলে গেল তার ঠিক নাই।

তখন বাঘা বল্ল, "দাদা, চল এই বেলা এখান থেকে পালাই, নইলে শেষে কুত্তা দিয়ে খাওয়াবে।" গুপী বল্ল, "পাগল হয়েছ নাকি? আমাদের এমন জুতা থাকতেই কুত্তা দিয়ে খাওয়াবে? দেখাই যাক না, কি হয়।" এ কথায় বাঘা খুব খুসী হল; সে বুঝতে পারল যে, গুপীদা একটা কিছু মজা করবে।

দু দিন চলে গেল, আর একদিন পরেই রাজা তাদের বিচার করবেন। বিচারের দিন রাত থাকতে উঠে গুপী থলের ভিতরে হাত দিয়ে বল্ল, "আমাদের দুজনের রাজ পোষাক চাই।" বলতেই তার ভিতর থেকে এমন সুন্দর পোষাক বেরুল যে তেমন পোষাক কেউ তয়েরই করতে পারে না। সেই পোষাক তারা দুজনে পরে, তাদের পুরাণো কাপড় আর বাসন কখানি পুটুলী বেঁধে নিয়ে, জুতা পায় দিয়ে তারা বল্ল, "এখন আমরা মাঠে হাওয়া খেতে যাব।" অমনি দেখে, রাজবাড়ীর বাইরের প্রকাণ্ড মাঠে চলে এসেছে। সে মাঠের এক জায়গায় তাদের পুঁটুলীটি লুকিয়ে রেখে, তারা বেড়াতে বেড়াতে এসে রাজবাড়ীর সামনে উপস্থিত হল।

দূরে থেকে তাদের আসতে দেখেই রাজার লোক ছুটে গিয়ে তাঁকে খবর দিয়েছিল যে, "মহারাজ, দু জন রাজা আসছেন", রাজাও তা শুনে তাঁর ফটকের সামনে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বাঘা আর গুপী আসতেই তিনি তাদের যারপরনাই আদর দেখিয়ে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গেলেন। চমৎকার একটি ঘরে তাদের বাসা দেওয়া হল। কত চাকর, বামুন, পিয়াদা, পাইক তাদের সেবাতে লেগে গেল, তার অন্ত নাই।

তারপর গুপী আর বাঘা হাত পা ধুয়ে জলযোগ করে একটু ঠাণ্ডা হলেই, রাজা মশায় আবার তাদের খবর নিতে এলেন। তাদের পোষাক দেখে অবধিই তিনি ভেবে নিয়েছেন যে, 'না জানি এঁরা কত বড় রাজাই হবেন!' তারপর শেষে যখন তিনি গুপীকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, "আপনারা কোন দেশের রাজা?" তখন গুপী হাত যোড় করে তাঁকে বল্ল, "মহারাজ! আমরা কি রাজা হতে পারি? আমরা আপনার চাকর!"

গুপী সত্য কথাই বলেছিল, কিন্তু রাজার তাতে বিশ্বাস হল না। তিনি ভাবলেন, 'কি ভাল মানুষ, কেমন নরম হয়ে কথা বলে। যেমন বড় রাজা, তেমনি ভদ্রলোকও দেখ্‌ছি।' তিনি তখন আর বিশেষ কিছু না বলে তাদের দুজনকে তাঁর সভায় নিয়ে এলেন। সেখানে সে দিন সেই দুটো লোকের বিচার হবে,—তিন দিন আগে যারা গিয়ে তাঁর শোবার ঘরে ঢুকেছিল। বিচারের সময় উপস্থিত, আসামী দুটোকে আনতে পিয়াদা গিয়েছে; কিন্তু তাদের আর কোথায় পাবে? এ তিন দিন তাদের ঘরে তালা বন্ধ ছিল, সেই তালা খুলে দেখা হল, সেখানে কেউ নাই, খালি ঘর পড়ে আছে।

তখন ত ভারী একটা ছুটা ছুটি হাঁকা হাকি পড়ে গেল। দারোগা মশাই বিষম ক্ষেপে গিয়ে পিয়াদাগুলোকে বকতে লাগলেন। পিয়াদারা হাত যোড় করে বল্ল, "হুজুর! আমাদের কোন কসুর নাই; আমরা তালা দিয়ে রেখেছিলাম, তার উপর আবার আগাগোড়া দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ও দুটা ত মানুষ ছিল না, ও দুটা ছিল ভূত; নইলে এর ভিতর থেকে কি করে পালাল?"

এ কথায় সকলেরই বিশ্বাস হল! রাজা মশাইও প্রথমে দারোগার উপর রেগে তাঁকে কেটেই ফেলতে গিয়েছিলেন, শেষে ঐ কথা শুনে বল্লেন, "ঠিক! ও দুটো নিশ্চয় ভূত। আমার ঘরও ত বন্ধ ছিল, তার ভিতর এত বড় ঢোল নিয়ে কি করে ঢুকেছিল?"

তা শুনে সকলেই বল্ল, "হাঁ হাঁ, ঠিক ঠিক, ও দুটো ভূত!" বলতে বলতেই তাদের শরীর শিউরে উঠল, গা বেয়ে ঘাম পড়তে লাগল। তখন তারা বাঘার সেই ঢোলটির কথা মনে করে বল্ল, "মহারাজ! ভূতের ঢোল বড় সর্ব্বনেশে জিনিস! ওটাকে কখনো আপনার ঘরে রাখবেন না। ওটাকে এখনি পুড়িয়ে ফেলুন।"

রাজা মশাইও বল্লেন "বাপরে! ভূতের ঢোল ঘরে রাখব? এক্ষুণি ওটাকে এনে পোড়াও!"

যেই একথা বলা, অমনি বাঘা দু হাতে চোখ ঢেকে 'হাউ হাউ হাউ হাউ' করে কেঁদে গড়াগড়ি দিতে লাগল! ক্রমশঃ

চালাক চাকর।

এক বাবুর একটি বড় বুদ্ধিমান চাকর ছিল, তার নাম ভজহরি। একদিন ভজহরি পথ দিয়ে যেতে যেতে দেখল তার বাবু ভারী ব্যস্ত হয়ে বাড়ীর দিকে ছুটে চলেছেন। ভজহরি জিজ্ঞাসা করল, "বাবু কোথায় যাচ্ছেন?" বাবু বল্লেন, "শীগ্গির এস ভজহরি, সর্ব্বনাশ হয়েছে,—আমাদের ঘরে আগুন লেগেছে!" তাতে ভজহরি বল্ল, "আপনার কোন ভয় নাই বাবু, ও মিছে কথা! আগুন কি করে লাগবে? আমার কাছে যে ঘরের চাবি রয়েছে।"

ভজহরি গেল কলুর দোকানে, এক সের তেল কিনতে। কলু তাকে এক সের তেল মেপে দিল, তাতেই তার বাটিটি ভরে গেল। তখন ভজহরি বল্ল, "ফাউ দেবে না?" কলু বল্ল, "হাঁ, দেব বই কি? কিসে করে নিবে?" ভজহরি ভাবল, "তাই তঁ, কিসে করে নিই? কিন্তু ফাউ না নিয়ে গেলে যে বাবু আমাকে বোকা ভাববেন।" তখন তার মনে হল যে বাটির তলায় একটু গর্ত্ত আছে। অমনি সে বাটিটি উল্টিয়ে নিয়ে সেই গর্ত্তটা দেখিয়ে কলুকে বল্ল, এতে ফাউ দাও।" কলু হাসতে হাসতে সেই গর্ত্তে ফাউ ঢেলে দিল, ভজহরি মহা খুসী হয়ে তাই নিয়ে বাড়ী এল!

ভজহরি তার বাবুর সঙ্গে নৌকায় চড়ে নদী পার হচ্ছে। নৌকায় ঢের লোক; ভজহরি ভাব্‌ল নৌকা বড্ড বোঝাই হয়েছে, যদি ডুবে যায়!" এই ভেবে সে তাদের

পুঁটুলীটি মাথায় করে বসে রইল। বাবু বল্লেন, "ভজহরি, পুঁটুলীটা নামিয়ে রাখ না, মাথায় করে কেন কষ্ট পাচ্ছ?" ভজহরি বল্ল, "আজ্ঞে না! নৌকা বড্ড বোঝাই হয়েছে, পুঁটুলীটা তাতে রাখলে আরো বোঝাই হয়ে যাবে!"

বাড়ীতে চোর এসেছে, ভজহরি তা টের পেয়েছে। সে ভাবল, 'বেটাকে ধরতে হবে।' তখন সে মাথায় শিং বেঁধে, লেজ পরে ওঠানের কোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মতলবখানা এই যে, চোর নিশ্চয় তাকে দেখে ছাগল মনে করে তাকে চুরী করতে আসবে, তখন সে তাকে

জড়িয়ে ধরবে। চোর এল, ঘরে গিয়ে ঢুকল ; ভজহরি ওঠানের কোণ থেকে বল্ল, "ম্যা-আ-আ-আ !" চোর ঘরের সব জিনিস পত্র একটি একটি করে বাইরে এনে পুঁটুলী বাঁধল, ভজহরি তাকে বল্ল "ম্যা-আ-আ-আ !" তা শুনে চোর তাড়াতাড়ি সেই পুঁটুলী নিয়ে আস্তাকুড়ের উপর দিয়ে ছুট দিল। তখন ভজহরি হেসে গড়াগড়ি দিয়ে বল্ল, "ব্যাটা কি বোকা ! আস্তাকুড় মাড়িয়ে গেল,—এখন বাড়ী গিয়ে স্নান করতে হবে !"

রামধন লোকটি বেশ সাদা সিদে, কিন্তু একটু রাগী। সে গিয়েছে চোরেদের বাড়ী চাকরী করতে। রাত্রে চোরেরা এক জায়গায় চুরী করতে গেল, রামধনকেও সঙ্গে নিল। সেখানে রামধনকে একটা কচু বনে বসিয়ে দিয়ে বল্ল, "তুই এইখানে চুপ করে বসে থাক্, আমরা চুরী করে জিনিস নিয়ে এলে সেগুলো বয়ে নিয়ে যাবি।" রামধন বল্ল, "আচ্ছা !"

চোরেরা সিঁদ কাটছে, রামধন কচুবনে বসে আছে। সেখানে বড্ড বেজায় রকমের মশা, রামধনকে কামড়িয়ে পাগল করে তুল্ল। বেচারা অনেক ক্ষণ সয়ে চুপ করে ছিল, তারপর চটাস্ চটাস্ করে দু একটা মারতে লাগল, শেষে রেগে গিয়ে লাঠি দিয়ে মেরে কচুবন তোলপাড় করে তুল্ল। সেই শব্দে বাড়ীর লোক সব জেগে গিয়ে বল্ল, "কেরে তুই, এত গোলমাল করছিস ?" রামধন বল্ল, "আমি রামধন গো !" বাড়ীর লোকেরা বল্ল, "ওখানে কি করছিস্ ?" রামধন বল্ল, "আপনাদের ঘরে যে সিঁদ হচ্ছেন !"

তখন ত আর ছুটাছুটি হাঁকা হাঁকির সীমাই রইল না। চোরেরা আর চুরি করবে কি, তাদের প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসাই ভার হল। ঘরে এসে তারা অবশ্যি রামধনের উপর খুবই চোটপাট লাগাল। সে বল্ল, "কি করি ভাই, আমার রাগ হয়ে গেল ; যে ভয়ানক মশা !" চোরেরা বল্ল, "আচ্ছা, খবরদার আর কখনো এমন করিসনে।"

পরদিন চোরেরা আবার রামধনকে নিয়ে চুরী করতে গিয়েছে। এবারে রামধন ঠিক করে এসেছে যে মশায় তাকে খেয়ে গিলে ফেল্লেও আর সে টুঁ শব্দটি করবে না। আর চোরেরাও বেশ বুঝে নিয়েছে যে রামধনকে বাইরে রেখে ঘরে ঢুকলে বড়ই বিপদ হতে পারে। তাই তারা ভেবেছে ওকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে তারা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে।

একটা বাড়ীর কাছে এসে চোরেরা বাইরে থেকেই কেমন করে তার একটা দরজার ছিট্‌কিনি খুলে ফেল্ল, তারপর রামধনকে বল্ল, "এখন তুই চুপি চুপি ঘরে ঢুকে জিনিস পত্র বার করে আন। দেখিস্, কোন শব্দ করিস না যেন।" রামধন দরজা খুলে ঘরে

ঢুকতে গেল। দরজার কব্জায় ছিল মরচে ধরে, তাই দরজা ঠেলতেই সেটা বল্ল, “ক্যাঁচ্!” রামধন থতমত খেয়ে অমনি থেমে গেল। তারপর আবার যেই ঠেলতে যাবে, অমনি দরজা আবার বল্ল ‘ক্যাচ্!’ রামধন তাতে দাঁত খিচিয়ে ‘আঃ!’ বলে আবার থেমে গেল। তারপর আবার একটু ঠেলতেই যখন আবার দরজা ‘ক্যাঁচ্’ করে উঠেছে, তখন রামধন কিছুতেই তার রাগ সামলাতে পারল না। তখন সে পাগলের মত হয়ে প্রাণপণে সেই দরজা নাড়তে নাড়তে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, “ক্যাঁচ্!—ক্যাঁচ্!!—ক্যাঁচ্!!!—ক্যাঁচ্!!!!” তারপর কি হল, বুঝতেই পার।

এ সব ত সুধু গল্প; এবারে একটি সত্যিকার চাকরের কথা বলি। তার নাম, ধরে নাও যেন কেনারাম। কেনারাম সেজে গুজে একটা বোটের ছাতে উঠে বসে আছে,—তার বাবুর সঙ্গে একজায়গার তামাসা দেখতে যাবে। খানিক বাদেই বোটের ভিতর থেকে জুতার শব্দ এল; কেনারাম বুঝল, বাবু বেরুচ্ছেন, এই বেলা যেতে হবে। সে অমনি তাড়াতাড়ি বোটের ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ল,—আর পড়ল ঠিক তার বাবুর ঘাড়ে!

প্রথমে যখন কেনারাম আসে তখন একজন পুরাণো চাকর তাকে বলেছিল যে “বাবু কাছারি থেকে এলে রোজ তাঁকে পান খেতে দিও।” সে দিন বাবু কাছারি থেকে এসেই পাইখানায় গেলেন; কেনারামও তাড়াতাড়ি সেইখানে গিয়ে তাঁকে বল্ল, “বাবু, পান এনেছি!”

দুষ্ট দানব।

এক দানব আর এক চাষা, দুজনায় পাশা খেলছিল। খেলায় চাষার হার হল।

পাশায় হেরে চাষা হায় হায় করতে লাগল। খেলবার আগে সে বাজি রেখেছিল যে, সে হারলে দানব তার ছেলেটিকে নিয়ে যাবে। এখন উপায় কি হবে? দানব কিছুতেই ছাড়ছে না, সে বলছে, “কালই এসে আমি ছেলে নিয়ে যাব। যদি তাকে রাখতে চাও, তবে এমন করে তাকে লুকিয়ে রেখে দাও, যাতে আমি তাকে খুঁজে বার করতে না পারি। খুঁজে পেলে কিন্তু আর তাকে ফেলে যাব না!”

হায় কি বিপদ! ছেলেটিকে কোথায় লুকাবে? যেখানেই রাখুক, দানব নিশ্চয় তাকে খুঁজে বার করবে। চাষা ভেবে কিছু বুঝতে না পেরে শেষে দেবতার রাজাকে

ডাকতে লাগল। দেবতার রাজা তার দুঃখ দেখে দয়া করে এসে বল্লেন, "তোমার কোন চিন্তা নাই; আমি তোমার ছেলেটিকে এমন করে লুকিয়ে দিব যে দানবের বাবাও তাকে খুঁজে বার করতে পারবে না।"

এই বলে তিনি ছেলেটিকে গমের ক্ষেতে নিয়ে গিয়ে তাকে একটি ছোট্ট গমের ভিতরে লুকিয়ে রাখলেন। তার পরদিন দানব এসে চাষার ঘরে, বাগানে, পুকুরে, বাক্সে, উনুনে, হাঁড়িতে, হুকোর ভিতরে, কতই খুঁজল, কোথাও ছেলেটিকে দেখতে পেল না। কিন্তু সে এমনি দুষ্ট দানব ছিল—সে তখনি বুঝে নিল যে, তবে নিশ্চয় গমের ক্ষেতে গমের ভিতরে লুকিয়ে রেখেছে! অমনি সে কাস্তে নিয়ে গিয়ে ঘ্যাস্ ঘ্যাস্ করে গম কাটতে লাগল। সব গম কেটে, তারপর তার এক একটি করে দানা হাতে নিয়ে উল্টে' পাল্টে' দেখে, সে দু দণ্ডের "মধ্যেই ধরে ফেল্ল যে, এই "গমটার ভিতরে চাষার ছেলে বসে আছে!"

আর একটু হলেই সে সেই গমটার ভিতর থেকে চাষার ছেলেটিকে বার করে নিয়ে যেত। এর মধ্যে দেবতার রাজা এসে তার হাত থেকে সেটা কেড়ে নিয়ে ছেলেটিকে তাড়াতাড়ি চাষার হাতে দিয়ে বল্লেন, "আমার যা সাধ্যি আমি তা করেছি; এর বেশী আর পারব না।" দানব ছেলেটিকে নিতে না পেরে ভারী চটে বল্ল, "বটে, আমাকে ফাঁকি দিলে? সে হবে না; আমি কাল আবার আসব।"

দেবতার রাজা যখন পারলেন না, তখন চাষা আলোর দেবতার কাছে গেল। আলোর দেবতা এসে তার ছেলেটিকে একটা রাজহাঁসের গলায় পালক বানিয়ে রেখে দিলেন। কিন্তু তাতে কি সে দানবকে ঠকাবার যো আছে? সে এসেই হাঁসের গলা ছিঁড়ে সেই পালকটি সুদ্ধ তাকে মুখে দিতে নিয়েছে। ভাগ্যিস পালকটি তখন তার ঠোঁটে লেগে রইল, নইলে আর উপায়ই ছিল না। পালকটিকে দানবের ঠোঁটে লাগতে দেখেই আলোর দেবতা সেটিকে উড়িয়ে নিয়ে চাষার কাছে পৌঁছিয়ে দিলেন, আর বল্লেন, "আমি আর কিছু করতে পারব না।" দানব সেদিনও ঠকে গেল, কিন্তু যাবার সময় বলে গেল, "কাল আবার আসব!"

দেবতার রাজা হেরে গেলেন, আলোর দেবতা হেরে গেলেন। চাষা তখন আগুনের দেবতাকে ডেকে বল্ল, "ঠাকুর! আপনি আমার ছেলেটিকে বাঁচান!" আগুনের দেবতা তখন ছেলেটিকে সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে একটা মাছের পেটের মধ্যে তার একটি ডিমের ভিতরে লুকিয়ে রাখলেন।

দানব মাছের পেট থেকে ছেলেকে বার করছে।

দানব কিন্তু এর সবই টের পেয়েছে, আর তাই এবারে সে ছিপ নিয়ে তয়ের হয়ে এসেছে। সমুদ্রে কত কোটি কোটি মাছ, তার ভিতর থেকে সে সেই মাছটাকে দেখতে দেখতে ধরে ফেল্ল। সেই মাছটার পেটে কত কোটি কোটি ডিম, তার ভিতর থেকে সে সেই ডিমটিকে দেখতে দেখতে খুঁজে বার করল।

তখন আগুনের দেবতা সেই ডিমটি তার হাতে থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চুপি চুপি ছেলেটিকে বল্লেন, "শীগ্গির ঘরে পালিয়ে যা; ভিতরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিস্।" একথা তখন দানব শুনতে পায়নি। তারপর ছেলেটি পালিয়ে অনেক দূর গেলে সে তাকে দেখতে পেল। অমনি ঘোঁৎ করে লাফিয়ে উঠে সে যে তার পিছু পিছু ছুটল! কিন্তু ছেলেটি ততক্ষণে ঘরে ঢুকে গিয়েছে। দানবটাও তাকে ধরবার জন্য তাড়াতাড়ি গেল সেই ঘরে ঢুকতে; সে জানত না যে আগুনের দেবতা এর আগেই কখন সেই ঘরের দরজায় তিন হাত লম্বা এক লোহার খোঁচ বসিয়ে রেখেছেন। দানব রাগে ভূত হয়ে ঘরে ঢুকবার সময় সেই খোঁচ আগাগোড়া গেল খ্যাঁচ্ করে তার মাথায় ঢুকে। তখন সে ভয়ানক চেঁচিয়ে চিৎপাৎ হয়ে পড়ে যেতেই আগুনের দেবতা ছুটে এসে তার একটা পা কেটে ফেল্লেন।

কিন্তু পা কাটলে কি হবে? দুষ্ট দানব তাতে কি যাদুই করে রেখেছে,—সেই কাটা পা তখনি এসে আবার যোড়া লেগে গেল! যা হোক, আগুনের দেবতা সেই দানবের চেয়ে ঢের বড় যাদুকর ছিলেন; তিনি জানতেন যে কাটা জায়গায় লোহা আর পাথর ফেলে দিলে আর তা যোড়া লাগতে পারে না। কাজেই তিনি তাড়াতাড়ি দানবের আর একটা পা কেটেই লোহা আর পাথর দিয়ে কাটা জায়গা চাপা দিয়ে ফেল্লেন। তখন আর দানবের যাদু খাটল না; দেখতে দেখতে তার প্রাণ বেরিয়ে গেল।

তখন ত চাষার খুবই আনন্দ হল। সে আগুনের দেবতাকে কত প্রণাম যে করল তা গুণে শেষ করা যায় না। তারপর থেকে সে সকলকে বলত যে, এই দেবতাটির মত দেবতা আর নাই।

খেলায় সাজা।

একটা কথা আমার কাছে বড় মজার ঠেকে; লোকে খেলে আমোদের জন্য, কিন্তু অনেক সময় সেই আমোদের ভিতরে এক একটা সাজার ব্যবস্থা করে রাখে। যে সাজা পায়, তার এতে তেমন আমোদ হয় না; কিন্তু যারা সাজা দেয় তাদের খুবই আমোদ হয়। পাশা খেলে মহারাজা যুধিষ্ঠিরের দুর্গতির একশেষ হল, দুর্য্যোধন তাতে যারপরনাই আমোদ পেলেন।

এমনিতর অনেক খেলা আছে, তাতে যে হারে তার কিছু জরিমানা দিতে হয়। কিন্তু খেলার সাজা জরিমানা ছাড়া আরো অনেক রকম হতে পারে,—যেমন কীল। পাড়াগাঁয় আগে 'ষাঁড় ষাঁড়' বলে একটা খেলা হত। এ খেলায় একটু ষণ্ডা গোছের একজন 'ষাঁড়' হয়ে একটা গণ্ডীর ভিতরে আটকা থাকে, আর সকলে সেই গণ্ডীর ভিতরে ঢুকে তাকে ভেঙ্‌চায়, সে তাড়া করলে অমনি ছুটে পালায়। ষাঁড় যদি কখনো এদের কাউকে ধরতে পারে, অমনি কীলের চোটে তাকে পোষ মানাতে চেষ্টা করে। একেকটা কীল মেরে জিজ্ঞাসা করা হয়, "মানিস্?" তার উত্তর দিতে হয় 'না!' সহজে পোষ মানাটা এ খেলায় বড় লজ্জার বিষয়। যা হোক, কীলের ওজন ক্রমে বাড়তে থাকে, তার ফলে শেষে 'না' বলা কঠিন হয়ে উঠে। সুতরাং এর আগে ষাঁড়ের হাত থেকে ছুটে আসতে না পারলে তখন 'না'র জায়গায় 'হাঁ' বলতেই হয়। এরি নাম পোষমানা। এমনি করে সব কটিকে পোষমানাতে পারলেই ষাঁড়ের জয় হল। কীল খেয়েও কাঁদব না, এই জেদটুকুর ভিতরে যথেষ্ট আমোদ আছে। তবে, মাঝে মাঝে দুএকজন 'ভ্যাঁ-া-া' করে কেঁদেও ফেলে; তারও যে একটা আমোদ না আছে, তা নয়।

আর একটা খেলা আছে, তার নাম কড্ডা খেলা। তোমরা পাঁচ ছয় জন লোক মাথা হেট করে, মুখোমুখী হয়ে বসেছ, আর একজন একখানি কড়া গামছা দিয়ে দড়ি পাকিয়ে নিয়ে, সেইটে হাতে করে তোমাদের চারধারে ঘুরছে। এর মধ্যে একবার হয় ত সে দড়িটি চুপি চুপি তোমার পিছনে রেখে গেল। তোমার পিছনের দিকে চেয়ে দেখবার হুকুম নাই; দড়িওয়ালার ভাব দেখে তোমাকে এঁচে নিতে হবে যে, পিছনে দড়ি রেখে গিয়েছে। যদি তা না পার, তবে দড়িওয়ালা আরেক পাক ঘুরে এসেই সেই দড়ি দিয়ে তোমাকে ঠাঁই ঠাঁই করে মারতে থাকবে,—যতক্ষণ না তুমি তাড়াতাড়ি ছুটে সকলের চারদিক ঘুরে এসে আবার নিজের জায়গায় বসতে পার! আর যদি

তুমি টের পাও, তবে তুমি তখনি উঠে সেই দড়ি দিয়ে তাকে মারবে, যতক্ষণ না সে সকলের চারদিক ঘুরে এসে তোমার খালি জায়গাটিতে বসতে পারে। তখন তুমি হলে 'দড়িওয়ালা'। এমনিভাবে খেলা চলবে।

আর একটি খেলা হচ্ছে, সন্দেশের নূতন আবিষ্কৃত 'যষ্টি-হরণ' খেলা। এ খেলা যারা খেলেছে আর দেখেছে, তারা ত বলে এতে বেশ আমোদ। আমরা আহ্লাদের সহিত সন্দেশের পাঠক পাঠিকাদের সে খেলা উপহার দিচ্ছি। যদি তাঁদের ভাল লাগে, তবে আমাদের কথা ভেবে মিঠাই খাবেন; আর যদি না লাগে তবে চিরেতা চিবোবেন।

এ খেলার আয়োজন একটি লাঠি। সেইটিকে একটা গণ্ডীর মাঝখানে আলগোছে পুতে একজন তাতে পাহারা দিবে, আর সকলে মিলে সেটা চুরী করতে চেষ্টা করবে। চুরী করবার সময় যদি পাহারাওয়ালা তোমাকে ছুঁয়ে দিতে পারে, তবে তুমি হবে পাহারাওয়ালা; সাবেক পাহারাওয়ালা গিয়ে তোমার জায়গায় ভর্ত্তি হয়ে লাঠি চুরীর ফন্দি আঁটবে। আর যদি তুমি ছোঁয়া ধরা না দিয়ে লাঠিটি নিয়ে আসতে পার, তবে সেই পাহারাওয়ালার সাজা হবে।

সাজা তিন রকমের। সে খুব উৎসাহ করে দু পাক নাচবে; তা যদি না পারে, তবে গলাছেড়ে একটা গান গাইবে; তাও যদি না পারে, তবে দশটা বিদ্‌ঘুটে ভেংচি কাটবে।

পাহারাওয়ালা গণ্ডীর বাইরে গিয়ে কাউকে ছুঁতে পারবেন না; লাঠিও ছুঁতে, বা হাত দিয়ে ক্রমাগত তাকে আগলে রাখতে পারবেন না; তাঁকে সকল সময়েই লাঠি থেকে নিজের হাতের এক হাত দূরে থাকতে হবে। যদি ভেংচি কাটেন, তা হলে দাঁত বার করে কাটতে হবে; দাঁত না দেখা গেলে ভেংচি নামঞ্জুর।

অদ্ভুত ভ্রমণকারী।

আমি বসে লিখছি, জানালা দিয়ে শাল বন দেখা যাচ্ছে। এত দিন এই গাছগুলোতে ভারী চমৎকার ফুলের শোভা হয়েছিল। এখন ফুল গিয়ে ফল এসেছে, কিন্তু তাকে দেখলে হয় ত তুমি মানতে চাইবে না যে সে ফল। এ গাছের ফল দেখতে অনেকটা ফুলেরই মত। ফুলের মত তাতে পাপড়ি থাকে, সেই সব পাপড়ির গোড়ায় একটি শুপারির মত ফল। ফলটি গাছ থেকে আলগা হয়ে গেলে সেই পাপড়িগুলো তার পাখার

কাজ করবে, অর্থাৎ সেই পাপড়িগুলোর জোরে সে হাওয়ায় উড়ে গাছ থেকে খানিক দূরে চলে যেতে পারবে। এমনি করে একটা গাছের চারধারে অনেক দূর অবধি তার বংশধরেরা জন্মাবে; গাছের তলায় সবগুলো ফল পড়ে থাকলে সে সুবিধাটুকু হতে পারত না।

শিমুল গাছেরও তেমনি। শিমুলের বড় বড় কলার মত ফলগুলো পাকলে ফেটে যায়, আর তার ভিতর থেকে রাশি রাশি তুলা বেরয়। সেই তুলা হচ্ছে বীজগুলির বাহন; বীজেরা তাতে চড়ে হাওয়ায় উড়ে কোথাকার জিনিস কোথায় চলে যায়।

আকন্দ কাপাস

শিমুল ডুধিয়া

কার্পাসেরও ঠিক এমনি; তার তুলাতেও বীজগুলোকে গাছ থেকে অনেক দূরে বয়ে নিয়ে যায়। অবশ্য আমাদের জ্বালায় সকল সময় তা হতে পারে না,—তার আগেই আমরা কাপাস আর শিমুলের তুলোগুলো এনে তা দিয়ে কাপড়, লেপ, তোষক, বালিস, গদি তয়ের করি; কিন্তু আসলে ঐ তুলো হয়েছিল বীজগুলোর তাতে চড়ে হাওয়া খাবার জন্য।

তাই বলছিলাম, এই বীজগুলো ভ্রমণকারী। এমন ভ্রমণকারী পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়। তাদের যে কত রকমের চেহারা, আর কত রকমের উড়বার কায়দা, তার অন্তই নাই। অনেক সময় দেখা যায় যে সরু সরু শাদা শাদা রোঁয়ার

একটি কদম ফুলের (বা ছাতার) মত গোলা হাওয়ায় উড়ে বেড়াচ্ছে। সে এতই হালকা যে, নিতান্ত সামান্য একটু হাওয়াতেই সে উপরের দিকে উঠে যেতে থাকে, নীচে বড় একটা নামতে চায় না। ছেলেবেলায় ভাবতাম, ওগুলো চাঁদের মা বুড়ীর চুল। কিন্তু আসলে তা নয়, ওর প্রত্যেকটি এক একটি বীচির ঘোড়া। গোলাটিকে ধরে দেখলে বীচিটিকে অনেক সময় তাতে পাওয়া যায়, অনেক সময় আবার পাওয়া যায়ও না, সেটিকে কোথায় ফেলে এসে শুধু ঘোড়াটি উড়ে বেড়াচ্ছে।

এমনিতর ছাতাওয়ালা বীচি অনেক গাছেরই হয়। আমাদের চেনা গাছের মধ্যে আকন্দের নামটা আমার সহজেই মনে হচ্ছে। শিমুলের যেমন কলা হয়, আকন্দেরও ঠিক তেমনি কলা হয়। সেই কলার ভিতরে চমৎকার ছাতাওয়ালা রাশি রাশি বীচি থাকে। একদিন গিরিডির বনের ভিতর বেড়াতে গিয়ে একটা লতার ডাল ছিঁড়ে এনেছিলাম, তার বীচিরও সুন্দর ছাতা আছে। এই লতার নাম

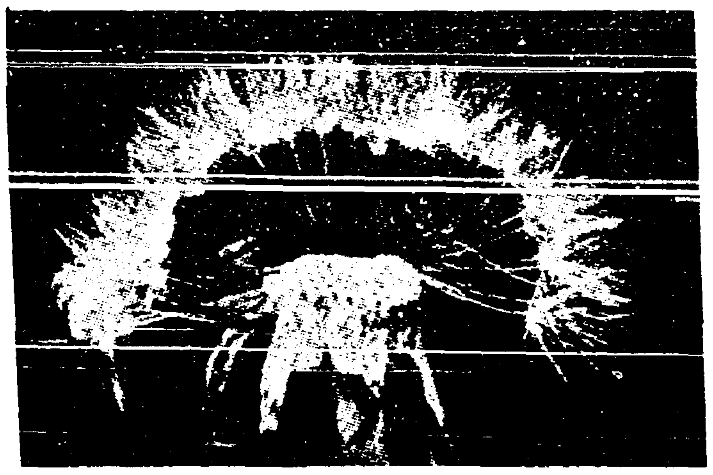

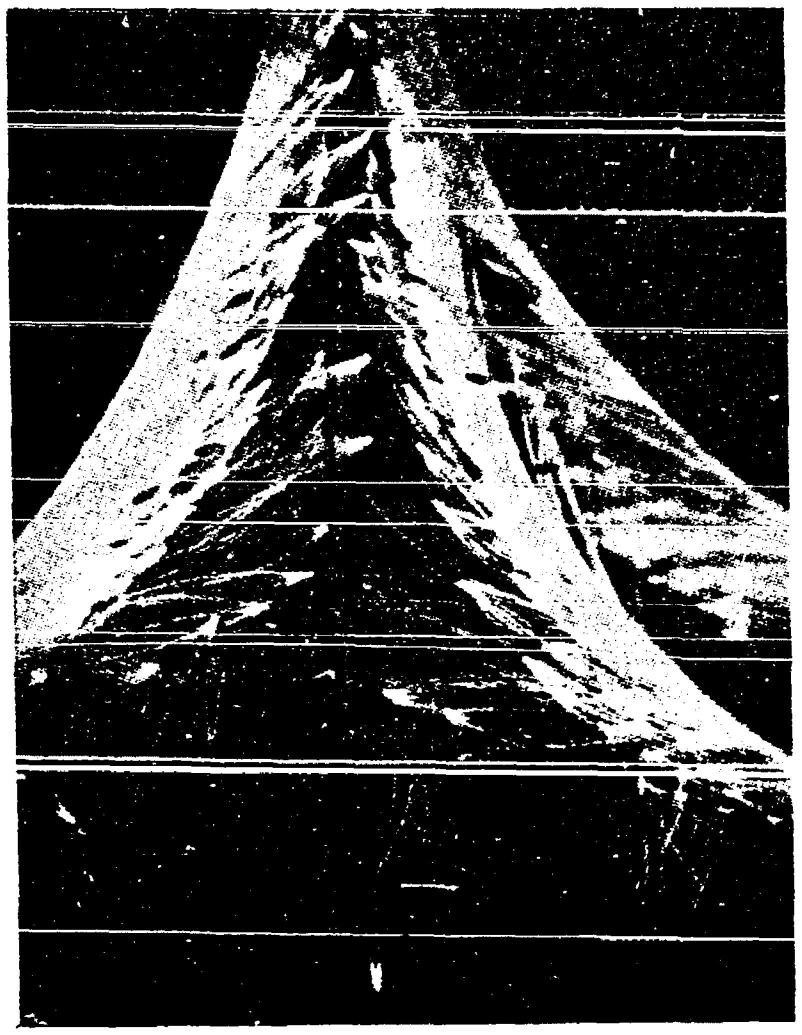

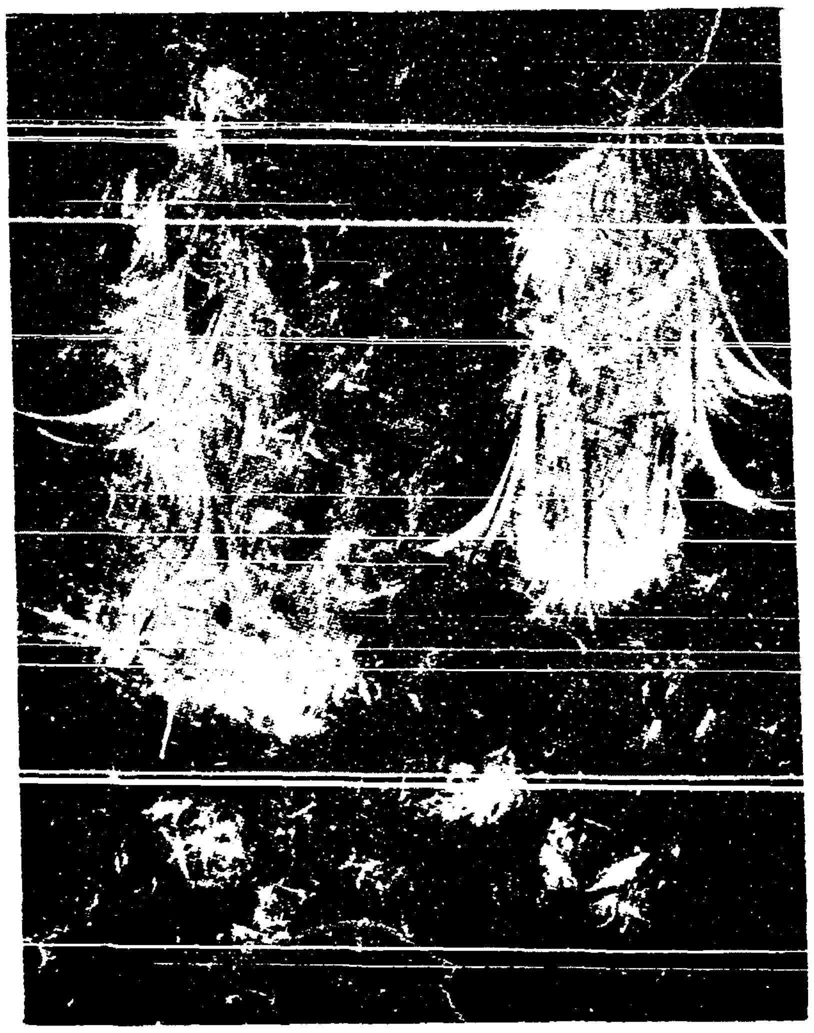

তুধিয়া। তুধিয়ার গাছ থেকে পাটের মত সূতা পাওয়া যায়, তাতে দড়ি তয়ের হতে পারে। একখানা ইংরাজি বই থেকে ছাতাওয়ালা বীচির আরো দু একটা ছবি দেওয়া গেল।

কোন বীচির গায় খুব পাতলা কাগজের মত কিছু লাগান থাকে, তাতে তার পাখার কাজ করে। একদিন একটা মাঠে এমনিতর কতকগুলো বীচি পেয়েছিলাম। না জানি কোথাকার কোন্ গাছ থেকে সেগুলোকে হাওয়ায় উড়িয়ে এনেছিল। সেই মাঠের আশ পাশে কোথাও তেমন গাছ দেখতে পেলাম না। একজন চাষাকে জিজ্ঞাসা

করলাম, “ভাই, ইয়ে কিস্‌কা বীজ হ্যায়?” সে বল্ল, “কণার কা বীজ হ্যায় বাবু,—কণার।” সেই ইংরাজি বইখানাতে এই কায়দার আরো দু এক রকমের বীজের ছবি দিয়েছে। আর, এক রকম মনসা গাছের ছবি আছে, সে ভারি চমৎকার। গাছটির গায় ছোট ছোট ফুলের মত দেখা যাচ্ছে, সেগুলি তার ছানা। একটু বড় হলেই তারা তাদের মার কোল থেকে নেমে হাওয়ায় গড়িয়ে চলতে থাকবে।

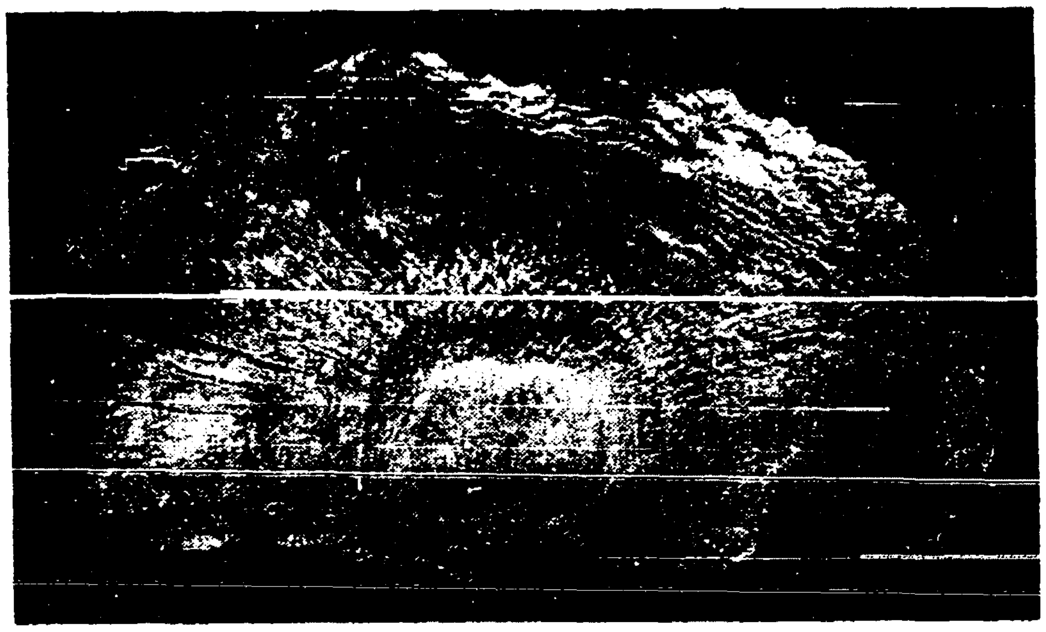

কণার

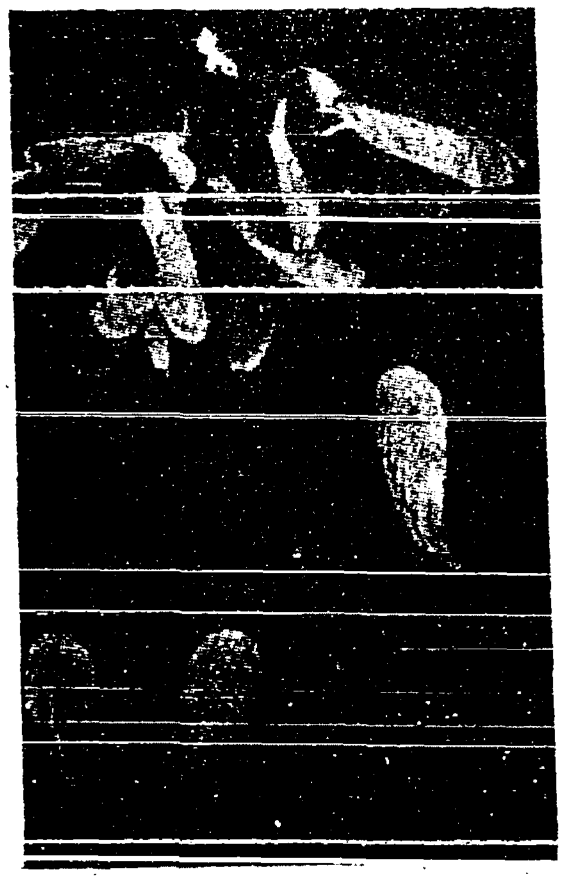

‘সিকামোর’ গাছের ফল

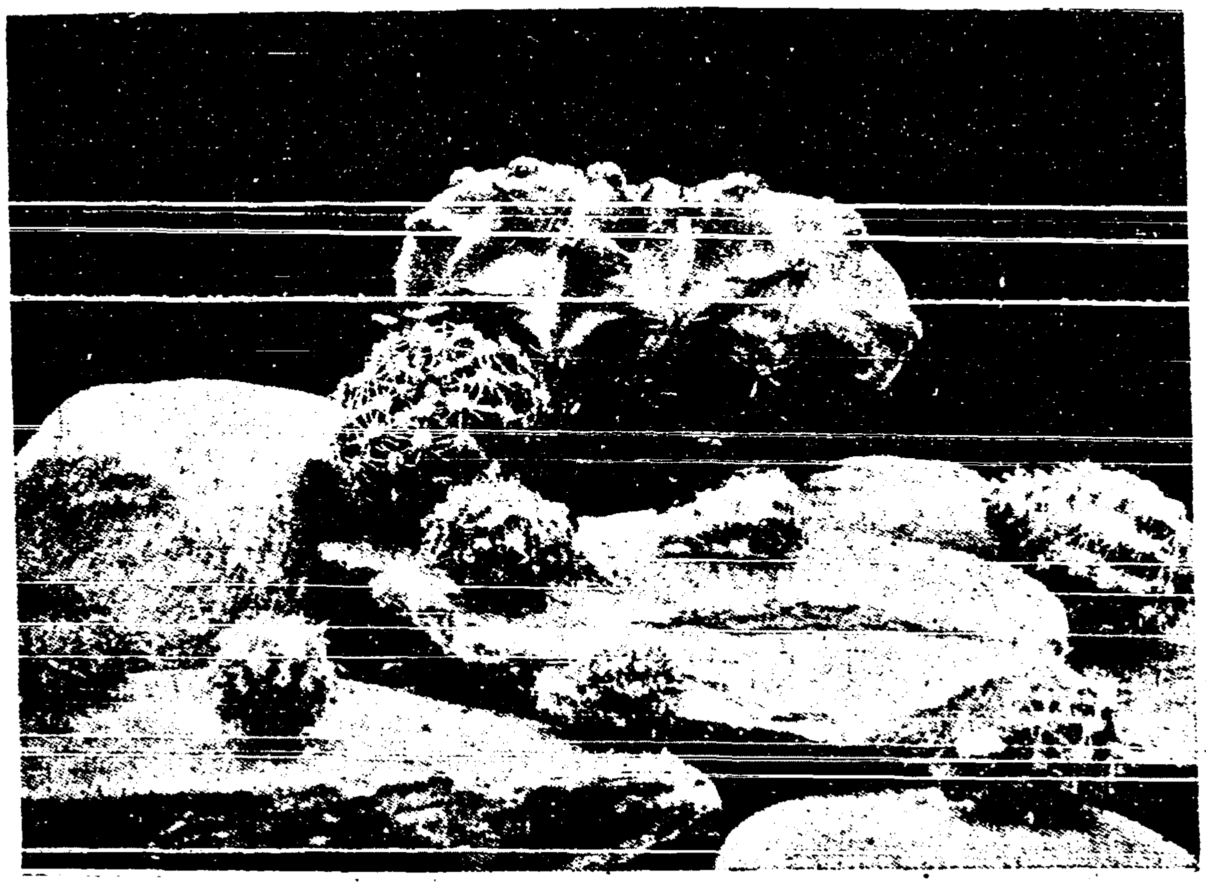

ভ্রমণকারী মনসা

শালের ফল

তোমরা যাকে চোরকাঁটা বল, সেও এক রকম ভ্রমণকারী। মানুষের কাপড়ে বা জানোয়ারের রোঁয়ায় লেগে তারা এক দেশ থেকে আরেক দেশে চলে যেতে পারে। চোরকাঁটা অনেক রকমের আছে। এদের আগায় খুব সরু সরু ছোট ছোট কাঁটা উল্টো বাগে পরান থাকে। কাপড়ে ঢুকবার সময় সেগুলো বেশ সহজেই ঢুকে যায়, কিন্তু টেনে বার করবার সময় আটকায়।

‘গিলা’ তোমরা সকলেই দেখেছ,—সেই যা দিয়ে ঘসে কাপড়ের পাড় কোঁচকান হয়। অনেকে তার শাঁষ দিয়ে চুলও পরিষ্কার করে। গিলার এক রকম খেলাও আছে। এই গিলা এক রকম লতার বীচি। ঠিক এক একটা প্রকাণ্ড সীমের মত,

চীনেদের কথা।

আম পেকেছে, সুখের দিন এসেছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে আমার চীনেদের কথা মনে পড়ছে। তারা ভারী বুদ্ধিমান লোক। তোমরা হয় ত বলবে, 'আম পাকার ভিতরে চীনেরা কি করে এল, আর তাতে তাদের বুদ্ধির কথাই বা কি করে বোঝা গেল?' তবে একটা গল্প শোন, যদিও আমি সেটা বিশ্বাস করতে বলছি না।

একবার চীনদেশের রাজা আমাদের এই ভারতবর্ষে কয়েকটি দূত পাঠিয়েছিলেন। দূতদের তিনি বিশেষ করে বলে দিলেন, "দেখ, ওদেশে নাকি 'আম' বলে ভারী আশ্চর্য্য একরকম ফল আছে; তোমরা আসবার সময় আমার জন্যে তার নমুনা আনবে।"

দূতেরা ভারতবর্ষে এল, আমও খেল, কিন্তু যাবার সময় আর তার কোন নমুনা নিয়ে গেলনা। দেশে গেলে রাজা তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হে, আমার জন্য আমের নমুনা এনেছ?" দূতেরা বল্ল, "হাঁ মহারাজ, এনেছি।" রাজা বল্লেন, "তবে দাও ত খাই।" অমনি দূতদের একজন ছুটে গিয়ে তার দাড়িতে খুব করে বাঘা তেঁতুল মাখিয়ে এসে রাজাকে বল্ল, "মহারাজ, হাঁ করুন।" একথায় রাজা হাঁ করতেই সে তার সেই তেঁতুল মাখা দাড়ি তাঁর মুখের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে বল্ল, "এখন চুষে দেখুন, তা হলেই আমের নমুনা পাবেন।" রাজা সেই দাড়ি চুষে ভয়ানক রেগে বল্লেন, "কি অসভ্য দেশ,—এমন ফলকে ভাল বলে?"

এখন হয় ত বুঝতে পারছ, আমের কথায় কেন আমার চীনেদের কথা মনে পড়ে। আর, সেই দূতেরা যে আম না নিয়েও তাদের রাজাকে তার নমুনা খাইয়েছিল, এটা কি খুব বুদ্ধির কাজ নয়? আমি খালি ভাবি, না জানি তারা এদেশে এসে কি রকম আম খেয়েছিল!

ভাগ্যিস সেই দূতটির দাড়ি ছিল, নইলে ত আর এমন বুদ্ধি খাটিয়ে রাজামশাইকে আমের নমুনা দেখান সম্ভব হত না। চীনদেশে দাড়ি গোঁফ অল্প লোকের মুখেই জন্মিয়ে থাকে। যাদের জন্মায়, তাদেরও চল্লিশ বছর বয়সের আগে, বা নাতি না হলে, সে দাড়ি রাখবার দস্তুর নাই। যা হোক, যখন দাড়ি রাখার সুবিধা হয়, তখন তারা তার যত্ন করে খুবই। যত্ন করা পোষায়ও, কেন না, সে দেশের লোকে লম্বা দাড়ি দেখলে বড়ই মান্য করে। সৌখীন লোকেরা সে দেশে তাদের দাড়ির থলে তয়ের করে দেয়, শোবার সময় সেই থলে দাড়িতে পরিয়ে তবে শোয়। একখানা চিরুণী তাদের

সঙ্গে থাকাই চাই, তাই দিয়ে বার বার দাড়ি আঁচড়ায়। তা ছাড়া দাড়িতে কত তেল আর মলম লাগায় তা আমি বলতে পারি না।

চীন দেশের এক মন্ত্রীর এমনিতর সুন্দর দাড়ি ছিল। রাজার সেই দাড়িটি ভারী পছন্দ হওয়ায়, তিনি একদিন মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মন্ত্রী, তোমার দাড়ি এত সুন্দর হল কি করে?" মন্ত্রী বল্লেন, "আমি এতবার দাড়ি আঁচড়াই, এতবার তাতে হাত বুলাই, এমনি করে রেশমী কাপড় দিয়ে জড়াই, এমন এমন তেল, এই এই মলম, এত রকমের আতর।" রাজামশাই এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন, তারপর শেষে চটে গিয়ে বল্লেন, "তোমার দাড়ি নিয়ে যদি এতই ব্যস্ত থাকতে হয়, তবে তুমি কাজ কর কখন? তোমার মাইনে কমিয়ে দেওয়া হল!"

দাড়ির কথা বলতেই চীনেদের টিকীর কথা মনে হয়। এখন আর তারা টিকী রাখে না; আগে টিকী দিয়ে দাড়ির দুঃখ অনেকটা দূর করে নিত। আর টিকীতে কাজের সুবিধাও ছিল ঢের। ঝগড়ার সময় শত্রুর ঐ জিনিসটায় ভাল করে ধরতে পারলে আর কোন ভাবনাই থাকত না। দুষ্টু ছেলেদের পিঠে ওটা দিয়ে সাঁই করে মারতে পারলেও খুব কাজ দিত। টিকী না থাকলে তখন বড় অপমানের কথা হত। চোরের জেল হলে তার টিকীটি কেটে ফেলার নিয়ম ছিল, কাজেই জেল থেকে বেরিয়ে তার একটি আলগা টিকী না বাঁধলে চলত না। তারপর আবার চুরী করে ধরা পড়লে সেই জাল টিকীটি পুলিশের হাতে রেখে ছুটে পালাবার বেশ সুবিধা ছিল।

গ্রীষ্মকালে আমাদের মতন চীনেরাও পাখা ব্যবহার করে। পুরুষদের পাখা গুটিয়ে রাখা যায়, মেয়েদের পাখা গুটান যায় না। প্রত্যেকেরই একটি পাখা সঙ্গে থাকা চাই, আর চাই দুটি 'ভোজন কাঠি'। চীনেরা আমাদের মত হাত দিয়ে খায় না। তারা দুটি কাঠি দিয়ে খাবার জিনিস তুলে মুখে দেয়। ঐ দুটি কাঠি দিয়ে তারা এমন তাড়াতাড়ি খেতে পারে যে, দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়।

চীনেরা যে খুবই বুদ্ধিমান, একথা আমাদের দেশের লোকে চিরকালই বলে আসছে। আর, আসলেও তারা অনেক বুদ্ধির কাজ করেছে। দিগ্‌দর্শন যন্ত্র, ছাপার অক্ষর, বারুদ এ সব চীনেরাই আবিষ্কার করেছিল। পৃথিবীর মধ্যে সকলের চেয়ে বড় দেওয়াল, সকলের চেয়ে লম্বা খাল, সকলের চেয়ে পুরাণো সংবাদ পত্র, সব চীন দেশী। জ্যোতিষের চর্চ্চাও সে দেশে বহুকাল থেকে হয়ে আসছে। তবে অবশ্য সেই প্রাচীন কালের জ্যোতিষে অনেক আজগুবি খবরও থাকতে পারে। চীনেরা বলে যে পৃথিবীটা

চার কোণা। আর গ্রহণ হয় কেন? না, একটা মস্ত বড় কুকুর সূর্য্যটাকে আর চাঁদটাকে গিলতে আসে, তাইতে গ্রহণ হয়।

অবশ্য, আমাদের দেশেও পৃথিবী তিন কোণা, আর রাহু কেতু চন্দ্র সূর্য্যকে গিলার দরুন গ্রহণ হয়, এমনি সব কথা শোনা যায়। কিন্তু গ্রহণের আসল কারণ যে কি, তারও একটু একটু আভাস আমাদের জ্যোতিষের পুস্তকে আছে। পৃথিবীর ছায়ার কথা পুরাণেও দেখা যায়।

আমাদের যেমন ১২টি রাশি, চীনেদেরও তেমনি; তবে, তাদের রাশিগুলির নাম অন্য রকমের। আমরা বলি,—মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক,

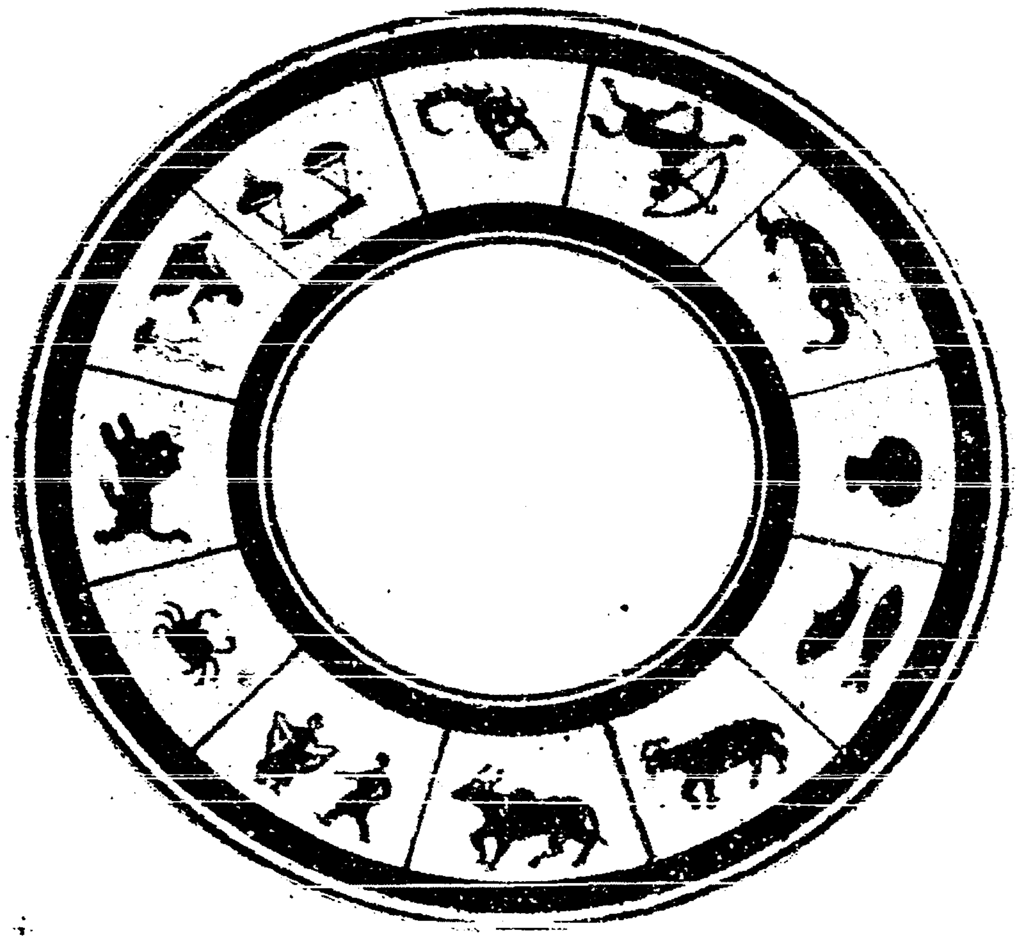

আমাদের দেশের রাশি চক্র

চীনের রাশি চক্র

ধনু, মকর, কুম্ভ, মীণ; চীনেরা বলে,—ইঁদুর, গাই, বাঘ, খরঘোষ, ড্রাগন্, সাপ, ঘোড়া, ভেড়া, বানর, মুরগী, কুকুর, শূয়র। আমাদের দেশের রাশিগুলির ছবি আর চীনেদের রাশির ছবি দেওয়া হ'ল।

সৎমেয়ে।

হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে মাঠ জঙ্গল পার হয়ে তিন বোনে এক সহরে এসে হাজির হ'ল। সেখানে রাজবাড়ীতে রাণীর মহলে দুটো ভাল চাকরী খালি ছিল—লক্ষ্মী চেষ্টা ক'রে তার বোনদের জন্য সেই কাজের জোগাড় ক'রে দিল—আর নিজে এক সামান্য গৃহস্থ-বাড়ীতে ঝিয়ের কাজ কর্‌তে লাগ্‌ল।

রাজবাড়ীর আর সবই ভাল—কেবল সেখানে হাসিতামাসা গানবাজনা আমোদ একেবারেই নেই। সকলেরই মুখ বিষণ্ণ—যেন কিছু বিপদ হ'য়েছে, যেন কেউ মারা গিয়েছে। কয়েক দিনের মধ্যেই দুই বোনে তার কারণ জান্‌তে পার্‌ল। রাজার একটি মাত্র ছেলে; ছ মাস হ'ল সে একদিন শিকার কর্‌তে বেরিয়েছিল—আজ পর্য্যন্ত বাড়ী ফেরেনি। রাজা কত খোঁজ করিয়েছেন, নিজে লোকজন নিয়ে বনজঙ্গলে কত ঘুরেছেন—কিন্তু রাজপুত্রকে আর পাওয়া গেল না। শেষে এক গনক এসে বল্ল, "মহারাজ, আপনার ছেলেকে এক ডাইনী যাদু ক'রে রেখেছে। সেই ডাইনীর কাছে একটা 'রোশ্‌নী তলোয়ার' আছে—সেটা আপনার আলোতে আপনি জ্বলে। সেই তলোয়ার না আন্‌লে আপনার ছেলে উদ্ধার হবে না।" তাই শুনে রাজা বল্লেন "আমি যাব—সেই তলোয়ার আন্‌তে।" মন্ত্রী ঘাড় নেড়ে বল্লেন "আমি যাব"—সেনাপতি গোঁফে চাড়া দিয়ে বল্লেন "আমি যাব"—বড় বড় যোদ্ধা মাল্লা সিপাই শান্ত্রী তারা সব তাল্‌ঠুকে বল্লে "আমরা যাব"। কিন্তু হায়! যারা বড় বড় বীর, যারা যুদ্ধ করে, শিকার করে তাদের সাহস আছে, কিন্তু তারা সেই খুনীর সাঁকো পার হবে কি করে? তাই রাজ্যশুদ্ধ লোকের ভাবনা আর ঘোচে না!

তখন সেই দুষ্টু বোন দুটো পরামর্শ ক'রে ঠিক কর্‌ল যে লক্ষ্মীটাকে আবার ডাইনীর বাড়ী পাঠাতে হ'চ্ছে। এই ভেবে তারা রাণীকে বল্ল "রাণীমা, আমাদের একটা বোন আছে, সে ঐ ডাইনীর বাড়ী চেনে—তাকে দিয়ে তলোয়ারটা আনান্ না কেন?" রাণী একথা রাজাকে জানালেন; রাজা লক্ষ্মীকে ডাকিয়ে আন্‌লেন। লক্ষ্মীকে সমস্ত কথা বলামাত্রই সে ডাইনীর বাড়ী যেতে রাজি হ'ল।

সন্ধ্যার সময় কাপড়ের খোঁটে খানিকটা নূন বেঁধে লক্ষ্মী "খুনীর সাঁকো" পার হ'য়ে ডাইনীর বাড়ীর কাছে গেল। বাড়ীর পিছনে খাবার ঘরের জানালা দিয়ে উঁকিমেরে লক্ষ্মী দেখ্‌ল বুড়ীর জন্য একবাটি পায়েস রয়েছে—লক্ষ্মী আস্তে আস্তে হাত বাড়িয়ে পায়েসের মধ্যে একমুঠো ধূলো ফেলে দিল আর জলের কলসীটার মধ্যে বেশ খানিকটা নূন ছড়িয়ে দিল।

খানিক বাদে বুড়ী খেতে এসেছে! এসে খানিকটা পায়েস্ মুখে দিয়েই থু থু ক'রে সব ফেলে দিয়ে তার ছেলেটাকে বল্ল—"ওরে, জল দে শীগ্গির—পায়েস খেয়ে আমার বমি আস্‌ছে।" তার ছেলে দৌড়ে এসে এক গেলাস জল দিল। জল খেয়ে বুড়ীর চোখ্ একেবারে কপালে ঠেকে গেল! সে বল্ল "দৌড়ে যা, কূয়ো থেকে ভাল জল নিয়ে আয়। নিশ্চয় কেউ এ জলে বিষ মিশিয়েছে।" বুড়ীর ছেলে বল্ল, "অন্ধকার রাতে কি ক'রে জল আন্‌ব ?" বুড়ী বল্ল "আমার ঘর থেকে রোশ্‌নী তলোয়ারটা নিয়ে যা।"

বুড়ীর ছেলে কূয়োর ধারে রোশ্‌নী তলোয়ার রেখে নীচু হ'য়ে জল তুলছে, এমন সময় লক্ষ্মী ধাঁ ক'রে তার চোখে খানিকটা নূন আর বালি ছিটিয়ে তলোয়ার খানা নিয়ে পালাল। ছেলেটা তাকে তাড়া কর্‌বে কি সে নিজের চোখ ঘষ্‌তে আর চোখে জল দিতেই ব্যস্ত। এদিকে লক্ষ্মী সাঁকো পার হ'তে হ'তে ভাবছে "তলোয়ার ত আন্‌লাম, কিন্তু রাজপুত্র উদ্ধার হবেন কি করে ?" যেই একথা ভাবা আর অমনি হঠাৎ কোথা থেকে একটা বুনো শূয়োর তেড়ে তাকে মার্‌তে এসেছে। লক্ষ্মী ভয়ে থতমত খেয়ে তাকে সেই তলোয়ারটা ছুঁড়ে মেরে একেবারে চোখ বুজে দে দৌড়! কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সেই শূয়োরের গর্জ্জন আর দাপাদাপি এক মুহূর্ত্তে থেমে গেল আর লক্ষ্মী শুন্‌তে পেল কে যেন তাকে ডাক্‌ছে, "তুমি কেগো, আমায় দেখে এত ভয় পাচ্ছ কেন ?" লক্ষ্মী ফিরে দেখে শূয়োর টুয়োর কিছু নেই—শীকারীর বেশে অতি সুন্দর এক রাজপুত্র!

তারপর লক্ষ্মীকে নিয়ে রাজপুত্র বাড়ী ফিরে এল। রাজবাড়ীতে মহা ধুমধাম লাগ্‌ল, সহরময় হুলস্থূল পড়ে গেল! রাজা লক্ষ্মীকে ডাকিয়ে বল্লেন "তুমি আমার এত উপকার কর্‌লে, এখন বল তুমি কি পুরস্কার চাও"। লক্ষ্মী বল্ল, "মহারাজ, আমার তুই বোন আপনার বাড়ী কাজ করে; তারা যেন সুখে থাকে, আমি এই চাই।" রাজা বল্লেন, "বেশ কথা; আর কি চাও ?" লক্ষ্মী বল্ল, "রাজপুত্র যখন শূয়োরের বেশে ছিলেন, তখন আমি তাঁকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত ক'রেছিলাম—আমার সে অপরাধ যেন ক্ষমা করা হয়"। রাজা হেসে বল্লেন "এ বড় ভয়ানক অন্যায়—এ কিছুতেই ক্ষমা করা যায় না। তোমাকে আমি এই শাস্তি দিলাম যে আমার ছেলেকে তোমার বিয়ে কর্‌তে হবে"!

এ রকম "শাস্তি"র কথা শুনে সেই বোন্ তুটো ছাড়া সে রাজ্যের সকলেই খুব খুসী হ'ল।

আলোকস্তম্ভ।

সমুদ্রের ধারে ডাঙার কাছে কাছে, যে সকল পথে জাহাজ চলাফিরা করে, এবং যেসকল জায়গায় জাহাজ খুব সাবধানে না চালাইলে চড়ায় বা পাহাড়ে ঠেকিয়া দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে, এই রকম স্থানে নাবিকদের সুবিধার জন্য বড় বড় আলোকস্তম্ভ বসান হয়। এখনও জাহাজডুবির জন্য একএকটা জায়গার এমন বদ্‌নাম আছে, যে খুব পাকা নাবিকও অন্ধকার রাতে সেখানে জাহাজ চালাইতে ভয় পায়। ঝড়ের দিনে যখন তারা দেখা যায় না, জাহাজ সহজেই পথ হারাইয়া ফেলে, তখন এই আলোকস্তম্ভ নাবিক-দের হুঁসিয়ার করাইয়া দেয়।

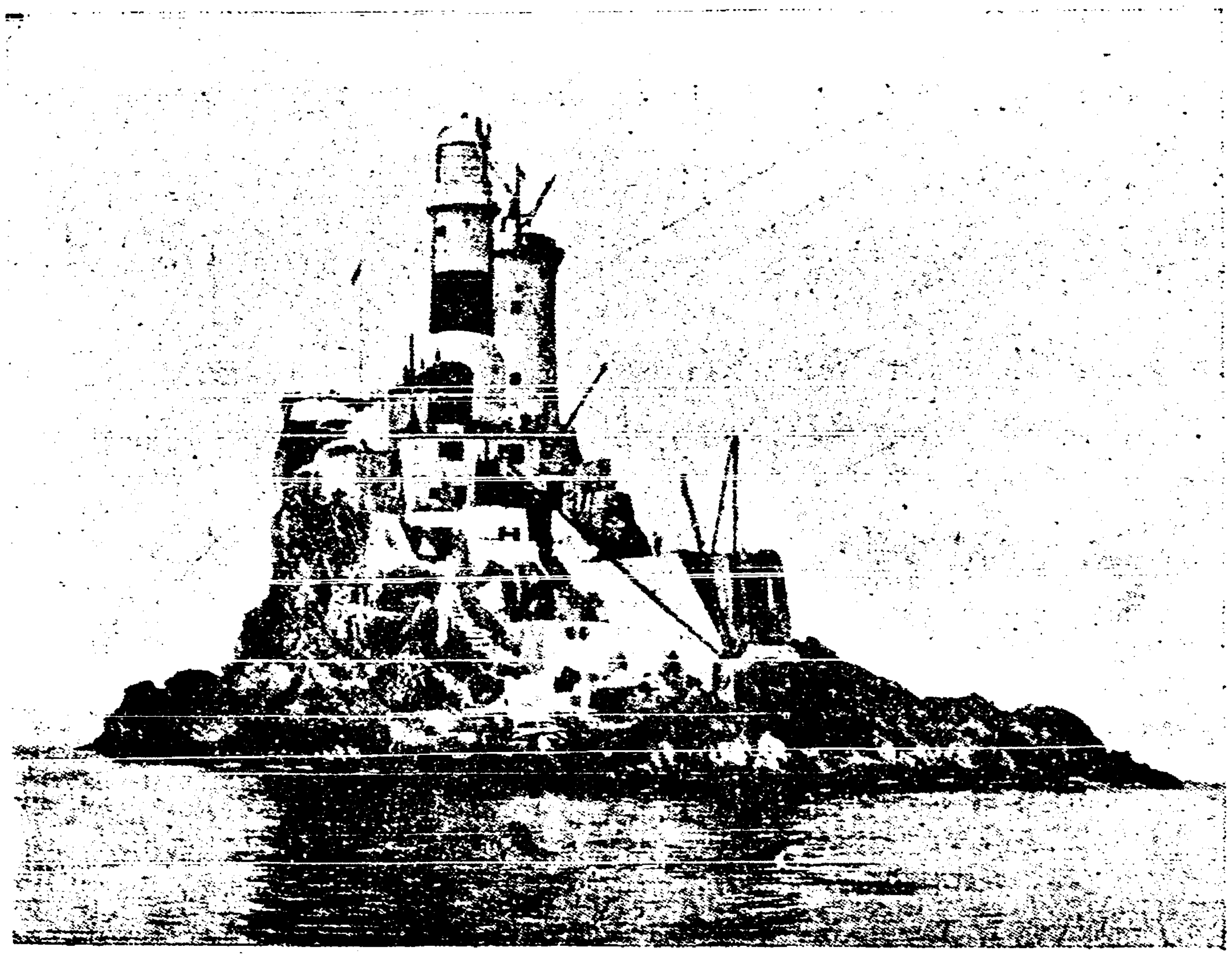

আলোকস্তম্ভ হাজার হাজার আছে; তার মধ্যে কতকগুলি একেবারে সমুদ্রের উপরে। খোলা সমুদ্রের মধ্যে খানিকটা পাথরের ঢিপির উপর লোহা ঠুকিয়া পাথর বসাইয়া মানুষ যখন আলোকস্তম্ভ বানায় তখন তাহাকে বাতাসের ঝড় আর জলের ঢেউ, এ দুয়ের সঙ্গে রীতিমত লড়াই করিতে হয়। উপরে যে স্তম্ভের ছবি দেখিতেছ, দলে দলে লোক পাঁচ ছয় বৎসর খাটিয়া তবে ঐ রকম একটি স্তম্ভ বানায়। কিন্তু সে খাটুনি যে কি রকম তাহা না বলিলে আসল কথাই বলা হইল না। একবার একদল লোক চার পাঁচ মাস খাটিয়া পাথরের গায়ে লোহার থাম কড়ি বরগা বসাইয়া স্তম্ভের গোড়া পত্তন করিয়াছিল। শীতকালে ঝড়ের জন্য কিছুদিন কাজ বন্ধ ছিল; পরে যখন আবার সকলে কাজে আসিল তখন দেখা গেল, সে সকল লোহালক্কড়ের চিহ্নমাত্র নাই, খালি দু একটি বাঁকাচোরা থাম নিতান্ত কাহিলভাবে হেলিয়া আছে!

জলের ঢেউ যে কি সাংঘাতিক জিনিষ হইতে পারে, তাহা চোখে না দেখিলে সহজে বিশ্বাস হয় না। বড় বড় লোহার থাম পর্য্যন্ত মোটা জাহাজী শিকলের বাঁধন ছিঁড়িয়া

ঢেউয়ের মুখে ভাসিয়া যায়। এমনও দেখা যায় যে ঢেউয়ের ঝাপটায় দু মণ ভারী পাথরের ডেলা ছিট্‌কাইয়া ষাট সত্তর হাত উপরে থামের চূড়ায় গিয়া লাগে!

অনেক সময়ে কাজ করিতে করিতে ঝড় আসিয়া পড়ে; সেইজন্য লোকেরা প্রথমেই ঢিপির আগায় একটা থাকিবার মত লোহার ঘর বানাইয়া রাখে। ঝড় যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ তাহারা কোন রকমে সেই ঘরের মধ্যে পড়িয়া দিন কাটায়। কখনও এমন হয় যে দিনের পর দিন ঝড় আর থামে না, সঙ্গের খাবার ফুরাইয়া আসে, লোকেরা আধপেটা খাইয়া বা না খাইয়া পড়িয়া থাকে। সে ঝড়ও এমন সর্ব্বনেশে যে তার তাড়ায় এক একটা ঢেউ একেবারে পাহাড়ের উপর দিয়া চলিয়া যায়, আর হয়ত যাইবার সময় বেচারাদের কাপড় চোপড়, খাবার জিনিষ, যন্ত্র পাতি যাহা কিছু আল্‌গা পায় সব ভাসাইয়া দেয়। সুতরাং আলোকস্তম্ভ বানাইতে গিয়া অনেক সময়ে লোকে যে প্রাণ হারায় সেটা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

আলোকস্তম্ভের যে রক্ষক থাকে তার প্রধান কাজ সন্ধ্যার সময় বাতি জ্বালান। স্তম্ভের আলো নানারকমের হয়—তবে সাধারণত গরম কেরোসিনের গ্যাসেই আলো জ্বালান হয়। সেই আলো যে খুব বড় আর খুব উজ্জ্বল হওয়া আবশ্যক তাহা বুঝিতেই পার, তা না হইলে নাবিকেরা দূর হইতে দেখিবে কিরূপে? তার উপর বাতিটাকে কাচের ঝাড় আর আয়না দিয়া এমনভাবে ঘেরিয়া দেওয়া হয় যে আলোক চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে পারে না—বাহির হইতে দেখিলে মনে হয় যেন একটা প্রকাণ্ড আলোকের চোঙা সমুদ্রের দিকে চলিয়াছে। ৫০ মাইল দূর হইতে নাবিকেরা সে আলোক দেখিতে পায়। বাতির নীচে কতগুলা কলকব্জা রহিয়াছে; সেইগুলি কাচের ঘরটিকে ডাইনে বাঁয়ে ঘোরায়—তাতে আলোর চোঙাটিও সমুদ্রের উপরে এদিক্ ওদিক্ খেলিতে থাকে। এক একটা আলোকস্তম্ভের বাতি দেখাইবার কায়দা এক এক রকম। কোনটা ধীরে ধীরে ডাইনে বাঁয়ে আলো খেলায়; কোনটার আলো রীতিমত চমকায়; কোনটার আলো স্থির; আবার কেউ বা বহুরূপীর মত রং বদলায়! নাবিকেরা এই সব লক্ষণ দেখিয়া বুঝিতে পারে, এটা অমুক স্তম্ভ।

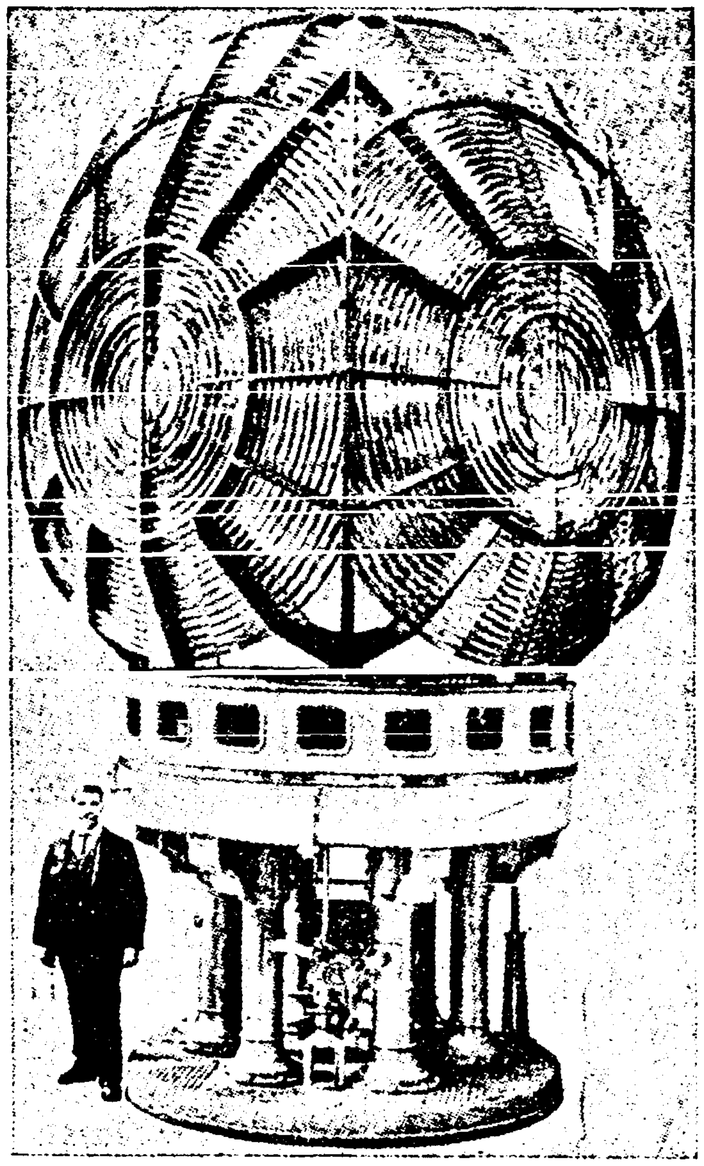

অবশ্য, আলোক যে কেবল নাবিকেরাই দেখে তাহা নয়। এক এক সময় এমন হয় যে হাজার হাজার পাখী কার্ত্তিক মাসের "দেওয়ালী পোকা"র মত বাতির চারি দিকে পাগলের মত ঘুরিতে থাকে। আলোকের কি নেশা আছে জানি না, কিন্তু প্রতি বৎসরই দলে দলে পাখী সারসির উপরে আছাড় খাইয়া মরে—না হয় উড়িতে উড়িতে অবশ হইয়া সমুদ্রে পড়িয়া যায়। সেই জন্য আজকাল কোন কোন স্তম্ভের চূড়ায় পাখী বসিবার জায়গা রাখা হয়। হাজারে হাজারে পাখী আসিয়া তার উপরে বিশ্রাম করে।

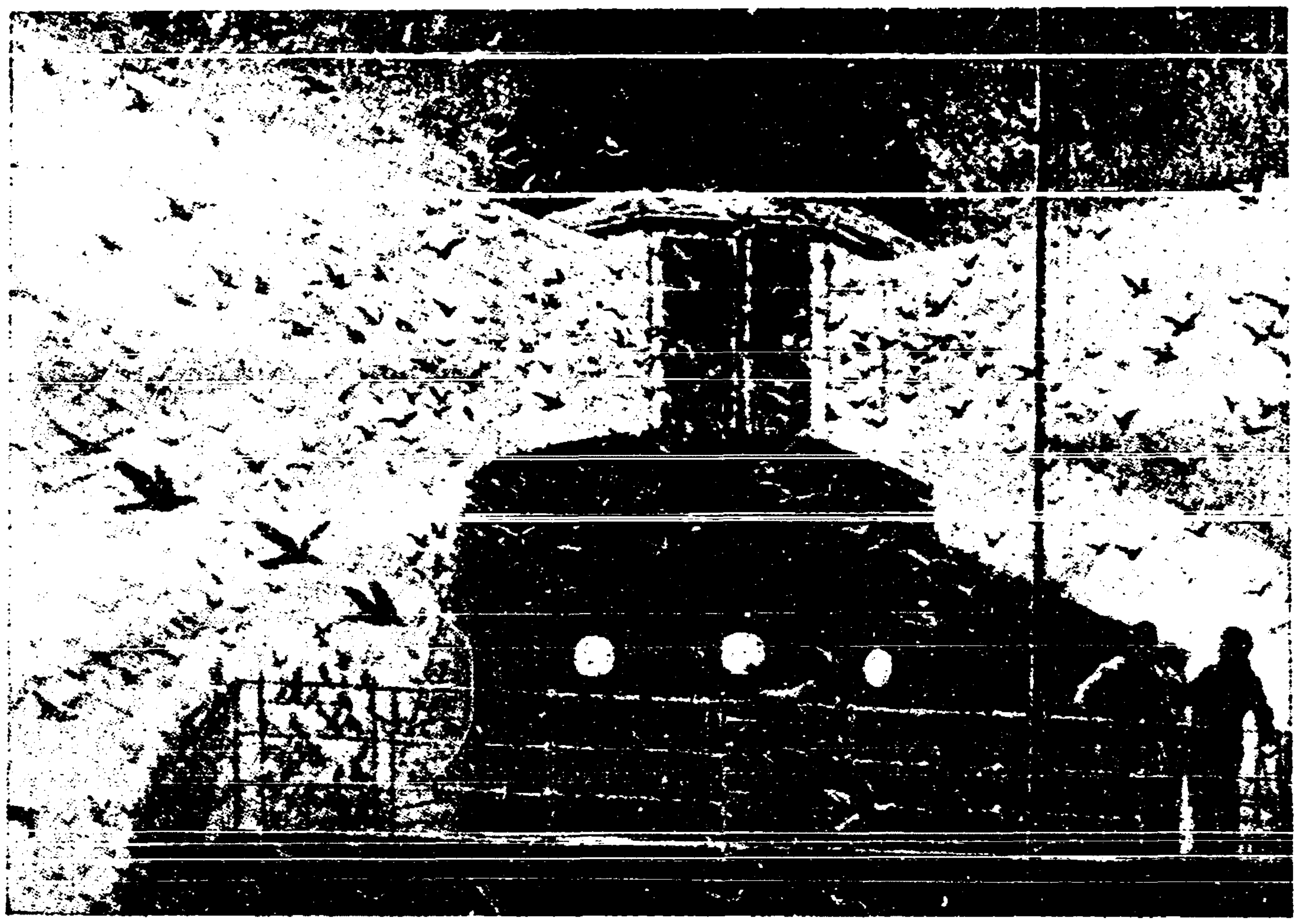

কাতুকুতু বুড়ো।

আর যেখানে যাওনারে ভাই সপ্ত-সাগর পার,
কাতুকুতু বুড়োর কাছে যেও না খবরদার;
সর্ব্বনেশে বুড়ো সে ভাই যেয়ো না তার বাড়ী—
কাতুকুতুর কুল্‌পী খেয়ে ছিঁড়্‌বে পেটের নাড়ি।
কোথায় বাড়ী কেউ জানে না, কোন্ সড়কের মোড়ে,
একলা পেলে জোর ক'রে ভাই গল্প শোনায় পড়ে।
বিদ্‌ঘুটে তার গল্পগুলো না জানি কোন্ দেশী—
শুন্‌লে পরে হাসির চেয়ে কান্না আসে বেশী!
না আছে তার মুণ্ডু মাথা না আছে তার মানে,
তবুও তোমায় হাস্‌তে হবে তাকিয়ে বুড়োর পানে।
কেবল যদি গল্প বলে তাও থাকা যায় স'য়ে,

গায়ের উপর সুড়্‌সুড়ি দেয় লম্বা পালক ল'য়ে।
বলে "এক যে যোদ্ধা রাজা—হোঃ হোঃ হোঃ হিহী,
"তার যে ঘোড়া—হাঃ হাঃ হা—ডাক্‌ত সেটা চীঁহিঁ,
"ছুট্‌ত যখন—হেঃ হেঃ হে—সবাই বল্‌ত বাহা
"হোঃ হোঃ হো হীঃ হীঃ হি হেঃ হেঃ হে হাহা"।
হঠাৎ বলে, "আর কোথা যাও কাতুকুতু ময়না,
ভাত খাবি ত আয়না দেখি আর ত দেরী সয় না"!
এই না ব'লে কুটুৎ করে চিম্‌টি কাটে ঘাড়ে,
খ্যাংরা মতন আঙুল দিয়ে খোঁচায় পাঁজর হাড়ে।
তোমায় দিয়ে কাতুকুতু আপনি লুটোপুটি,
যতক্ষণ না হাস্‌বে তোমার কিছুতে নাই ছুটি।

গল্প স্বল্প।

ধ্রুব যে 'ধ্রুব' তারা হয়েছিল, সেই ধ্রুব তারাটাকে তোমরা দেখেছ? পরিস্কার রাত্রে আকাশের উত্তর ভাগে খুঁজলে তাকে দেখতে পাওয়া যায়। একবার সন্দেশে ধ্রুব তারাকে খুঁজে বার করবার সঙ্কেত লেখা হয়ে ছিল। আমাদের পুরাণে লেখা আছে যে 'শিশুমারে' ধ্রুব থাকে। শিশুমার মানে কুমীর। সাতটা তারাকে যে আমাদের দেশে 'সপ্তর্ষি' বলে তা বোধ হয় তোমরা জান; আর সাতটা তারা আছে, তাদের বলে 'শিশুমার'। চারটি তারা যেন কুমীরের হাত পা, আর তিনটি তার লেজ; সেই লেজের আগায় 'ধ্রুব'। আজ কাল সন্ধ্যা বেলায় সপ্তর্ষিকে আকাশের উত্তরভাগে খুব স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। সপ্তর্ষির সামনের তারা দুটির ভিতর দিয়ে সোজাসুজি সূতা ধরলে ধ্রুবে উপস্থিত হওয়া যায়।

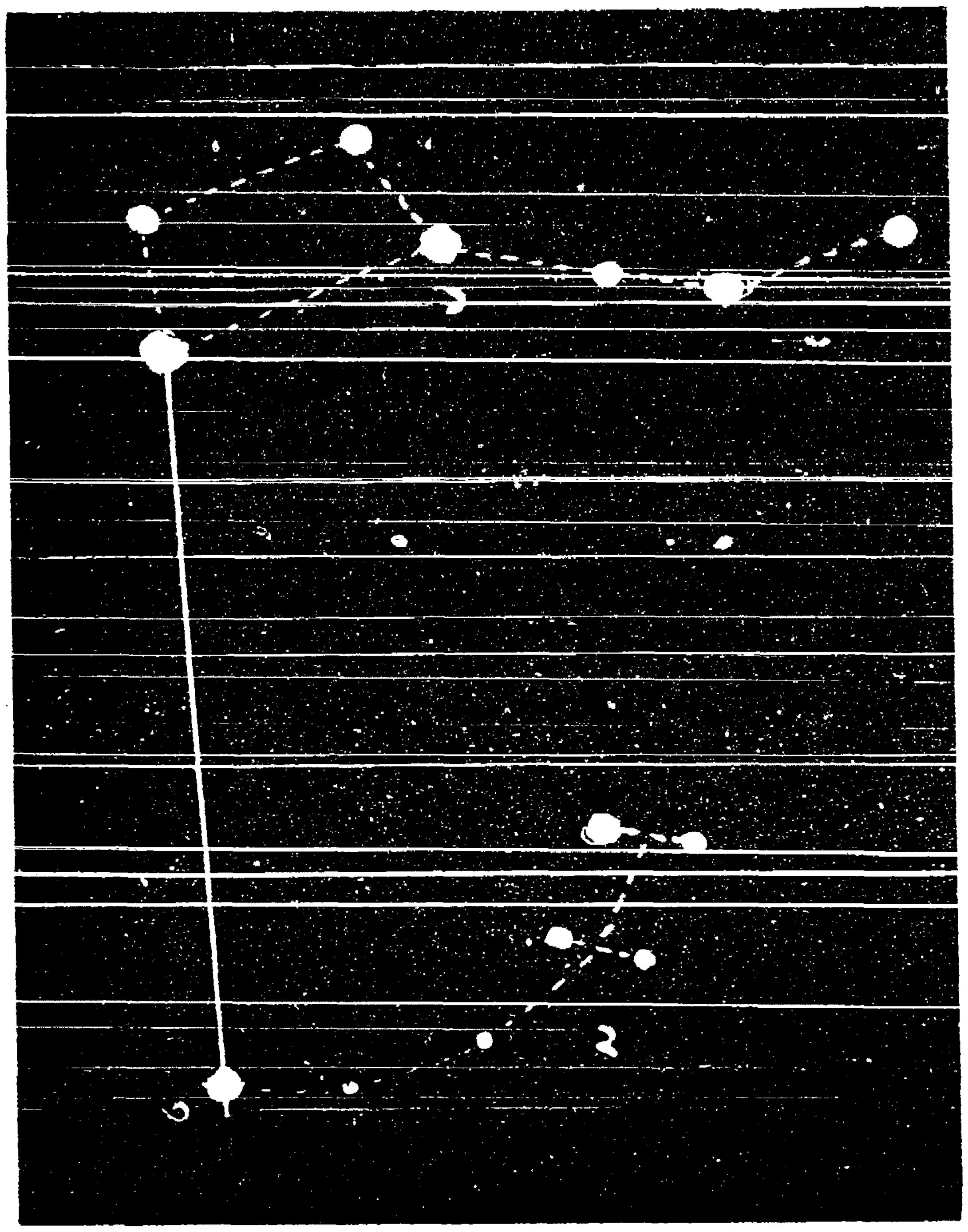

(১) সপ্তর্ষি, (২) শিশুমার, (৩) ধ্রুবতারা।

ধ্রুব, কিনা, স্থির;—যে নড়ে চড়ে না। সন্ধ্যার সময় এই তারাটিকে যেখানে দেখবে, দুপুর রাত্রে উঠেও দেখবে সে ঠিক সেইখানে বসে আছে, ভোরের বেলায়ও দেখবে সে একটুও সরে নি। দিনের বেলায়ও যে সে সেই জায়গাটিতেই স্থির থাকে, তাতে আর কোন ভুল নাই। কাজেই ধ্রুব নামটি খুব সঙ্গতই হয়েছে।

পুরাণে আছে, ধ্রুব এক 'কল্প' কাল এই ভাবে থাকবে। এক কল্প কত দিনে হয়? তত দিন কি আমরা বেঁচে থাকব? আমাদের এই পৃথিবী কি থাকবে? সূর্য্য কি জ্বলবে? পোনের নিমেষে এক কাষ্ঠা হয়, ত্রিশ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিশ কলায় এক ঘটিকা, দুই ঘটিকায় এক মুহূর্ত্ত, ত্রিশ মুহূর্ত্তে এক দিবা রাত্র, ত্রিশ দিবা রাত্রে এক মাস, ছয় মাসে এক অয়ন, দুই অয়নে এক বৎসর। আমাদের তিন শত ষাট বৎসরে দেবতাদের এক একটি বৎসর হয়;

এইরূপ বারো হাজার বৎসরে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারিটি যুগ; সেইরূপ হাজারটি যুগে ব্রহ্মার এক দিন, তারই নাম 'কল্প'—আমাদের ৪৩২০০০০০০০ বৎসর। পুরাণের মতে এই সৃষ্টির আয়ু এতদিন, তারপর প্রলয়।

প্রাচীনকালে আমাদের দেশের লোকে এইরূপ বিশ্বাস করত যে যাবৎ সৃষ্টি, তাবতই ধ্রুব থাকবে। কিন্তু ঐ শিশুমারের লেজের আগার তারাটি এতদিন ওখানে থাকতে পারে না। ২৫০০ কি ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে এই তারাটি ধ্রুব ছিল না। তখন অন্য একটি তারা ধ্রুব ছিল, আমাদের এই ধ্রুবটি তার চার ধারে ঘুরে বেড়াত। আর কয়েক হাজার বৎসর পরে অভিজিৎ নামে আর একটি তারা ধ্রুব হবে। এমনি করে ক্রমে ধ্রুব তারার পরিবর্ত্তন হয়ে, প্রায় ২৫০০০ বৎসর পরে এখানকার ঐ শিশুমারের লেজের আগার তারাটি আবার এই জায়গায় ফিরে আসবে। এক কল্পের ভিতরে কত বার এইরূপ ঘটবে, তা তোমরা সহজেই হিসাব করে দেখতে পার।

ধ্রুবর সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প আছে। অন্য এক জন্মে সে ব্রাহ্মণের পুত্র ছিল। তখন সে এক মনে পিতা মাতার সেবা করত, আর কখনো কোন পাপ কাজে হাত দিত না; সে জন্য দেবতা তার উপরে যারপর নাই তুষ্ট ছিলেন। এর মধ্যে এক রাজার ছেলের সঙ্গে সেই ব্রাহ্মণকুমারের বন্ধুতা হয়। রাজপুত্র মহামূল্য পোষাক পরেন, মিঠাই মণ্ডা পোলাও পায়েস যত খুসী খান। তা দেখে ব্রাহ্মণকুমার ভাবল, 'আহা! অন্য জন্মে আমিও যেন রাজপুত্র হই।' দেবতা তার উপর তুষ্ট ছিলেন, তিনি তার এই সাধ পূর্ণ করলেন। তাইতে সে ধ্রুব নামে রাজা উত্তানপাদের পুত্র হয়ে জন্মাল।

নূতন ধাঁধা।

রংবেরঙের দেহের ঢঙে ল্যাজের কিবা ছিরি
নাকৃটি তুলে হেলে দুলে ফড়্‌ফড়ি়য়ে ফিরি।
উড়ে বেড়াই পৈতা গলায় বাতাসে হাল ছেড়ে
আপন জ্ঞাতির দেখা পেলেই কাট্‌তে যাব তেড়ে॥

বৈশাখের ধাঁধার উত্তর।

১। 'ব' ২। কলম ৩। জুতা

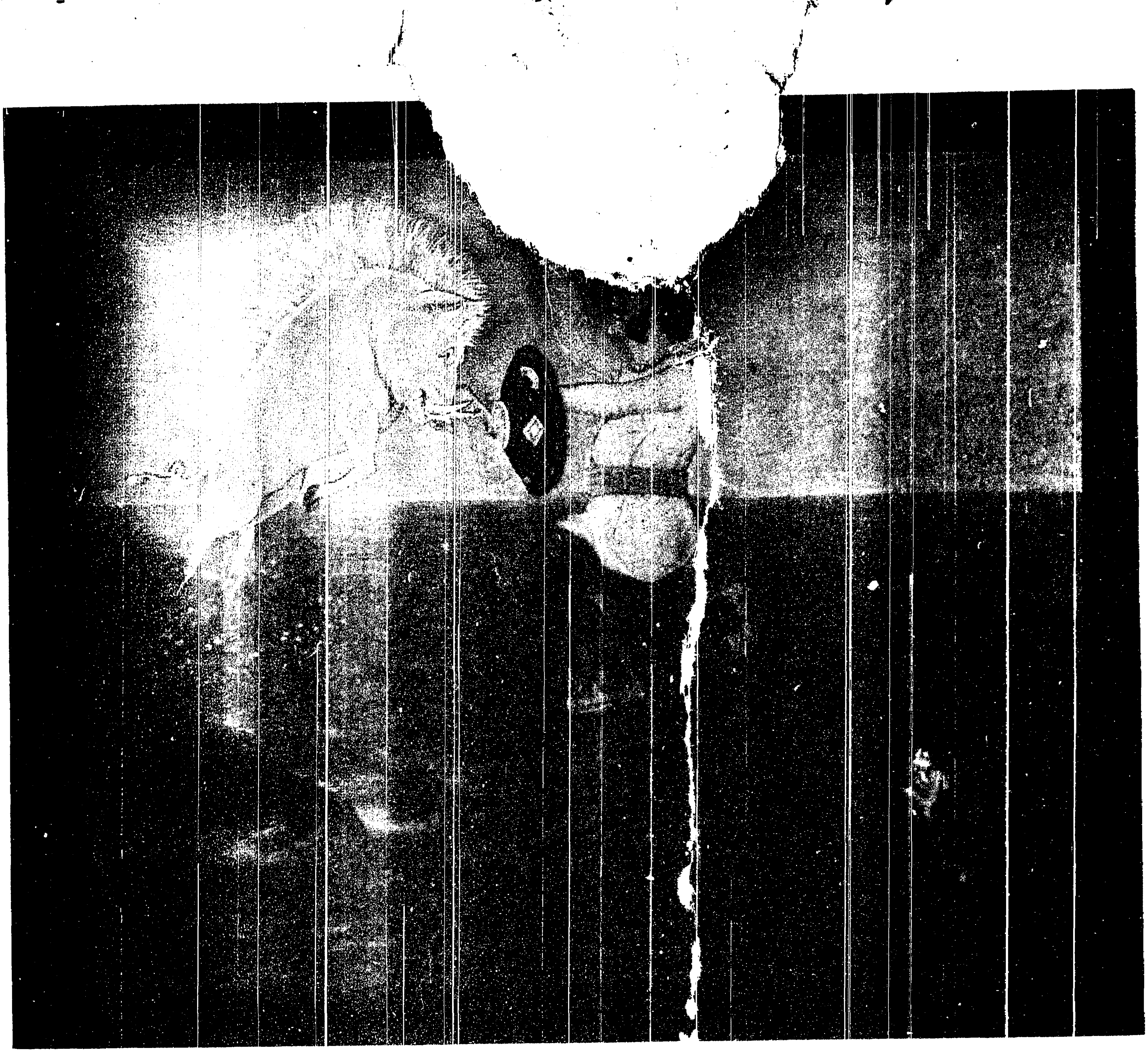

বরাহাবতারের যুদ্ধ।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

তৃতীয় বর্ষ আষাঢ়, ১৩২২ তৃতীয় সংখ্যা

আষাঢ় মাসের ছড়া।

আষাঢ় মাসে আকাশ যোড়া
কালো মেঘের দল;
হাওয়ায় চ'ড়ে আস্‌ছে উড়ে
বুকে ভরা জল।
চিক্ চিক্ চিক্ চিকুর হানে,
গুড়ুম গুড়ুম ডাক;
কে সাজালে এমন ক'রে
কালো মেঘের থাক!

শন্ শন্ শন্ ছুট্‌ছে হাওয়া
তরুলতার দোল;
ঝর্ ঝর্ ঝর্ জলের ধারা
ঝর্‌ছে ক'রে গোল।
খানা ডোবা উঠ্‌ল ভ'রে,
ফুট্‌ল ভেকের ডাক;
কে সাজালে এমন ক'রে,
কালো মেঘের থাক!

নাইক ধুলা; পিছল পথে
কেবল কাদা জল;
উঠ্‌ল পেকে বাগান ভরা
নানা বিধ ফল।
নদ নদীতে জল বেড়েছে—
ঘুর্ণী জলের পাক্;
কে সাজালে এমন ক'রে
কালো মেঘের থাক!

সবুজ ঘাসে ঢেকে গেছে
বাঙ্‌লা দেশের মাঠ;
কল্‌মী দলে ঢেকে দিলে
পুকুর, দীঘির ঘাট।
মাঠের ধারে ঝাড়ে ঝাড়ে
উঠ্‌ছে বেড়ে আখ্;
কে সাজালে এমন ক'রে
কালো মেঘের থাক!

ধানের জমি রোআ হ'ল,
হ'বে দেশের ভাত ;
পাটের চারা জমি ছাড়া
উঠ্‌ল দু' তিন হাত।
চাষার আশা উঠ্‌ল বেড়ে,
কর্‌ছে টাকার তাক্ ;
কে সাজালে এমন ক'রে
কালো মেঘের থাক !

সকলেরি পিতা যিনি,
যাঁহার হাতে গড়া,
ছোট বড় সকল জিনিস্,
আকাশ, পাতাল, ধরা।
মেঘের মাঝে আজ্‌কে বাজে,
তাঁ'র গরবের ঢাক ;
তিনিই দিলেন সাজিয়ে এমন
কালো মেঘের থাক !

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিষ্ণুর অবতার।

পুরাণে আছে যে, বিষ্ণু সময় সময় নানারূপ জন্তু ও মানুষের রূপ ধরিয়া অনেক আশ্চর্য্য কাজ করিয়াছিলেন। বিষ্ণুর এই সকল রূপ ধারণকে তাঁহার এক একটী 'অবতার' বলা হয়।

এই যে সৃষ্টি তাহার জীবন নাকি এক 'কল্প' কাল। এক এক কল্প পরে 'প্রলয়' অর্থাৎ সৃষ্টি নাশ হইয়া আবার নাকি নূতন সৃষ্টি হয়। এখানকার এই জগতের সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে আর এক জগতের প্রলয় হইয়াছিল। বিষ্ণু তাহার পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে প্রলয়ের কাল উপস্থিত হইয়াছে। তখন তিনি একটি খুব ছোট মাছের রূপ ধরিয়া কৃতমালা নামক নদীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে সূর্য্যের পুত্র বৈবস্বত মনু সেই নদীর নিকটে থাকিয়া তপস্যা করিতেছিলেন। একদিন মনু কৃতমালার জলে নামিয়া তর্পণ করিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ তিনি দেখিলেন যে একটি নিতান্ত ছোট মাছ তর্পণের জলের সঙ্গে তাঁহার অঞ্জলির ভিতর উঠিয়াছে।

সেই মাছটিই ছিলেন বিষ্ণু, কিন্তু মনু তাহা জানিতেন না ! তিনি মাছটিকে জলে ফেলিয়া দিতে যাইবেন, এমন সময় সে তাঁহাকে মিনতি করিয়া বলিল, "আমাকে জলে ফেলিবেন না, বড় মাছেরা আমাকে খাইয়া ফেলিবে।" এ কথায় মনু তাহাকে তাঁহার ঘরে আনিয়া কলসীর ভিতরে রাখিয়া দিলেন। কিন্তু সে মাছ এত তাড়াতাড়ি বাড়িতে লাগিল যে, দেখিতে দেখিতে আর সে সেই কলসীতে ধরে না। কলসী হইতে

চৌবাচ্ছায় রাখিলেন, খানিক পরেই আর সে তাহাতেও ধরে না; চৌবাচ্ছা হইতে পুকুরে রাখিলেন, শেষে তাহাতেও ধরে না; সেখান হইতে হ্রদে রাখিলেন, ক্রমে তাহাও তাহার পক্ষে ছোট হইয়া গেল।

তখন মনু তাহাকে কাঁধে করিয়া সমুদ্রের জলে নিয়া ফেলিবামাত্র সে লক্ষ যোজন বড় হইয়া যাওয়ায় তিনি যারপর নাই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "ভগবান্, আপনি কে? আপনি নিশ্চয় স্বয়ং বিষ্ণু; আপনাকে নমস্কার!" মাছ বলিল, "তুমি ঠিক বুঝিয়াছ, আমি দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনের নিমিত্ত মৎস্যরূপ ধারণ করিয়াছি। আজ হইতে সাত দিনের মধ্যে সকল সৃষ্টি সাগরের জলে ডুবিয়া যাইবে। সেই সময়ে তোমার নিকট একখানি নৌকা আসিবে; তুমি সপ্তর্ষিদিগকে আর সকল জীবের দুটি দুটিকে সঙ্গে লইয়া তাহাতে উঠিয়া বসিও। তখন আমিও আবার আসিব; আমার শিঙ্গে তোমার নৌকাখানাকে বাঁধিয়া দিও।

এই বলিয়া বিষ্ণু চলিয়া গেলেন; তারপর ক্রমে তাঁহার কথা মত সমস্তই ঘটিতে লাগিল। সমুদ্র উথলিয়া উঠিল, নৌকা আসিল, সেই মাছও আসিয়া দেখা দিল,—সে এখন দশ লক্ষ যোজন বড়, তাহার দেহ সোনার, আর মাথায় একটা শিঙ্। সেই শিঙ্গে নৌকা বাঁধিয়া দিলে আর কোন বিপদের আশঙ্কা রহিল না।

ইহাই হইল বিষ্ণুর মৎস্যাবতার; তারপর কূর্ম্মাবতার। সমুদ্রের ভিতর অমৃত ছিল; সেই অমৃত পাইবার জন্য দেবতারা দৈত্যগণের সহিত মিলিয়া সমুদ্রকে মন্থন করিয়াছিলেন। সেই মন্থনের দণ্ড হইয়াছিল মন্দার পর্ব্বত, আর দড়ি হইয়াছিল বাসুকি নাগ। মন্থন আরম্ভ হওয়ামাত্রই সেই পর্ব্বত জলের ভিতরে ঢুকিয়া যাইতে লাগিল, কাজেই দেবতারা দেখিলেন যে তাঁহাদের সকল পরিশ্রমই মাটি হইতে চলিয়াছে। সেই সময়ে বিষ্ণু বিশাল কচ্ছপের রূপ ধরিয়া পর্ব্বতটিকে পিঠে করিয়া লইয়াছিলেন, নচেৎ নিশ্চয় তাহা একেবারেই তল হইয়া যাইত, মন্থন অসম্ভব হইত, দেবতাদের ভাগ্যেও আর অমৃত খাওয়া ঘটিত না।

কূর্ম্মাবতারের পর বরাহাবতার। হিরণ্যাক্ষ আর হিরণ্যকশিপু নামে দুইটা ভারী ভয়ানক দৈত্য ছিল। দেবতাদিগকে তাহারা যে কিরূপ নাকাল করিয়াছিল, সে আর বলিবার নহে। হিরণ্যাক্ষ ছেলে বেলায় হাতী আর সিংহে চড়িয়া সূর্য্যটাকে লইয়া খেলা করিত। তারপর একদিন সে করিল কি, কুকুর যেমন মুখে করিয়া পিঠা লইয়া ছুট দেয়, তেমনি ভাবে সে পৃথিবীটাকে মুখে লইয়া জলের ভিতরে গিয়া ঢুকিল।

ইহাতে ব্রহ্মা নিতান্তই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু তাঁহার এমন শক্তি হইল না যে দুষ্ট দৈত্যের মুখ হইতে পৃথিবীটাকে ছিনাইয়া আনেন। তখন তিনি আর উপায় না দেখিয়া বিষ্ণুর স্তব আরম্ভ করিলেন। বিষ্ণু একটা শূয়রের বেশ ধরিয়া তাঁহার নাকের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তারপর সেই শূয়র বাড়িতে বাড়িতে পর্ব্বতপ্রমাণ হইয়া জলের দিকে ছুটিয়া চলিল।

সেই জলের নিকটে নারদ মুনি ছিলেন, তিনি সেই শূয়রকে দেখিয়াই চিনিতে পারিয়া যোড় হাতে বলিলেন, "আজ্ঞা করুন, কি করিব!" শূয়র বলিল, "আমি যতক্ষণ হিরণ্যাক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করিব, ততক্ষণ তুমি কেবলই জল শুষিতে থাকিবে। নারদ দু হাতে জল তুলিয়া ক্রমাগত মুখে দিতে লাগিলেন; যতক্ষণ না হিরণ্যাক্ষের সহিত বিষ্ণুর যুদ্ধ শেষ হইয়াছিল, ততক্ষণ তিনি থামেন নাই। সেই যুদ্ধ জলে পাঁচ শত বৎসর, আর স্থলে পাঁচ শত বৎসর, সব শুদ্ধ এক হাজার বৎসর চলিয়াছিল। তারপর সেই শূয়র হিরণ্যাক্ষকে মারিয়া মুখে করিয়া পৃথিবীকে জল হইতে তুলিয়া আনিয়া ব্রহ্মাকে দিল।

ইহার পর নৃসিংহাবতার; এবারে বিষ্ণু অর্দ্ধেক মানুষের আর অর্দ্ধেক সিংহের মত অতি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া হিরণ্যাক্ষের ভাই হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছিলেন। হিরণ্যাক্ষের মৃত্যুতে ভয়ানক রাগিয়া গিয়া হিরণ্যকশিপু তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য দশ হাজার বৎসর ঘোরতর তপস্যা করে। তাহার দেহে গাছ হইল, তাহাতে পাখীরা বাসা করিল, তথাপি সে তপস্যা ছাড়িল না। তখন ব্রহ্মা আর থাকিতে না পারিয়া তাহাকে বর দিতে আসিলে সে বলিল, "আপনার সৃষ্ট কোন বস্তু বা জীব আমাকে বধ করিতে পারিবে না, এই বর আমাকে দিন্।" ব্রহ্মা সেই বর তাহাকে দিয়া চলিয়া গেলেন,—আর অমনি সেই দৈত্য তাহার জ্ঞাতি বন্ধুগণের সহিত মিলিয়া সৃষ্টি তোলপাড় করিয়া তুলিল। ইন্দ্র, বরুণ, কুবের, কাহাকেও সে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে দিল না, সকলেরই ধন সম্পত্তি কাড়িয়া লইল। তখন দেবতাগণ তাহার জ্বালায় অস্থির হইয়া বিষ্ণুর নিকট নিজ নিজ দুঃখ জানাইলে, বিষ্ণু বলিলেন, "তোমাদের কোন ভয় নাই, আমি শীঘ্রই এই দৈত্যকে বধ করিয়া তোমাদের দুঃখ দূর করিব।"

কিন্তু বিষ্ণুর উপরেই হিরণ্যকশিপুর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রাগ ছিল। সে তাঁহার পূজা বন্ধ করিয়া দিবার জন্য কোন চেষ্টারই ত্রুটি করে নাই। তাহার নিজের পুত্র প্রহ্লাদ বিষ্ণু ভক্ত ছিল, সে জন্য দুষ্ট দৈত্য সেই বালককে কি ভীষণ যন্ত্রণাই দিয়াছিল।

কিন্তু প্রহ্লাদ কিছুতেই হরিনাম পরিত্যাগ করে নাই। সে সব কথা আর একদিন ভাল করিয়া বলিব। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোর হরি কোথায় আছে ?" প্রহ্লাদ বলিল, "তিনি সর্ব্বত্রই আছেন।" হিরণ্যকশিপু একটা থাম দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এই থামের ভিতর আছে ?" প্রহ্লাদ বলিল, "অবশ্য আছেন। হিরণ্যকশিপু তখন খড়্গ লইয়া মহারোষে সেই স্তম্ভে আঘাত করিল। অমনি বজ্রপাতের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জনে বিষ্ণু সেই স্তম্ভের ভিতর হইতে বাহির হইলেন ; তাঁহার দেহ অর্দ্ধেক মানুষের, অর্দ্ধেক সিংহের ন্যায় ; নখ অতি ভীষণ ; কেশর উড়িয়া মেঘে ঠেকিয়াছে ; মুখ দিয়া আগুন বাহির হইতেছে। দৈত্যেরা ক্ষণমাত্র তাঁহার সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিল। কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর নৃসিংহ মূর্ত্তি নিজের নিশ্বাসদ্বারাই আর সকল

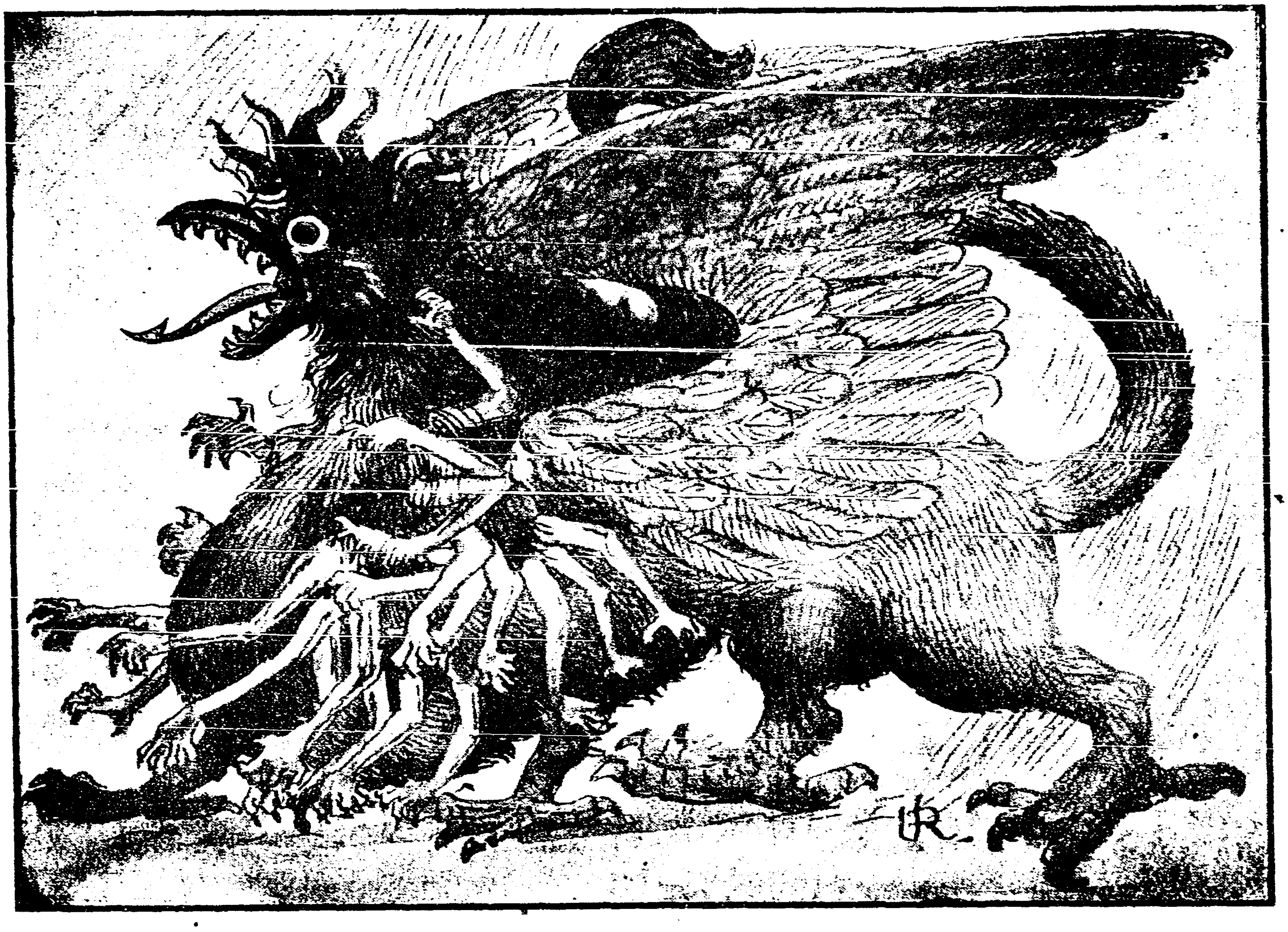

মহাদেবের শরভ মূর্ত্তি।

দৈত্যকে মুহূর্ত্তে ভস্ম করিয়া, দেখিতে দেখিতে হিরণ্যকশিপুর বুক নখে চিরিয়া তাহার রক্ত খাইতে আরম্ভ করিলেন।

এত করিয়াও সেই ভীষণ মূর্ত্তির রাগ দূর হইল না, তাঁহার মুখের আগুনও নিবিল না। তখন দেবতাগণ যারপরনাই ভয় পাইয়া তাঁহাকে থামাইবার উপায় দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু কাহারও তাঁহার নিকটে যাইতে ভরসা হইল না। ইন্দ্র বলিলেন, "আমার চোখ ঝলসিয়া যাইবে!" ব্রহ্মা বলিলেন, "আমার দাড়ি পুড়িয়া যাইবে।" গণেশ অনেক সাহস করিয়া তাঁহার ইঁদুরে চড়িয়া কিছু দূর আসিয়াছিলেন, কিন্তু এর মধ্যে হঠাৎ নৃসিংহের ফুঁ লাগিয়া তাঁহার ইঁদুরটি উল্টিয়া যাওয়াতে তাঁহাকে তাঁহার সেই বিশাল ভুঁড়িসুদ্ধ গড়াগড়ি যাইতে হইল।

শেষে আর কোন উপায় না দেখিয়া দেবতাগণ মহাদেবের শরণাপন্ন হইলে মহাদেব অতি অদ্ভুত শরভের মূর্ত্তি ধরিয়া নৃসিংহের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই শরভকে দেখিবামাত্রই নৃসিংহের রাগ থামিয়া গেল, সকলের ভয়ও দূর হইল।

গুপী গাইন।

সে দিন বাঘাকে নিয়ে গুপীর কি মুস্কিলই হয়েছিল। ঢোল পোড়াবার নাম শুনেই বাঘা কাঁদতে আরম্ভ করেছে, ঢোল এনে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলে না জানি সে কি করবে! তখন, সেটা যে তারি ঢোল, সে কথা কি আর বাঘা সামলে রাখতে পারবে? কি সর্ব্বনাশ! এখন বুঝি ধরা পড়ে প্রাণটাই হারাতে হয়।

গুপীর বড়ই ইচ্ছা হচ্ছিল যে বাঘাকে নিয়ে ছুটে পালায়। কিন্তু তার ত আর যো নাই; সভায় বসবার সময় যে সেই জুতাগুলো পা থেকে খুলে রাখা হয়েছে।

এ দিকে কিন্তু বাঘার কাণ্ড দেখে সভাময় এক বিষম হুলস্থূল পড়ে গেছে। সবাই ভাবছে, বাঘার নিশ্চয় একটা ভারী অসুখ হয়েছে, আর সে বাঁচবে না। রাজবাড়ীর বৈদ্যি ঠাকুর এসে বাঘার নাড়ী দেখে যার পর নাই গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন। বাঘাকে খুব করে জোলাপের ওষুধ খাইয়ে তার পেটে বেলেস্তারা লাগিয়ে দেওয়া হল। তারপর বৈদ্যি ঠাকুর বল্লেন যে, 'এতে যদি বেদনা না সারে, তবে পিঠে আর একটা, তাতেও না সারলে দুপাশে আর দুটো বেলেস্তারা লাগাতে হবে।'

এ কথা শুনেই বাঘার কান্না তৎক্ষণাৎ থেমে গেল। তখন সকলে ভাবল যে, বৈদ্যি ঠাকুর কি চমৎকার ওষুদই দিয়েছেন, দিতে দিতেই বেদনা সেরে গেছে।

যা হোক, বাঘা যখন দেখল যে তার কান্নাতে ঢোল পোড়াবার কথাটা চাপা পড়ে গেছে, তখন সেই বেলেস্তারার বেদনার ভিতরেই তার মনটা কতক ঠাণ্ডা হল। রাজামশায় তখন তাকে খুব যত্নের সহিত তার ঘরে শুইয়ে রেখে এলেন; গুপী তার কাছে বসে তার বেলেস্তারায় হাওয়া করতে লাগল।

তারপর সকলে ঘর থেকে চলে গেলে, গুপী বাঘাকে বল্ল, "ছি, ভাই, যেখানে সেখানে কি এমন করে কাঁদতে আছে? দেখ দেখি, এখন কি মুস্কিলটা হল।" বাঘা বল্ল, "আমি যদি না কাঁদ্তুম, তা হলে ত এতক্ষণে আমার ঢোলকটি পুড়িয়ে শেষ করে দিত। এখন না হয় একটু জ্বলুনি সইতে হচ্ছে, কিন্তু আমার ঢোলকটা ত বেঁচে গেছে!"

বাঘা আর গুপী এমনি কথাবার্ত্তা বলছে। এদিকে রাজামশায় সভায় ফিরে এলে দারোগামশায় তাঁর কানে কানে বল্লেন, "মহারাজ, একটা কথা আছে, অনুমতি হয় ত বলি।" রাজা বল্লেন, "কি কথা?" দারোগা বল্লেন, "মহারাজ, ঐ যে লোকটা গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদল, সে আর তার সঙ্গের ঐ লোকটা,—সেই দুই ভূত; আমি তাদের চিনতে পেরেছি।" রাজা বল্লেন, "তাইত হে, আমারও একটু যেন সেই রকমই ঠেকছিল। তা হলে ত বড় মুস্কিল দেখছি। বল ত এখন কি করা যায়?"

তখন একথা নিয়ে সভার মধ্যে ভারী একটা কাণাকাণি সুরু হল। কেউ বল্ল, "রোজা ডাক, ও দুটোকে তাড়িয়ে দিক্।" আর একজন বল্ল, "রোজা যদি তাড়াতে না পারে, তখন ত সে দুটো ক্ষেপে গিয়ে একটা বিষম কিছু করতে পারে। তার চেয়ে কেন রাত্রে ঘুমের ভিতরে ও দুটোকে পুড়িয়ে মারুন না।"

এ কথাটা সকলেরই খুব পছন্দ হল, কিন্তু এর মধ্যে একটু মুস্কিল এই দেখা গেল যে, ভূতদের পোড়াতে গেলে রাজবাড়ীতেও তখন আগুন ধরে যেতে পারে। শেষে অনেক যুক্তির পর এই স্থির হল যে, একটা বাগান বাড়ীতে তাদের বাসা দেওয়া হবে; বাগানবাড়ী পোড়া গেলেও বিশেষ ক্ষতি হবে না। তখন রাজামশায় বল্লেন যে, "সেই ঢোলটাকেও তা হলে সেই বাগানবাড়ীতে নিয়ে রাখা যাক; বাগানবাড়ী পোড়াবার সময় এক সঙ্গে সকল আপদ চুকে যাবে।"

বাগানবাড়ী যাবার কথা শুনে গুপী আর বাঘা খুব খুসী হল। তারা ত জানে না যে এর ভিতরে কি ভয়ানক ফন্দি রয়েছে; তারা খালি ভাবল যে বেশ আরামে নিরিবিলি থাকা যাবে, সঙ্গীত চর্চ্চারও সুবিধা হতে পারে। জায়গাটি খুবই নিরিবিলি আর সুন্দর। বাড়ীটি কাঠের, কিন্তু দেখতে চমৎকার। সেখানে গিয়ে দেখতে

দেখতে বাঘা ভাল হয়ে গেল। তখন গুপী তাকে বল্ল, "ভাই, আর এখানে থেকে কাজ কি ? চল আমরা এখান থেকে চলে যাই।" বাঘা বল্ল, "দাদা, এমন সুন্দর জায়গায় ত আর থাকতে পাব না, দু দিন এখানে রইলাম বা। আহা, আমার ঢোলকটি যদি থাক ত !"

সেদিন বাঘা বাড়ির এঘর ওঘর ঘুরে বেড়াচ্ছে, গুপী বাগানের এক জায়গায় বসে গুণ্ গুণ্ করছে, এমন সময় হঠাৎ বাঘা ভয়ানক চ্যাঁচামেচি করে উঠল। তার সকল কথা বোঝা গেল না, খালি 'ও গুপী দা ! ও গুপী দা !' ডাকটা খুবই শোনা যেতে লাগল। গুপী তখন ছুটে এসে দেখল যে, বাঘা তার সেই ঢোলটা মাথায় করে পাগলের মত নাচছে, আর যা'তা আবোল তাবোল বলতে বলতে 'গুপী দা, গুপী দা' বলে চ্যাঁচাচ্ছে। ঢোল পেয়ে তার এত আনন্দ হয়েছে যে সে আর কিছুতেই স্থির হতে পারছে না, গুছিয়ে কথাও বলতে পারছে না। এমনি করে প্রায় আধ ঘণ্টা চলে গেলে পর বাঘা একটু শান্ত হয়ে বল্ল, "গুপী দা, দেখছ কি, এই ঘরে আমার ঢোলকটি— আরে কি মজা—হাঃ হাঃ হাঃ" বলে আবার সে মিনিট দশেক খুব নেচে নিল। তারপর সে বল্ল, "দাদা, এত দুঃখের পর ঢোলকটি

পেয়েছি, একটা গান গাও, একটু বাজিয়ে নি'।" গুপী বল্ল, "এখন নয় ভাই,

এখন বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে। খাওয়া দাওয়ার পর রাত্রে বারান্দায় বসে তুজনায় খুব করে গান বাজনা করা যাবে।”

রাজামশাই কিন্তু ঠিক করেছেন, সেই রাত্রেই তাদের পুড়িয়ে মারবেন। দারোগার উপর হুকুম হয়েছে যে, সেদিন সন্ধ্যার সময় সেই বাগান বাড়ীতে মস্ত ভোজের আয়োজন করতে হবে। দারোগামশায় পঞ্চাশ ষাট জন লোক নিয়ে সেই ভোজে উপস্থিত থাকবেন; খাওয়া দাওয়ার পর গুপী আর বাঘা ঘুমিয়ে পড়লে, তাঁরা সকলে মিলে এক সঙ্গে সেই কাঠের বাড়ীর চারদিকে আগুন দিয়ে তাদের পালাবার পথ বন্ধ করবেন।

সেদিনকার খাওয়া বেশ ভাল মতেই হল। গুপী আর বাঘা ভাবল যে লোক জন চলে গেলেই তারা গান বাজনা আরম্ভ করবে, দারোগা মশাই ভাবলেন যে গুপী আর বাঘা ঘুমালেই ঘরে আগুন দিবেন। তিনি তাদের ঘুম পাড়াবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর ভাব দেখে যখন স্পষ্টই বুঝা গেল যে তারা না ঘুমালে তিনি সেখান থেকে যাবেন না, তখন গুপী বাঘাকে নিয়ে গিয়ে বিছানায় পড়ে নাক ডাকাতে লাগল।

একটু পরেই গুপী আর বাঘা দেখল যে লোক জন সব চলে গেছে, আর কারু সাড়া শব্দ নাই। তারপর আরেকটু দেখে, যখন মনে হল যে বাগান একেবারে খালি হয়ে গেছে, তখন তারা তুজনে বারান্দায় এসে ঢোল বাজিয়ে গান যুড়ে দিল।

এদিকে দারোগা মশায় তাঁর লোকদের বলে দিয়েছেন, ‘তোরা প্রত্যেক দরজায় বেশ ভাল করে আগুন ধরাবি; খবরদার, আগুন ভাল করে না ধরলে চলে যাস্‌নি যেন।’ তিনি নিজে গিয়েছেন সিঁড়িতে আগুন ধরাতে। আগুন বেশ ভাল মতেই ধরেছে, দারোগা মশাই ভাবছেন ‘এই বেলা ছুটে পালাই,’ এমন সময় বাঘার ঢোল বেজে উঠল, গুপীও গান ধরে দিল। তখন আর দারোগা মশাই বা তাঁর লোকদের কারু সেখান থেকে নড়বার যো রইল না, সকলকেই পুড়ে মরতে হল। ততক্ষণে গুপী আর বাঘাও আগুন দেখতে পেয়ে, তাদের জুতার জোরে, তাদের ঢোল আর থলেটি নিয়ে সেখান থেকে চম্পট দিল।

ক্রমশঃ

ছোট ভাই।

সাতটি ভাই ছিল, তাদের সকলের ছোটটির নাম ছিল রুরু। দেশের মধ্যে তারা সাতটি ভাই দেখতে আর সকল ছেলের চেয়ে সুন্দর ছিল; তাদের মধ্যে আবার রুরু ছিল সকলের চেয়ে সুন্দর। রুরুকে সকলেই কেন এত সুন্দর বলে, আর তাদের বলে না, এই জন্য রুরুর বড় ভাইয়েরা তাকে বড্ড হিংসা করত। ভাল ভাল কাপড়গুলো সব তারা ছ জনায় পরে বেড়াত, রুরুকে পরতে দিত শুধু ছেঁড়া ন্যাকড়া। যত বিচ্ছিরী নোংরা কাজ, সব তারা রুরুকে দিয়ে করাত, আর নিজেরা বাবুগিরি করে বেড়াত। তবু সকল লোকে রুরুকেই বেশী ভাল বাসত, বড় কটিকে কেউ দেখতে পারত না। তাতে তারা আরো চটে রুরুকে যখন তখন ধরে ঠ্যাঙ্গাত, বেচারাকে এক দণ্ডও সুখে থাকতে দিত না।

রুরুদের গ্রাম থেকে ঢের দূরে ররঙ্গা বলে একটি মেয়ে থাকত। এমন সুন্দর মেয়ে এই পৃথিবীতে আর কোথাও ছিল না। তার কথা শুনেই রুরুর দাদারা বল্ল, "চল, আমরা সেই মেয়েকে দেখতে যাব। আমাদের মত সুন্দর ছেলে আর কোথায় আছে? আমাদের দেখলেই নিশ্চয় সেই মেয়ে আমাদের একজনকে বিয়ে করে ফেলবে।"

তখন ত তাদের খুবই আনন্দ আর উৎসাহ হল। ছ জনের প্রত্যেকে ভাবল, 'ররঙ্গা নিশ্চয় আমাকেই বিয়ে করবে!' কত কাপড়, কত গহনা এনে যে তারা তাদের ছটি পুঁটুলীর ভিতরে পূরল, তার লেখা জোখা নাই। মস্ত বড় পান্‌সী তাদের জন্য তয়ের হল। ছ ভাই মিলে আজ কত রকম করেই পোষাক পরছে আর চুল আঁচড়াচে; একটু পরে তারা সেই পান্‌সীতে চড়ে বউ আনতে যাবে।

তাদের মা জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যাঁ রে, তোরা রুরুকে সঙ্গে নিবি নে?" অমনি তারা ছজন এক সঙ্গে বল্ল, "নিব বই কি? নইলে আমাদের রান্না কে করবে? কে জল তুলবে? ররঙ্গাকে দেখতে যাবার সময় আমরা তাকে আমাদের বাসায় রেখে যাব। ও যে ছেঁড়া কাপড় পরে, ও আমাদের ভাই, একথা জানলে লোকে কি বলবে?"

রুরু সবই শুনল, কিন্তু কিচ্ছু বল্ল না। সেও তার দাদাদের সঙ্গে সেই পান্‌সীতে চড়ে ররঙ্গাদের দেশে গিয়ে উপস্থিত হল। সেখানকার লোকেরা এর আগেই শুনতে পেয়েছিল যে, কয়েকটি খুব সুন্দর ছেলে তাদের দেশে বউ খুঁজতে যাচ্ছে। তারা সেই পান্‌সী পৌঁছাবামাত্রই এসে রুরুর দাদাদের আদর করে তাদের গ্রামে নিয়ে গেল। সেখানে তারা বাড়ী ঘর সাজিয়ে মস্ত ভোজের আয়োজন আগেই করে রেখেছিল।

ছ ভাই হাসতে হাসকে দুলতে দুলতে তাদের সঙ্গে চলে গেল। রুরুকে বলে গেল, "আমাদের জন্যে একটা বাসা ঠিক করে, জিনিস পত্র সব তাতে নিয়ে রাখবি।"

তারপর তাদের খাওয়া দাওয়া, আমোদ আহ্লাদ খুবই হল। সেখানে অনেক মেয়ে ছিল, কিন্তু তাদের কোন্‌টি যে ররঙ্গা, ছ ভাইয়ের কেউ তা বুঝতে পারল না। তাদের প্রত্যেকেই তার পাশের মেয়েটিকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করল, "কোন্‌টি ররঙ্গা ?" সেই মেয়েদের প্রত্যেকেই বল্ল, "আমিই ররঙ্গা ; কাউকে বো'ল না !"

একথা শুনে ত আর ভাইদের আনন্দের সীমাই রইল না। অত সহজে ররঙ্গাকে পেয়ে ফেলবে, তা তারা মোটেই ভাবেনি। তারা তখনি সেই মেয়েগুলোর সঙ্গে বিয়ের কথা ঠিক করে ফেল্ল। তারপর কয়েক দিনের মধ্যেই তাদের বিয়ে হয়ে গেল। সকলেই ভাবল, ররঙ্গাকে বিয়ে করেছে ; ঠকেছে যে, সে কথা কারুরই মনে হল না।

রুরু বেচারা এত কথার কিচ্ছু জানে না, আর তার জানবার দরকারই বা কি ? প্রথম দিন বাসা ঠিক ঠাক করে সে কলসী হাতে জল আনতে বেরিয়েছিল। জল কোথায় আছে তাত আর সে জানে না, তাই সে একটি ছোট্ট মেয়েকে জিজ্ঞাসা করল, "হ্যাঁ গা, কোথায় জল পাব ?" মেয়েটি বল্ল, "ঐ যে ররঙ্গার বাড়ী, তারি পাশে একটা ঝরনা আছে।"

রুরু সেই দিকে জল আনতে চল্ল। যেতে যেতে সে ভাবল, "ররঙ্গা ত ভোজে গিয়েছে ; এর মধ্যে আমি একটু উঁকি মেরে দেখে নিই না, তার বাড়ীটি কেমন।" এই ভেবে সে আস্তে আস্তে সেই ঘরটির দরজার কাছে গিয়ে উঁকি মারল। উঁকি মেরে আর তার সেখান থেকে চলে আসবার কথা মনে রইল না। সে দেখল, ঘরের ভিতরে ররঙ্গা বসে আছে ! নিশ্চয় সে ররঙ্গা, নইলে এত সুন্দর আর কে হবে ?

ররঙ্গা তাকে দেখেই ভারী খুসী হয়ে অমনি তাকে ডাকল, "এস, এস ; ঘরে এস।" রুরু জড় সড় হয়ে ঘরে গেল। তখন ররঙ্গা জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কে ?" রুরু বল্ল, "সেই যে ছ জন লোক বউ খুঁজতে এসেছে, যাদের জন্যে ভোজ হচ্ছে, আমি তাদের ছোট ভাই !" ররঙ্গা বল্ল, "তুমি কেন তবে ভোজে যাও নি ?" রুরু বল্ল, "আমাকে তারা নিয়ে যায়নি, কাজ করবার জন্য বাসায় রেখে গেছে। আমার এর চেয়ে ভাল কাপড় নাই ; এগুলো কাজ করতে করতে ময়লা হয়ে আর ছিঁড়ে গেছে।"

রুরুকে দেখেই ররঙ্গার যারপরনাই ভাল লেগেছিল, তার কথা শুনে তার বড়ই দুঃখ হ'ল। সে বুঝতে পারল যে রুরুর দাদারা বড় দুষ্টু, তাকে কষ্ট দেয়। তখন রুরুকে তার আরো ভাল লাগল। দুদিন পরে তাদের বিয়েও হয়ে গেল।

তারপর দিন রুরুর দাদারা বউ নিয়ে ঘরে যাবে। রুরু যে তার আগেই ররঙ্গাকে নিয়ে নৌকার তলায় লুকিয়ে রেখেছে, সে কথা তাদের কেউ টের পায়নি। তারা ভারী ধূমধাম করে দেশে এল। তারপর বৌ নিয়ে বাড়ীতে পা দিয়েই সকলের বড় ভাই তাদের মাকে বল্ল, "এই দেখ মা, ররঙ্গাকে বিয়ে করে এনেছি!" অমনি তার ছোট ভাই তার চেয়ে বেশী করে চেঁচিয়ে বল্ল, "না মা, ও মিছে কথা বল্‌ছে; আমি ররঙ্গাকে এনেছি!"

রুরু ররঙ্গাকে দেখ্‌তে পেয়েছে।

তখন ত ভারী একটা মজা হল। সবাই বলছে, "ওদের কথা মিথ্যা; আমি ররঙ্গাকে এনেছি!" ভয়ানক চটাচটি; মারামারি হয় হয়। বউ কটি থতমত খেয়ে মুখ চাওয়া চাওয়ি করছে; তারা ভাবে নি যে অত সহজে ধরা পড়ে যাবে।

তখন মা বল্লেন, "বাবা, ররঙ্গা ত ছটি নয়, আর, এদের একটিও তেমন সুন্দরী নয়। তোমরা ঠকে এসেছ। রুরু এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল, মার কথা শুনে সে বল্ল, "ঠিক বলেছ মা; ঠকে এসেছে। আমার সঙ্গে এস, আমি ররঙ্গাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।"

এ কথায় রুরুর দাদারা ত হেসেই গড়াগড়ি দিতে লাগল ; কিন্তু মা বল্লেন, "আচ্ছা, গিয়েই দেখি না।" বলেই তিনি রুরুর সঙ্গে নৌকায় এলেন, আর একটিবার ররঙ্গার মুখের দিকে চেয়েই তাকে কোলে নিয়ে আনন্দে নাচতে লাগলেন। সে খবর দেখতে দেখতে গ্রামময় ছেয়ে পড়ল। তখন পাড়ার ছেলে বুড়ো, গিন্নী বউ সকলে ছুটে এসে ররঙ্গাকে ঘিরে নাচতে লাগল।

এ সব দেখে দাদারা চোখ লাল করে, দাঁত খিঁচিয়ে তাদের স্ত্রীদের বল্ল, "বটে ? ফাঁকি দিয়েছিস্ ?" শুনে সকলে হো হো করে হাসল। তাদের মা বল্লেন, "আরে কেন বাছা ? চুপ কর ! তোমরা যেমন, তোমাদের তেমনি যুটেছে !"

তিনটি বর।

এক দেশে এক কামার ছিল, তার মত অভাগা আর কোন দেশে কখনো জন্মায় নি। তাকে এক জিনিস গড়তে দিলে তার জায়গায় আরেক জিনিস গড়ে রাখত ; একটা কিছু সারাতে দিলে তাকে ভেঙ্গে আরো খোঁড়া করে দিত। আর লোককে ফাকি যে দিত, সে কি বলব ! কাজেই কেউ তাকে কোন কাজ করতে দিতে চাইত না, তার দুবেলা দুটি ভাতও জুটত না ; লাভের মধ্যে সে তার গিন্নীর তাড়া খেয়ে সারা হত।

এক দিন সে দোকানে বসে গালে হাত দিয়ে ভাবছে। ভয়ানক শীত ; গায় জড়াবার কিচ্ছু নাই। ক্ষিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে ; ঘরে খাবার নাই। এমন সময় কোত্থেকে এক এই লম্বা সাদা দাড়িওয়ালা বুড়ো লাঠি ভর করে কাঁপতে কাঁপতে এসে তার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বল্ল, "জয় হোক, বাবা ! দুঃখী বুড়োকে কিছু খেতে দাও।"

কামার বল্ল, "বাবা, খাবার যদি থাকত, তবে নিজেই দুটি খেয়ে বাঁচতুম। দুদিন পেটে কিছু পড়েনি, ছেলেপুলে নিয়ে উপোস করছি,—তোমাকে কোত্থেকে দিব ? তুমি না হয় ঘরে এসে একটু গরম হয়ে যাও, আমি হাপর ঠেলে আগুনটা উস্কিয়ে দিচ্ছি।"

বুড়ো তখন কাঁপতে কাঁপতে ঘরে এসে বল্ল, "আহা বাঁচালে বাবা; শীতে জমে গিয়েছিলুম। তুমি দেখছি তবে আমার চেয়েও দুঃখী। আমার নিজে খেতে পেলেই চলে, তোমার আবার স্ত্রী আর ছেলেপুলেও আছে।"

এই বলে বুড়ো আগুনের কাছে এসে বস্‌ল, কামার খুব করে হাপর ঠেলে আগুন উস্কিয়ে তাকে গরম করে দিল। যাবার সময় বুড়ো তাকে বল্ল, "তুমি আমাকে খেতে দিতে পারনি, তবু তোমার যত দূর সাধ্যি তুমি করেছ। এখন তোমার যেমন ইচ্ছা, তিনটি বর চাও, আমি নিশ্চয় দিব।"

এ কথায় কামার অনেকক্ষণ বুড়োর মুখের দিকে চেয়ে মাথা চুলকাতে লাগল, কিন্তু কি বর চাইতে হবে, বুঝতে পার্‌ল না। বুড়ো বল্ল, "শীগ্‌গির বল; আমার বড্ড তাড়াতাড়ি; ঢের কাজ আছে।"

তখন কামার থতমত খেয়ে বল্ল, "আচ্ছা, তবে এই বর দিন্ যে, আমার এই হাতুড়িটি যে একবার হাতে করবে, সে আর আমার হুকুম ছাড়া সেটি রেখে দিতে পারবে না। আর যদি তা দিয়ে ঠুক্‌তে আরম্ভ করে, তবে আমি থামতে না বল্লে আর থামতে পারবে না।"

বুড়ো বল্ল, "আচ্ছা, তাই হবে। আর কি বর চাই?" কামার বল্ল, "আমার এই কেদারা খানিতে যে বসবে, সে আমার হুকুম ছাড়া তা থেকে উঠতে পারবে না।" বুড়ো বল্ল, "আচ্ছা, তাও হবে। আর কি?" কামার বল্ল, "আমার এই থলিটির ভিতরে আমি কোন টাকা রাখলে, আমি ছাড়া আর কেউ তাকে তা থেকে বার করতে পারবে না।"

সেই বুড়ো ছিলেন এক দেবতা। তিনি এই শেষ বরটিও সেই কামারকে দিয়ে, ভয়ানক রেগে বল্লেন, "অভাগা, তুই ইচ্ছা করলে এই তিন বরে পরিবার শুদ্ধ স্বর্গে চলে যেতে পারতিস্, তার মধ্যে তোর এই দুর্ম্মতি!"

এই বলে দেবতা চলে গেলেন, কামার আবার বসে বসে ভাবতে লাগল। হঠাৎ তার মনে হল যে, "তাই ত, এই তিন বরের জোরে ত আমি বেশ দু'পয়সা রোজগার করে নিতে পারি।"

তখন সে দেশময় এই কথা রটিয়ে দিল যে, "আমার দোকানে এলে আমি বিনি পয়সায় কাজ করে দিব।" দেশের যত কিপ্টে পয়সাওয়ালা লোক, সেকথা শুনে তার দোকানে এসে উপস্থিত হতে লাগ্‌ল। এক এক জন আসে, আর কামার তাকে

দুহাতে লম্বা লম্বা সেলাম করে তার সেই কেদারাখানায় নিয়ে বসতে দেয়। বিনি পয়সায় কাজ করিয়ে চলে যাবার সময় আর সে বেচারা তা থেকে উঠতে পারে না,

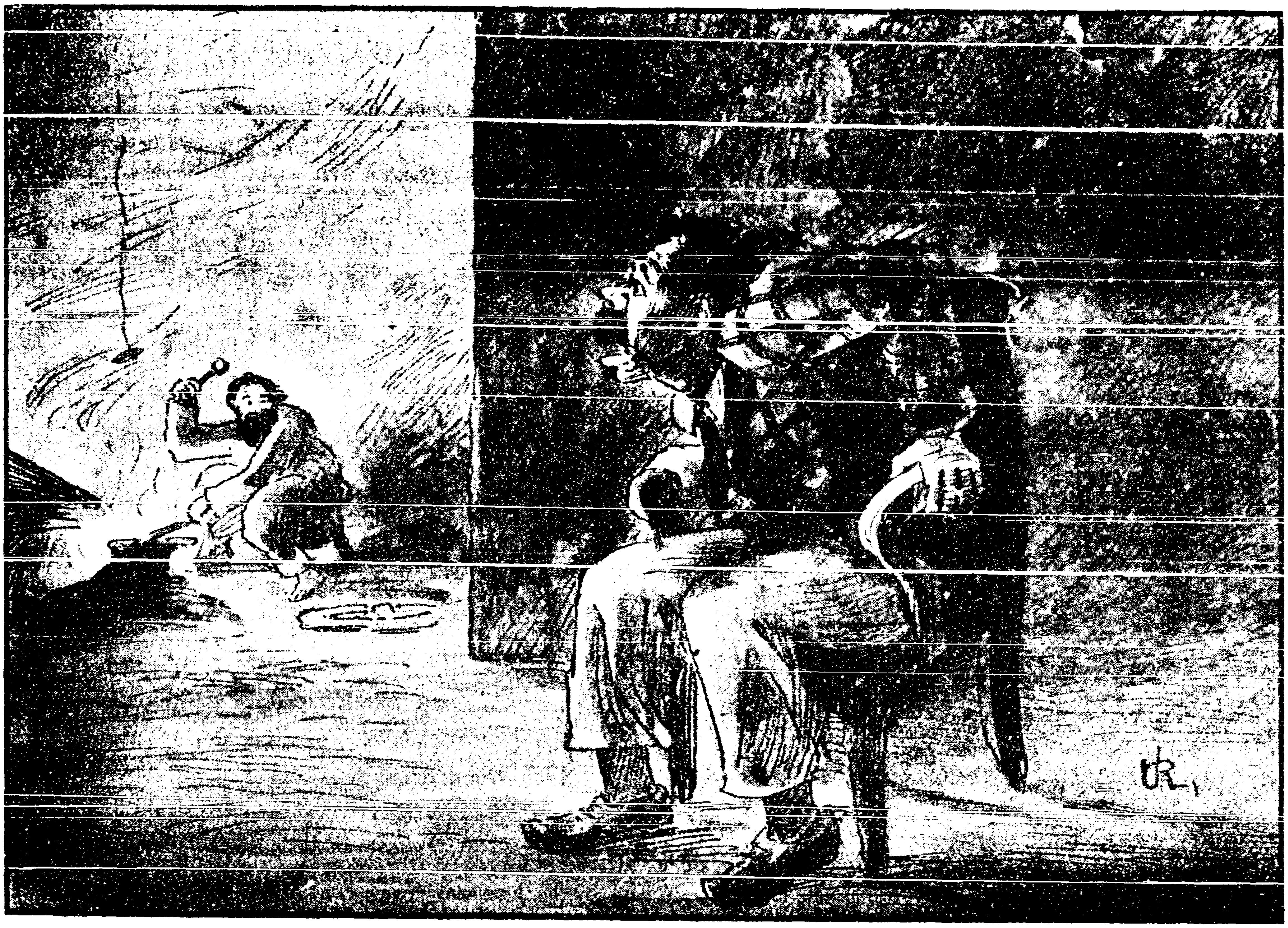

কামারের কেদারায় কৃপণ আট্‌কেছে।

কামারও বেশ ভাল মতে তার কাছ থেকে কিছু টাকা আদায় না করে তাকে উঠতে দেয় না। এমনি করে দিন কতক সে খুব টাকা পেতে লাগল। কাউকে এনে চেয়ারে বসায়, কারু হাতে তার হাতুড়িখানা তুলে দেয়, তারপর টাকা না দিলে আর তাকে ছাড়ে না।

যা হোক, ক্রমে সকলেই তার দুষ্টুমি টের পেয়ে ফেল্ল; তখন আর কেউ তার কাছে আসে না, কাজেই আবার তার দুর্দ্দশার এক শেষ হতে লাগল। এই সময়ে কামার একদিন একটা বনের ভিতর বেড়াতে গিয়ে একটি সাদাসিধে গোছের বুড়োকে

দেখতে পেল। বুড়োকে দেখে সে আগে ভাবল, বুঝি কোন উকীল হবে। কিন্তু তখনি আবার কোন উকীলের সেই বনের ভিতর আসা তার ভারী অসম্ভব মনে হল। তারপর সে আবার ভাল করে চেয়ে দেখল যে সেই লোকটার পা দুখানিতে ঠিক ছাগলের পায়ের মত ক্ষুর আছে। তখন আর তার বুঝতে বাকি রইল না যে সেই বুড়ো আর কেউ নয়, স্বয়ং সয়তান। সয়তানের পা ঠিক ছাগলের মত থাকে, একথা সেই কামার ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছিল।

আর কেউ হলে তখনি সেখান থেকে ছুটে পালাত। কিন্তু সেই কামার তেমন কিছু না করে জোড় হাতে সয়তানকে নমস্কার করে বল্ল, "প্রণাম হই!"

সয়তান অমনি হাসতে হাসতে তার নাম ধরে বল্ল, "কিহে, কেমন আছ?"

কামার বল্ল, "আজ্ঞে, কেমন আর থাকব? দুবেলা দুটি ভাতও খেতে পাইনে।"

সয়তান বল্ল, "বটে? তুমি এতই কষ্ট পাচ্ছ? তুমি কেন আমার চাকরী কর না, আমি তোমাকে ঢের টাকা দিব।"

ঢের টাকার নাম শুনে কামার তখনি সয়তানের কথায় রাজী হল, যদিও সে জানত যে তার কাজে একবার ঢুকলে আর কেউ ছেড়ে আসতে পারে না। সয়তান তখন তাকে তিন থলী মোহর দিয়ে বল্ল, "এখন গিয়ে এই টাকা দিয়ে খুব আরামে খাও দাও; সাত বছর পরে আমি তোমার কাছে আসব, তখন তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।" এই বলে সয়তান চলে গেল, কামারও হাসতে হাসতে টাকার থলি নিয়ে ঘরে ফির্‌ল।

ক্রমশঃ

জর্ম্মানের কুকুর।

আজকালকার ভীষণ গোলাগুলির সামনে খোলা ময়দানে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করা বড়ই কঠিন কাজ। আজকালকার সৈন্যেরা প্রায়ই গর্ত্তের ভিতরে থেকে যুদ্ধ করে। এক দল ফরাসী সৈন্য তাদের গর্ত্তে বসে আছে, জর্ম্মানরা দলবেঁধে তাদের মারতে আসছে। আর একদল ফরাসী সৈন্য একটা বনের ভিতরে থেকে 'লাখমারী' বন্দুক দিয়ে সেই জর্ম্মানগুলোকে তাড়াচ্ছে।

'লাখমারী' বন্দুক দিয়ে ভয়ানক তাড়াতাড়ি গুলি ছোঁড়া যায়। এ সব বন্দুকের ইংরাজী নাম হচ্ছে 'Mitrailleuse'। এর কোন বাংলা নাম নাই, কিন্তু লাখমারী বল্লে বোধ হয় তোমরা সকলেই বুঝতে পারবে।

যা বলছিলাম। জর্ম্মানরা লাখমারীর গুলিতে জ্বালাতন হয়ে ভাবল যে ওগুলোকে ঐ বন থেকে দূর করতে না পারলে চলছে না। তাই দুপুর রাতে ভয়ানক অন্ধকারের মধ্যে তাদের দু দল সৈন্য সঙ্গিন বাগিয়ে সেই বনের দিকে রওনা হল। তারা খুবই চুপি চুপি যাচ্ছিল, কিন্তু ফরাসীরা তবু তাদের পায়ের আওয়াজ শুনতে পেয়ে তাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে রইল। জর্ম্মানরা ভেবেছিল যে, কাছে এসেই ফরাসীদের উপরে ভয়ঙ্কর আলো ফেলবে, তা হলেই তাদের মারতে খুব সুবিধা হবে। কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর আলো যখন দপ্ ক'রে জ্বলে উঠল, তখন তা পড়্‌ল জর্ম্মানদের মুখের উপরে, আর ফরাসীরা মনের সাধ মিটিয়ে গুলি মেরে তিন মিনিটের মধ্যে সেগুলোকে মেরে শেষ করে দিল। সকালে দেখা গেল ২৮০ জন জর্ম্মান সেখানে মরে পড়ে আছে।

সেই জর্ম্মানদের একজনের একটি কুকুর ছিল। সে তার প্রভুকে এতই ভাল বাসত যে, এমন ভীষণ সময়েও তার কাছ ছাড়া হয়নি। জর্ম্মানটি কপালে গুলি খেয়ে চিৎ হয়ে মরে পড়ে আছে, কুকুরটি গুলিতে খোঁড়া হয়েও, অতি কষ্টে তিন পায় দাঁড়িয়ে প্রভুর কপালের সেই গুলির দাগটা চাটছে, আর করুণ স্বরে তার মনের দুঃখ জানাচ্ছে।

একটি ফরাসী কাপ্তানের তাকে দেখে বড়ই মায়া হল, কিন্তু তিনি অনেক মিষ্ট কথা বলেও তাকে ভুলাতে পারলেন না। তাঁর সেই সব মিষ্ট কথার উত্তরে সে ভাল করে একবার তাঁর দিকে তাকালও না, বরং অতি গম্ভীর স্বরে তাঁকে শাসিয়ে দিল। শেষে তিনি তাঁর লোকদের বল্লেন যে, 'জর্ম্মানটিকে গোর দাও'। প্রভুকে তার কাছ থেকে নিয়ে যাবে, একথা কুকুরটির প্রাণে কিছুতেই সহ্য হল না। যতক্ষণ তার সাধ্য ছিল, ততক্ষণ কারুই ক্ষমতা হল না যে তার প্রভুর কাছে যায়। তারপর যখন দূরে থেকে তার গলায় ফাঁস লাগিয়ে, মুখে মুখোস পরিয়ে দেওয়া হল, তখন আর বেচারা কি করবে? সে বাধ্য হয়ে তখন নিতান্ত দুঃখের সহিত সকলের সঙ্গে তার প্রভুর সমাধি কার্য্য দেখতে চল্ল।

গোর দেওয়া শেষ হয়ে গেলে সেই জর্ম্মানটির টুপী আর তলোয়ার ছাড়া আর কিছুই রইল না। ফরাসী কাপ্তান সেই তলোয়ার আর টুপী শুঁকিয়ে কুকুরটিকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে যেতে চেষ্টা করলেন; কুকুরটিও তার প্রভুর এই শেষ চিহ্ন দুটিকে চিনতে পেরে তাদের মায়ায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে তার সঙ্গে চল্ল। মুখোস তখনো তার মুখে রয়েছে, সেটা খুলতে সাহস হচ্ছে না।

কাপ্তান এই ভাবে কুকুরটিকে তাঁর শোবার জায়গায় নিয়ে একটা বিছানায়,—অর্থাৎ কতগুলো খড় একটা কাঠের বাক্সে রেখে দেওয়া হয়েছে, তাই তাঁদের বিছানা, তারি

উপরে—শুইয়ে দিলেন। সেই জর্ম্মানটির টুপী আর তলোয়ারখানিও তার পাশে রেখে দেওয়া হল, যদি তাতে তার মন একটু ঠাণ্ডা থাকে।

এ সব দেখে শুনে কুকুরের মনও যেন একটু গল্‌ল। কাপ্তেন তাকে আদর করতে গেলে এখন আর সে গড় গড় করে না। শেষে একবার একটু লেজও নাড়ল। তখন কাপ্তেন বুঝলেন যে আর তার মনে রাগ নাই, রাগ থাকলে কুকুর কখনো লেজ নাড়ে না, সেটি হচ্ছে তাদের কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা। সেই কৃতজ্ঞতার আরো প্রমাণ এই পাওয়া গেল যে, সে এখন মুখ তুলে তাঁর মুখের পানে স্নেহের সহিত তাকায়। অমনি তার মুখোস খুলে দিয়ে তাকে একটু জল খেতে দেওয়া হল। তারপর ডাক্তার এসে তার ভাঙ্গা পায় ওষুদ লাগিয়ে কাঠ দিয়ে বেঁধে দিলেন। সে সেই বাঁধন শুদ্ধই লাফিয়ে উঠে তার নূতন বাসস্থানটির এদিক সেদিক ঘুরে দেখে এল। তারপর যখন তার জন্যে বাটি ভরা সূরুয়া আর খাবার এসে উপস্থিত হল, তখন ত আর তার আনন্দের সীমাই রইল না। সেই সূরুয়া খাওয়া হলে কাপ্তান যেই বল্লেন, “এখন শোও গিয়ে”, অমনি নিতান্ত লক্ষ্মীটির মত সে তার সেই খড়ের বিছানায় উঠে শুয়ে রইল।

এত দিনে সেই কাপ্তানটির সঙ্গে তার খুবই বন্ধুতা হয়েছে। এখন আর তাঁকে ছেড়ে সে এক মুহূর্ত্তও থাকতে রাজি হয় না; খানার সময়ই হোক, আর যুদ্ধের সময়ই হোক, ছায়ার মত তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আছেই।

বেজায় খুসি।

বাহবা বাবুলাল! গেলে যে হেসে!
বগলে কাতুকুতু কে দিল এসে?
এদিকে মিটি মিটি দেখ কি চেয়ে?
হাসি যে ফেটে পড়ে দু'গাল বেয়ে!
হাসে যে রাঙা ঠোঁট দন্ত মেলে
চোখের কোনে কোনে বিজলী খেলে।
হাসির রসে গ'লে ঝরে যে লালা
কেন এ খি-খি-খি-খি হাসির পালা?
যে দেখে সেই হাসে হাহাহা হাহা
বাহবা বাবুলাল বাহবা বাহা!

বেজায় খুসি।

বানরের বাঁদরামি।

তোমরা বানরের গালের থলী দেখেছ ? বানর তার এই থলী দুটার ভিতরে খাবার পূরে রাখে, তারপর অবসর মত সেগুলোকে থলী থেকে বার করে খায়। থলীর ভিতরে বেশী খাবার পূরলে সেটা ফুলে ওঠে ; তখন বানরের চেহারাখানি দেখতে বেশ মজার হয় !

একবার এক চিড়িয়াখানায় একটা বানরের এই থলীর ভিতরে একটা বাদাম আটকে গেল, সেটাকে সে কোন মতেই বার করতে পারল না। তার দরুণ তার বড় যন্ত্রণা হতে লাগল ; ক্রমে থলী শুদ্ধ টাটিয়ে লাল হয়ে উঠল। তখন সেই থলী কেটে বাদামটি বার করে আবার থলী সেলাই করে দেওয়া ভিন্ন আর উপায় রইল না।

তোমরা হয় ত বল্‌ছ 'আহা, বেচারা !' কিন্তু সেই বানর ভাবল যে কি মজাই হয়েছে। সে তখনি চিম্‌টিয়ে সেলাই খুলে ফেলে সেই ফুটোর ভিতর দিয়ে যা'তা ঢুকিয়ে দিতে লাগ্‌ল, শুধু যে বাইরের জিনিস সে সেখান দিয়ে মুখের ভিতর ঢোকাত, তা নয়, মুখের ভিতরের জিনিসও সেই ফুটোর ভিতর দিয়ে বার করে আন্‌ত। যখন সে এ সব কাণ্ড করত, তখন তার খাঁচার আর সব বানরের আর আশ্চর্য্যের সীমাই থাকৃত না। তারা তার চারদিক ঘিরে বসে হাঁ করে তামাসা দেখ্‌ত। সেও তাতে খুব মজা পেয়ে লম্বা লম্বা খড় মুখে দিয়ে, সেগুলাকে সেই থলীর ফুটোর ভিতর দিয়ে টেনে বার করে তাদের আরো তাক লাগিয়ে দিত !

বাস্তবিক এটা বানরের পক্ষে বাহাদুরীর কাজ হয়েছিল বলতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এতে তার ঘা শুকাবার পক্ষে বড়ই অসুবিধা হতে লাগল। তখন কাজেই তাকে সেই খাঁচা থেকে সরিয়ে নিতে হল, যাতে তার আর তামেসগির না যোটে। কয়েক দিন সে খুব নরম জিনিস ছাড়া আর কিছু খেতে পেল না ; তাকে শোরার জন্য খড় দেওয়াও বন্ধ হয়ে গেল। তখন আর সে কা'কে ম্যাজিক্ দেখাবে ? আর কি দিয়েই বা দেখাবে ? কাজেই তার ঘা সারতে আর বেশী দেরী হল না।

আর এক জায়গায় একটা বানর আর একটা হুণ্ডার (হায়না) পাশাপাশি ঘরে থাকত। দুই ঘরের মাঝখানে কাঠের দেয়াল, সেই দেয়ালে একটি দরজা চাবি দিয়ে বন্ধ থাকে। সেই চাবির ফুটো দিয়ে তাকালে এ ঘর থেকে ও ঘরের ভিতর দেখা যায়। বানরটার ক্রমাগতই চেষ্টা যে, নানা রকম শব্দ করে সেই হুণ্ডারটাকে এনে যাতে সেই চাবির ফুটোর ভিতর দিয়ে উঁকি মারাতে পারে। শব্দ শুনে যেই হুণ্ডারটা এসে সেখান দিয়ে উঁকি মারে, অমনি বানরটা খড় দিয়ে তার চোখে খোঁচা বসিয়ে দেয়।

খাঁচার সামনের গরাদের ভিতর দিয়ে হাত গলিয়ে হুণ্ডারটার নাকে শুড় শুড়ি দেওয়া বানরটার ভারি আমোদের বিষয় ছিল। সে হুণ্ডারটাকে দেখতে পেত না, অথচ আন্দাজের উপরেই ক্রমাগত ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার নাকে শুড়শুড়ি দিয়ে তাকে পাগল করে তুল্‌ত। হুণ্ডারটা অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই বানরটার হাতে কামড়াতে পারত না, বেচারার খালি ক্ষেপে অস্থির হওয়াই সার হত।

রাক্ষুসে মাছ।

বড় বড় কুমীর হাঙ্গর, তারাই জ্যান্ত মানুষ খায় আমরা ত এই জানি। এক হাত লম্বা নদীর মাছ, তারা যে আবার জানোয়ার দেখ্‌লে কাম্‌ড়ে ধরে এমন কথা ত শুনিনি। আমাদের দেশের নদীতে ত এমন রাক্ষুসে মাছ দেখা যায় না। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার এমাজন (Amazon) নদীর আশে পাশে এরকম মাছ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। সে জায়গায় মানুষ যদি জলে নামে, তবে তাকে আদমিনিটও জলে থাক্‌তে হয় না, তার মধ্যেই মাছেরা তাকে কামড়িয়ে এমন রক্তারক্তি করে দেয়, যে তাকে প্রাণের দায়ে জল ছেড়ে উঠে আস্‌তে হয়। সে দেশের লোকে একে 'পিরাই' বলে।

মাছটার চেহারা দেখ। 'বুল্‌ ডগের' মত মুখ, তার মধ্যে ছোট ছোট ছুঁচল দাঁত; একেবারে ক্ষুরের মত ধারাল! তার উপর মেজাজখানাও চেহারারই উপযুক্ত—জলের মধ্যে থেকে এক হাত লাফিয়ে ডাঙার মানুষকে কাম্‌ড়ে দেওয়া তার পক্ষে কিছুই আশ্চর্য্য নয়। আর যেখানে কাম্‌ড়ে ধরে, সেখানের খানিকটা ছিঁড়ে না আসা পর্য্যন্ত সে কামড় ছাড়ে না! তার উপর এরা সব সময় দল বেঁধে ফেরে।

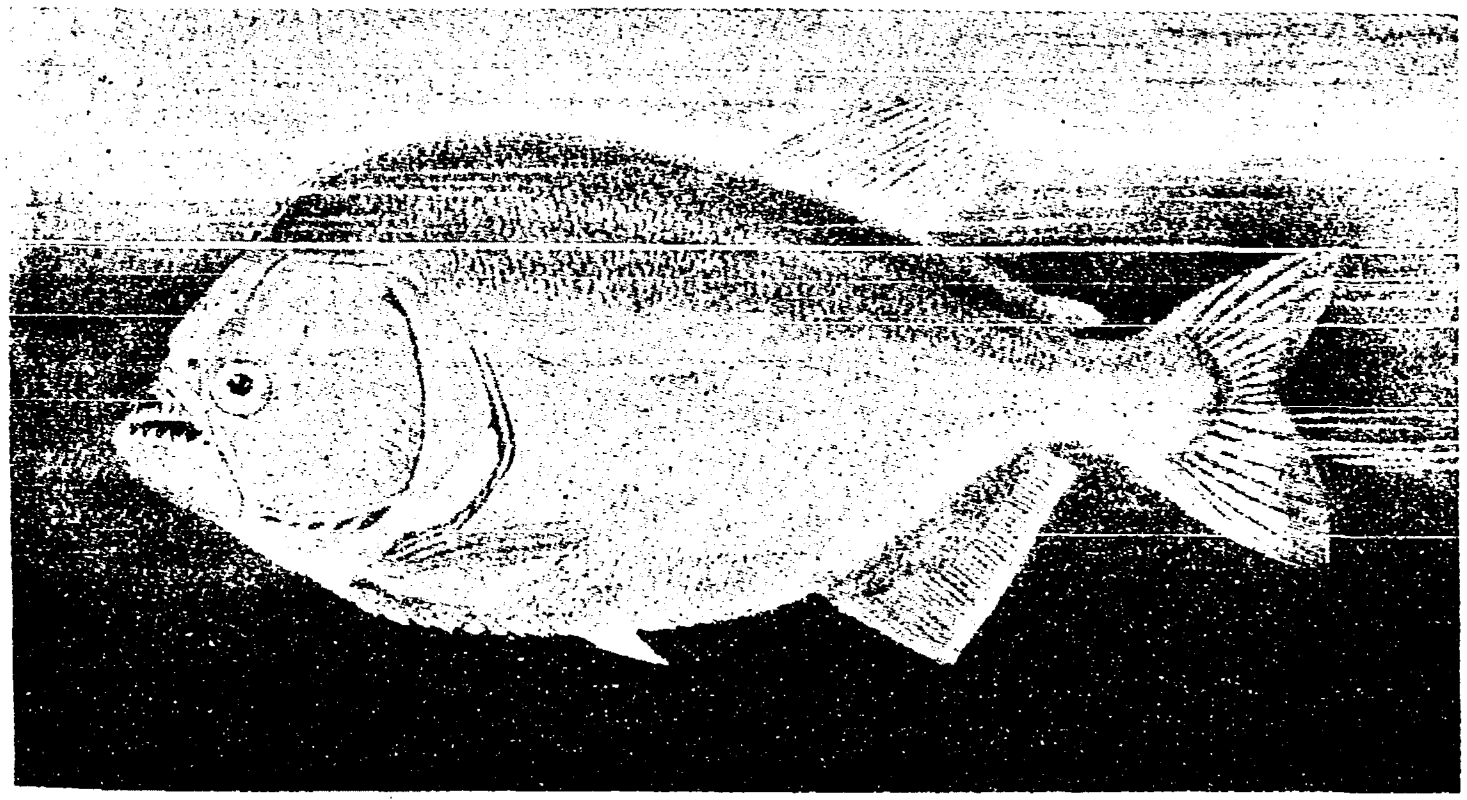

হাঙ্গর কুমীর যেখানে থাকে সেখানেও নাকি মাছ থাকে, নানারকম জলজন্তু থাকে; কিন্তু 'পেরাই'এর আড্ডা যেখানে, তার ত্রিসীমানার মধ্যে কোন প্রাণীর থাকবার যো নেই।

সেখানকার জলে যদি গরু ঘোড়া নামে তবে তারা আর আস্ত ফেরে না। একবার একটা ষাঁড় ২০।২৫ হাত চওড়া একটা নদী পার হ'তে গিয়েছিল—কিন্তু বেচারার আর

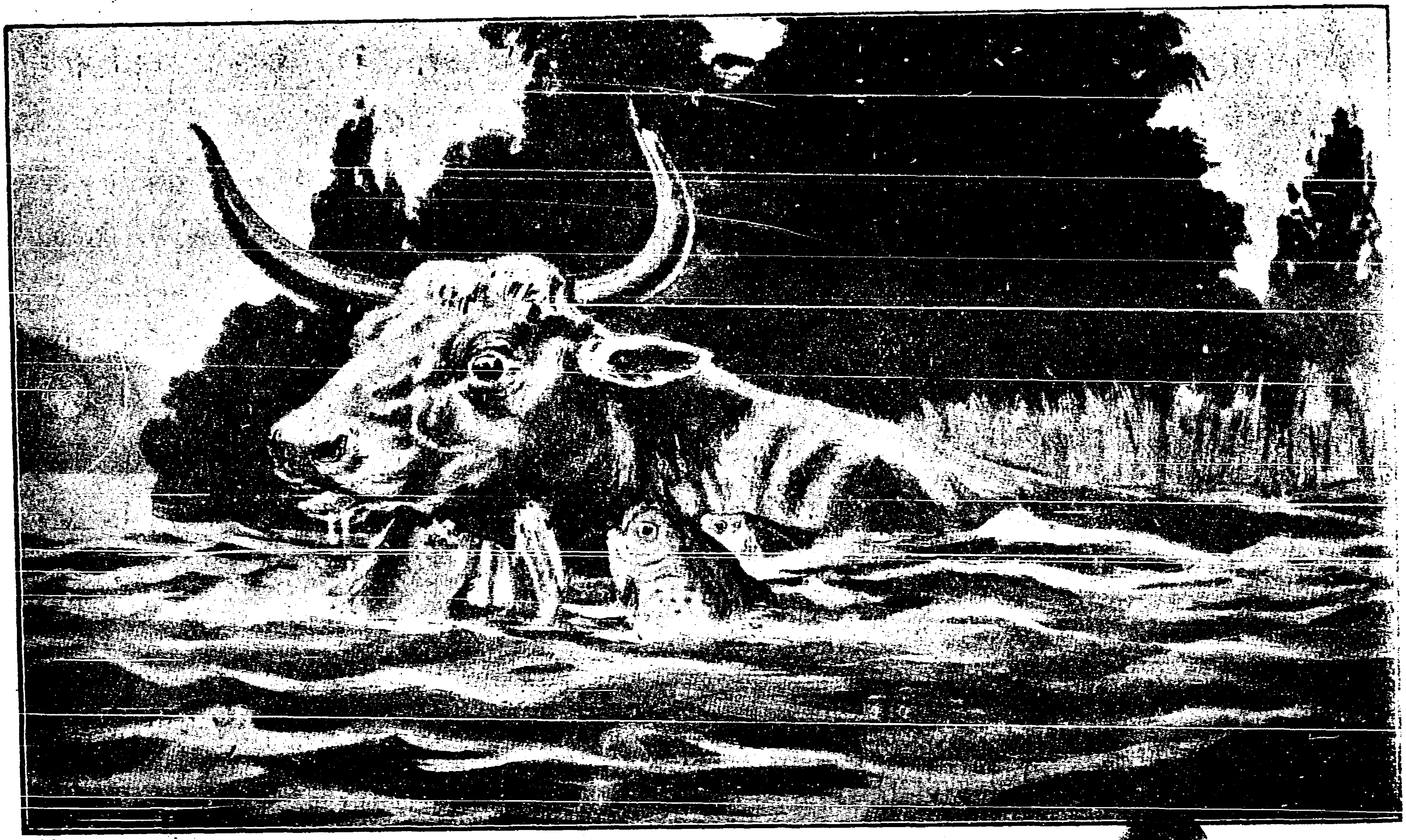

পার হওয়া হ'ল না। তার আগেই রাক্ষুসে মাছেরা তাকে খেয়ে শেষ ক'রে দিল। এ রকম দুর্ঘটনা অনেক জানোয়ারের ভাগ্যেই ঘটে থাকে—তার মধ্যে মানুষও বাদ পড়েনি। হাজার মাছে এক সঙ্গে কামড় দেয় আর এক এক কামড়ে এক এক খাবল মাংস উঠিয়ে আনে! দুচার মিনিটের মধ্যে এক একটা জানোয়ারকে খেয়ে শেষ ক'রে দেয়।

কত সময় এমন হয় যে, লোকে নদীতে জল আন্‌তে গেছে হঠাৎ কে তার হাত কেটে নিল! জানোয়ারেরা জল খেতে এসেছে—কট্‌ ক'রে তার নাক কেটে গেল। সে দেশের লোকে জানে—এ পেরাই মাছের কাণ্ড!

পড়া আর ছুটি।

এখন ছুটি হয়েছে, কি মজাই হয়েছে। কত জন এই ছুটির জন্য পথ চেয়ে বসে ছিল, ইস্কুল আর তাদের কিছুতেই ভাল লাগছিল না। কিন্তু তাহলে কি হয়? পরীক্ষাটি না দিয়ে আসবার যোই নাই; মাষ্টার মশাইরা কিছুতেই তার আগে ছুটি দিবেন না, তা তোমার চোখে জলই আসুক আর যাই হোক। আমাদের একটি মেয়ে এমনি করে পরীক্ষার দায়ে কলকাতায় আটকা পড়েছিল, কদিন পরে সে হাস্‌তে হাস্‌তে এসে উপস্থিত হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "পরীক্ষায় কত হলে?" সে বল্ল, "সেকেণ্ড্।" আমার তখন একটি ছেলের গল্প মনে পড়ল। সে রোজ ইস্কুল থেকে এসে তার বাবাকে বলত, "আমি থার্ড্ হয়েছি।" শুনে তার বাবা খুব খুসী হতেন, আর ভাবতেন, ছেলে বেশ পড়া শুনা করে, রোজই থার্ড্ হয়। তার পর হঠাৎ একদিন তাঁর মনে হল যে রোজই থার্ড্ হওয়া ত ভারী আশ্চর্য্য ব্যাপার,—এক দিনও কি সেকেণ্ড বা ফোর্থ হতে নাই? তখন তিনি খবর নিয়ে জানলেন যে তাঁর ছেলের ক্লাশে মোটেই তিনটি ছাত্র!

যা হোক আমাদের মেয়েটি সে ধরণের 'সেকেণ্ড্' হয় নি, তার ক্লাসে অনেকগুলি মেয়ে। পরীক্ষার জন্য আটকা পড়ে তার যে দুঃখ হয়েছিল, সেকেণ্ড্ হয়ে বোধ হয় তা একটু কমে থাকবে। আমাদের ছেলে বেলায় ছুটির আগেই পরীক্ষার জ্বালা ছিল না; আমাদের মাষ্টার মশায় ছুটির ৪।৫ দিন থাকতে পড়া শুনা বন্ধ করে ক্লাসে নানান রকমের ভাল ভাল গল্প বলতেন আর ছবি দেখাতেন। সে সময়েও ফরাসীদের সঙ্গে প্রুসিয়ান্‌দের যুদ্ধ চলছিল, আর বিলাতী কাগজে তার ছবি থাকত। সেই যুদ্ধের একটা ছবির কথা আমার বেশ মনে আছে। সামনে ফরাসী সৈন্যের দল; কাছে ব'লে, তাদের বড় বড় করে আঁকা হয়েছে। দূরে প্রুসিয়ান সৈন্য, তাই তাদের ছোট ছোট করে আঁকা হয়েছে। আমরা কিন্তু সেই ছবি দেখবার সময় অত কথা ভাবিনি; আমাদের তখন মনে হয়েছিল যে বাস্তবিকই বুঝি ফরাসীরা এমনি বড় বড়, আর প্রুশিয়ানেরা ঐ রকম ক্ষুদে ক্ষুদে। এই কথাটা তারপর অনেক দিন ধরে আমাদের ভারী ভাবনার বিষয় হয়েছিল যে ঐ ছোট্ট ছোট্ট প্রুশিয়ানগুলি কি করে এত বড় বড় ফরাসীদের হারিয়ে দিল!

পরীক্ষার কথা বল্লেই আমার 'প্রাইজের' কথা মনে হয়। আমার ভাগ্যে অনেক দিন প্রাইজ পাওয়া ঘটেনি। বড় বড় দাড়িগোঁফওয়ালা ছেলেরা 'ছাত্রবৃত্তি' পাস ক'রে

এসে আমাদের সঙ্গে ভর্ত্তি হত ; আমরা কিছুতেই তাদের সঙ্গে পেরে উঠতাম না। বাঙ্গালা সাহিত্য, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, সব তাদের মুখস্থ, দরকার হলে আমাদের মাষ্টারী করতে পারে ; কাজেই, প্রাইজগুলি যে সবই তারা নিয়ে যাবে, সে ত ধরা কথা। আমাদের খালি ঘরে এসে গঞ্জনা ভোগই সার হত।

আমার মুরব্বিরা বল্লেন, এ ভাবে কিছুতেই চলতে পারে না, আমার একটা প্রাইজ পাওয়া চাইই চাই। কিন্তু চাই বল্লেই ত আর পরীক্ষার ফল বদলে যাবে না, আর পরীক্ষায় ২২।২৩ জনের নীচে হলে প্রাইজও কিছুতেই পাওয়া যাবে না ; কাজেই, পরীক্ষা না দিয়ে যাতে আমি প্রাইজ পেতে পারি, আমার মুরব্বিরা তারি ব্যবস্থা করলেন। সেরূপ প্রাইজ পাওয়ার দুটি উপায় ছিল। খুব লক্ষ্মী ছেলে হলে প্রাইজ পাওয়া যেত, কিন্তু তা বল্লে যেমন ছেলেকে বুঝায় আমি বোধ হয় ঠিক তেমনিটি ছিলাম না। আরেক উপায় ছিল, বৎসরের মধ্যে একদিনও কামাই না করা। সেইটেই আমার পক্ষে একটু সহজ বোধ হল।

দিনের পর দিন যায়, আমিও প্রাণ পণে স্কুলে যাই, কিছুতেই কামাই করি না। আমাদের গোবিন্দ বেয়ারা রোজ আমার মাথায় প্রকাণ্ড ছাতা ধরে আমাকে স্কুলে পৌঁছিয়ে দেয়, আর ছুটির পর বাড়ী নিয়ে আসে। এত দিন পরে আমি একটা প্রাইজ পেতে চলেছি শুনে তারও উৎসাহের সীমা নাই ; সে পথে পথে আমাকে কত ভরসাই দেয়। পাঁচড়ায় আমি অচল হয়ে গেলাম, জুতা পরবার যো নাই, শুধু পায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে স্কুলে যাই ; গোবিন্দ তখনো আমার মাথায় সেই বিশাল ছাতা ধরে, আর আমাকে আরো বেশী করে ভরসা দেয়।

ক্রমে পূজার ছুটি এল, আমি বাড়ী গেলাম ; এর পর ফিরে এসে আর দেড়খানা মাস নিয়মমত স্কুলে যেতে পারলেই আর কোন ভাবনা নাই। কিন্তু হায় ! ছুটির শেষে ফিরে আসবার বেলায় আর পঞ্জিকায় সুবিধা মত ভাল দিন পাওয়া গেল না। তার ফলে আমার একটি দিন কামাই হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে প্রাইজ পাওয়ার আশাও গেল।

সে সময়ে এখনকার মত এত পরীক্ষার তাড়া ছিল না। বৎসরের শেষে একবার মাত্র পরীক্ষা হত ; কোয়ার্টার্লী, সিক্স্‌মন্থ্‌লী, এসব জঞ্জালের তখনো সৃষ্টি হয়নি। এক্সার্‌-সাইজ্‌ দেওয়ার নিয়ম ছিল না ; খাতার মধ্যে খালি হস্তলিপির জন্য একটি খাতা রাখ্‌তে হত। তখনকার মাষ্টার মশায়রা বোধ হয় একটু বেশী খবরও নিতেন ; আর ছেলেরাও বোধ হয় আজকালকার চেয়ে তাঁদের একটু বেশী মানত। সেটা ছিল

'নর্ম্মাল' স্কুলের দিন। নর্ম্মাল স্কুলগুলি ছিল যেন বাংলা কলেজ; সেখানে পড়ে মাষ্টার তয়ের হত।

নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্রেরা হাত পাকাবার জন্য মাসে মাসে আমাদের ক্লাসে মাষ্টারী করতে আসত। তাদের নাম ছিল 'উপশিক্ষক'। আমরা সেই উপশিক্ষকদেরই এত মান্য করিতাম যে, এখনকার রীতিমত মাষ্টারেরাও সকল সময় তেমন মান্য পান না। উপশিক্ষকেরাও ঘণ্টাখানেকের জন্য মাষ্টারী পেয়ে সাধ মিটিয়ে তার মজা আদায় করে নিত। টেবিল চাপড়িয়ে চাপড়িয়ে হাত দিয়ে রক্ত বেরুত, এমন উপশিক্ষকও দেখেছি।

আমি এমন কথা বলছি না যে, তখনকার সকল ছাত্রেরাই মাষ্টারদের খুব মানত। দুষ্ট ছাত্রও তখন ঢের ছিল। একটি বুড়া মাষ্টারকে তারা যেমন নাকাল করত, সে কথা ভাবলে এখনো আমার দুঃখ হয়। মাষ্টার মশায়েরও কিছু দোষ ছিল; তিনি ছেলেদের বড্ড বকতেন, আর তাদের মস্ত মস্ত আঁক কস্‌তে দিয়ে চেয়ারে বসে ঘুমাতেন। ছেলেদের আঁক কসা হয়ে গেলে তারা তাদের শ্লেটগুলি এনে তাঁর টেবিলের উপর রাখত। তিনি জেগে উঠে সেগুলি দেখতে আরম্ভ করলে সেই দুষ্টু ছেলেগুলি এসে তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে তাঁর মাথায় রাশি রাশি উকুন ছেড়ে দিত।

তারা দেখা।

যাদের চোখ খুব ভাল, তারা প্রায় ৮০০০ তারা দেখতে পায়; যাদের চোখ তত ভাল নয়, তারা সাড়ে পাঁচ হাজারের বেশী দেখতে পায় না।

তোমাদের কার কেমন চোখ, যদি জানতে চাও, তবে তারা দিয়ে তার পরীক্ষা করতে পার। কয়েকটি ছোট্ট ছোট্ট তারা এক জায়গায় দল বেঁধে থাকে, তাদের নাম 'কৃত্তিকা'। কৃত্তিকা নাম শুনেই তোমাদের অনেকে হয় ত তাদের চিনতে পেরেছ; যদি না পেরে থাক, কাউকে জিজ্ঞাসা করে নিলেও কাজ চলতে পারে। লোকে বলে, 'সাত বোন কৃত্তিকা', কিন্তু গণে দেখতে গেলে অনেকেই তার ভিতরে ছটি বই খুঁজে পায় না। আসল কথা হচ্ছে এই যে, যাদের ভাল চোখ, তারা সাতটাই দেখে। অনেকেই যে ছটি বই দেখতে পায় না, তাতে এ কথাই প্রমাণ হচ্ছে যে অনেকেরই চোখ একটু খারাপ। তা ছাড়া, আকাশ পরিস্কার না থাকলে ভাল চোখেও ছটিই দেখা যায়।

দুঃখের বিষয়, এ কয় মাস কৃত্তিকা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই অস্ত যায়, সুতরাং তাকে এখন দেখা অসম্ভব। এখন যদি চোখের পরীক্ষা করতে চাও, তবে সপ্তর্ষি মণ্ডলটাকে দিয়ে করতে পার। গত বারে এর কথা হয়েছে, সুতরাং এর সঙ্গে পরিচয় হতে আর বাকি নাই। সপ্তর্ষিকে ইংরাজিতে বলে 'বড় ভালুক' (Great Bear)। সামনের চারটি তারা ভালুকের দেহ, পিছনের তিনটি তারা তার লেজ। সেই লেজের মাঝখানের তারাটির সঙ্গে খুব ছোট্ট আর একটি তারা আছে, তাকে যদি দেখতে পার, তবে তোমার চোখ ভাল।

আগেই বলেছি, আকাশ পরিস্কার চাই। সহরের ছেলেরা যদি এই ছোট্ট তারাটিকে চট্ করে দেখতে না পার, তবে দুঃখিত হয়ো না। আর আকাশ খুব পরিস্কার থাকলে এটাকে দেখতে পাওয়া যে খুব বাহাদুরী, তাও মনে ক'রো না। এখানে, পাড়া গাঁয়ে, আমাদের আকাশ খুবই পরিস্কার। এখানে আমি ওর চেয়েও ছোট্ট তারা দেখতে পাই, অথচ আমার চোখ খারাপ বই ভাল নয়,—চসমা ছাড়া কাজ করতে পারি না।

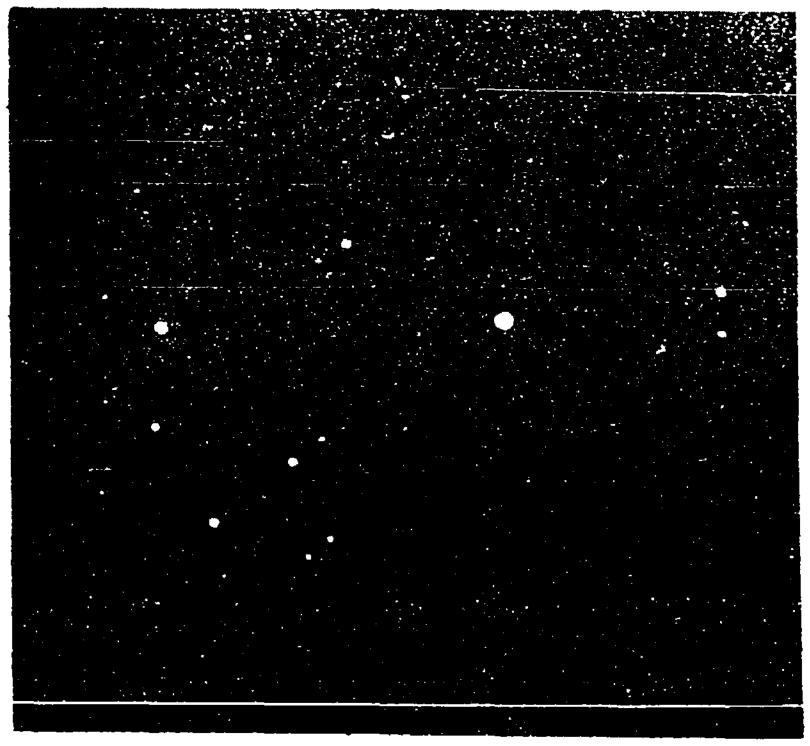

শুধু চোখে কৃত্তিকা।

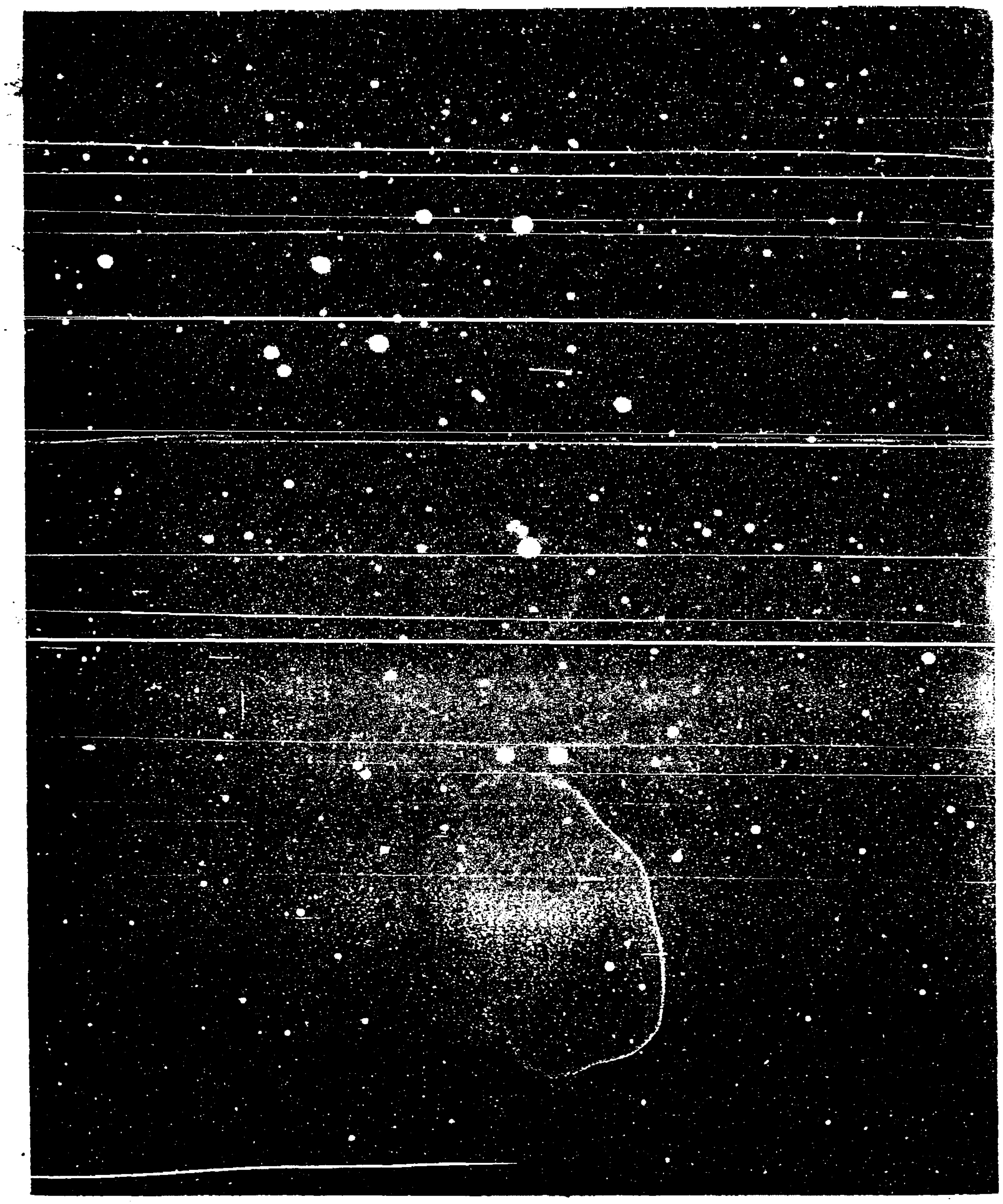

দূরবীণে কৃত্তিকা।

অবশ্য দূরবীণ দিয়ে এর চেয়ে অনেক ছোট ছোট তারাও দেখতে পাওয়া যায়। শুধু চোখে কয়েক হাজার মাত্র দেখ, খুব ভাল একটা দূরবীণ দিয়ে দেখবে কয়েক কোটি। কৃত্তিকার সাতটি তারার জায়গায় দূরবীণ দিয়ে প্রায় দুশ দেখতে পাওয়া যায়।

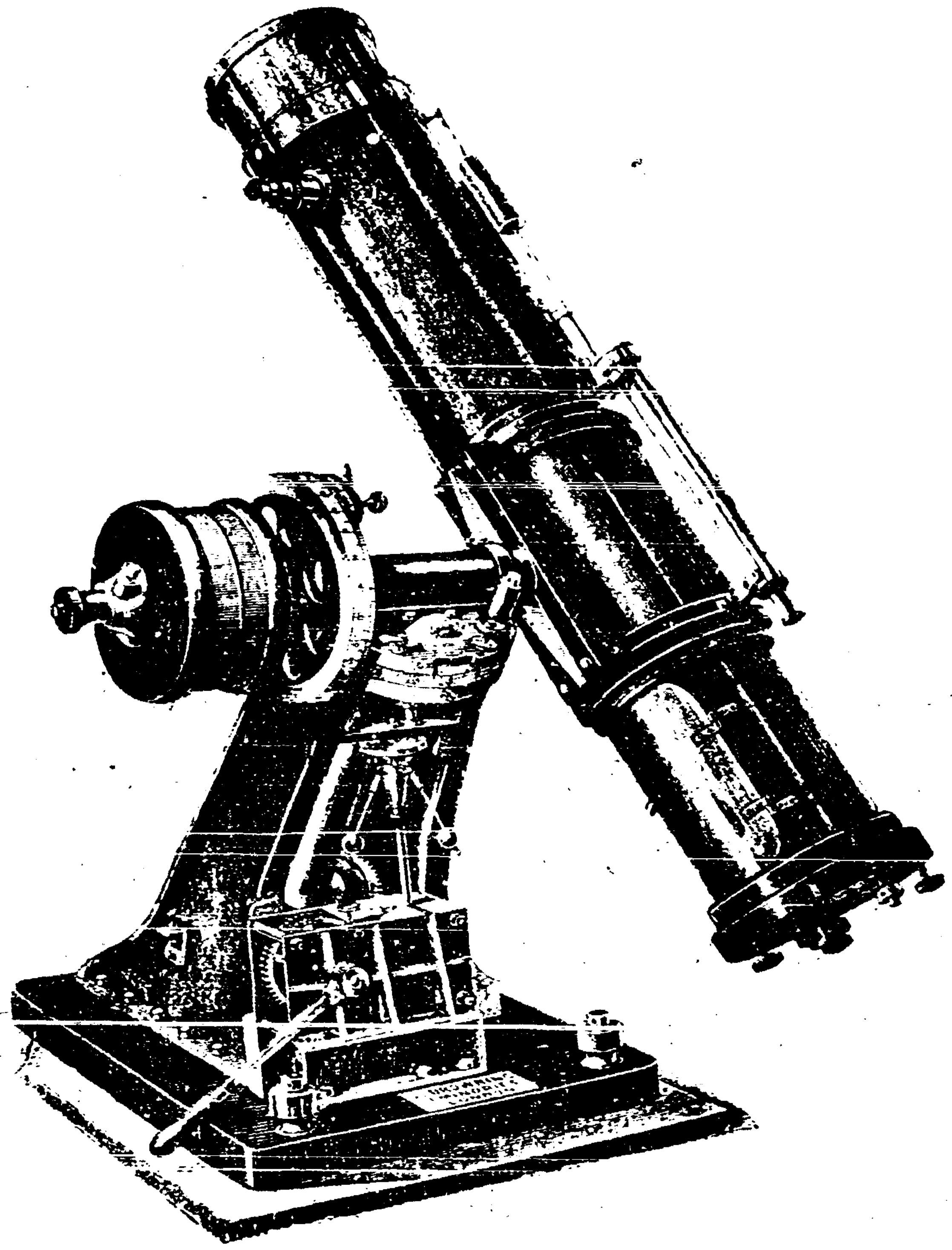

দূরবীণ।

শুধু চোখে গ্রহ আর তারার তফাৎ বুঝতে পারা যায় না, সবগুলোকেই বিন্দুর মত মনে হয়। কিন্তু দূরবীণ দিয়ে দেখলে গ্রহগুলিকে দেখা যায় গোলার মত। তারাগুলি কিন্তু তেমন তেমন বড় দূরবীণেও সেই বিন্দুর মতই দেখায়, খালি খুব উজ্জ্বল। শুধু চোখে যাকে একটা তারার মত দেখায়, দূরবীণ দিয়ে অনেক সময় তার জায়গায় দু তিনটা দেখতে পাওয়া যায়; তার মধ্যে হয় ত আবার একটা আরেকটার চার ধারে ঘুরছে।

আমাদের পৃথিবীর যেমন একটি চাঁদ আছে, গ্রহগুলিরও অনেকের তেমনি চাঁদ আছে,—দূরবীণ দিয়ে সেগুলিকে দেখতে পাওয়া যায়। যত ভাল দূরবীণ হয়, ততই এই চাঁদগুলোকে ভাল করে দেখবার কথা। আগে তেমন ভাল দূরবীণ ছিল না, তখন বৃহস্পতি গ্রহের চারিটি বই চাঁদ দেখা যেত না। এখন খুব ভাল ভাল দূরবীণ তয়ের হয়েছে, আর তাতে বৃহস্পতির এ পর্য্যন্ত নয়টা চাঁদ ধরা পড়েছে।

এ কথা বলেই যদি আমি শেষ করে ফেলি, তবে তোমাদের একটু ভুল বুঝিয়ে দেওয়া হবে। আজকালকার সকলের চেয়ে ভয়ঙ্কর দূরবীণটার ভিতর দিয়ে তাকালেই যে অমনি বৃহস্পতির নয়টি চাঁদকে ঝলমল করতে দেখা যাবে, তা নয়। সেই ভয়ঙ্কর দূরবীণটার ভিতর দিয়েও এতগুলো চাঁদের সব ক'টাকে দেখতে পাওয়া যায় না। এদের খুব ছোট্টটি ফটোতে ধরা পড়েছে।

চোখের চেয়ে ফটোগ্রাফীর জোর অনেক বেশী। তাই আজকালকার খুব ভাল ভাল দূরবীণে সাধারণতঃ ফটোগ্রাফ তোলার উপায় থাকে। উপায় থাকলেও কিন্তু সে অতি কঠিন ব্যাপার। তোমরা যেমন চেহারা তোলাতে গিয়ে সেকেণ্ড খানেক ক্যামেরার সামনে চুপ করে বসে থাকলেই কাজ হয়ে যায়, তারার ফটোগ্রাফীতে তা হবার যো নাই। তারাগুলি অন্ততঃ ঘণ্টা খানেক দূরবীণের সামনে স্থির হয়ে থাকলে তবে তাদের ভাল রকম ছবি উঠতে পারে; দু তিন ঘণ্টা থাকলে আরো ভাল হয়।

এখন কথা হচ্ছে এই যে, আকাশের কোন জিনিসেরই তিল মাত্র স্থির হয়ে থাকবার হুকুম নাই, তারা ক্রমাগতই পূব থেকে পশ্চিম দিকে ছুটে চলেছে। কাজেই, তাদের সঙ্গে সঙ্গে দূরবীণটিকে ঠিক তাদের সমান ওজনে ঘুরাতে হয়; ঠিক সমান ওজনে ঘুরাতে না পারলে ফটোগ্রাফে তাদের ছবি নড়ে ঝাপসা হয়ে যাবে, হয় ত বা উঠবেই না। এ কাজ কলেও হতে পারে, হাতেও হতে পারে। দূরবীণের সঙ্গে ঘড়ীর মত কল জোতা থাকে। একবার দূরবীণটিকে কোন তারার দিকে ফিরিয়ে সেই কল চালিয়ে দিলে, সে ঠিক সেই তারাটির ওজনে দূরবীণটিকে ঘোরায়, তারাটিকে একটুও নড়তে দেয় না।

বড় বড় দূরবীণের গায় আবার ছোট ছোট দূরবীণ বসান থাকে। এই ছোট দূরবীণগুলির কোনটির ভিতর দিয়ে যদি একটি তারাকে, দূরবীণে যতটুকু জায়গা দেখা যাচ্ছে ঠিক তার মাঝখানে দেখতে পাওয়া যায়, তবে সেই তারাটিকে বড় দূরবীণেরও ঠিক মাঝখানে দেখতে পাওয়া যাবে। বড় দূরবীণটার ভিতরে ফটোগ্রাফীর মসলা মাখান কাঁচ রেখে দিয়ে, ছোট দূরবীণটিকে ক্রমাগত ঠিক একটি তারার দিকে ফিরিয়ে রাখতে হয়, যাতে সেই তারাটি দূরবীণের ঠিক মাঝখান থেকে এক চুলও এদিক সেদিক না হতে পারে। এমনি করে এক হতে তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত রাখতে পারলে আকাশের সেই জায়গাটুকুর ফটোটি বেশ ভাল হয়ে উঠবে।

তিন বৎসর আগে বৃহস্পতির আটটি মাত্র গ্রহের কথা জানা ছিল। সেই অষ্টম গ্রহটির ছবি তুলতে গিয়ে একদিন তার কাছে ফটোতে আরেকটি ছোট্ট বিন্দু দেখা গেল। অবশ্য ফটোগ্রাফীর প্লেটখানিতে কোন দোষ থাকলেও ঐ রকম একটি দাগ অনায়াসেই হতে পারত; কিন্তু দিন কয়েক ধরে ক্রমাগত কয়েকটি ফটো তুলেও

যখন তার প্রত্যেকটি ফটোতেই সেই বিন্দুটি পাওয়া গেল তখন আর তাকে প্লেটের দাগ বলে মনে করবার কোন কারণই রইল না। তখন বুঝা গেল, ওটি বৃহস্পতিরই একটি চাঁদ।

ওটি যে কোন তারা নয়, তা বুঝতে পারা খুবই সহজ,—ঐ জায়গার তারাগুলির কোন ফটোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই হল। তা ছড়া, গ্রহের ফটো তুলতে গেলে, সেই প্লেটে তারার ফটো উঠে আঁচড়ের মত, বিন্দুর মত নয়।

বৃহস্পতির এই ছোট্ট চাঁদটি মোটে মাইল দশেক চওড়া। আমাদের চাঁদ এর চেয়ে ঢের বড়।

ব্যাঙের সমুদ্র দেখা।

(জাপানী গল্প)

গ্রামের ধারে কবেকার পুরাণ এক পাতকুয়োর ফাটলের মধ্যে কোলাব্যাং তার পরিবার নিয়ে থাকৃত। গ্রামের মেয়েরা সেখানে জল তুলতে এসে যে সব কথাবার্ত্তা বলৃত কোলাব্যাং তার ছেলেদের সেই সব কথা বুঝিয়ে দিত—আর ছেলেরা ভাবৃত "ইস্! বাবা কত জানে!"

একদিন সেই মেয়েরা সমুদ্রের কথা বলতে লাগ্‌ল। ব্যাঙের ছানারা জিজ্ঞাসা করল—"হ্যাঁ বাবা! সমুদ্র কাকে বলে?" ব্যাং খানিক ভেবে বল্ল, "সমুদ্র? সে এক রকম জন্তুর নাম"। তখন একটা ছানা বল্ল—"ওরা যে বলৃছিল সমুদ্র খুব ভয়ানক বড় হয়, আর তার মধ্যে অনেক অনেক জল থাকে—আর লোকেরা সাঁতার কেটে তা পার হ'তে পারে না।" তখন কোলাব্যাং মুস্কিলে পড়্‌ল। সে গাছ পালা দেখেছে, বাড়ী ঘর দেখেছে—মানুষ কুকুর ঘটি বাটি নানা রকম জিনিষ পত্র সব দেখেছে, আর ছেলেবেলায় অনেক রকম জিনিষের গল্প শুনেছে। কিন্তু সমুদ্রের কথা ত কখন শোনেনি! তখন সে ভাব্‌ল সমুদ্রের কথা একটু খোঁজ ক'রে দেখ্‌তে হবে।

পরদিন সকালে উঠেই কোলাব্যাং তার ছাতা পোঁট্‌লা নিয়ে বল্ল, "আমি সমুদ্রের সন্ধান করতে যাচ্ছি"। তার গিন্নী কত কাঁদ্‌ল ছেলেরা নানা রকম সুর ক'রে তাকে

বারণ কর্‌ল কিন্তু কোলাব্যাং বল্ল "না এতে আমার জ্ঞান লাভ হবে—তোমরা বাধা দিওনা"। এই ব'লে সে পাতকূয়ো থেকে উঠে একটা মাঠের দিকে চল্ল। ব্যাং বাইরে এসেই দেখ্‌ল মানুষ কুকুর গরু তারা কেউ তার মত লাফিয়ে লাফিয়ে চলে না—তাই দেখে সে ভাব্‌ল "লাফিয়ে চল্লে সবাই আমায় বেকুব ভাব্‌বে"। এই ভেবে সে হেঁটে হেঁটে চল্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু অমন করে চ'লে ত তার অভ্যাস নেই—খানিক দূর গিয়েই তার ভারি পরিশ্রম বোধ হ'ল।

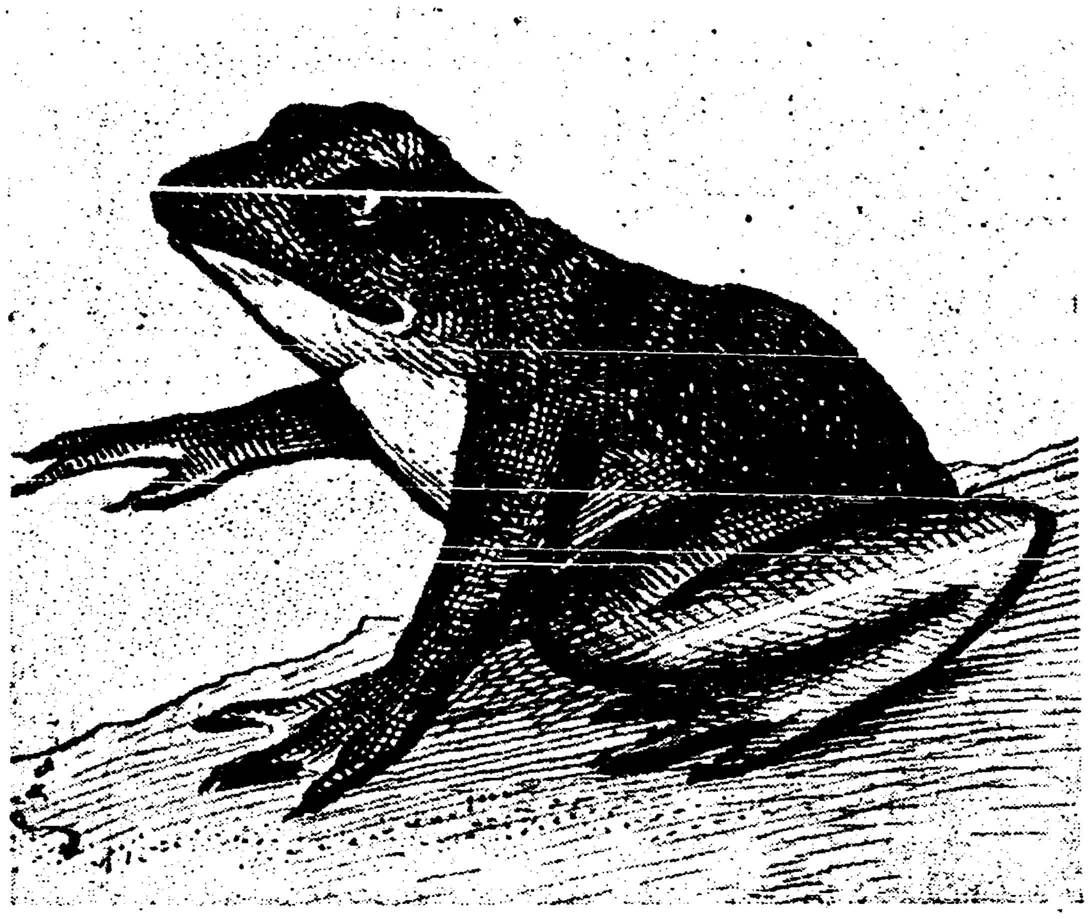

মাঠের ওপারে আর এক গ্রামের কাছে এক গর্ত্তের মধ্যে মেটে ব্যাংদের বাসা ছিল। মেটে ব্যাঙেরাও সমুদ্রের কথা শুনেছে তাই তাদের মধ্যে একজন বেরিয়েছে সমুদ্রটা দেখ্‌তে। মাঝ পথে দুই ব্যাঙের দেখা হ'ল। কোলা ব্যাং বল্ল, "আমি ফাটলকুয়োর কোলা ব্যাং, যাচ্ছি সমুদ্রে।" মেটে ব্যাং বল্ল, "আমি মেঠো-মাটির মেটে ব্যাং, আমিও যাচ্ছি সমুদ্রে।" তখন তাদের ভারি ফূর্ত্তি হ'ল!

কিন্তু সমুদ্রে যাবার পথ ত তারা জানে না। মাঠের মধ্যে একটা মস্ত ঢিপি ছিল; মেটে ব্যাং বল্ল, "ওর উপরে উঠে দেখি ত কিছু দেখা যায় কি না।"

এই ব'লে তারা অনেক কষ্টে সেই ঢিপির উপর চ'ড়ে সেখান থেকে একটা গ্রাম দেখ্‌তে পেল। মেটে ব্যাং বল্ল, "আরে দূর ছাই! এ রকম ত ঢের দেখেছি! আমার বাড়ীর কাছেই ত অমন আছে।" কোলা ব্যাং বল্ল, "তাই ত! আমিও ছেলেবেলা থেকে ওরকম কত দেখেছি! সব জায়গাই দেখ্‌ছি এক রকম। মিছামিছি আমরা হেঁটে মর্‌লাম।"

তখন তারা ভারি বিরক্ত হ'য়ে বাড়ী ফিরে গেল। কোলা ব্যাং তার ছানাদের বল্ল, "সমুদ্র টমুদ্র কিছু নেই—ওসব মিছে কথা!"

গল্প স্বল্প।

আমাদের দেশে 'পুরাণ' বলে অনেকগুলো খুব পুরাণো আর ভাল ভাল বই আছে। ধর্ম্মের কথা, সৃষ্টির কথা, ব্রহ্মাণ্ডের বর্ণনা, দেবতা অসুর রাক্ষস প্রভৃতির কথা, সে কালের লোকের কথা, নানারূপ জ্ঞানের কথা সেই সব পুস্তকে লেখা আছে। ধ্রুবের কথাও এই সকল পুস্তক থেকেই জানা গিয়েছে; বিষ্ণুর অবতারের কথাও তাতেই লেখা। কিন্তু সকল পুরাণে এ সব কথা ঠিক এক রকম লেখা নাই, কোন কোন বিষয়ে প্রভেদ দেখা যায়।

বিষ্ণুপুরাণের মতে সপ্তর্ষিরা ধ্রুবকে শ্রীহরির আরাধনা করতে বলেছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতের মতে নারদ বলেছিলেন। নারদ ধ্রুবের কাছ থেকে পরে উত্তানপাদের কাছে এসে দেখলেন যে, ধ্রুবকে আর তার মাকে বনে পাঠিয়ে রাজার বড়ই অনুতাপ হয়েছে। সুরুচিরও বোধ হয় সে জন্য শেষে লজ্জা হয়ে থাকবে। ধ্রুব যে বনে গিয়ে বিষ্ণুর কাছে বর পেয়েই অমনি ধ্রুবতারা হয়ে গিয়েছিল, তা নয়। বন থেকে সে তার মা বাপের কাছে ফিরে এল। তখন রাজা তার যারপরনাই আদর করলেন। সুরুচিকে যখন ধ্রুব এসে প্রণাম করল, তখন সুরুচির চোখে জল এল। উত্তানপাদের রাজ্যে শেষে ধ্রুবই রাজা হয়েছিল।

নৃসিংহকে থামাবার জন্য শিব যে শরভ সেজে এসেছিলেন, সেই শরভটা না জানি কি অদ্ভুত জন্তু। আমাদের দেশের অনেক প্রাচীন পুস্তকে এই জন্তুর উল্লেখ দেখা যায়। তার নাকি আটটা পা। সে ডিগ্‌বাজী খেতে খেতে চলে, আর সিংহ ধরে খায়। সকল পুরাণে কিন্তু নৃসিংহের ব্যাপারে শরভের উল্লেখ নাই। আবার কোন পুরাণে এমনও দেখা যায় যে, সেই শরভটা এসে নৃসিংহকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। শিব শেষে সেই নৃসিংহের মাথা কেটে চামড়া তুলে নিয়েছিলেন। সেই পুরাণে লেখা আছে, যে সেই শরভটার এক হাজারটা ভয়ানক লম্বা লম্বা হাত, চারটা পা, দুটো পাখা, আর তিনটা চোখ ছিল। ঠোঁটও ছিল, তাতে ভয়ঙ্কর দাঁতও ছিল।

গতবারে শালের ফলের কথা বলেছিলাম, সেগুলো দেখতে যেন ফুলের মত। মহুয়ার যে ফুল, সে হয় ফলের মত; হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন এক রকমের গোলাপ

জাম। সাঁওতাল পরগনায় আর ছোটনাগপুরে অসংখ্য মহুয়ার গাছ আছে। একেকটা বড় বড় মাঠে অনেক সময় মহুয়া ছাড়া আর কোন গাছই দেখতে পাওয়া যায় না। এ অঞ্চলের লোকের পক্ষে এটি বড়ই উপকারী গাছ। অনেকে বছরের মধ্যে কয়েক মাস এই গাছের ফুল খেয়েই দিন কাটায়।

মহুয়ার ফুল শুকালে কতকটা কিসমিসের মত হয়। তখন তাকে ভেজে খাওয়া যায়; আটা বা ময়দার সঙ্গে মিশিয়ে তা দিয়ে রুটিও তয়ের করে। গরুকে এই শুকনো মহুয়া খেতে দিলে গরু খুব দুধ দেয়, কিন্তু সেই দুধে কেমন একটা বিশ্রী গন্ধ থাকে।

মহুয়ার ফল কচি থাকতে তার তরকারী রেঁধে খাওয়া যায়। পাকলে, সেই ফলের বীচি থেকে তেল তয়ের হয়। সে তেল দেখতে ঘীয়ের মত, তাতে বিশ্রী গন্ধ। গরীব লোকেরা সেই তেল জ্বালায়, আর দুষ্টু দোকানদারেরা ঘীয়ের সঙ্গে মিশায়।

নূতন ধাঁধা।

১। কলের মধ্যে পা দিয়েছ তাইত আমায় পেলে
বিপদ হ'লে দোষটা সবাই আমার ঘাড়েই ফেলে।
ফেল না মোর মুণ্ডু কেটে তবুও লাগি কাজে
আমায় তুলে ছুট্‌বে তরী পদ্মানদীর মাঝে॥

২। আগে ডাকি আয় আয় শেষে করি মানা
উল্টা স্বভাব মোর আছে তোর জানা!
নূতন শিখায়ে কেবা ঠকাইবি মোরে।
যা দেখাবি ফিরে তাই দেখাইব তোরে॥

গতমাসের ধাঁধার উত্তর।

১। ঘুঁড়ি

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

বাঘে বরাহে।

U. RAY & SONS.

সন্দেশ

তৃতীয় বর্ষ | শ্রাবণ, ১৩২২ | চতুর্থ সংখ্যা

বর্ষা বাদল।

বাদল এল দেশে।
উঠান পথে জল থই থই ক্ষেত গিয়েছে ভেসে।
মাটির ধরা ডুবিয়ে দিয়ে বাদল এল দেশে।
আঁধার কাল মেঘের ফাঁকে,
গুড়ুম গুড়ুম আওয়াজ হাঁকে,
চিক্ মিকিয়ে ফিক্ ফিকিয়ে উঠছে কেমন হেসে;
সাঁই সাঁই সাঁই ছুটছে হাওয়া, ডাইনী বুড়ীর বেশে।
নীল আকাশে নাইরে শশী,
নাইরে কোন তারা।
দিবা নিশি ঝুর ঝুর ঝুর,
ঝরছে জলের ধারা।
সুর্য্যি মামা ঘুমিয়ে প'লো ঘুম পাড়ানির দেশে;
সাগর জলে ঢেউ খেলিয়ে বাদল এল হেসে।

শ্রীমতী শৈলসরসী দেবী।

বিষ্ণুর অবতার।

দেবতাদিগের সহিত অসুরেরা চিরকালই ঘোরতর শত্রুতা করিত, আর অনেক সময়ই তাঁহাদের লাঞ্ছনা করিত যতদূর হইতে হয়। প্রহ্লাদের পিতা কি করিয়াছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বেই শুনিয়াছি। প্রহ্লাদের নাতি 'বলি'ও তাহার চেয়ে নিতান্ত কম করে নাই। এদিকে বলি ধার্ম্মিক ছিল খুবই, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? সে যে অসুর, কাজেই দেবতাদের সঙ্গে শত্রুতা না করিয়া থাকিতে পারিত না।

একবার সে ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে দল বল শুদ্ধ স্বর্গ হইতে তাড়াইয়া দিল। তখন দেবতাগণ আর কি করিবেন? তাঁহারা অতিশয় দুঃখিত হইয়া বিষ্ণুর আশ্রয় লইলেন। এদিকে ইন্দ্রের মাতা অদিতি দেবীও এক মনে বিষ্ণুকে ডাকিয়া এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যে, "হে দেব! আমাকেএমন একটি পুত্র দান কর, যে এই সকল অসুরকে বধ করিতে পারে।" কিছুকাল এইরূপে প্রার্থনা করার পর বিষ্ণু তাঁহাকে দেখা দিয়া বলিলেন, "মা, তুমি দুঃখ করিও না; আমি নিজেই তোমার পুত্র হইয়া অসুর বধ করিব।"

সেই পুত্রের নাম বামন। এমন সুন্দর ছোট্ট খোকা আর কেহ কখনও দেখে নাই। ঐরূপ ছোট্ট ছিলেন বলিয়াই তাঁহার নাম বামন। দেবতারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন, আর কত সুন্দর সুন্দর জিনিস যে তাঁহাকে দিলেন, কি বলিব। কেহ দিলেন পৈতা, কেহ দিলেন লাঠি, কেহ কমণ্ডলু, কেহ কাপড়, কেহ বেদ, কেহ জপের মালা।

বড় হইয়াও সেই খোকা তেমনি ছোট্টটিই রহিয়া গেলেন। তারপর একবার বলি এক বিশাল যজ্ঞ আরম্ভ করিল, মুনি ঋষি কত যে তাহাতে আসিলেন তাহার সংখ্যা নাই। বামনও সেই যজ্ঞের কথা শুনিয়া বেদের মন্ত্র আওড়াইতে আওড়াইতে তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। বলি দেখিল, কোথা হইতে একটি ছোট্ট মুনি আসিয়াছেন, তাঁহার মাথায় জটা, হাতে দণ্ড কমণ্ডলু আর ছাতা। সে অতিশয় আদরের সহিত তাঁহাকে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ঠাকুর, আপনার কি চাই?" বামন বলিলেন "আমি তোমার নিকট তিন পা জমি চাই।"

এ কথায় বলি হাসিয়া বলিল, "সে কি ঠাকুর, মোটে তিন পা জমি দিয়া কি করিবে? ও ত ছেলেমানুষের কথা! বড় বড় গ্রাম চাও, টাকাকড়ি, লোকজন যত খুসী চাও।"

বামন বলিলেন, "আমার অত জিনিসের দরকার নাই; আমার তিন পা জমি হইলেই চলিবে। বেশী লোভ করা ভাল নয়।"

তখন বলি বলিল, "আচ্ছা তবে তুমি তিন পা জমিই নাও।" তারপর হাতে জল লইয়া সে বামনকে তিন পা জমি দান করিতে যাইবে, এমন সময় তাহার গুরু শুক্রাচার্য্য ব্যস্তভাবে তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "মহারাজ! কর কি? ওঁকে যে সে লোক ভাবিও না। ইনি আর কেহ নহেন নিজে বিষ্ণুই বামন সাজিয়া আসিয়াছেন। ইঁহাকে কিছুই দিওনা; দিলে তোমার সর্ব্বনাশ হইবে।"

বামন

বলি বলিল, "সামান্য একজন ভিক্ষুককেও আমি অমনি ফিরাই না, ইঁহাকে কেমন করিয়া ফিরাইব? বিশেষতঃ আমি 'দিব' বলিয়াছি।"

এই বলিয়া বলি তিন পাদ ভূমি দান করিবামাত্র দেখিল, সেই খোকা আর খোকা নাই,—সে এখন আকাশের চেয়েও উঁচু বিরাট পুরুষ হইয়া গিয়াছে। তারপর দেখিতে দেখিতে সেই বিরাট পুরুষের নাভি দিয়া আর একটি পা বাহির হইল। তখন তিনি এক পদে

পৃথিবী, এক পদে স্বর্গ, আর তৃতীয় পদে স্বর্গেরও উপরে মহর্লোক জনলোক প্রভৃতি ঢাকিয়া ফেলিয়া বলির যত রাজ্য সকলই কাড়িয়া লইলেন। ইহার পর দুষ্ট অসুরগুলিকে বধ করা ত বিষ্ণুর পক্ষে অতি সহজ কাজ, তিনি সে কাজ শীঘ্র শীঘ্র শেষ করিয়া, পুনরায় ইন্দ্রকে ত্রিভুবনের রাজ্য দিয়া দিলেন।

যাহা হউক, বলি ধার্ম্মিক লোক ছিল; সুতরাং শ্রীবিষ্ণু তাহাকে বধ না করিয়া, স্নেহের সহিত বলিলেন, তুমি এক কল্প কাল বাঁচিয়া থাক। এই ইন্দ্রের পরে তুমি ইন্দ্র হইবে। এখন তুমি সুতল নামক পাতালে গিয়া বাস কর। সে অতি সুন্দর স্থান! দেখিও, আর কখনো যেন দেবতাদের সঙ্গে বিরোধ করিও না। তদবধি বলি পাতালে বাস করিতেছে।

ইহাই হইল বিষ্ণুর বামন অবতার। ইহার পরের অবতার পরশুরাম। সে অবতারে বিষ্ণু জমদগ্নি মুনির পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন।

সে কালে ক্ষত্রিয়েরা বড়ই উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাদিগকে সাজা দিবার জন্যই পরশুরামের জন্ম। তখনকার প্রধান ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন কার্ত্তবীর্য্য, অর্থাৎ কৃতবীর্য্যের পুত্র, অর্জ্জুন। দত্তাত্রেয়ের বরে অর্জ্জুনের এক হাজার হাত হইয়াছিল। সেই এক হাজার হাতে এক হাজার অস্ত্র লইয়া তিনি দেবতাদিগকে অবধি যুদ্ধে হারাইয়া দিতেন। এজন্য তাঁহার দর্পের আর সীমাই ছিল না।

একবার কার্ত্তবীর্য্য মৃগয়া করিতে গিয়া বনের ভিতরে অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়েন। সেই সময়ে মহর্ষি জমদগ্নি তাঁহাকে নিমন্ত্রণপূর্ব্বক নিজের আশ্রমে আনিয়া বিবিধ উপচারে আহার করাইয়াছিলেন। ভাল লোক হইলে ইহাতে সে মুনির প্রতি কতই কৃতজ্ঞ হইত, আর হয় ত তাঁহার কত উপকার করিত। কিন্তু কার্ত্তবীর্য্য সেরূপ স্বভাবের লোক ছিলেন না। মুনি যে তাঁহাকে কত ক্লেশ হইতে বাঁচাইলেন, সে কথা তাঁহার মনেই আসে নাই। তিনি এক দৃষ্টে কেবল মুনির গাইটিকেই দেখিতে লাগিলেন। সেটি কামধেনু, মুনি তাহার নিকট যাহা চাহেন, তাহাই পান, রাজার লোক তাহা খাইয়া শেষ করিতে পারে না। রাজা ভাবিলেন, এ গাইটি তাঁহার না হইলেই চলিতেছে না। কাজেই তিনি মুনিকে বলিলেন, "ভগবান্ গাইটি আমাকে দিন।" মুনি সে কথায় রাজি না হওয়ায় রাজা সেটি তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া গেলেন।

পরশুরাম কার্ত্তবীর্য্যকে বধ করিয়া সেই গাই ফিরাইয়া আনিলেন। তারপর তিনি

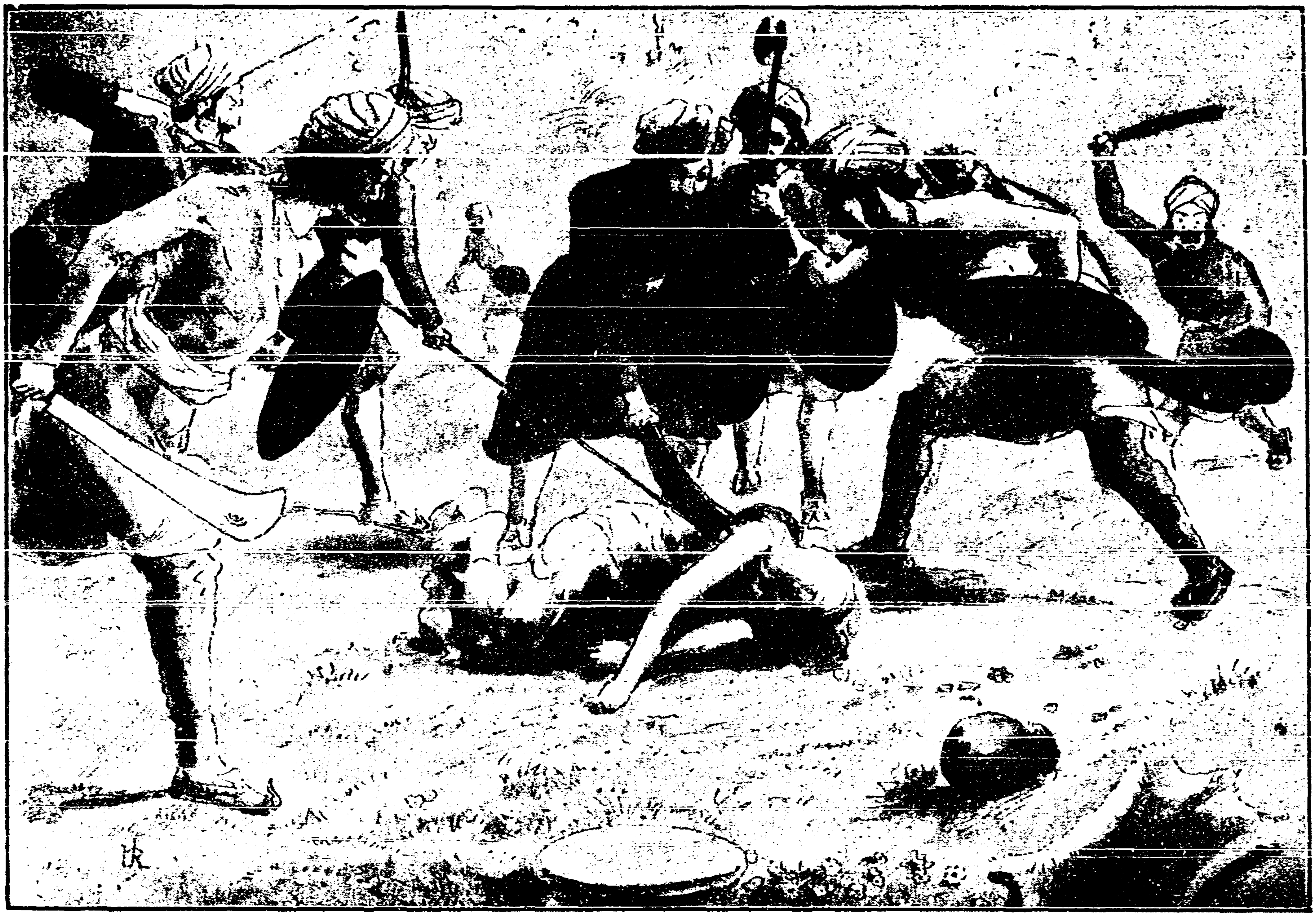

জমদগ্নি হত্যা

বনে চলিয়া গিয়াছেন, এমন সময় কার্ত্তবীর্য্যের পুত্রেরা আসিয়া অতি নিষ্ঠুর ভাবে মহর্ষি জমদগ্নির প্রাণ নাশ করিল।

পরশুরাম আশ্রমে ফিরিয়া সেই দারুণ সংবাদ শুনিবামাত্র ক্রোধে অধীর হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে পৃথিবীর যত ক্ষত্রিয় সব তিনি মারিয়া শেষ করিবেন। তারপর ভীষণ কুঠার হস্তে সেই যে তিনি ক্ষত্রিয় মারিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাদিগকে শেষ না করিয়া আর ক্ষান্ত হইলেন না। একবার নয়, দুবার নয়, ক্রমাগত একুশবার তিনি এইরূপে পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেন। ক্ষত্রিয়ের রক্তে কুরুক্ষেত্রে পাঁচটি কুণ্ড প্রস্তুত করিয়া তাহাতে পিতার তর্পণ করিলে তবে তাঁহার ক্রোধ কিঞ্চিৎ শান্ত হইল।

ক্ষত্রিয়েরাই ছিল পৃথিবীর রাজা ; তাহাদিগকে বধ করায় তাহাদের সকলের রাজ্যই পরশুরামের হইল। সেই সব রাজ্য তখন তিনি মহর্ষি কশ্যপকে দান করিলেন। দান করিয়া তাঁহার মনে এই চিন্তা হইল যে, 'সকলই ত পরের রাজ্য হইল, এখন কোথায় বাস করি ?' এই ভাবিয়া তিনি অস্ত্রদ্বারা সমুদ্রের জল সরাইয়া এক নূতন রাজ্যের সৃষ্টি করিলেন। তদবধি উহাই তাঁহার বাসস্থান হইল।

পাহাড়ের দাঁত।

পাহাড়ের আবার দাঁত থাকে ? এ কথায় তোমরা হয় ত হেসে বলবে, "দূর—না !" আমি কিন্তু দুবার দুজন পাড়াগেঁয়ে লোককে খুব গম্ভীরভাবে বলতে শুনেছি যে পাহাড়ের দাঁত থাকে,—অন্ততঃ ছিল।

একদিন আমি কলকাতার যাদুঘর দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে একটা ঘরে অনেক সেকেলে জন্তুর হাড়গোড় আছে। হাড়গুলো নানান্ জায়গার পাহাড়ে পাওয়া গিয়েছিল, সেখানকার পাথর শুদ্ধ সেই হাড়গুলো কেটে যাদুঘরে এনে রাখা হয়েছে। এর মধ্যে জন্তুর দাঁতই বেশী, তার মধ্যে আবার নানা জাতীয় হাতীর দাঁতগুলো, বড় বড় ব'লে, সহজেই চোখে পড়ে। হঠাৎ মনে হয় যেন সেগুলো সেই পাথরেরই দাঁত।

একদল পাড়াগেঁয়ে লোক সেই দাঁতগুলোর সামনে এসে ভারী আশ্চর্য্য হয়ে দাঁড়াল। তাদের একজন বল্ল, "পাহাড়ের আবার দাঁত থাকে ?" সেই দলের বুড়ো চাঁইমশাইটি বল্লেন, "থাকে বই কি ? তারা যে খেত,—আহার করত !" তা শুনে আমার ছেলেবেলার একটা কথা মনে পড়ল ; আমাদের একজন বুড়ো চাকর বলত যে পাহাড়েরা অভ্র খায়। সেই বুড়োটি যে একথা সরলভাবে বিশ্বাস কর ত, তাতে আর ভুল নাই, কেন না সে খুব গম্ভীরভাবেই এ কথা বলত। আর আমারও তখন সে কথা সত্য বলেই মনে হত।

এর অনেক বছর পরে, বড় হয়ে, আমি একবার সাঁওতাল পরগনায় বেড়াতে আসি। সে হচ্ছে পাথরের দেশ, কত রকমের পাথরই সেখানে আছে। মাঠে পাথর, ঝরণায় পাথর, নদীতে পাথর। এক জায়গায় দেখলাম, কালো পাথর ফেটে রয়েছে, সেই ফাটলের ভিতরে দু সার করে ঠিক দাঁতের মত সাদা সাদা পাথর, তার মাঝখানে অভ্রের

গুঁড়ো। অমনি আমার ছেলেবেলার সেই বুড়ো চাকরটির সেই কথা মনে পড়ল,—

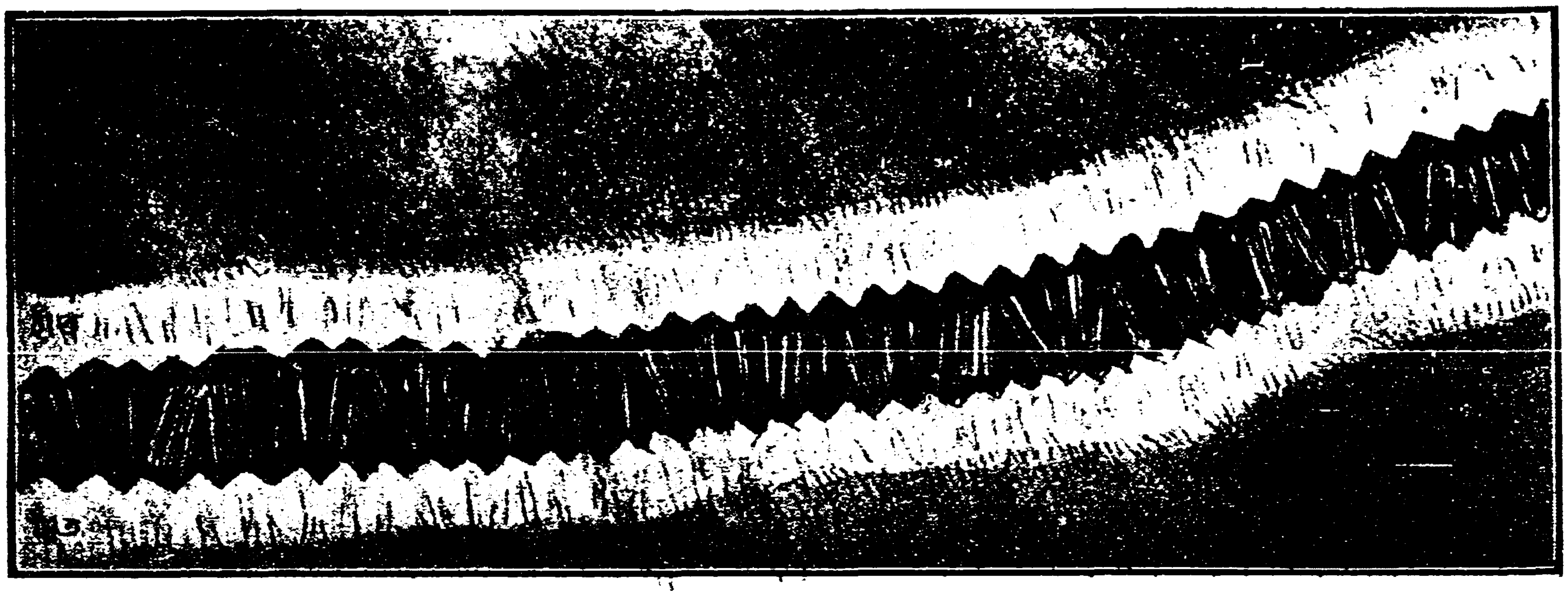

এই ত পাহাড়ের দাঁত, এই ত তার ভিতরে অভ্র, এই জিনিস দেখেই কোন সাদাসিদে লোকে বলে থাকবে যে পাহাড়েরা অভ্র খায়।

আমি এই জিনিসকেই বলছিলাম, পাহাড়ের দাঁত। এ অঞ্চলে অনেক স্থানেই দেখা যায়, কালো পাথর ফেটে হাঁ করে আছে, সেই হাঁর ভিতরে ঠিক দাঁতের মত দু সার সাদা পাথর, সেই দাঁতের মাঝখানে অভ্রের গুঁড়ো। ফাটলের ভিতরে এই সাদা পাথরের দাঁত কি করে জন্মাল? আর তার ভিতরে এই অভ্রই বা কোত্থেকে এল? ও দাঁত যে ওখানে দৈবাৎ এসে পড়েছে, তা বলবার যো নাই; এদেশময় অমনিতর ফাটলের ভিতরে ঐ রকম দাঁত দেখতে পাওয়া যায়, আর তাতে অভ্রও থাকে। এ আশ্চর্য্য ব্যাপার কি করে ঘটল?

এ কথার উত্তর দেওয়ার আগে এই ২নং পাথরের টুকরোকে ভাল করে দেখ।

ফাটলের ভিতরে এই পাথরেরই দাঁত থাকে। পাথর খানার গা ময় কেমন ছোট ছোট দাঁতের মত আছে দেখ। এ দাঁতগুলো নিতান্তই ছোট ছোট, এর চেয়ে ঢের বড় বড় দাঁতওয়ালা পাথরও পাওয়া যায়। বেশী বড় হলে দাঁতগুলো দেখতে ঝাড়ের 'কলমের' মত হয়, তখন তাকে বলে 'স্ফটিক'। একেকটা স্ফটিকের 'কলম' ঝাড়ের কলমের চেয়েও ঢের বড় বড় হতে পারে; যাদুঘরে গেলে তার নমুনা দেখতে পার। ময় দানব যে যুধিষ্ঠিরকে সভাঘর করে দিয়েছিল, সেই ঘরটি নাকি ছিল স্ফটিকের তৈরী।

তোমরা হয় ত বলবে, এ কথার কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু স্ফটিকের বাসন যে তয়ের হত তার বেশ ভাল প্রমাণ আছে। ইংরাজ ভ্রমণকারীরা দিল্লীর বাদসার দরবারে এসে, তাঁকে স্ফটিকের বাটিতে করে সরবৎ খেতে দেখে, সে কথা পুস্তকে লিখে রেখেছেন।

সে যা হোক, পাথরখানাকে একটিবার ভাল করে দেখ। দেখ, এই পাথরখানার গায় আরেকটি পাথরের টুকরো কেমন ঢুকে আছে। কি করে ঢুকল? তোমরা দুখানা পাথর নিয়ে চেষ্টা করে দেখ দেখি, একখানাকে আরেকখানার ভিতরে ঢুকাতে পার কি না। এ কথা মানতেই হবে যে বড় পাথরখানা এক সময়ে কোমল ছিল, সেই সময়ে ছোটখানা তার ভিতরে ঢুকেছে। এ ভিন্ন আর ঢুকবার কোন উপায় নাই।

এখন তবে এই ব্যাপারের ভিতরকার কথাটি বুঝতে পারা যাচ্ছে। এ সব পাথর এককালে তরল ছিল, শেষে জমাট বেঁধে শক্ত হয়েছে। তরল জিনিস জমাট বাঁধবার সময় অনেক স্থলে তাতে মিছরির দানার মত দানা বাঁধে; ঐ 'দাঁত'গুলো সেই দানা। ভয়ঙ্কর তাপ পেলে এ পাথর গলে যেতে পারে, আর কিছুতেই সে গলবার নয়। সুতরাং নিশ্চয় সে এক সময়ে তেমনি তাপ পেয়েছিল। পৃথিবীর দেহের ভিতরে যে এমন তাপ জন্মাবার ব্যবস্থা আছে, আগ্নেয় গিরির কাণ্ডই তার প্রমাণ। সেই কাণ্ড এই সাঁওতাল পরগনায় অতি প্রাচীন কালে কখনো হয়ে ছিল, তার ফলে পাথরের দেহ ফেটে গিয়ে ভিতর থেকে স্ফটিক আর অভ্রের মাল মসলা গলে বেরিয়ে এসেছিল। তার পর সে জিনিস জমাট বেঁধে স্ফটিক আর অভ্র হয়েছে।

এ দেশে অনেক অভ্রের খনি আছে, তার সকল স্থলেই দেখা যায় যে দু ধারে সেই সাদা পাথর (Quartz), মাঝখানে অভ্র। এ ভিন্ন আর কোন অবস্থায় অভ্র পাওয় যায় না।

এই সাদা পাথরের গুঁড়োই আমাদের দেশের বালি। নদীর জন্মস্থান থেকে আরম্ভ করে সকল রকম পাথরের গুঁড়োই তার জলের সঙ্গে মিশতে থাকে। কিন্তু এই সাদা পাথর (Quartz) ভিন্ন আর কোন পাথরই এ দেশে এসে পোঁছাতে পারে না। তারা তেমন মজবুত নয় বলে এর আগেই গলে পচে শেষ হয়ে যায়। এই অর্থেও দেখা যাচ্ছে যে কোয়ার্ট্জ্ পাথর পাহাড়ের দাঁত। কেন না, জন্তুর দেহের মধ্যে তার দাঁতই হচ্ছে সকলের চেয়ে মজবুত জিনিস।

ত্রৈলোক্যনাথ।

ঠানদিদির বিক্রম, মোহনমুন্সী প্রভৃতি পূর্ব্বে তোমাদের যে সকল গল্প বলেছি এবং এখন যা বল্‌ব এগুলি সবই সত্য কথা।

ত্রৈলোক্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন পুরুষে চাকরী করে নাই। কিছু ধানজমী ছিল, পূর্ব্ব পুরুষদিগের তাতেই এক রকম সংসার চলে যেত; তখন চাল ডাল দুধ ঘি সবই সস্তা। লোকে পানের দোকানে গিয়ে আধ পয়সা দিয়ে বল্‌তো অর্দ্ধেক পান আজ দাও বাকী অর্দ্ধেক ২।৩ দিন পরে নেব, কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের সময়ে এত সুবিধা ছিল না। জিনিসের দাম তখন অনেক বেড়ে গিয়েছিল, বিনা চাকরীতে আর সংসার চলা সম্ভব ছিল না। ত্রৈলোক্যনাথ গ্রামের স্কুলে,মাইনর পর্য্যন্ত পড়েছিল। সে ১॥৵০ রেলভাড়া জোগাড় করে কলিকাতায় মিরজাপুরের এক বাসায় এসে হাজির হলো। ছেলেরা যখন দশটার সময় খেয়ে স্কুল কলেজে যেত, ত্রৈলোক্যনাথও সেই সময়ে চাকরীর চেষ্টায় বাহির হতো।

তখন কল্‌কাতায় ইলেক্‌ট্রিক ট্রাম ছিল না; ঘোড়ায় টানা ট্রাম সবেমাত্র হয়েছে। ১৫।১৬ দিন কল্‌কাতার রাস্তায় ঘুরে ঘুরে, ত্রৈলোক্যনাথ একদিন ভবানীপুরে ট্রাম কোম্পানীর আপিসের গায়ে দেখল লেখা রয়েছে "কণ্ডাক্‌টর চাই"। ত্রৈলোক্যনাথ আপিসের ভিতরে গিয়ে বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করে জানল, পনর টাকা নগদ জামিন দিতে হবে। শ্যামবাজার হতে হাইকোর্ট বা ধর্ম্মতলা, কালীঘাট হতে ক্লাইভ ষ্ট্রীট বা হাইকোর্ট যাতায়াতে ছয় পয়সা হিসাবে পাইবে, দিনে যদি আটবারও যাতায়াত করতে পারে তাহলেও মাসে ২০।২২ টাকা হবে। এই

মনে করে, ত্রৈলোক্যনাথ চাকরী স্বীকার করে এসেছে; পনরটি টাকা জমা দিলে কাজ আরম্ভ করতে পারবে।

বাসার সকলেই বল্‌তে লাগল, "তুমি অত খাটতে পারবে না, রোদ বৃষ্টি তোমার সহ্য হবে না, একটা ভয়ানক অসুখ হয়ে পড়বে" ইত্যাদি। ত্রৈলোক্যনাথ বল্ল, "যখন স্বীকার করে এসেছি, কথা দিয়ে কথা না রাখা অন্যায় হ'বে; আর কত দিনই বা বসে বসে তোমাদের খাব ?"

সকলে চেষ্টা করে সংগ্রহ করে, জামিনের পনর টাকা ও তার পোষাক (অর্থাৎ জিনের প্যাণ্ট কোট ও বনাতের টুপী) কিনে দিল। ইংরাজী ১৮৮২ সালের ১৪ই নভেম্বর ত্রৈলোক্যনাথ ট্রামের কণ্ডাক্‌টর হ'ল। শ্যামবাজার হতে হাইকোর্ট ও ধর্ম্মতলার গাড়িতে তাহাকে কাজ করতে হতো। ত্রৈলোক্যনাথ সকালে স্নান ও সন্ধ্যা বন্দনা করে, কিছু জলখাবার খেয়ে কাজে যেতো এবং সন্ধ্যার পরে ফিরত; যে দিন ভাত খেয়ে দশটার সময় যেতো, সে দিন ফিরতে রাত দশটা হতো এবং পয়সাও কম হতো।

তিন চারি মাস কাজের পর, একদিন ত্রৈলোক্যনাথ শেষ গাড়িতে ধর্ম্মতলা হতে ফিরবার সময় গাড়িতে একটি টাকার থলে পাইল। ত্রৈলোক্যনাথ শ্যামবাজার পৌঁছিয়াই আপিসের বড়বাবুর নিকট থলেটি জমা দিল। বাসায় এসে এই কথা বলায়, বাসার সকলের পরামর্শে তার পরদিন সঞ্জীবনীতে বিজ্ঞাপন দেওয়া হলো;—বুধবার রাত্রি নয়টার সময় শ্যামবাজারের গাড়ীতে, একটি টাকার থলে পাওয়া গিয়াছে, যাঁহার থলে তিনি উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে শ্যামবাজার ডিপোর বড়বাবুর নিকট হইতে টাকা গ্রহণ করিবেন।

বিজ্ঞাপন বাহির হওয়ার পরেই যাঁহার টাকা তিনি শ্যামবাজারে উপস্থিত হয়ে বল্লেন, "ধর্ম্মতলায় আমার দোকান আছে, আমি রাত্রিতে দোকান বন্ধ করে, দোকানের বিক্রী টাকা নিয়ে বাড়ী ফির্‌ছিলাম; রাস্তায় থলেটি হারিয়েছিল। আমার দোকানের খাতায় লেখা আছে দুইখান পঞ্চাশ টাকার ও ত্রিশখান দশটাকার নোট, একশত তিন টাকা, এগারটা আধুলি, সতেরটা সিকি, বাইশটা দুয়ানি ও ছয়টা পয়সা মোট— ৫১৫৷৶১০ পাঁচ শত পনর টাকা সাড়ে নয় আনা"। থলে খুলে দেখা গেল তাঁহার কথা মতই নোট টাকা ও রেজকী আছে। বাবুটি টাকাগুলি পেয়ে, ত্রৈলোক্যনাথকে পুরস্কার দিতে চেয়েছিলেন, ত্রৈলোক্যনাথ অস্বীকার করে বল্ল "আমার টাকার লোভ থাক্‌লে থলে সমেত নিতে পারতাম।"

কিছুদিন পরে ত্রৈলোক্যনাথ কালীঘাট লাইনে বদলী হলো, একদিন বিকালে চৌরঙ্গী রাস্তায় একটি সাহেব ট্রামে উঠলেন। ত্রৈলোক্যনাথ তাঁকে টিকিট কিন্‌তে বলায় সাহেব বল্লেন "পাশ আছে"। ত্রৈলোক্যনাথ পাশ দেখতে চাইলে, সাহেব সমস্ত পকেট খুঁজে বল্লেন "পাশখানা বাসায় ফেলে এসেছি।"

"তবে পয়সা দিয়ে টিকিট কিনুন।"

"কেন ? তুমি কি আমায় বিশ্বাস কচ্ছ না ?"

"বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা নয়, আমি ট্রাম কোম্পানীর নিয়ম অনুসারে কাজ কচ্ছি।"

তখন সাহেব নানা প্রকারে ত্রৈলোক্যনাথকে বুঝাতে চেষ্টা কল্লেন তিনি ট্রাম কোম্পানীর বড় সাহেব, তাঁহাদ্বারা ত্রৈলোক্যনাথের অনেক উন্নতি হতে পারে ; কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথ ছাড়বার পাত্র নয়, সে গাড়ি থামিয়ে সাহেবকে বল্ল "আপনি টিকিট কিনুন অথবা নেমে যান, তা না হলে আমি গাড়ি চালাব না"। সাহেব বল্লেন "তুমি কার হুকুমে আমায় নামিয়ে দিচ্ছ ?" ত্রৈলোক্যনাথ বল্ল "লণ্ডন সাহেবের হুকুমে।" সাহেব তখন পয়সা বার করে টিকিট কিন্‌লেন। গাড়ি এসে ভবানীপুর ট্রাম আপিসের সাম্‌নে দাঁড়াল, সাহেব নেমে আপিসের দোতালায় উঠে গেলেন। এই সময় একজন ইনেস্‌পেক্‌টর সাহেবকে সেলাম করে গাড়িতে উঠ্‌ল, ত্রৈলোক্যনাথ ইনেস্‌পেক্‌টরকে জিজ্ঞাসা কল্ল "এ সাহেবটি কে ?" "আমাদের বড় সাহেব মিষ্টার লণ্ডন।"

ত্রৈলোক্যনাথের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো, সে কোন মতে কালীঘাটে পৌঁছে, ব্যাগ ও টাকা পয়সা বুঝিয়ে দিয়ে, বাসায় চলে আস্‌ল।

ক্রমশঃ

প্রবাসী পাখী।

কতগুলো বক হাঁটু-জলে নেমে ভারী গম্ভীরভাবে মাছ ধরবার ফন্দি আঁটছে, এমন সময় একটি রাজহাঁস উড়ে এসে সেইখানে নামল। বকগুলো তাকে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে বল্ল, "বাঃ! চোখ লাল, মুখ লাল, পা লাল ;—তুমি কে হে ?"

হাঁস বল্ল, "আমি হাঁস।"

বকেরা বল্ল, "তুমি কোত্থেকে আসছ ?"

হাঁস বল্ল, "মানস সরোবর থেকে।"

"সেখানে কি আছে ?"

"সোনার পদ্মবন আছে, অমৃতের মত জল আছে, আর মণি মাণিকের বেদীওয়ালা গাছ আছে।"

"শামুক সেখানে আছে কি ?"

"না !"

এ কথায় বকগুলো হো হো করে হেসে বল্ল, "তবে সে ছাই জায়গা। শামুক নেই, খাব কি ?" তারা ঠিক কথাই বলে ছিল ; যেখানে খাবার মিলে না, অন্ততঃ আমি ত সেখানে গিয়ে থাকতে রাজি নই, তা সেখানে সোনার পদ্ম ফুলই থাক্, আর মাণিকের বেদীই থাক্।

মানস সরোবরে ঢের লোক গিয়েছে। সেখানে সোনার পদ্মফুলও নাই, মাণিকের বেদীবাঁধান গাছও নাই ; হাঁসের ও সব নিতান্তই বাজে কথা। তবে, তার কথার মধ্যে এই টুকু সত্য হতে পারে যে, সে মানস সরোবর থেকে এসে ছিল।

আমি পোষা হাঁসের কথা বলছি না, কিন্তু বুনো হাঁসগুলো যখন শীত কালে আমাদের দেশে আসে, তখন বাস্তবিকই তারা হিমালয় পার হয়ে আসে। মানস সরোবর থেকেও আসতে পারে, তার চেয়েও উত্তর থেকে, এমন কি সাইবিরিয়া থেকেও, আসতে পারে।

এ কথা অবিশ্বাস করার কোন কারণ নাই, এ সকল পরীক্ষিত বিষয়। অনেক পাখীর এ রকম অভ্যাস আছে। তাদের কারু বেশী শীত সয় না, কারু গরম সয় না, কারু কোনটাই সয় না। হাঁসগুলো শীত কালে এসে আমাদের দেশে দেখা দেয়, বৈশাখ মাসে চলে যায়। শীত কালে বাঙ্গালা দেশের কোন কোন জায়গায় এদের কলরবে লোকের ঘুমান অসম্ভব হয়। তার পর গরম পড়তেই তারা এ দেশ ছেড়ে পালাবার জন্য পাগল হয়ে ওঠে। কেন পাগল হয় তা আমি ঠিক বলতে পারি না। গরমের ভয়ে হতে পারে, আরো কারণ থাকতে পারে। যে কারণেই হোক, নিতান্ত দায়ে না ঠেকলে তারা তখন চলে যাবেই। সে সময়ে সন্তানের মায়াও তাদের আটকে রাখতে পারবে না। তারপর আবার শীতকাল এলেই তারা এদেশে ফিরে আসবে।

শুধু যে এ দেশে আসবে তা নয়, ঠিক যে জায়গাটিতে আগের শীত কাটিয়ে গিয়েছিল হয়ত সেই জায়গাটিতেই ফিরে আসবে। কলকাতার চিড়িয়াখানায় একবার হাঁসের গায় চিহ্ন দিয়ে এ বিষয় পরীক্ষা করে দেখা হয়েছিল। সেখানকার একটা

ডোবায় কতগুলো বুনো হাঁস থাকত; গ্রীষ্মকালে তারা চলে গেল, আবার শীতকালে এসে সেই ডোবায় উপস্থিত হল।

আমি আগেই বলেছি, অনেক পাখীরই এ রকম অভ্যাস আছে। এজন্য তারা কত কষ্টই স্বীকার করে। এদেশ থেকে হিমালয় পার হয়ে সাইবিরিয়া চলে যাওয়া কিরূপ কঠিন কাজ, তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। অনেক পাখী বড় বড় সাগর পার হয়ে এক দেশ থেকে আরেক দেশে চলে যায়। এদের মধ্যে গগনবেড়ের মত বড় বড় পাখীও আছে, তাদের এক একটার ওজন প্রায় আধ মন। আবার খঞ্জনের মত ছোট ছোট পাখীও আছে, যার ওজন এক ছটাকের বেশী হবে না।

আমি ভাবি এই ছোট ছোট পাখীগুলো কি করে এত বড় সাগর পার হয়ে যায়। না জানি সে কিসের টান, যাতে তাদের এত কষ্ট সইবার শক্তি এনে দেয়। অন্ধকার রাত্রে সেই অকূল পাথারে কে তাদের পথ দেখায়?

আর, কত পাখী! লাখ লাখ, কোটি কোটি। এর কত যে যেতে যেতে পথে মারা যায়, তার সীমা সংখ্যা নাই। শুধু পথের কষ্টে যে তারা মরে, তা নয়। এদের অধিকাংশেরই মরার কারণ অতি আশ্চর্য্য। রাত্রে জাহাজের চলা ফেরার সুবিধার জন্য সমুদ্রের ধারে জায়গায় জায়গায় বাতী-ঘর থাকে, সেখানকার বাতীগুলো ভয়ানক উজ্জ্বল। আগুন দেখে যেমন পোকা উড়ে আসে, ঠিক তেমনি এই পাখীগুলো বাতী-ঘরের বাতী দেখে সেখানে এসে উপস্থিত হয়। তাদের অনেকে সোজাসুজি সেই ঘরের দেয়ালে প'ড়ে ঢুঁ খায়, অমনি আর তাদের উড়তে হয় না। বড় বড় গগনবেড়গুলোকে এমনি করে একেবারে থেৎলো হয়ে যেতে দেখা গিয়েছে।

যারা বাতী-ঘরটাকে এড়িয়ে এ বিপদ থেকে রক্ষা পায়, তারা ক্রমাগত সেই বাতী-ঘরের চার ধারে বোঁ বোঁ করে ঘূরতে থাকে। জ্যৈষ্ঠের সন্দেশে তার ছবি দেওয়া হয়েছে। ঘূরে ঘূরে শেষে আর উড়বার শক্তি থাকে না, তখন সেই বাতী ঘরের আশে পাশে বিশ্রামের জায়গা না থাকলে অমনি করে ঘূরতে ঘূরতেই কত বেচারার প্রাণ বেরিয়ে যায়। এক একটা বাতী-ঘরের কাছে এমনি করে এক রাত্রের ভিতরে ৪০০।৫০০ পাখী মরতে দেখা গিয়েছে। হল্যাণ্ড দেশের উপকূলে একটা প্রকাণ্ড বাতী-ঘর আছে তার ধারে নাকি একদিন এক হাজারটা পাখী এমনি ভাবে মারা গিয়েছিল।

আফ্রিকার কাছে একটা দ্বীপের দৃশ্য। হাজার হাজার পাখী সমুদ্র পার হবার পথে এইখানে ব'সে বিশ্রাম করে। বছরের মধ্যে প্রায় এগার মাস এখানে জনপ্রাণী থাকে না আর শীতের শেষে মাসখানেক পাখীর গোলমালে কাণে তালা লাগিয়ে দেয়—ছুমাইল দূরে জাহাজের লোকেরা সে শব্দ শুনতে পায়!

এজন্য এখন কোন কোন জায়গায় বাতী ঘরের গায় পাখীদের জন্য ‘দাঁড়’ বসিয়ে দেওয়া হয়। ঘূরে ঘূরে নিতান্ত ক্লান্ত হলে পাখীরা তাতে বসে বিশ্রাম করে, তারপর আবার ঘূরতে থাকে। এমনি করে তাদের সারারাত কেটে যায়; প্রভাতের আলোক ফুটে উঠলে তবে তাদের চোখের ধাঁধা ভাঙ্গে। দাঁড় বসাবার কাজটি খুব হিসাব করে করা চাই। দাঁড় আলোর বেশী কাছে হলে পাখীরা তাতে বসতে চায় না, বেশী দূরে হলে তাকে তারা দেখতে পায় না।

তিনটি বর।

সেই তিন থলী মোহর নিয়ে কামার যারপরনাই খুসী হয়ে নাচতে নাচতে বাড়ী এল। ভাবল, এখন সাত বছর এই মোহর দিয়ে খুব ধূমধাম করে নিবে। সাত বছর পরে সয়তানের তাকে নিতে আসবার কথা, তখন তার সঙ্গে যেতেই হবে।

তারপর লোকে দেখল যে কামার কেমন করে রাতারাতি বড় লোক হয়ে গেছে। এখন আর সে হাপরও ঠেলে না, লোহাও পিটে না; এখন তার গাড়ী ঘোড়া চাকর বাকরের অন্তই নাই। দিন যাচ্ছে, আর তার বাবুগিরি ক্রমেই বেড়ে উঠছে। সে বাবুগিরিতে সাত বছর শেষ হবার ঢের আগেই সয়তানের দেওয়া সব টাকা ফুরিয়ে গেল, আর ঘরে একটি পয়সাও নাই, এক মুঠো চা’লও নাই। তখন কাজেই তাকে আবার যে কামার সেই কামারই হতে হল, নইলে খাবে কি?

তারপর একদিন সে তার দোকানে বসে একটা লোহা পিটচে আর ভাবছে, কখন খদ্দের আসবে, এমন সময় একজন বুড়ো হেন লোক ধীরে ধীরে এসে তার কাছে দাঁড়াল। কামার আগে ভাবল, ‘এই রে খদ্দের!’ তারপর চেয়ে দেখল, ‘ওমা! এ যে সয়তান!’

সয়তান বল্ল, “মনে আছে ত? সাত বছর শেষ হয়েছে, এখন আমার সঙ্গে চল।”

কামার বল্ল, “তাই ত, আমি গেলে আমার ছেলেপুলে গুলো কি খাবে? তোমার ত কতই লোক আছে, আমাকে দয়া করে ছেড়ে দাও।”

সয়তান বল্ল, “সে হবে না! আমাকে ফাঁকি দেওয়া বড় শক্ত কাজ; চল, এখনি চল।”

কামার বল্ল, "তুমি ছাড়বেই না যখন তখন ত চলতেই হবে, কিন্তু আমার হাতের এই কাজটি শেষ করে যেতে পারলে আমার ছেলেগুলোর পক্ষে বড় ভাল হত,—এর দরুন কিছু পয়সা পাওয়া যাবে। তুমি দাদা আমার এই উপকারটুকু কর না—আমি সকলের কাছে বিদায় হয়ে নিই, ততক্ষণ তুমি বসে এই হাতুড়িটা দিয়ে এই লোহা খানিকে পিট।"

সয়তান কাজে এমন দুষ্টু হলেও কথা বার্ত্তায় ভারী ভদ্র লোক, সে কামারের কথা শুনে তখনি তার হাত থেকে হাতুড়িটি নিয়ে লোহাটাকে পিটাতে লাগল। সে জানত না যে সেটা সেই দেবতার বর দেওয়া সর্ব্বনেশে হাতুড়ি, তা দিয়ে একবার পিটতে আরম্ভ করলে আর কামারের হুকুম ছাড়া থামবার উপায় নাই। কামার তার হাতে সেই হাতুড়ি দিয়েই অমনি যে ঘর থেকে বেরুল, আর এক মাসের ভিতরে সেইমুখোই হল না।

এক মাস পরে কামার দোকানে ফিরে এসে দেখল যে, সয়তান তখনো ঠনা ঠন্ ঠনা ঠন্ করে বেদম হাতুড়ি পিটছে, আর তার দশা যে হয়েছে! খালি সয়তান বলে এতক্ষণ সে বেঁচে আছে, আর কেউ হলে মরেই যেত। কামারকে দেখে সে অনেক মিনতি করে বল্ল, "ভাই,

ঢের ত হয়েছে ; আমাকে মেরে ফেলে তোমার লাভ কি ? তার চেয়ে তোমাকে আরো তিন থলী মোহর দিচ্ছি, আরো সাত বছরের ছুটি দিচ্ছি, আমাকে ছেড়ে দাও।"

কামার ভাবল, 'মন্দ কি ? আর তিন থলী মোহর দিয়ে সাত বছর সুখে কাটান যাক্।' কাজেই সে সয়তানকে বল্ল, "আচ্ছা, তবে তাই হোক।"

তখন সয়তান কামারকে আবার তিন থলী মোহর দিয়ে, তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে গেল, কামারও সেই টাকা দিয়ে, আবার বেজায় ধূমধাম যুড়ে দিল। তারপর সে টাকা শেষ হতেও আর বেশী দেরী হল না, তখন আর হাতুড়ি পিটা ভিন্ন উপায় নাই। এমনি করে আবার সাত বছর কেটে গেল।

এবারে সয়তান কামারকে নিতে এসে দেখে, তার বাড়ীতে ভারী গোলমাল। কি কথা নিয়ে কামার তার গিন্নীর উপর বিষম চটেছে, আর তাকে ধরে ভয়ানক মারছে। কামারের গিন্নীও যেমন তেমন মেয়ে নয়, পাড়ার সকলে তার জ্বালায় অস্থির থাকে। কামারকেও সে ঝাঁটা দিয়ে কম নাকাল করছে না, কিন্তু কামারের হাতে কি না হাতুড়ি, কাজেই জিত হচ্ছে তারি। সয়তান এসে এ সব দেখে কামারকে ভয়ানক দুই থাপ্পড় লাগিয়ে বল্ল, "বেটা পাজি,—স্ত্রীকে ধরে মারিস ? চল্ আমার সঙ্গে চল !"

সয়তান ভেবেছিল, এতে কামারের স্ত্রী খুব খুসী হয়ে তার সাহায্য করবে। কিন্তু কামারের স্ত্রী তার কিছু না করে, 'বটেরে হতভাগা, তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা ! আমার স্বামীর গায় হাত তুলছিস !' বলে, সেই ঝাঁটা দিয়ে সয়তানের নাকে মুখে এমনি সপাংসপ মারতে লাগল যে বেচারার দমই ফেলা দায়। সে তাতে বেজায় থতমত খেয়ে একটা চেয়ারের উপরে বসে পড়ল,—সেই চেয়ার, যাতে একবার বসলে আর বিনা হুকুমে উঠবার যো নাই।

কামার দেখল যে সয়তান এবারে বেশ ভাল মতেই ধরা পড়েছে, হাজার টানা-টানিতেও উঠতে পারছে না। তখন সে তার চিমটেখানি আগুনে তাতিয়ে নিয়ে তা দিয়ে আচ্ছা করে তার নাকটা টিপে ধরল। তারপর তারা স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলে 'হেঁইয়ো' বলে সেই চিমটা ধরে টানতেই নাকটা রবারের মত লম্বা হতে লাগল। এক হাত, দু হাত, চার হাত, আট হাত—নাক যতই লম্বা হচ্ছে, সয়তান বেটা ততই ষাঁড়ের মত চ্যাঁচাচ্ছে। নাকটা যখন কুড়ি হাত লম্বা হল, তখন সয়তান আর থাকতে না পেরে নাকি সুরে বল্ল, "দোহাই দাদা ! আর টেনো না, মরে যাব।"

"কামার বল্ল, "আরো তিন থলী টাকা, আর সাত বছরের ছুটি,—দিবে কি না বল।" সয়তান ব্যস্ত হয়ে বল্ল, "এক্ষুণি, এক্ষুণি, এই নাও।" বলতে বলতেই তিন থলী ঝকঝকে মোহর এসে কামারের কাছে হাজির হল; কামার সেগুলো সিন্ধুকে তুলে সয়তানকে বল্ল, "আচ্ছা, তবে যাও।" সয়তান ছাড়া পেয়েই সেখান থেকে এমনি ছুট দিল যে ছুট যাকে বলে।

তখন কামার আর তার স্ত্রী মেঝেয় গড়াগড়ি দিয়ে হাসিটা যে হাসল! আর সাত বছরের জন্য তাদের কোন ভাবনা রইল না। সাত বছর যখন শেষ হল, তখন কামারের টাকাও ফুরিয়ে গেল, তাকে আবার তার ব্যবসা ধরতে হল, ততদিনে সয়তানও আবার তাকে নিবার জন্য এসে উপস্থিত হল।

ক্রমশঃ।

উদোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে।

এক সিপাহি কি যেন একটা অপরাধ করেছিল, তাতে তাকে পঞ্চাশ বেত মারার হুকুম হল। বিচারের সময় সে লোকটা উপস্থিত ছিল না, হুকুম হয়ে গেলে পর তাকে খুঁজে ধরে এনে বেত মারতে আরম্ভ করে দিল। তখন একটা মজার কথা এই হল যে, বেত খেয়ে কোথায় সে বেচারা চ্যাঁচাবে, না তার বদলে সে হেসেই অস্থির! বেত মারা শেষ হয়ে গেলে তাকে জিজ্ঞাসা করা হল "বেত খাওয়ার ভিতরে এমন মজার কথা কি ছিল যে তুই এত হাসলি?" সে তাতে আরো হো হো করে হেসে বল্ল, "হাসব না? তোমরা কি বোকা! কাকে বেত মারবার কথা হল, আর কাকে ধরে এনে মারলে; আমি সে লোক মোটেই নই! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হা-হা-হা !!"

রথের দিন বড্ড লোকের ভিড় হয়েছে। এক বুড়ী অনেক কষ্টে সেই ভিড়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেই সামনে আরেক বুড়ীকে দেখতে পেল, আর অমনি সে তার গলা জড়িয়ে ধরে 'ও দিদি, এত দিন কোথায় ছিলে গো!' বলে চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগল। ও বুড়ীও তখন তাকে বুকে চেপে নিয়ে 'আরে আমার বোন্ রে, তোকে যে আর দেখতে পাব তা ত ভাবিনি রে!' বলে খুব করে তার সঙ্গে কাঁদল। শেষে যখন আর তাদের কারুরই কান্না যোগাচ্ছে না, তখন দুজনে দুজনের মুখের দিকে

চেয়ে বল্ল, "ওমা! তাই ত! এ বুড়ী কেন আমার বোন হবে? আবাগী চলছিল ঠিক তারি মতন করে!"

আমার একটি বুড়া গুরুজন ছিলেন, তিনি কোন কারণে আমার উপর ভারী চটে যান। আমার কোন অপরাধ ছিল না, কিন্তু তিনি ঠিক করে রেখেছিলেন যে আমার দেখা পেলে একটা কিছু কাণ্ড কারখানা করবেন। এই সময়ে আমি অনেক দিন পরে বিদেশ থেকে বাড়ী ফিরে এসেছি, আর আমার ভাগ্যের জোরে একটি দারোগাবাবুও তার একটু আগেই আমাদের বাড়ী বেড়াতে এসেছেন। সেই দারোগাবাবুর চেহারাটি ছিল কতকটা আমারই মত, আর আমার সেই গুরুজনটির চোখও ছিল বেশ একটু ঝাপসা। তিনি সেই দারোগাবাবুকে দেখবামাত্রই রেগে আগুন হয়ে তাঁকে গাল দিতে লাগলেন। তেমন গাল দারোগাবাবু তাঁর জীবনে কখনো খাননি। পাঁচ ছ বছর ধরে যে বিষম বকুনি আমার জন্যে তৈরী হয়ে মজুত ছিল, তার সবই পড়ল সেই বেচারার উপরে। তারপর যখন আমার সঙ্গে দারোগাবাবুর দেখা হল, তখন তিনি হাসতে হাসতে বল্লেন, "মশায়, আজ আমি অনেক গাল থেকে আপনাকে বাঁচিয়ে দিয়েছি!" বাস্তবিকই আমার আর সে সব গাল খেতে হয় নি। আমার সেই গুরুজনটি তাঁর ভুল বুঝতে পেরে এমনি অপ্রস্তুত হলেন যে, আমাকে শাসন করার কথা তিনি একেবারেই ভুলে গেলেন।

আমি একটি মার কথা জানি, তিনি তাঁর খুকীর উপরে ভারী চটে তাকে মারবার জন্য খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। এমন সময় আরেক বাড়ীর একটি খুকী তাঁর সামনে পড়ল! সেই খুকীটিও তাঁরি খুকীর মত লম্বা চওড়া ছিল; তিনি তাকে সামনে পেয়েই তার চুলের মুঠি ধরে ঠাঁই ঠাঁই করে মারতে লাগলেন। তারপর যখন তাঁর হুঁস হল যে সে তাঁর খুকী নয়, তখন তাকে কোলে নিয়ে কি করে আদর দেখাবেন, খুঁজে পান না। আর একজন মার এক আত্মীয়ের বাড়ী থেকে একটা ভারী সুখের ঘটনার সংবাদ এসেছে, তিনি তাঁর খোকা খুকীদের নিয়ে তাই দেখতে যাবেন। তাড়াতাড়িতে তিনি খুকীর 'ফ্রক্'টি নিয়ে খোকাকে পরাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। খোকা বেচারা তাতে বিষম ব্যস্ত হয়ে যতই আপত্তি আর ছটফট করছে, মাও ততই তাকে চেপে ধরে ফ্রকের ভিতর ঢোকাচ্ছেন।

আর একটা ভারী মজার গল্প একখানা ইংরাজী পুস্তকে পড়েছিলাম। ঘটনাটা একটা বোর্ডিং স্কুলে হয়েছিল। আমেরিকার অসভ্যদের গল্প পড়ে ছেলেরা ভারী

আমোদ পায়। বিশেষতঃ, সেই অসভ্যেরা যে শত্রুর মাথার চামড়া শুদ্ধ তাদের চুল কেটে নেয়, সে কথা তাদের ভারী আশ্চর্য্য ঠেকে। এর মধ্যে একটি পাড়াগেঁয়ে ছেলে এসে তাদের স্কুলে ভর্ত্তি হয়েছে; অন্য ছেলেরা ঠিক করেছে, তাকে নিয়ে একটু মজা করবে। সেই ছেলেটি ৬নং ঘরে ঘুমোয়। একদিন রাত্রে পাঁচ ছ জন মিলে, অসভ্য সেজে তার ঘরে গিয়ে সেই অসভ্যদের মত করে তার চুল কেটে নিবার আয়োজন করে দেখা যাবে, সে কেমন চ্যাঁচায়।

সব ঠিক ঠাক। অসভ্যেরা সেজে তয়ের। তাদের হাতে রূপালি রং দেওয়া কাঠের 'ছোরা,' তাই দিয়ে চামড়া শুদ্ধ চুল 'কাটতে' হবে। এক বোতল লাল কালীও নেওয়া হয়েছে,—সেই কাঠের ছুরি মাথায় ঠেকিয়ে এই কালী ঢেলে দিলেই রক্তের মত দেখাবে।

তারপর ৬নং ঘর খুঁজে বার করা হল। খাটের উপর বেচারা ঘুমিয়ে আছে, কোন বিপদের কথা জানে না, এমন সময় সেই বিকট অসভ্যগুলো সেখানে ঢুকে, তার হাত পা চেপে ধরে, মাথার চার ধারে কাঠের ছোরা বুলিয়ে, লাল কালী ঢেলে দিয়েছে। সে বেচারা বিষম চমকে গিয়ে চোখ মিলেই যখন সেই সব অসভ্য আর কাঠের ছোরা আর সেই রক্তে বিছানা লাল দেখতে পেল, তখন আর তার জীবনের আশা কিছুমাত্র রইল না। সে অমনি প্রাণপণে চ্যাঁচাতে লাগল।

সেই চ্যাঁচানি শুনেই অসভ্যদের হাত থেকে ছোরা টোরা সব পড়ে গেল। তারা বুঝতে পারল যে এ সে ছেলে নয়, এ বুড়ো মানুষের গলা। তারা পাড়াগেঁয়ে ছেলে ভেবে তাদের হেড মাষ্টার মশায়ের এই দুর্দ্দশা করেছে!

তারপর কি হল, আর বলে কাজ নেই। হেড্‌মাষ্টার মশায়ের ঘরের নম্বর ছিল ৯ কিন্তু সেই নম্বরের কাগজখানা কেমন করে উল্‌টে গিয়ে ৯কে (9) দেখতে ঠিক ৬এর (6) মত দেখাচ্ছিল, তার ফলে তাঁকে এই তামাসা দেখতে হয়েছে।

গুপী গাইন।

সে দিনকার আগুনে দারোগা মশাই ত পুড়ে মারা গিয়েছিলেনই, তাঁর দলের অতি অল্প লোকই বেঁচে ছিল। সেই লোকগুলো গিয়ে রাজামশাইকে এই ঘটনার খবর দিতে তাঁর মনে বড়ই ভয় হল। পরদিন আরো দু চারজন লোক রাজসভায় এসে বল্ল যে, তারা সেই আগুনের তামাসা দেখতে সেখানে গিয়েছিল ; তারা তখন ভারী আশ্চর্য্য রকমের গান বাজনা শুনেছে, আর ভূত দুটোকে শূন্যে উড়ে পালাতে স্বচক্ষে দেখেছে। তখন যে রাজা মশায়ের কাঁপুনি ! সে দিন আর তাঁর সভা করা হল না।

তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতরে এসে ভূতের ভয়ে দরজা এঁটে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলেন, এক মাসের ভিতরে আর বাইরে এলেন না।

এদিকে গুপী আর বাঘা সেই আগুনের ভিতর থেকে পালিয়ে একেবারে তাদের বাড়ীর কাছের সেই বনে এসে উপস্থিত হয়েছে, যেখানে প্রথমে তাদের দেখা হয়েছিল। তাদের বড় ইচ্ছা যে এত ঘটনার পর একবার তাদের মা বাপকে দেখে যায়। বনে

এসেই বাঘা বল্ল, "গুপী দা, এইখানে না তোমায় আমায় দেখা হয়েছিল ?" গুপী বল্ল, "হাঁ।" বাঘা বল্ল, "তবে, এমন জায়গায় এসে কি একটু গান বাজনা না করে চলে যেতে আছে ?" গুপী বল্ল, "ঠিক বলেছ ভাই। তবে আর দেরী কেন ? এই বেলা আরম্ভ করে দাও।" এই বলে তারা প্রাণ খুলে গান বাজনা করতে লাগল।

এর মধ্যে এক আশ্চর্য্য ঘটনা হয়েছে। একদল ডাকাত হাল্লার রাজার ভাণ্ডার লুটে, তাঁর ছোট ছেলে দুটিকে সুদ্ধ চুরী করে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল, রাজা অনেক সৈন্য নিয়ে তাদের পিছু পিছু প্রাণপণে ছুটেও তাদের ধরতে পারছিলেন না। গুপী আর বাঘা যখন গান ধরেছে ঠিক সেই সময়ে সেই ডাকাতগুলোও সেই বনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে গান একবার শুনলে ত আর তার শেষ অবধি না শুনে চলে যাবার যো নাই ; কাজেই ডাকাতদের তখনি সেখানে দাঁড়াতে হল। সারা রাত্রের ভিতরে আর সে গান বাজনাও থামল না, ডাকাতদেরও সেখান থেকে যাওয়া ঘটল না। সকালে হাল্লার রাজা এসে অতি সহজেই তাদের ধরে ফেল্লেন। তারপর যখন তিনি জানলেন যে গুপী আর বাঘার গানের গুণেই তিনি ডাকাত ধরতে পেরেছেন তখন আর তাদের আদর দেখে কে ? রাজকুমারেরাও বল্লেন, "বাবা এমন আশ্চর্য্য গান আর কখ্খনো শোন নি ; এদের সঙ্গে নিয়ে চল।" কাজেই রাজা গুপী আর বাঘাকে বল্লেন, "তোমরা আমার সঙ্গে চল। তোমাদের পাঁচশ টাকা করে মাইনে হল।"

এ কথায় গুপী যোড় হাতে রাজামশাইকে নমস্কার করে বল্ল, "মহারাজ, দয়া করে আমাদের দুদিনের ছুটি দিতে আজ্ঞা হোক। আমরা আমাদের পিতা মাতাকে দেখে তাঁদের অনুমতি নিয়ে আপনার রাজধানীতে গিয়ে উপস্থিত হব।" রাজা বল্লেন, "আচ্ছা ; এ দুদিন আমরা এই বনেই বিশ্রাম করছি। তোমরা তোমাদের মা বাপকে দেখে দুদিন পরে এসে এইখানেই আমাদের পাবে।

গুপীকে তাড়িয়ে অবধি তার বাবা তার জন্য বড়ই দুঃখিত ছিল, কাজেই তাকে ফিরে আসতে দেখে তার বড় আনন্দ হল। কিন্তু বাঘা বেচারার ভাগ্যে সে সুখ মিলেনি। তার মা বাপ এর কয়েকদিন আগেই মারা গিয়েছিল। গ্রামের লোকেরা তাকে ঢোল মাথায় করে আসতে দেখেই বল্ল, "ঐ রে! সেই বাঘা বেটা আসছে, আবার আমাদের হাড় জ্বালিয়ে মারবে ; মার বেটাকে!" বাঘা বিনয় করে বল্ল, "আমি খালি আমার মা বাবাকে দেখতে এসেছি ; দুদিন থেকেই চলে যাব, বাজাব টাজাব না।" সে কথা কি তারা শোনে ? তারা দাঁত খিঁচিয়ে তার মা বাপের মৃত্যুর

কথা বলে, এই বড় বড় লাঠি নিয়ে তাকে মারতে এল, সে প্রাণপণে ছুটে পালাতে পালাতে ইট মেরে তার পা ভেঙ্গে মাথা ফাটিয়ে রক্তারক্তি করে দিল।

গুপী তাদের ঘরের দাওয়ায় বসে তার বাপের সঙ্গে কথা বলছিল এমন সময় সে দেখল যে বাঘা পাগলের মত হয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটে আসছে ; তার কাপড় ছিঁড়ে ফালি ফালি আর রক্তে লাল হয়ে গেছে। অমনি সে তাড়াতাড়ি বাঘার কাছে ছুটে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কি হয়েছে ? তোমার এ দশা কেন ?" গুপীকে দেখেই বাঘা একগাল হেসে ফেলেছে। তারপর সে হাঁপাতে হাঁপাতে বল্ল, "দাদা, বড্ড বেঁচে এসেছি ! মুর্খ গুলো আরেকটু হলেই আমার ঢোলকটি ভেঙ্গে দিয়েছিল !" গুপীদের বাড়ী এসে আর গুপীর যত্নে আর তার মা বাপের আদরে বাঘার দু দিন যতটা সম্ভব সুখেই কাটল। দুদিন পরে গুপী তার মা বাপের কাছ থেকে বিদায় নিবার সময় বলে গেল, "তোমরা তয়ের হয়ে থাকবে ; আমি আবার ছুটি পেলেই এসে তোমাদের নিয়ে যাব।"

তারপর কয়েক মাস চলে গিয়েছে। গুপী আর বাঘা এখন হাল্লার রাজার বাড়ীতে পরম সুখে বাস করে। দেশে বিদেশে তাদের নাম রটে গিয়েছে,—'এমন ওস্তাদ আর কখনো হয় নি, হবেও না !' রাজা মশাই তাদের ভারী ভালবাসেন ; তাদের গান না শুনে একদিনও থাকতে পারেন না। নিজের দুঃখ সুখের কথা সব গুপীর কাছে বলেন। এক দিন গুপী দেখল রাজা মশায়ের মুখখানি বড়ই মলিন। তিনি ক্রমাগতই যেন কি ভাবছেন, যেন তাঁর কোন বিপদ হয়েছে। শেষে একবার তিনি গুপীকে বল্লেন, "গুপী, বড় মুস্কিলে পড়েছি, কি হবে জানি না। শুণ্ডীর রাজা আমার রাজ্য কেড়ে নিতে আসছে।"

শুণ্ডীর রাজা হচ্ছেন সেই তিনি, যিনি গুপী আর বাঘাকে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলেন। তাঁর নাম শুনেই গুপীর মনে একটা চমৎকার মতলব এল। সে তখন রাজা মশাইকে বল্ল, "মহারাজ ! এর জন্য কোন চিন্তা করবেন না। আপনার এই চাকরকে হুকুম দিন, আমি এ থেকে হাসির কাণ্ড করে দিব।" রাজা হেসে বল্লেন, "গুপী, তুমি গাইয়ে বাজিয়ে মানুষ, যুদ্ধের ধারও ধার না, তার কিছু বোঝও না। শুণ্ডীর রাজার বড় ভারী ফৌজ, আমি কি তার কিছু করতে পারি ?" গুপী বল্ল, "মহারাজ, হুকুম পেলে একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি। ক্ষতি ত কিছু হবে না।" রাজা বল্লেন, "তোমার যা ইচ্ছা তাই তুমি করতে পার।" এ কথায় গুপী যারপরনাই খুসী হয়ে, বাঘাকে ডেকে পরামর্শ করতে লাগল। ক্রমশঃ

বরাহ শিকার।

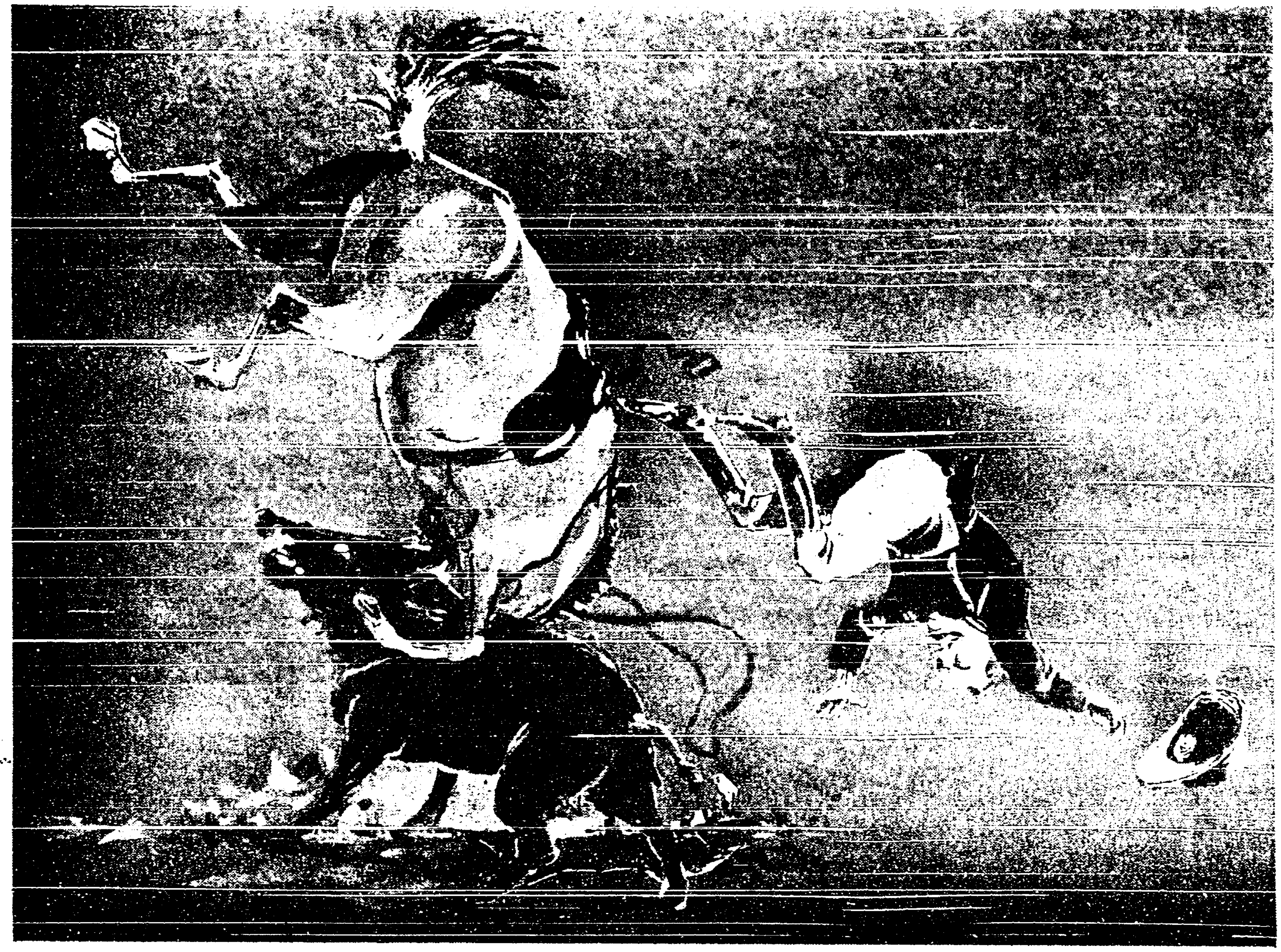

এক সাহেব গিয়েছিলেন বরাহ শিকার কর্‌তে। তার আগে তিনি কখনও বরাহ শিকার করেন নি। তাঁর ধারণা ছিল যে, একটা শূয়োর মারা এ আর এমন কি কঠিন! বনের মধ্যে ঢুকে তিনি এক শূয়োর দেখেই তাকে বল্লম নিয়ে তাড়া কর্‌লেন—ভাবলেন শূয়োর মাটিতে, আমি ঘোড়ার উপরে—ও আমার কি করবে?

সকলে বারণ কর্‌ল; তিনি তা না শুনে সোজা বরাহের উপর ঘোড়া হাঁকিয়ে দিলেন। তারপর চোখের পলকের মধ্যে যে কি হ'ল তা কেউই ঠিক বুঝ্‌তে পারল না। শূয়োরটা হঠাৎ "ঘঁৎ" ক'রে ঘোড়ার ঠ্যাঙের ভিতর দিয়ে এম্‌নি তেড়ে বেরুল যে ঘোড়াটা একেবারে ডিগ্‌বাজী খেয়ে উল্টে গেল—আর শিকারী মশাই ঠিক্‌রে যেখানে পড়্‌লেন আদঘণ্টা চোখ বুঁজে সেইখানেই শুয়ে রইলেন।

বাস্তবিক শূয়োরের মত বদ্‌মেজাজী জানোয়ার কমই আছে—আর তার সাহসও বড় কম নয়। বাঘের পাশে দাঁড়িয়ে জল খেতে আর কোন জানোয়ারই বোধ হয় সাহস পায় না।

একবার কতগুলো লোক শিকার কর্‌তে গিয়ে দেখে একটা বাঘ একটা নদীর ধারে জল খেতে এসেছে—আর তার কয়েক হাত দূরে একটা বরা জল খাচ্ছে। বাঘটা ভয়ানক রেগে শূয়োরটার দিকে চেয়ে গোঁ গোঁ শব্দ কর্‌তে লাগ্‌ল।

শূয়োর তাতে ভ্রুক্ষেপমাত্র না ক'রে জল খাওয়া শেষ ক'রে তারপর বাঘের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে "হূস্" ক'রে তাকে এক ধমক দিল। তারপর ঘাড় বাগিয়ে পিঠের লোম খাড়া ক'রে সে দাঁড়িয়ে রইল। এই রকম খানিক ক্ষণ মুখোমুখি থেকে বাঘটা এক লাফ দিয়ে একেবারে শূয়োরের পিঠে পড়্‌ল। দুই তিন থাবা মেরে শূয়োরের ঘাড় থেকে খাবল খাবল মাংস তুলে ফেল্ল। বাঘের চড় বড় সহজ চড় নয়! শূয়োর যে তাতে একটু কাবু হ'য়েছিল সেটা কিছু আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু এরই মধ্যে সেও বেশ দু চারটা গুঁতো মেরে বাঘের গায় দাঁত বসাতে ছাড়ে নি।

শূয়োরটা বারবার বাঘের হাত এড়িয়ে আবার ঘুরে তেড়ে আসে। কিন্তু শূয়োরের অস্ত্র খালি দাঁতের গুঁতো—বাঘের যেমন দাঁত তেমনি নখ তার উপর তার থাপ্পড়টিও আছে। সুতরাং খানিক ক্ষণ পর্য্যন্ত মনে হ'ল যেন বাঘেরই জিত। সে শূয়োরের ঘাড়ে পিঠে গলায় ঠ্যাঙে কাম্‌ড়ে আঁচড়ে একেবারে রক্তারক্তি কর্‌তে লাগ্‌ল। এর মধ্যে একবার শুয়োরটা এক দৌড়ে খানিকটা দূর গিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল—মনে হ'ল যেন তার আর দম নেই। কিন্তু বাঘটা যেই আবার লাফ দিয়ে তার ঘাড়ে পড়্‌তে গেল—শূয়োরটা চট্ করে নীচু হ'য়ে কি রকম একটা গাঝাড়া দিল তাতেই বাঘটা একেবারে ডিগ্‌বাজী খেয়ে চিৎ হ'য়ে পড়ে গেল।

আর যায় কোথা! শূয়োর এক লাফে তার উপর চ'ড়ে দাঁত দিয়ে তিন চার গুঁতোয় তার পেট ফুঁড়ে দিয়ে তারপর হয়রান হ'য়ে মাটিতে প'ড়ে রইল। এদিকে বাঘেরও আর উঠবার সাধ্যি নেই—দুজনেই মাটির উপর প'ড়ে হাঁপাচ্ছে।

তখন শিকারীরা গুলি মেরে তাদের শেষ ক'রে দিল।

বরাহ যখন খেপে বসে তখন তার কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না—আর সে যে কখন খেপে বসে তারও কোন ঠিকঠিকানা নেই। হয়ত শিকারীরা একটা শূয়োরকে তাড়া ক'রেছে—শূয়োরটা দৌড়ে পালাচ্ছে; হঠাৎ কেমন ক'রে একটা পাথরে

পা লেগে শূয়োরটা প'ড়ে গেছে—অম্নি আর কথাবার্ত্তা নেই! সাম্‌নে গাছ জঙ্গল যা থাকে সে তাতেই তেড়ে গুঁতিয়ে সব ভেঙে উপ্‌ড়িয়ে সাবাড় ক'রে দিল! ওদিকে শিকারীরা যে তাকে ধ'রে ফেল্‌ছে সে হুঁস তার নেই!

একজন বড় শিকারী বলেছেন যে শূয়োর যখন তেড়ে আসে তখন যদি তাকে এড়িয়ে চট্ ক'রে তার পিছনের পা ধ'রে তোলা যায় তবে নাকি সে আর কিছু কর্‌তে পারে না। কথাটা সত্যি কিনা জানি না—কিন্তু আমায় যদি শূয়োরে তাড়া করে আমি তার ঠ্যাং ট্যাং ধরতে যাচ্ছি না, একেবারে একদৌড়ে একটা গাছের উপরে চ'ড়ে বস্‌ব!

বোকা বুড়ী।

এক ছিল বুড়ো আর এক ছিল বুড়ী। তারা ভারি গরীব। আর বুড়ী বেজায় বোকা আর ভয়ানক বেশী কথা বলে—যেখানে সেখানে যারতার সঙ্গে গল্প জুড়ে দেয়—তার পেটে কোন কথা থাকে না।

বুড়ো একদিন তার জমী চষ্‌তে চষ্‌তে মাটির নীচে এক কলসী পেলে, সেই কলসী ভরা টাকা আর মোহর! তখন তার ভারি ভাবনা হ'ল—এ টাকা যদি ফেলে রাখি কোন দিন কে চুরি ক'রে নেবে। আর যদি টাকা বাড়ী নিয়ে যাই, বুড়ী টের পেয়ে যাবে—সে সকলের কাছে তার গল্প কর্‌বে; ক্রমে কথা রাষ্ট্র হ'য়ে পড়লে রাজার কোটাল এসে সব কেড়ে কুড়ে নিয়ে যাবে। ভেবে ভেবে সে এক ফন্দি আঁট্‌ল। সে ঠিক কর্‌ল যে বুড়ীকে সব কথা বল্‌বে কিন্তু এ রকম উপায় কর্‌বে যাতে বুড়ীর কথা কেউ না বিশ্বাস করে।

তখন সে একটা মাছ কিনে এনে তার ক্ষেতের ধারে একটা গাছের উপর বেঁধে রাখ্‌ল, আর একটা খরগোস এনে নদীর ধারে একটা গর্ত্তের মধ্যে জাল দিয়ে জড়িয়ে রাখ্‌ল। তারপর সে তার স্ত্রীকে গিয়ে বল্ল "একটা ভারি আশ্চর্য্য খবর শুনলাম—গাছের ডালে নাকি মাছ উড়ে বসে আর খরগোস নাকি জলে খেলা করে। আমাদের গণক ঠাকুর বলেন—

"মৎস্য বসেন গাছে
জলে খরগোস নাচে
গুপ্ত রতন খুঁজ্‌লে পাবে খুঁড়্‌লে তারি কাছে।"

বুড়ী বল্ল "তোমার যেমন কথা"! বুড়ো বল্ল "হাঁ! এরকম নাকি সত্যি সত্যি দেখা গেছে।" এই বলে বুড়ো আবার কাজে বেরুল।

আদঘণ্টা না যেতে যেতেই বুড়ো আবার ফিরে এসে ভারি ব্যস্ত হ'য়ে বুড়ীকে সেই টাকা পাওয়ার কথা বল্ল। তখন বুড়ো বুড়ী মিলে টাকা আন্‌তে চল্ল। পথে যেতে যেতে বুড়ো সেই গাছতলায় এসে বল্ল, "গাছের উপর চক্‌চক্ কর্‌ছে ওটা কি?" এই ব'লে সে একটা ঢিল ছুঁড়্‌তেই মাছটা প'ড়ে গেল। বুড়ী ত অবাক! 'তখন বুড়ো বল্ল, নদীতে জাল ফেলেছিলাম, মাছ টাছ পড়্‌ল কি না দেখে আসি।" জাল

টান্‌তেই—ওমা! খরগোস যে! তখন বুড়ো বল্ল, "কেমন! গনক ঠাকুরের কথা আর অবিশ্বাস কর্‌বে?" তারপর টাকা নিয়ে তারা বাড়ী এল।

টাকা পেয়েই বুড়ী বল্ল, "ঘর কর্‌ব, বাড়ী কর্‌ব, গহনা বানাব, পোষাক কিন্‌ব।" বুড়ো বল্ল, "ব্যস্ত হ'য়ো না—কিছুদিন র'য়ে স'য়ে দেখ—ক্রমে সবই হবে। হঠাৎ অত কাণ্ড কর্‌লে লোকে সন্দেহ কর্‌বে যে।" কিন্তু বুড়ীর তাতে মন উঠে না—সে একে বলে, ওকে বলে; শেষে একেবারে কোটালের কাছে নালিশ ক'রে দিল। কোটালের হুকুমে বুড়োকে হাতকড়া দিয়ে হাজির করা হ'ল।

বুড়ো সব কথা শুনে বল্ল, "সে কি হুজুর! আমার স্ত্রীর কি মাথার কিছু ঠিক আছে? সে ত ওরকম আবোল তাবোল কত কি বলে।" কোটাল তখন তেড়ে উঠ্‌লেন—"বটে! তুমি টাকা পেয়ে লুকিয়ে রেখেছ—আবার বুড়ীর নামে দোষ দিচ্ছ?" বুড়ো বল্ল, "কিসের টাকা? কবে পেলাম? কোথায় পেলাম? আমি ত কিছুই জানি না।"

বুড়ী বল্ল "না তুমি কিছুই জান না? সেই যেদিন গাছের ডালে মাছ ব'সেছিল নদীতে জাল ফেলে খরগোস ধরলে—সে দিনের কথা তোমার মনে নেই? কচি খোকা আর কি!"

তাই শুনে সবাই হাস্‌তে লাগ্‌ল; কোটাল এক ধমক দিয়ে বুড়ীকে বল্‌ল—"যা পাগ্‌লী, বাড়ী যা! ফের যদি এসব যা' তা' বলবি তোকে আমি কয়েদ ক'রে রাখ্‌ব"।

বুড়ী তখন বাড়ী ফিরে গেল। কোটালের ভয়ে সে আর কারু কাছে টাকার কথা বল্‌ত না।

ভয়ানক নেমন্তন!

মাগো

কাল আমি খেয়েছি শোন, কি ভয়ঙ্কর নেমন্তন—
জলে থাকে একটা জন্তু দেখ্‌তে সে ভয়ানক কিন্তু!
লম্বা লম্বা দাড়ি রাখে, লাঠির আগায় চোখ থাকে;
তার যে কতগুলো পা ঢের লোকে তা জানেই না;
দুটো পা যে ছিল তার—বাপ্‌রে সেকি বল্‌ব আর!
চিম্‌টি কাট্‌ত তা দিয়ে যদি ছিঁড়ে নিত নাক অবধি!
তার মাথাটা কচ্‌কচিয়ে খেয়েছিলাম মুলো দিয়ে!—
আর একটা সে কিসের ছা নাইক মাথা নাইক পা!
কিন্তু তার মাকে জানি তার আছে পা দুখানি!—
আরেকটা সে কি যে ছিল খেতে খেতে পালিয়ে গেল!

বাবা।

(শেষ পৃষ্ঠা দেখ)

কামানের কথা।

যুদ্ধের সংবাদ নিতে গেলে নানা রকম কামানের কথা শোনা যায়—যেমন, ফীল্ড্ গান্, মেশিন গান্, হাউইট্জার ইত্যাদি। পরপৃষ্ঠার ছবিতে এই সকলের কিছু পরিচয় দেওয়া হ'য়েছে। নানা রকম কাজের জন্য নানা রকম কামান। কোনটা সরু লম্বা কোনটা বেঁটে মোটা—কোনটা গোলা মারে সাম্‌নের দিকে—কোনটা গোলা ছুঁড়ে দেয় আকাশের দিকে—কেউ মারে ছোট ছোট বন্দুকের গুলি কেউ মারে ৩০ মণ গোলা—কারুর দৌড় আদ মাইল সিকি মাইল, কারু বা ২০ মাইল ২৫ মাইল!

মেশিন গান্ (কলের বন্দুক) বা 'লাখমারী' কামান নানা রকমের। Maxim, Miltrailleuse এ সবই মেশিন গান্। তেপায়ার উপর, সাইকেলের উপর, এরোপ্লেনের উপর নানা জায়গায় নানান্ কায়দায় এই সব কামান বসান হয়। বন্দুকের গুলির মত গুলি ফিতের গায়ে বসান থাকে; কল চালাতেই সেই ফিতে কামানের মধ্যে হুড়্ হুড়্ ক'রে ঢুক্‌তে থাকে—আর মিনিটে ২০০।৩০০ গুলি ছুটে বের হয়।

জাহাজী কামান, কেল্লার কামান, 'ফীল্ড্ গান্' এসব অনেকটা এক জাতীয়। জাহাজী কামানগুলো খুব ভারি আর মস্ত লম্বা হয়। তাকে চাকার উপর বসিয়ে টানাটানি করা যায় না—তার বসাবার কায়দা আর গাঁথুনি খুব মজ্‌বুৎ হওয়া চাই, তা না হ'লে গোলা ছোঁড়বার ধাক্কায় কামান টামান সব উল্টে যেতে পারে। জাহাজী কামানের গোলা ভয়ানক জোরে চলে—তার মধ্যে বোমার মশলা ভরা থাকে। গোলা যেখানে লাগে সেখানে সে পাথর লোহা সব ফুটো ক'রে ঢুকে পড়ে, তার পরে সে যখন আপনি ফেটে যায় তখন সেই ফাটার চোটে পাহাড়ের চূড়ো পর্য্যন্ত উড়ে যায়।

কেল্লার কামানের ছবিতে দেখ, কামানটাকে একটা লোহার ঘরের মধ্যে বন্ধ করা হ'য়েছে—ঘর শুদ্ধ কামানটাকে যে দিকে ইচ্ছা ঘোরান যায়। কামানের নলের মুখ যত চওড়া তার গোলাও তত বড় হয়। যে কামান যুদ্ধক্ষেত্রে সহজে টেনে নেওয়া যায় তাকে বলে ফীল্ড্‌গান। ফীল্ড্‌গানের মুখ সাধারণতঃ ৩ ইঞ্চি চওড়া থাকে, কেল্লার কামানগুলো ৮।১০ ইঞ্চি, আর খুব বড় জাহাজী কামানের মুখ ১৫ ইঞ্চি।

এরোপ্লেন মারবার কামানগুলোতে যে গোলা থাকে তাকে বলে "শ্রাপ্‌নেল"। একেকটা গোলার মধ্যে অনেকগুলো ছোট ছোট গুলি ভরা থাকে। গোলাটা

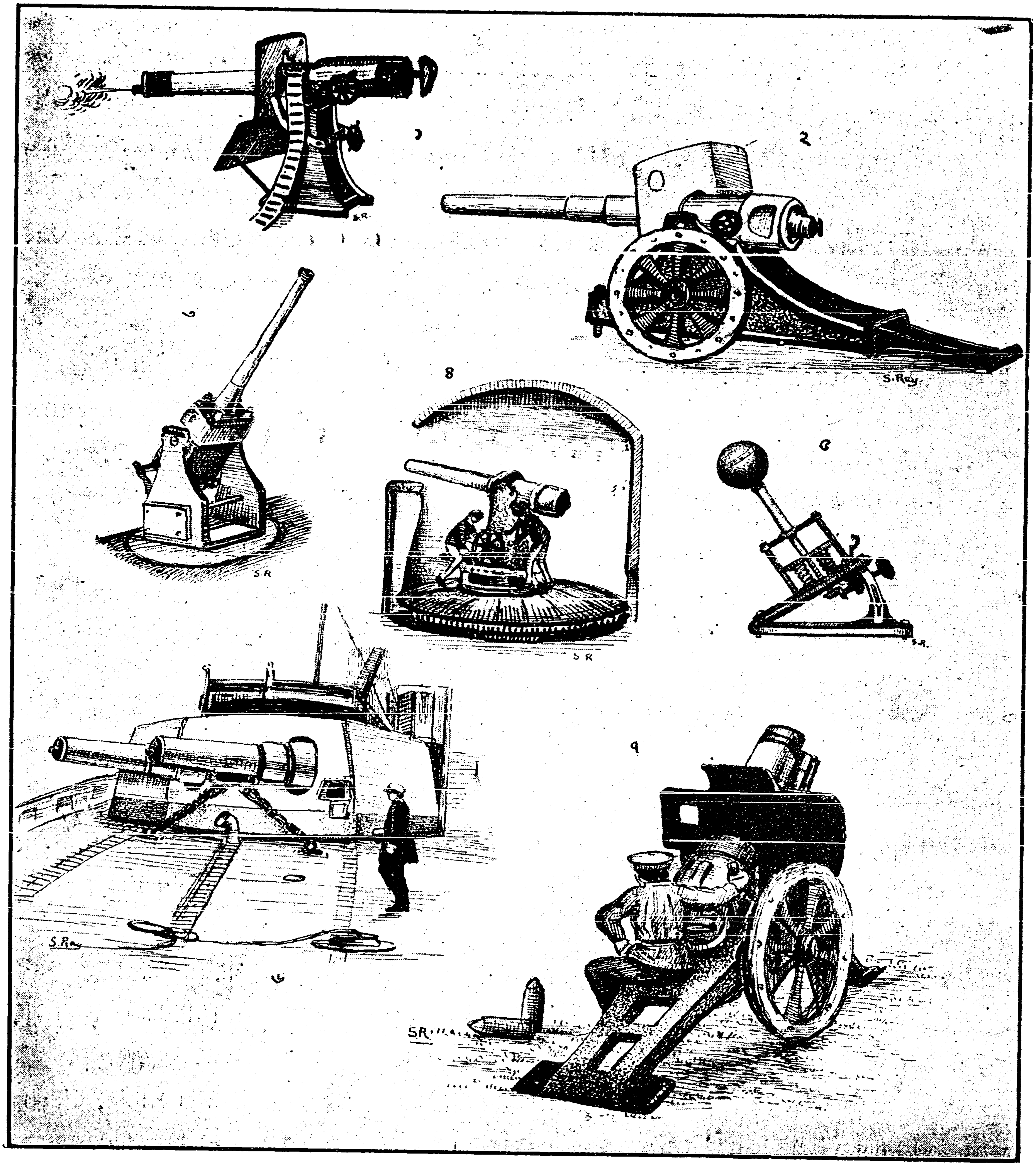

১। লাথমারী বন্দুক ; ২। 'ফীল্ড্গান' ; ৩। এরোপ্লেন মারবার কামান ; ৪। লোহার ঘরে কেল্লার কামান ; ৫। 'স্প্রিং'ওয়ালা খাদের কামান ; ৬। জাহাজী কামান ; ৭। হাউই কামান ও তার 'গোলা'।

শূন্যেই ফেটে গিয়ে অনেকটা জায়গা জুড়ে গুলি ছিটিয়ে দেয়। ফীল্ড্‌গানেও শ্রাপনেল্ খুব ব্যবহার হয়।

'হাউইট্‌জার' বা 'হাউই' কামানগুলো বেঁটে মোটাগোছের থাকে—আকাশের দিকে মুখ ক'রে বড় বড় গোলা খুব উঁচু ক'রে ছুঁড়ে দেয়—তাতে গোলা সহজেই অনেক দূর যায়; কিন্তু জাহাজী কামানের মত অত জোরে যায় না। বড় বড় কেল্লা ভাঙ্‌তে হ'লে কিম্বা পাহাড় ঢিপি টপ্‌কিয়ে গোলা মারতে হ'লে হাউই কামানে খুব কাজ দেয়। খুব বড় হাউই কামানের মুখ প্রায় ২১ ইঞ্চি চওড়া হয়—তাতে ৩০ মণ ওজনের গোলা ২৫ মাইল দূরে ছুঁড়তে পারে।

আজ কাল অনেক সময়েই সৈন্যেরা মাটিতে খাদ খুঁড়ে তার মধ্যে থেকে লড়াই করে। যখন দুই পক্ষের খাদ খুব কাছাকাছি আসে তখন এক রকম 'স্প্রিং'এর কামান দিয়ে এক খাদ থেকে অন্য খাদে বড় বড় গোলা ফেলা যায়।

কামানে যে গোলা ছোঁড়ে—সে গোলা কোথা থেকে কতটা উঁচুমুখে কি রকম ভাবে ছুঁড়্‌লে কোথায় পড়্‌বে তার খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম হিসাব দরকার হয়। অনেক সময়েই শত্রুকে দেখা যায় না—ম্যাপ দেখে তার চালচলন আন্দাজ করে গোলা মার্‌তে হয়।

গল্পস্বল্প।

বলি বামনকে দান করতে গেল, শুক্র তাকে নিষেধ করলেন। এই ঘটনার সম্বন্ধে একটা হাসির গল্প আছে। বলি শুক্রের কথা না শুনে, দান করবার জন্য গাড়ুতে করে জল নিল, তা দেখে শুক্র তাড়াতাড়ি গাড়ুর নলের ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন, ভাবলেন, জল বেরুতে দিবেন না, তাহলে দানও করা হবে না।

সবাই বলছে, "কি হল ? কি হল ? হঠাৎ জল কেন পড়ছে না ?" তাতে একজন বল্ল, "গাড়ুর নলে কিছু ঢুকেছে, তাতেই জল আটকে গেছে, কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে পরিস্কার করে দাও।"

কাঠি দিয়ে খোঁচা দিতেই সেই খোঁচা গিয়ে লাগল শুক্র ঠাকুরের চোখে; তখন কাজেই তাঁকে ভয়ানক চটে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বেরিয়ে আসতে হল। যে খুঁচিয়েছিল, তাকে অবশ্য তিনি খুবই বকলেন, কিন্তু তাঁর চোখ আর ভাল হল না। সেই অবধি শুক্রাচার্য্যের এক চোখ কানা।

কার্ত্তবীর্য্যের পুত্রেরা যে জমদগ্নি মুনিকে হত্যা করেছিল, একথা অগ্নিপুরাণে আছে, ভাগবতেও আছে। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে দেখা যায় যে কার্ত্তবীর্য্যের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করে, জমদগ্নি তাঁর হাতেই মারা যান।

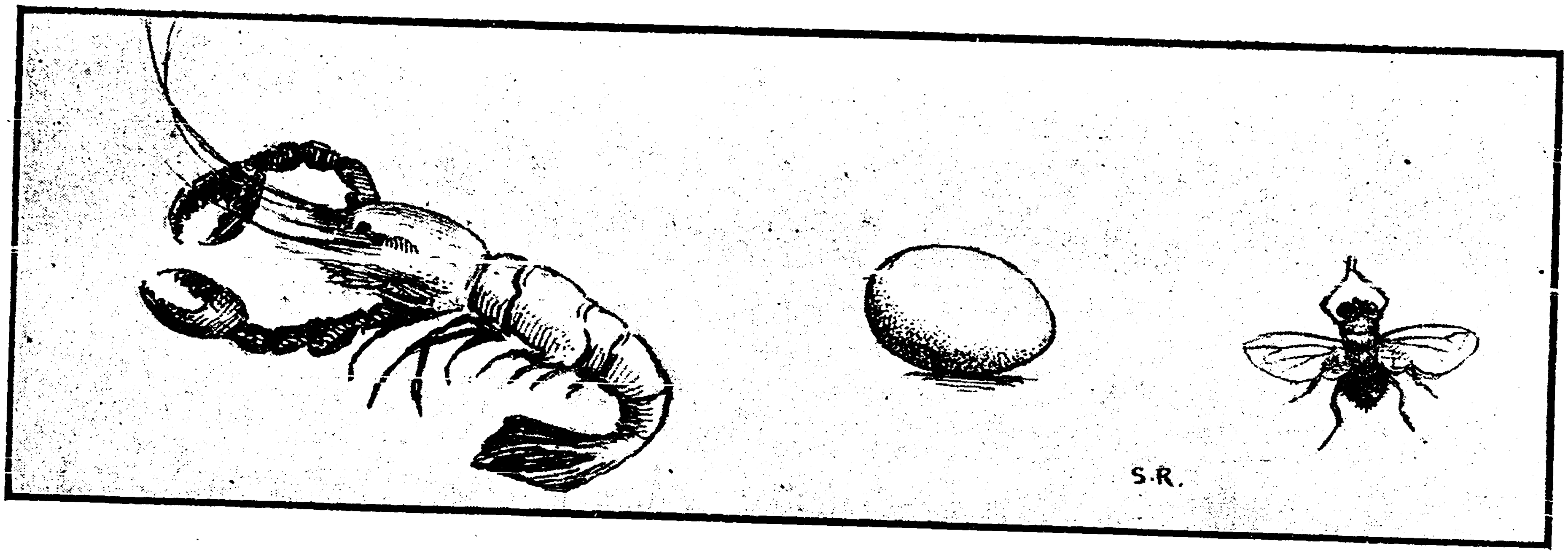

ভয়ানক নেমন্তন! (১২৪ পৃষ্ঠা)

গত মাসের ধাঁধার উত্তর।

১। কপাল ২। আয়না

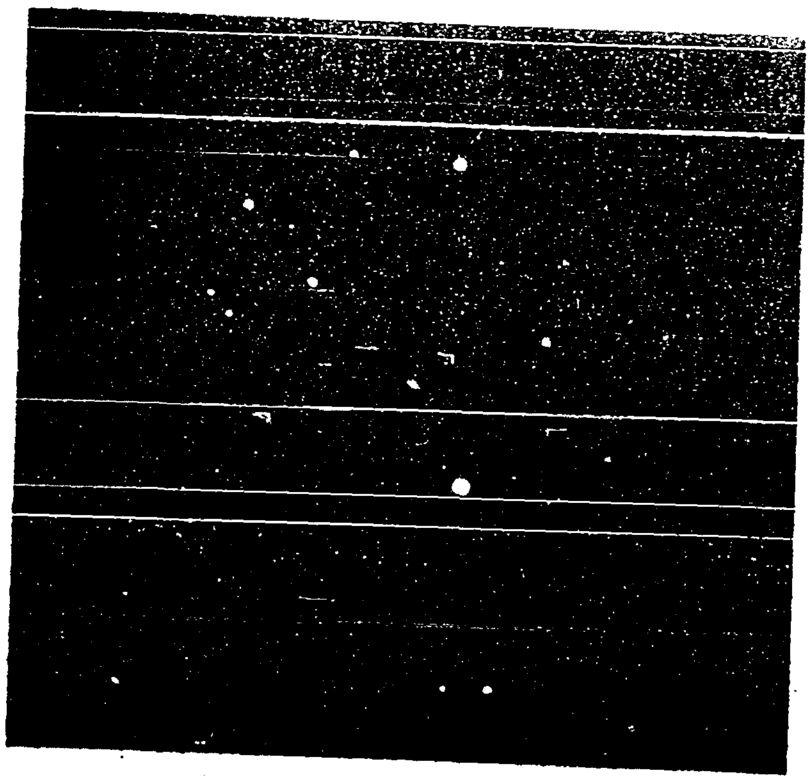

এই ছবিটা গতবারে কাৎ ক'রে ছাপা হ'য়েছিল। এই ভাবে বসালে তবে শুধু চোখে আর দূরবীণে দেখার তফাৎটা ঠিক বোঝা যায়। বড় ছবিটা যদি আরো বড় দূরবীণে তোলা হ'ত, তাহ'লে আরো অনেক তারা দেখা যেত।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

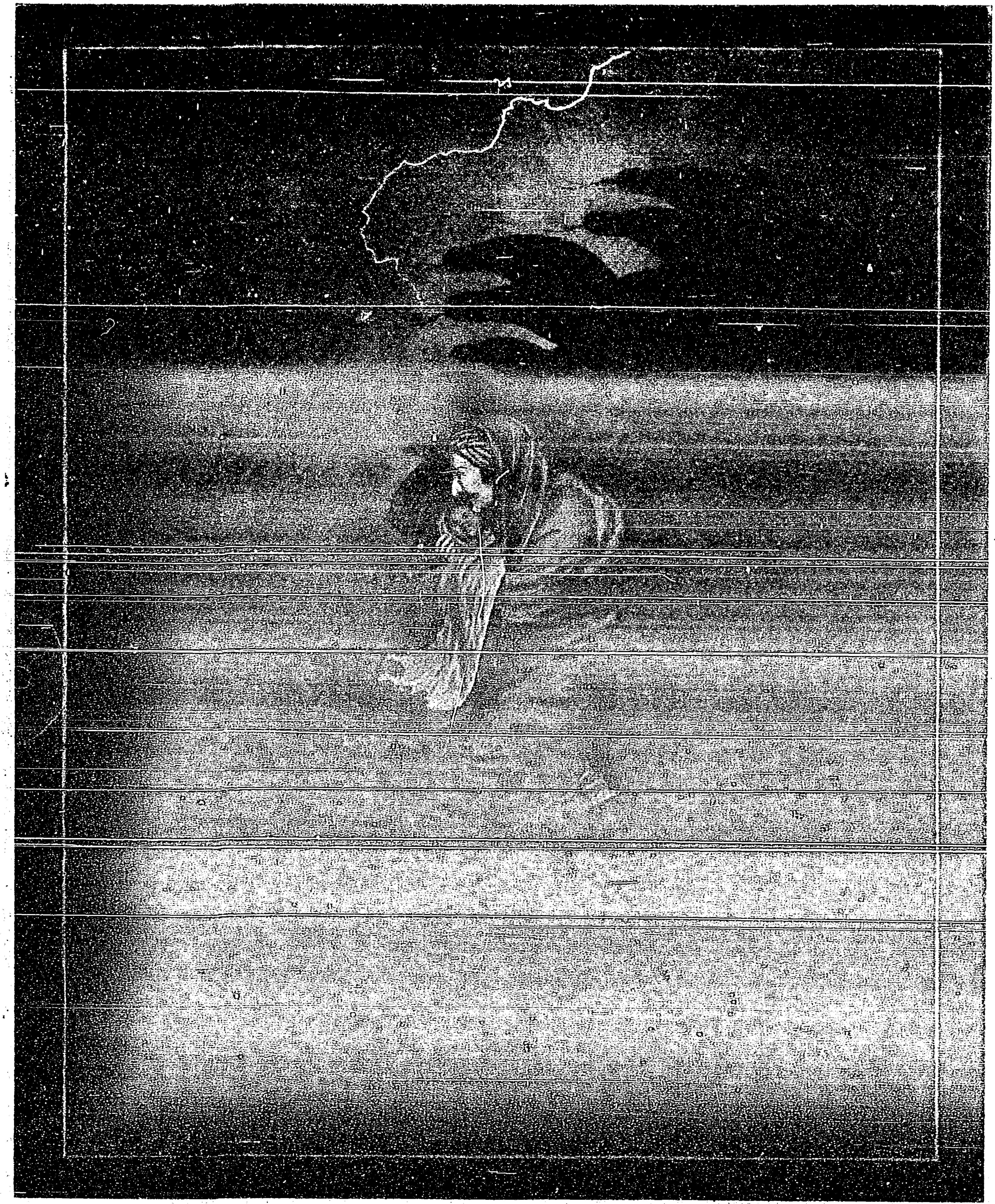

বসুদেব কৃষ্ণকে লইয়া যমুনা পার হইতেছেন।

U. RAY & SONS.

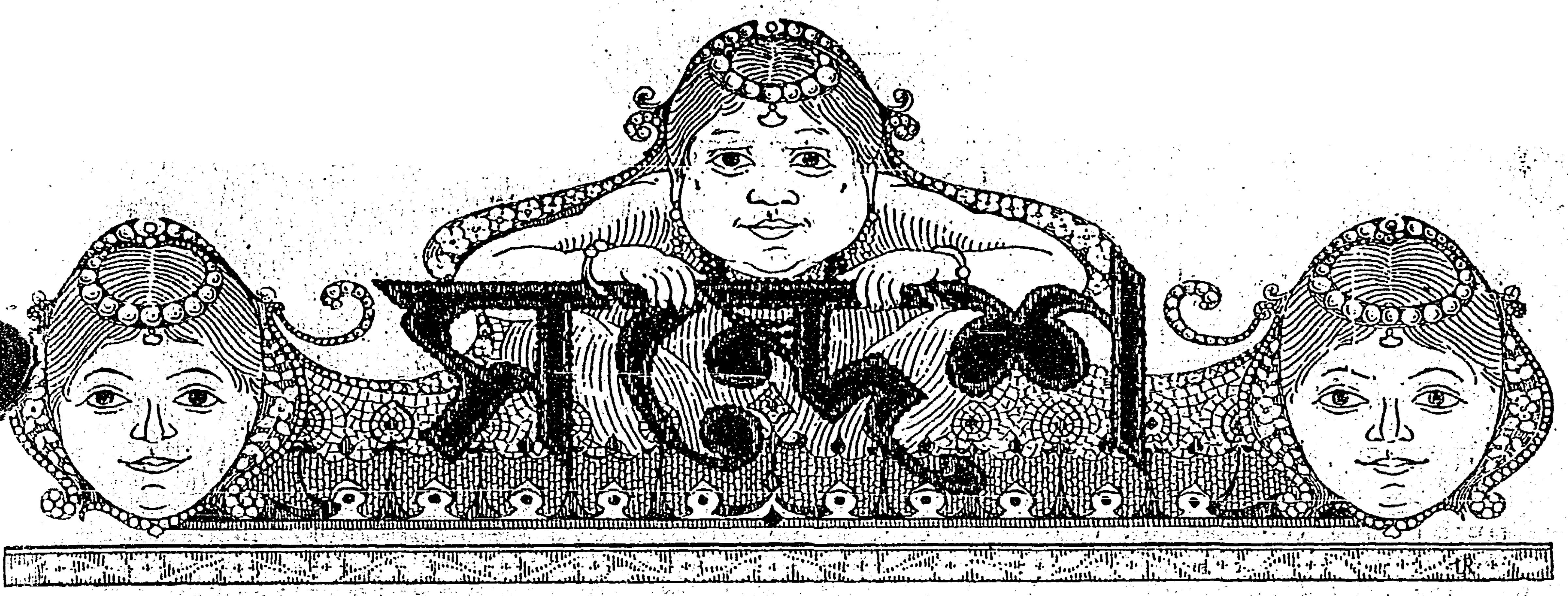

তৃতীয় বর্ষ   ভাদ্র, ১৩২২   পঞ্চম সংখ্যা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

সাঁঝের আকাশ।

সাঁঝের বাতি উঠ্‌ল জ্বলে
ডুব্‌ল সোনার রবি।
আকাশ বুড়ী আপন হাতে
সাজায় গগন ছবি।
সিঁদুর যখন ফুরিয়ে এল
পড়্‌ল বুড়ী স’রে।
অযুত তারা উঠ্‌ল ফুটে,
একটি একটি ক’রে।
উজল হাসি হাস্‌ল শশী
ভাস্‌ল ধরাতল।
পাতায় পাতায় জোছনা খেলে
সোনার শতদল।

শ্রীমতী শৈলসরসী দেবী।

বিষ্ণুর অবতার।

মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম,—বিষ্ণুর এই ছয়টি অবতারের কথা বলা হইয়াছে। ইহার পর রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, কল্কী, এই চারি অবতারের কথা বলিতে বাকি আছে। শেষ অবতার কল্কী এখনো জন্মগ্রহণ করেন নাই, সুতরাং তাঁহার কথা এখন না বলিলেও বিশেষ ক্ষতি দেখা যায় না। পুরাণে লেখা আছে যে তিনি শম্ভল গ্রামে বিষ্ণুযশার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবেন।

বিষ্ণুর যে ঠিক কয়টি অবতার হইয়াছিল, সে কথাও যে আমি একেবারে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি তাহা নহে। দশটি অবতারের কথা আমরা সচরাচর শুনিতে পাই ; কিন্তু কোন কোন পুরাণে দেখা যায় যে তাঁহার অনেক হাজার অবতার হইয়াছে, আরো অনেক হইবে। বুদ্ধ যে বিষ্ণুর অবতার, এ কথা সকলে বলেন না ; অনেকের মতে আবার চৈতন্যও বিষ্ণুর অবতার।

যাহা হউক, রাম আর কৃষ্ণ যে বিষ্ণুর অবতার, এ বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। ইহার মধ্যে রামের কথা হয় ত তোমরা সকলেই রামায়ণে পড়িয়াছ, সুতরাং তাঁহার কথাও বেশী করিয়া বলার প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণের নামও তোমরা সকলেই শুনিয়াছ বটে, কিন্তু তাঁহার জীবনের সকল ঘটনা অনেকের জানা না থাকিতে পারে। বিশেষতঃ কৃষ্ণের বাল্যকালের বিবরণ অতি আশ্চর্য্য, তাহা শুনিলে তোমরা খুবই আমোদ পাইবে।

কৃষ্ণ বসুদেবের পুত্র, তাঁহার মাতার নাম দেবকী। সে সময়ে মথুরানগরে কংস নামে এক অতি দুষ্ট রাজা ছিল। বসুদেবের বিবাহের সময় কংসের নিকট এইরূপ দৈববাণী হয় যে, "দেবকীর অষ্টম পুত্র তোমাকে বধ করিবে।" এ কথা শুনিয়া কংস দেবকীকে কাটিতে গেলে বসুদেব তাহাকে বিনয় করিয়া বলিলেন, "আপনি দেবকীকে বধ করিবেন না, ইহার সন্তানগুলিকে আমি আপনার হাতে সমর্পণ করিব।" এ কথায় কংস দেবকীকে বধ করিল না বটে, কিন্তু বসুদেবকে শুদ্ধ তাঁহাকে গোপনে একটা ঘরের মধ্যে কয়েদ করিয়া রাখিল।

তারপর একটি একটি করিয়া দেবকীর পুত্র হয়, আর বসুদেব নিজের কথা মত অমনি তাহাকে কংসের নিকট দিয়া আসেন। ক্রমে ছয়টি সন্তান এই ভাবে মারা গেল। সপ্তম সন্তানটি জন্মিবার পূর্ব্বেই বিষ্ণুর কথায় যোগনিদ্রা (দুর্গা) দেবী তাহাকে

দেবকীর নিকট হইতে লইয়া গিয়াছিলেন। বসুদেবের রোহিণী নামে আর এক স্ত্রী ছিলেন। যোগনিদ্রার কৌশলে দেবকীর সেই সপ্তম সন্তানটি রোহিণীর সন্তান হইয়া জন্মগ্রহণ করিল; লোকে বুঝিল যে দেবকীর এই সন্তান জন্মিবার পূর্ব্বেই মারা গিয়াছে। এই সন্তানটিই বলরাম।

দেবকীর অষ্টম সন্তানটিই কৃষ্ণ। সেটি যখন জন্মগ্রহণ করে, ঠিক সেই সময়ে গোকুলে গোপগণের রাজা নন্দেরও একটি কন্যা হয়। বসুদেব তাঁহার শেষ সন্তানটিকে আর কংসের হাতে দেন নাই, সেটি জন্মিবামাত্র তিনি তাহাকে লইয়া গোকুলে চলিয়া গেলেন। দেবী যোগনিদ্রা তখন মথুরার দ্বারপালদিগকে এমনি মায়ায় ভুলাইয়া রাখিয়াছিলেন যে, বসুদেব যাইবার সময় তাহারা কিছুই টের পাইল না।

সে দিনকার রাত্রি বড়ই ভয়ঙ্কর ছিল। আকাশ ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন, শ্রাবণের বৃষ্টি-ধারা ভীষণ গর্জ্জনে চারিদিক ভাসাইয়া দিতেছে, ঝড়ের হাওয়ায় যমুনার গভীর জল তোলপাড় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সেই অতল জলে বসুদেবের হাঁটু অবধিও ডুবিল না, তিনি অনায়াসে হাঁটিয়া যমুনা পার হইলেন। এদিকে অনন্ত নাগ তাঁহার বিশাল ফণা বিস্তার করিয়া বসুদেবকে ঢাকিয়া রাখায় বৃষ্টির জলও বিন্দুমাত্র তাঁহার গায় পড়িতে পারিল না।

গোকুলে সে দিন গোপেরা উপস্থিত ছিল না, তাহারা কংসকে কর দিতে গিয়াছিল। ইহার মধ্যে নন্দের স্ত্রী যশোদার একটি কন্যা জন্মিল, কিন্তু তখন তিনি যোগনিদ্রার মায়ায় ঘুমে অচেতন থাকায় কিছুই টের পাইলেন না। এই অবসরে বসুদেব আসিয়া কৃষ্ণকে যশোদার পাশে রাখিয়া, যশোদার কন্যাটিকে লইয়া চলিয়া গেলেন। তারপর যশোদা জাগিয়া যখন দেখিলেন যে তাঁহার পাশে নীলপদ্মের ন্যায় শ্যামবর্ণ পরম সুন্দর একটি খোকা শুইয়া আছে, তখন তিনি তাহাকে তাঁহার নিজেরই পুত্র মনে করিয়া যারপর নাই আনন্দিত হইলেন।

এদিকে বসুদেব সেই কন্যাটিকে আনিয়া দেবকীর নিকট দেওয়া মাত্র, তাহার শব্দে কংসের প্রহরীদিগের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাহারা তখন কংসকে সংবাদ দিতে আর কংসও তাহা শুনিয়া দেবকীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইতে তিল মাত্র বিলম্ব করিল না। দেবকী সেই কন্যাটিকে ছাড়িয়া দিবার জন্য কংশের নিকট কত মিনতি করিলেন, কিন্তু দুরাত্মা তাঁহার কোন কথায় কান না দিয়া বিষম রোষভরে শিশুটিকে পাথরে আছড়াইয়া ফেলিল।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সে মেয়েটি পাথরে না পড়িয়া শূন্যেই রহিয়া গেল। সে ত আর যে সে মেয়ে ছিল না, সে ছিল স্বয়ং যোগনিদ্রা। তিনি তখন নিজের অপরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া হাসিতে হাসিতে কংসকে বলিলেন, "মূর্খ! আমাকে আছড়াইলে কি হইবে? তোমাকে যিনি মারিবেন, তিনি জন্মিয়াছেন; এখন বাঁচিবার পথ দেখ।" এই বলিয়া দেবী আকাশে মিলাইয়া গেলেন, কংস হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। তখন সে ভাবিল যে, "আমি বৃথাই দেবকীর এতগুলি সন্তানকে নষ্ট করিলাম। এখন দেখিতেছি, আমাকে মারিবার জন্য আর কোথাও যেন একটা বালক জন্মিয়াছে।" এই ভাবিয়া সে বসুদেব আর দেবকীকে কারাগার হইতে ছাড়িয়া দিল, আর নিজের লোকদিগকে ডাকিয়া বলিল যে, "তোমরা বিশেষ করিয়া দেখ, কোথায় কাহার ছেলে হইয়াছে। এই সকল ছেলের মধ্যে যাহাকে খুব ষণ্ডা দেখিবে, তাহাকেই বধ করিতে হইবে।"

সেই ষণ্ডা খোকাটি যে কে, তাহাও জানিতে কংসের অধিক বিলম্ব হইল না। তখন হইতেই তাহাকে বধ করিবার জন্য দুষ্ট বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

গুপী গাইন।

গুপী আর বাঘা সে দিন অনেকক্ষণ ধরে পরামর্শ করেছিল। বাঘার তখন কতই উৎসাহ। সে বল্‌ল, "দাদা, এবারে আমরা দুজনে মিলে একটা কিছু করবই করব। আমার শুধু এক কথায় একটু ভয় হচ্ছে; হঠাৎ যদি প্রাণ নিয়ে পালাবার দরকার হয়, তবে হয় ত আমি জুতার কথা ভুলে গিয়ে সাধারণ লোকের মত কসে ছুট দিতে যাব, আর মার খেয়ে সারা হব। এমনি করে দেখনা সেবারে আমাদের গাঁয়ের মূর্খগুলোর হাতে আমার কি দশা হল!"

যা হোক, গুপীর কথায় বাঘার সে ভয় কেটে গেল, আর পরদিন থেকেই তারা কাজে লাগল। দিন কতক ধরে রোজ রাত্রে তারা শুণ্ডী চলে যায়, আর রাজ বাড়ীর আশ পাশে ঘুরে সেখানকার খবর নেয়। যুদ্ধের আয়োজন যা দেখতে পেল সে বড়ই ভয়ঙ্কর; এ আয়োজন নিয়ে এরা হাল্লায় গিয়ে উপস্থিত হলে আর রক্ষা নাই। রাজার ঠাকুর বাড়ীতে রোজ মহা ধূমধামে পূজা হচ্ছে। দশ দিন এমনিতর পূজা দিয়ে, ঠাকুরকে খুসী করে তারা হাল্লায় রওয়ানা হবে।

গুপী আর বাঘা এর সবই দেখল। তারপর একদিন তাদের ঘরে বসে, দরজা এঁটে, সেই ভূতের দেওয়া থলিটিকে বল্ল, "নূতন ধরণের মিঠাই চাই, খুব সরেশ।" সে কথায় থলির ভিতর থেকে মিঠাই যে বেরুল, সে আর বলবার নয়। তেমন মিঠাই কেউ খায় নি, চোখেও দেখে নি। সেই মিঠাই নিয়ে বাঘা আর গুপী শুণ্ডীর রাজার ঠাকুর বাড়ীর বিশাল মন্দিরের চূড়ায় গিয়ে বস্‌ল। নীচে খুব পূজার ধূম,—ধূপ, ধুনা, সঙ্খ ঘণ্টা কোলাহলের সীমা নাই, আঙ্গিনায় লোকে লোকারণ্য। সেই সব লোকের মাথার উপরে ঝড়াৎ করে মিঠাইগুলো ঢেলে দিয়ে, বাঘা আর গুপী মন্দিরের চূড়া আঁকড়ে বসে তামাসা দেখতে লাগল। অন্ধকারের মধ্যে সেই ধূপ ধূনা আর আলোর ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে কেউ তাদের দেখতে পেল না।

মিঠাইগুলো আঙ্গিনায় পড়তেই অমনি কোলাহল থেমে গেল। অনেকেই লাফিয়ে উঠল, কেউ কেউ চেঁচিয়ে ছুটও দিল। তারপর দু চার জন সাহসী লোক কয়েকটা মিঠাই তুলে, আলোর কাছে নিয়ে ভয়ে ভয়ে দেখতে লাগল। শেষে তাদের একজন চোখ বুঁজে তার একটু মুখে পূরে দিল। দিয়েই আর কথাবার্ত্তা নাই; সে দু হাতে আঙ্গিনা থেকে মিঠাই তুলে খালি মুখে দিচ্ছে আর নাচছে আর আহ্লাদে চ্যাঁচাচ্ছে। তখন সেই আঙ্গিনা শুদ্ধ লোক মিঠাই খাবার জন্য পাগলের মত কাড়াকাড়ি আর কিচিরমিচির করতে লাগল।

এদিকে কয়েক জন ছুটে গিয়ে রাজামশাইকে বলেছে যে, "মহারাজ! ঠাকুর আজ পূজায় তুষ্ট হয়ে স্বর্গে থেকে প্রসাদ পাঠিয়ে দিয়েছেন। সে যে কি অপূর্ব্ব প্রসাদ, সে কথা আমরা বলতেই পারছি না।" সে কথা শুনবা মাত্রই রাজামশাই প্রাণপণে কাছা গুঁজতে গুঁজতে ঊর্দ্ধশ্বাসে এসে ঠাকুর বাড়ীতে উপস্থিত হলেন।

কিন্তু হায়! ততক্ষণে সব প্রসাদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত উঠান ঝাঁট দিয়েও রাজামশাইয়ের জন্য একটু প্রসাদের গুঁড়ো পাওয়া গেল না। তখন তিনি ভারী চটে গিয়ে বল্লেন, "তোমাদের কি অন্যায়! পূজা করি আমি, আর প্রসাদ খেয়ে শেষ কর তোমরা! আমার জন্যে একটু গুঁড়োও রাখ না! তোমাদের সকলকে ধরে শূলে চড়াব!" একথায় সকলে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে যোড়হাতে বল্ল, "দোহাই মহারাজ! আপনার প্রসাদ কি আমরা খেয়ে শেষ করতে পারি? বাপরে! আমরা খেতে না খেতেই ঝাঁ করে কোন্‌খান দিয়ে

ফুরিয়ে গেল! আজ আমাদের প্রসাদগুলো আপনি মাপ করুন; কালকের যত প্রসাদ, সব মহারাজ একাই খাবেন!" রাজা তাতে বল্লেন, "আচ্ছা, তাই হবে। খবরদার! মনে থাকে যেন।"

পরদিন রাজামশাই প্রসাদ খাবেন, তাই এক প্রহর বেলা থাকতেই তিনি ঠাকুর বাড়ীর আঙ্গিনায় এসে আকাশের পানে তাকিয়ে বসে আছেন। আর সকলে ভয়ে ভয়ে একটু দূরে বসে তাঁকে ঘিরে তামাসা দেখছে। আজ পূজার ঘটা অন্য দিনের চেয়ে শতগুণ; সবাই ভাবছে, দেবতা তাতে খুসী হয়ে রাজামশাইকে আরো ভাল প্রসাদ দিবেন।

রাত দুপুরের সময় গুপী আর বাঘা আরো আশ্চর্য্য রকমের মিঠাই নিয়ে এসে মন্দিরের চূড়ায় বসল। আজ তাদের পরনে খুব জমকালো পোষাক, মাথায় মুকুট, গলায় হার, হাতে বালা, কানে কুণ্ডল; তারা দেবতা সেজে এসেছে। ধোঁয়ার জন্য কিছুই দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তবু রাজামশাই আকাশের পানে তাকিয়ে আছেন। এমন সময় গুপী আর বাঘা হাসতে হাসতে তাঁর উপরে সেই মিঠাইগুলো ফেলে দিল। তাতে রাজামশাই প্রথমে একটা চীৎকার দিয়ে তিন হাত লাফিয়ে উঠলেন, তারপর তাড়াতাড়ি সামলিয়ে গিয়ে, দু হাতে মিঠাই তুলে মুখে দিতে লাগলেন, আর ধেই ধেই করে নাচনটা যে নাচলেন!

এমন সময় গুপী আর বাঘা হঠাৎ মন্দিরের চূড়া থেকে নেমে এসে রাজার সামনে দাঁড়াল। তাদের দেখে সকলে 'ঠাকুর এসেছেন' 'ঠাকুর এসেছেন' বলে, কে আগে গড় করবে ভেবে ঠিক পায় না। রাজামশাই ত লম্বা হয়ে মাটিতে পড়েই রয়েছেন, আর খালি মাথা ঠুকছেন। গুপী তাঁকে বল্ল, "মহারাজ! তোমার নাচ দেখে আমরা বড়ই তুষ্ট হয়েছি; এস তোমার সঙ্গে কোলাকুলি করি।" রাজা তা শুনে যেন হাতে হাতে স্বর্গ পেলেন; দেবতার সঙ্গে কোলাকুলি, সে কি কম সৌভাগ্যের কথা?

কোলাকুলি আরম্ভ হল; সকলে 'জয় জয়' বলে চ্যাঁচাতে লাগল। সেই অবসরে গুপী আর বাঘা রাজামশাইকে খুব করে জড়িয়ে ধরে বল্ল, "এখন তবে আমাদের ঘরে যাব!" বলতে বলতেই তারা তাঁকে শুদ্ধ একেবারে এসে তাদের নিজের ঘরে উপস্থিত। ঠাকুর বাড়ীর আঙ্গিনায় সেই লোকগুলো অনেকক্ষণ ধরে হাঁ করে আকাশের পানে চেয়ে রইল, তারপর যখন রাজামশাই আর ফিরলেন না, তখন তারা যে যার ঘরে এসে

-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থা
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

গুপী আর বাঘা শুণ্ডীর রাজাকে ধ'রেছে।

বল্ল, "কি আশ্চর্য্যই দেখলাম! রাজামশাই সশরীরে স্বর্গে গেলেন! দেবতারা নিজে তাঁকে নিতে এসেছিলেন!"

এদিকে রাজামশাই গুপী আর বাঘার কোলে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন, তাদের ঘরে এসেও অনেকক্ষণ তাঁর জ্ঞান হয় নি। ভোরের বেলায় তিনি চোখ মেলে দেখলেন যে সেই দুটো ভূত তাঁর মাথার কাছে বসে আছে। অমনি তিনি তাদের পায় পড়ে কাঁপতে কাঁপতে বল্লেন, "দোহাই বাবা! আমাকে খেয়ো না। আমি দুশ মোষ মেরে তোমাদের পূজা করব!"

গুপী বল্ল, "মহারাজ, আপনার কোন ভয় নাই। আমরা ভূতও নই, আপনাকে খেতেও যাচ্ছি না।" রাজামশাইয়ের কিন্তু তাতে একটুও ভরসা হল না। তিনি আর কোন কথা না বলে মাথা গুঁজে বসে কাঁপতে লাগলেন।

এদিকে বাঘা এসে হাল্লার রাজাকে বল্ল, "কাল রাত্রে আমরা শুণ্ডীর রাজাকে ধরে এনেছি; এখন কি আজ্ঞা হয়?" হাল্লার রাজা বল্লেন, "তাঁকে নিয়ে এস।"

দুই রাজায় যখন দেখা হল, তখন শুণ্ডীর রাজা বুঝতে পারলেন যে তাঁকে ধরে এনেছে। হাল্লা জয় করা ত তাঁর ভাগ্যে ঘটলই না, এখন প্রাণটিও যাবে। কিন্তু হাল্লার রাজা তাঁকে প্রাণে না মেরে শুধু তাঁর রাজ্যই কেড়ে নিলেন। তারপর তিনি গুপী আর বাঘাকে বল্লেন, "তোমরাই আমাকে বাঁচিয়েছ, নইলে হয় ত আমার রাজ্যও যেত প্রাণও যেত। আমি আর তোমাদের কি উপকার করতে পারি? শুণ্ডী রাজ্যের অর্দ্ধেক আর আমার দুটি কন্যা তোমাদের দুজনকে দান করলাম।"

তখন খুবই একটা ধূমধাম হল। গুপী আর বাঘা হাল্লার রাজার জামাই হয়ে আর শুণ্ডীর অর্দ্ধেক রাজ্য পেয়ে পরম আনন্দে সঙ্গীতের চর্চ্চা করতে লাগল। গুপীর মা বাপের মান্য আর সুখ তখন দেখে কে?

সমাপ্ত।

তিনটি বর।

সাত বছর পরে সয়তান আবার কামারকে নিবার জন্য এসে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু গত বারে সে নাকে যে চিমটি খেয়ে গিয়েছিল, তার কথা ভেবে আর সে সোজাসুজি কামারের সামনে এসে দাঁড়াতে ভরসা পাচ্ছে না, তাই এবারে সে ভারী এক ফন্দি এঁটে এসেছে।

সয়তান জানে যে, কেউ যদি তাকে নিজে থেকে আদর করে নিয়ে যায়, তাহলে আর সে কিছুতেই তার হাত ছাড়াতে পারে না। তখন সয়তান করল কি, একটি ঝক ঝকে মোহর হয়ে ঠিক কামারের দোকানের সামনে রাস্তায় গিয়ে পড়ে রইল। সে ভাবল যে কামার খেতে পায় না, মোহরটি দেখলে সে পরম আদরে তাকে এসে তুলে নিয়ে যাবে ; তারপর আর সে সয়তানকে ফাঁকি দিয়ে যাবে কোথায় ?

যে কথা সেই কাজ। কামার সেই মোহরটিকে দেখতে পাওয়া মাত্রই ছুটে গিয়ে সেটিকে তুলে এনে তার থলেয় পূর্‌ল। তখন থলের ভিতর থেকে সয়তান হেসে তাকে বল্ল, "কি বাপু, এখন কোথায় যাবে? নিজে ধরে আমাকে ঘরে এনেছ, তার মজাটা এখনি দেখতে পাবে!"

কামার বল্ল, "কিরে বেটা ? তুই নাকি। তোর বুঝি আর মরবার জায়গা জোটেনি, তাই আমার থলের ভিতরে এসেছিস ? দাঁড়া, তোকে দেখাচ্ছি !"

এ কথায় শয়তান এমনি বেজায় রেগে গেল যে, পারলে সে তখনি কামারকে মেরে শেষ করে। কিন্তু থলের বাইরে এলে, তবে ত শেষ করবে ? সে যে সেই বিষম থলে,—তার ভিতরে ঢুকলে আর বেরোবার হুকুম নাই। সয়তান বেচারার খালি ছটফটিই সার হল, সে আর থলের ভিতর থেকে বেরুতে পারল না। ততক্ষণে কামার সেই থলেটি তার নেহাইয়ের উপর রেখে, গিন্নীকে ডেকে, দু জনে দুই প্রকাণ্ড হাতুড়ি নিয়ে, দমাদ্দম, দমাদ্দম, এমনি পিটুনী যুড়ল যে পিটুনী যাকে বলে! পিটুনী খেয়ে সয়তান খানিক খুব চ্যাঁচাল। তারপর যখন আর চ্যাঁচানি আসে না, তখন গোঙাতে গোঙাতে বল্ল, "ছেড়ে দাও দাদা, তোমার পায় পড়ি। এবার তোমাকে বিশাল বিশাল ছয় থলে ভরা মোহর দিব, আর, আর কখ্খনো তোমার কাছে আসব না !"

একথায় কামারের গিন্নী বল্ল, "ওগো, সে হলে নেহাৎ মন্দ হবে না ; দাও হতভাগাকে ছেড়ে!" তখন কামার বল্ল, "কৈ তোর মোহরের থলে ?" বলতে বলতেই এমনি বড় বড় ছটা মোহরের থলে এসে হাজির হল যে তারা দুজনে মিলেও তার একটাকে টেনে তুলতে পারে না। তখন কামার এক গাল হেসে, তার থলের

মুখ খুলে দিয়ে বল্ল, "যা বেটা! ফের তোর পোড়া মুখ এখানে দেখাতে আসবি ত টের পাবি!" ততক্ষণে সয়তান থলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এমনি ব্যস্ত হয়ে ছুট দিল যে, কামারের সব কথা শুনতেও পেল না।

সেই ছটা থলের ভিতরে এতই মোহর ছিল যে, কামার হাজার ধূমধাম করেও তা শেষ করতে পারল না। চার থলে ভাল করে ফুরুতে না ফুরুতেই সে বুড়ো হয়ে শেষে একদিন মরে গেল। মরে গিয়ে ভূত হয়ে সে ভাবল যে, "এখন ত হয় স্বর্গে না হয় নরকে দুটোর একটায় যেতে হবে। আগে স্বর্গের দিকে গিয়েই দেখিনা, যদি কোন মতে সেখানে ঢুকতে পারি।"

স্বর্গের ফটকের সামনে গিয়ে তার সেই দেবতাটির সঙ্গে দেখা হল, যিনি তাকে সেই তিনটি বর দিয়েছিলেন। তাঁকে দেখে কামার ভারী খুসী হয়ে ভাবল, "এই ঠাকুরটি না আমাকে সেই চমৎকার বরগুলো দিয়েছিলেন? ইনি অবশ্যি আমাকে ঢুকতেও দিবেন।"

কিন্তু দেবতা তাকে দেখেই যারপরনাই রেগে বল্লেন, "এখানে এসেছিস্ কি করতে? পালা, হতভাগা, শীগ্‌গির পালা!"

কাজেই তখন বেচারা আর কি করে? সে সেখান থেকে ফিরে নরকের দিকে চল্ল। সেখানকার ফটকের সামনে উপস্থিত হলে সয়তানের দরোয়ানেরা তাকে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার নাম?"

কামার তার নাম বলতেই পাঁচ ছয়টা দরোয়ান ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে গিয়ে সয়তানকে বল্ল, "মহারাজ! সেই কামার এসেছে!" তা শুনে সয়তান বিষম চমকে গিয়ে একটা লাফ যে দিল! তারপর পাগলের মত ফটকের কাছে ছুটে এসে দরোয়ানদের বল্ল, "শীগ্‌গির দরজা বন্ধ কর্! আঁট্ হুড়কো! লাগা তালা! খবরদার! ও বেটাকে ঢুকতে দিবি না! ও এলে আর কি আমাদের রক্ষা থাকবে!"

সয়তানের গলা শুনে কামার গরাদের ভিতর দিয়ে উঁকি মেরে হাসতে হাসতে বল্ল, "কি দাদা! কি খবর?" সে কথা শেষ না হতেই সয়তান এক লাফে এসে এমনি তার নাক মলে দিল যে কি বলব। কামার তখনি সেখান থেকে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে ছুটে পালাল, কিন্তু তার আগেই তার নাকে আগুন ধরে গিয়েছিল। সে আগুন আজও নিবেনি। কামার তার জ্বালায় অস্থির হয়ে জলায় জলায় নাক ডুবিয়ে বেড়ায়। লোকে সেই আগুন দেখ্‌তে পেলে বলে "ঐ, আলেয়া।"

কামারের নাকে আগুন ধরেছে।

আষাঢ়ে গল্প।

এক যে ছিল দুষ্টু বুড়ো, তার নাম ছিল 'মনা'। মনা বল্লে, "ওগো, আমি তীর্থে যাব, তোমরা আমাকে কিছু ভিক্ষা দাও।" তা শুনে সবাই তাকে ভিক্ষা দিতে লাগল। কেউ দিল টাকা, কেউ দিল পয়সা, কেউ দিল ডাল চাল; দেখতে দেখতে মনার তীর্থে যাবার টাকার যোগাড় হয়ে গেল। মনা তাই নিয়ে দু বেলা মিঠাই কিনে খায় আর তাইরে নাইরে করে খুব বেড়ায়; তীর্থে যাবার নামও করে না। লোকে বল্লে, "তাই ত, মনা যে বলেছিল, তীর্থে যাবে, কই, সে ত তীর্থে গেল না?" মনা তা শুনে বল্ল, "আজ্ঞা, মনা কি রয়েছে? সে ত সেই কবে তীর্থে চলে গিয়েছে। এই যে দেখছেন, এ শুধু 'তনাটা' পড়ে আছে!"

তোমরা চিনলে ত, এই 'তনা'ই বা কে, আর 'মনা'ই বা কে? আমাদের সবারি একটা 'তনা' আর একটা 'মনা' আছে। তনা যতক্ষণ ঘরের দাওয়ায় পড়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়, মনা ততক্ষণ আকাশ পাতাল ঘুরে আসে। একদিন আমাদের বাড়ীর উপর দিয়ে একখানা ফুর ফুরে মেঘ উড়ে যাচ্ছিল, আমার মনাটা সুড়ুৎ করে গিয়ে তার পিঠে চড়ে বসল। সে যে কি মজা, কি বলব! মনা দেখল, সেই ফুর ফুরে মেঘটা আর কিছু নয়, শুধু জলের গুঁড়ো। যত মেঘ সবারি ভিতরে মনা উঁকি মেরে মেরে দেখল, তাদের আগা গোড়াই খালি জলের গুঁড়া, তাতে আর কিচ্ছু নাই। আকাশ ভরা মেঘ,—খালি মেঘের পর মেঘ। কোনটা হাতীর মতন দাঁড়িয়ে, কোনটা মোষের মত শুয়ে, কোনটা চাদরের মত বিছানো, কোনটা খইয়ের মত ছড়ানো, কোনটা চুলের মত এলানো। আর আমার মনা যে মেঘটিতে উঠে বসেছিল, সেই ফুর ফুরে মেঘটি ছিল তুলোর মত ধোনা। যত মেঘ আছে, তার মত কেউ নয়; সে শোঁ শোঁ করে ছুটে চলে, আর সকলে তার পিছনে পড়ে থাকে।

ওমা! একি সর্ব্বনাশ! মনার মেঘখানা ছোট হতে হতে শেষে কোথায় মিলিয়ে গেল? মিলিয়ে গেছে বটে, কিন্তু মনাকে ফাঁকি দিতে পারেনি। মনা দেখল যে রোদ লেগে সেই মেঘখানা ঠিক হাওয়ার মত হয়ে হাওয়ার সঙ্গে মিশে গিয়েছে, তাই লোকে তাকে দেখতে পাচ্ছে না।

আর কেউ হলে হয় ত তখন ঢিপ করে পড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যেত। কিন্তু মনা পড়বার ছেলে না, সে সেই হাওয়ার মত জিনিসটার সঙ্গে সঙ্গে চল্ল।

তারপর কত বন কত মাঠ কত পাহাড়ের উপর দিয়ে যে সেই হাওয়ার মত জিনিসটা বাতাসে ভেসে চল্ল, সে কি বলব। মনা আগাগোড়াই তার সঙ্গে সঙ্গে আছে আর এর মধ্যে ভারী একটা তামাসা দেখে নিয়েছে। গাছে হোক, মাঠে হোক, নদীতে হোক, পুকুরে হোক, যেখানেই জল আছে, গরম লেগে সে জল ক্রমাগতই হাওয়ার মত হয়ে বাতাসের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। এমনি করে শেষে তারা একটা সহরে একটি ঘরের ভিতর উপস্থিত হল। সেখানে একটা টেবিলের উপরে এক গেলাস জলে এক টুকরো বরফ ভাসছিল, আর দুটি ভাই বোন বসে তার তামাসা দেখছিল। সেই হাওয়ার মত জিনিসটা বাতাসের সঙ্গে ঘরের ভিতরে ঢুকে সেই ঠাণ্ডা গেলাসটার গায় ঠেকতেই তার খানিকটা আবার জলের গুঁড়ো হয়ে তাতে লেগে রইল। অমনি মেয়েটি বল্ল, "দেখ দাদা, গেলাসটা কেমন ঘেমে উঠেছে!"

ছেলেটি বল্ল, "বাতাসে জলের বাষ্প থাকে, সেই বাষ্প ঠাণ্ডা গেলাসের গায় ঠেকে জল হয়ে গিয়েছে, তাতেই গেলাসটা ঘেমেছে।"

মেয়েটি বল্ল, "'বাষ্প' কি, দাদা?"

ছেলেটি বল্ল, "জলে গরম লাগলে সে জল হাওয়ার মত হয়ে উড়ে যায়, তাকেই বলে 'বাষ্প'।"

তারপর কি কথা হল, মনা তা শুনতে পেল না, সে তার আগেই বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছিল। তখন আর তার সেই হাওয়ার মত জিনিসটার পিছু পিছু ছুটতে ভাল লাগছিল না; সে ভাবল, 'একবার ঐ পাহাড়ের মত উঁচু কালো মেঘগুলোর উপরে চড়ে দেখতে হবে।'

সেই কালো মেঘগুলোর একটার উপরে গিয়ে উঠতেই তার ভিতর থেকে গুড়ুম গুড়ুম করে ভয়ানক শব্দ হতে লাগল। তারপর যখন দেখা গেল যে তার ভিতর থেকে আগুন ছুটে বেরুচ্ছে, তখন ত আর মনার ভয়ের সীমাই রইল না। সে তখনি সেখান থেকে ছুটে পালাচ্ছিল, এমন সময় সে দেখতে পেল যে সেই মেঘটার তলা দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়ছে। তা দেখে সে ভাবল যে "এ আবার কি রকম তামাসা! দেখতে হবে, এ জল কোথায় যায়।"

একথা বলেই মনা সেই জলের ধারা বেয়ে নীচে নেমে এল। এসে দেখল যে সে জল একটা নদীতে পড়ে কল কল শব্দে ছুটে চলেছে। কাজেই মনাও তার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চল্ল। ছুটতে ছুটতে নানা দেশ, নানান সহর, নানা রকমের নৌকা, এসব

দেখতে মনার লাগছিল নিতান্ত মন্দ নয়, তবে কি না, জলটা ছিল বড্ড ঘোলা আর এক এক জায়গায় ভারী নোংরা। যাহোক, শেষে একদিন সেই জলের সঙ্গে মনা সমুদ্রে এসে উপস্থিত হল; আর তখন তার কি আশ্চর্য্যই যে বোধ হল সে আর বলবার নয়।

সকলের চেয়ে যে কথাটা বেশী আশ্চর্য্য বোধ হল, তা হচ্ছে এই যে, যে জলের সঙ্গে সঙ্গে মনা এত কষ্ট করে এত দূর এসেছিল, সেই জল আবার গরম লেগে হাওয়ার মত (অর্থাৎ বাষ্প) হয়ে আকাশে উঠতে লাগল। মনা তার সঙ্গে খানিক দূর উঠে দেখল যে নীচের চেয়ে উপরের হাওয়া ঠাণ্ডা, সেই ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে সেই বাষ্প জমে আবার জলের গুঁড়ো হয়ে গেল। সেই জলের গুঁড়ো নানা রকমের হয়ে বাতাসের সঙ্গে আবার বাংলা দেশের পানে উড়ে চল্ল। মনা ত তার আগেই সেই মেঘের একটার ঘাড়ে চড়ে বসে আছে। তারপর সেই মেঘে চড়ে নিজের দেশে এসে উপস্থিত হতেও তার দুদিন বই লাগল না। তখন সে ভাবল যে, "বাঃ! কি চমৎকার ব্যাপার! এমন খবরটা সন্দেশে না পাঠালেই নয়। সাগরের জল রোদ লেগে বাষ্প হয়ে উপরে ওঠে। সেখানে ঠাণ্ডা হাওয়ায় সে বাষ্প জমে মেঘ হয়। সেই মেঘ বাতাসে উড়ে বাংলা দেশে এসে বৃষ্টি দেয়। সেই বৃষ্টি দেশ ভিজিয়ে নদীর ভিতর দিয়ে গড়িয়ে আবার গিয়ে সাগরে পড়ে।"

বুলীর বুদ্ধি।

এক বাবুর বুলী বলে একটি কুকুর আছে। ছিপ্‌ছিপে ছোট্ট খাট্টো কুকুরটি। ফুটখানেক উঁচু, গায় কোরা কাপড়ের রঙ্গের লম্বা লম্বা ঝাঁক্‌ড়া ঝাঁক্‌ড়া রোঁয়া। স্বভাবটি বেশ মিষ্টি; ভয়ে ভয়ে এসে লেজ নাড়ে আর বড় বড় চোখ দুটি দিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়। মুখের সামনে উঁচু করে খাবার ধরলে দু পায় লাফিয়ে উঠে অনেক ক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।

বুলীকে দেখলে তোমার কখনই মনে হবে না যে তার বলবিক্রম বা সাহস কিছু আছে। তোমার কাছে খাবারের জন্যে আব্দার কর্‌তে এলে

যদি তুমি ধমক দাও, তা হলে সে অমনি উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালাবে, আর সপ্তাহের ভিতরেও তোমার দরজা মাড়াবে না।

সেই বুলী একদিন তার মুনিব ঘরে ঢুকবার সময় দরজা আগলে দাঁড়াল,—কিছুতেই তাঁকে ঢুকতে দিবে না। তিনি যতই ঢুকতে চান, ততই সে খেউ খেউ করে, আর তাঁর পায়ের কাছে এসে মাটিতে আঁচড় মেরে তাঁকে বুঝিয়ে দেয় যে আর এগুলে ভাল হবে না।

তখন সেই বাবুটি ভাবলেন যে নিশ্চয় এর ভিতরে কোন কারণ আছে। কাজেই তিনি আর ঘরে না ঢুকে, জানালার ভিতর দিয়ে উঁকি মারলেন। তখন আর তাঁর বুঝতে বাকি রইল না যে বুলী কেন তাঁর পথ আট্‌কিয়েছিল; ঘরের মাঝখানে প্রকাণ্ড সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে আছে। ঘরের ভিতর সাপ দেখে নিশ্চয়ই বুলী ভেবেছিল যে তার মুনিব সে ঘরে এলে সেটা তাঁকে কামড়াতে পারে। কাজেই, যাতে তিনি সে ঘরে না ঢোকেন বেচারা যথাসাধ্য তারি চেষ্টা করেছে।

সাপুড়ে।

সাপুড়ে দেখেছ ? আমাদের বাড়ীতে একবার একটা সাপুড়ে এসে বল্ল, "তোমাদের আঙ্গিনায় মস্ত একটা সাপ আছে ; আমি ধরে দিতে পারি।" আমাদের ওঠানের এক কোণে অনেকগুলো পুরাণো কাঠ পড়েছিল, সেইগুলো দেখিয়ে সে বল্ল, "ওর ভিতরে সাপ।"

তারপর সে সেই কাঠগুলোর কাছে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে তার বাঁশী বাজাল। বাঁশীর শব্দ শুনলে নাকি সাপ বেরিয়ে আসে। সাপুড়ে ক্রমাগত বল্‌তে লাগল, 'ঐ আসছে!' 'ঐ আসছে।' কিন্তু আমরা কিছু দেখতে পেলাম না। শেষে একবার সে 'ঐ বেরিয়েছে' বলে এক জায়গায় গিয়ে ছোঁ মেরে পড়ল। তার গায় অনেক

সাপুড়ে।

কাপড় চোপড় ছিল, তাতে সেই জায়গাটা তখন আড়াল পড়ে যাওয়ায় আমরা কিছুই বুঝতে পারলাম না যে, কোন্‌খান দিয়ে সাপ বেরুল, বা, সে কেমন করে সেটাকে ধরল।

আমরা খালি 'ফোঁ-স্' করে একটা শব্দ শুনলাম, আর তার পরেই দেখলাম, সাপুড়ে মস্ত বড় একটা গোখুরো সাপের লেজে ধরে সেটাকে ঝুলিয়ে নিয়ে আসছে। আমাদের তখন ভারী আশ্চর্য্য বোধ হল, আর ভয়ও হল খুবই, কেন না ঐ কাঠের গাদায় উঠে আমরা রোজ খেলা করতাম।

সাপুড়ে চলে গেলে পর এই ঘটনা নিয়ে একটা খুব তর্ক উপস্থিত হল। কেউ বল্ল, সাপুড়েরা ভারী মন্ত্র জানে; কেউ বল্ল, ওরা ভারী দুষ্টু, লোককে ফাঁকি দিয়ে পয়সা নেয়। ঐ সাপটা নাকি ওরই পোষা ছিল, চাদরের ভিতরে করে এনেছিল। তখন আমাদের মনে হল যে, সাপটা পোষা হলেও হতে পারে। সাপুড়ে তাকে ধরে আনবার সময় সেটা ত তেমন ব্যস্ত হয় নি। বুনো সাপ হলে হয় ত সে খুব ছটফট করত, কিন্তু সেটাকে বেশ নিশ্চিন্ত দেখলাম, যেন ঐ রকম ধরা পড়ে তার অভ্যাস আছে।

সাপুড়েরা যে খুব মন্ত্র তন্ত্র জানে একথা অনেকেই কিন্তু বিশ্বাস করে, আর অন্যকে তাতে সন্দেহ করতে দেখলে চটে। মাদ্রাজ অঞ্চলের সাপুড়েরাই নাকি এ বিষয়ে সকলের চেয়ে ওস্তাদ। আমি একখানা পুস্তকে সেই মাদ্রাজী সাপুড়েদের সম্বন্ধে একটা গল্প পড়েছিলাম, তা তোমাদের বলছি।

কয়েকটি সাহেব এইরকম তিনটা সাপুড়েকে আনিয়ে, একটা জায়গা দেখিয়ে বল্লেন, "এখানে যত সাপ আছে, সবগুলোকে ধরে ধরে মার্। ছেড়ে দিস্না যেন,—ধরে অমনি মার্বি।" সাপুড়েরা বল্ল, "সে কিছুতেই হবে না। আমরা সাপদের কথা দিয়েছি যে তাদের কখনো মার্ব না, নইলে কি তারা অত সহজে আমাদের কাছে ধরা দিত?"

তারপর তারা বাঁশী বাজাতে বাজাতে একটা ঘরের কাছে গিয়ে একটা সাপ ধরল, আর, ধরবার সময় তাদের পরনের ঝোল্লা দিয়ে সেটাকে এমনি আড়াল করে ফেল্ল যে, কেউ কিছু দেখতেও পেল না, বুঝতেও পার্ল না।

তখন সাহেবেরা বল্লেন যে, "তোমাদের ঝোল্লা খুলে রাখ।" এরপর আর তারা একটিও সাপ ধর্তে পার্ল না; কাজেই সাহেবেরা তাদের সব ফাঁকি বুঝে ফেল্লেন। তখন তারা আর কি করে? সাহেবদের কাছে সব স্বীকার কর্তে হল।

তাদের সেই ঝোল্লাগুলোর বড় বড় পকেট ছিল, তাতে করে পোষা সাপ নিয়ে এসেছিল। কেউ কেউ আলাদা থলেও রাখে। কোন জায়গায় সাপ ধরবার কথা হলে সেই পোষা সাপগুলোই ধরা পড়ে, আর তাই দেখে লোকে পয়সা দেয়।

যা হোক, সাপুড়েরা দুষ্টু হলেও এমন কথা বলা যায় না যে, শুধু হাতে সাপ ধরা অসম্ভব। তন্ত্র মন্ত্র না থাকলেও, সঙ্কেত থাকতে পারে। সেদিন খবরের কাগজে এমনি একটা ঘটনার কথা পড়েছিলাম।

চারটি সাহেব ব্যাঙ্গালোরের কাছে 'গল্‌ফ্' খেলছিলেন, খেলতে খেলতে তাঁদের একজন ভয়ঙ্কর এক কেউটের সামনে এসে উপস্থিত হলেন। সাপটা এতই বড় যে, সাহেবেরা তাঁদের খেলার লাঠি দিয়ে তাকে মারতে সাহস পেলেন না, দূরে থেকে ইঁট মেরেও তার কিছু করতে পারলেন না। লাভের মধ্যে সে তাঁদের তাড়া খেয়ে একটা গর্ত্তের ভিতরে গিয়ে ঢুকে পড়ল।

তখন তাঁরা সেখানে দাঁড়িয়ে সাপটাকে মারবার নানা রকম ফন্দি আঁটছেন, এমন সময় কোথেকে এইটুকু এক বেঁটে বুড়ী সেখানে এসে উপস্থিত হল। বুড়ী তাঁদের নিকট সব কথা শুনে বল্ল, "আমি সাপ ধরে দিব।" সাহেবেরা ত তাকে অমন ভাবে মরতে দিতে কিছুতেই রাজি হবেন না, বুড়ীও কিছুতেই ছাড়বে না, খালি বলে, "খুঁড়ে বার করে দাও, এক্ষণি ধরে দিচ্ছি।"

তারপর কয়েকজন লোক এসে সেই গর্ত্তটা খুঁড়তে লাগল, আর সাপটা দেখা দিতেই ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালাল। বুড়ী ততক্ষণে ফুট খানেক লম্বা একখানি কাঠ নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছে। তখন এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখা গেল। সাপটা রেগে ফণা ধরে বুড়ীকে কামড়াতে যায়, বুড়ী তার সেই কাঠখানা সেটার মুখের কাছে নেড়ে তাকে ফিরিয়ে দেয়, আর ক্রমাগত যা তা গাল দিয়ে তাকে রাগিয়ে অস্থির করে। শেষে সাপটা বিষম ক্ষেপে বুড়ীর দিকে রওয়ানা হল, বুড়ীও সাঁই সাঁই শব্দে ক্রমাগত তার মুখের কাছে কাঠ নেড়ে তাকে বকতে বকতে পিছিয়ে চল্ল। সাপটা ক্রমাগত তাকে ছোবল মারছে, বুড়ী কাঠ দিয়ে তাকে ফিরিয়ে দিচ্ছে। যারা দেখছে তারা ভয়ে অস্থির, কিন্তু বুড়ীর ভয় মাত্র নাই। দু একজন তাকে ফিরিয়ে আনতে গিয়েছিল, তাদের সে বকে তাড়িয়ে দিল।

এমনি করে শেষে সাপটা ক্লান্ত হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল। বুড়ী তৎক্ষণাৎ ছুটে তার পিছনের দিকে গিয়ে বল্ল, "কেউ এসে এখন এটার লেজের উপরে একখানি ছোট বাঁখারি আল্‌গোছে রেখে দাও।" সে কথায় একজন অনেক সাহস করে সাপের লেজের উপরে একখানি বাঁখারি রেখে এলে পর, বুড়ী খুব আস্তে আস্তে অতি সাবধানে তার গায়ের কাছে হাত নিয়ে গেল। সাপটা চুপ করে আছে, কিছু বলছে না, বুড়ীও

অতি ধীরে ধীরে তার হাতখানা ক্রমে সেটার মাথার দিকে এগিয়ে নিচ্ছে। শেষে হাত ফণার কাছে আসতেই সে খপ্‌ করে দু হাতে প্রাণপণে সাপের মাথা চেপে ধরল। তখন সাপটা খুব ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল, কিন্তু আর ছটফটিয়ে কি হবে? বুড়ী কিছুতেই তাকে ছাড়ছে না। তারপর খানিক বাদে দুহাতে তার গলা ধরে সে তাকে উঁচু করে তুলে ফেল্ল। সাপটা তখন হাঁ করে রয়েছে, আর তার মুখ দিয়ে টপ টপ করে বিষ গড়িয়ে পড়ছে। একবার একটি বিষের ফোঁটা বুড়ীর কব্জিতে পড়েছিল, সে অমনি তার সাড়ী দিয়ে সেটাকে ঘষে ফেলে দিল।

এমনি ভাবে সাপটাকে ধরে নিয়ে, সকলকে সেলাম কর্‌তে কর্‌তে বুড়ী বাড়ী চলে গেল। আর সকলে যে ততক্ষণ হাঁ করে ছিল, একথা বোধ হয় আমার না বল্লেও চলবে।

ফিঙ্গে আর কুঁক্‌ড়ো।

একটা দানব ছিল, তার নাম ছিল 'ফিঙ্গে'; সে দেড়শ' হাত লম্বা শাল গাছের ছড়ি হাতে নিয়ে বেড়াত। আরেকটা দানব ছিল, তার নাম ছিল 'কুঁক্‌ড়ো', সে ঘুঁষো মেরে লোহার মুগুর থেৎলো করে দিত।

আর যত দানব ছিল, তাদের সকলকেই কুঁক্‌ড়ো ঠেঙ্গিয়ে ঠিক করে দিয়েছে, এখন সে ফিঙ্গের সন্ধানে দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়ায়। একথা শুনে অবধি ফিঙ্গের আর ঘুম হয় না; কাজেই সেও কুঁক্‌ড়োকে এড়াবার জন্য খালি দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়ায়। ফিঙ্গে সমুদ্রের ধারে গেল, তা শুনে কুঁক্‌ড়ো সেই দিক পানে রওয়ানা হল; সে খবর পেয়েই ফিঙ্গে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে তার নিজের ঘরে চলে এল।

ঘর খানি ছিল একটা উঁচু পর্ব্বতের উপরে; সেখান থেকে দশ দিনের পথ অবধি দেখতে পাওয়া যায়, কাজেই ফিঙ্গে ভাব্‌ল যে ওখানে গেলে কুঁক্‌ড়ো নিতান্ত আচম্‌কা এসে তাকে মারতে পারবে না। ফিঙ্গেকে অমন ব্যস্ত হয়ে ফিরে আসতে দেখে তার স্ত্রী ঊনা বল্ল, "কি হয়েছে?" ফিঙ্গে আঙ্গুল দিয়ে সমুদ্রের দিকে দেখিয়ে বল্ল, "ঐ কুঁক্‌ড়ো আসছে! বেটা ঘুঁষো মেরে লোহার মুগুর থেৎলো করে দেয়। এবারে দেখছি ভারী বেগতিক।"

ঊনা সেদিকে দেখল, সত্যি সত্যিই কুঁক্‌ড়ো আসছে, কিন্তু এখনো সে ঢের দূরে, তিন চার দিনের কমে এসে পৌঁছাতে পারবে না। তখন সে ফিঙ্গেকে বল্ল, "তোমার

কোন ভয় নাই। তুমি পায়ের উপর পা তুলে বসে থাক, আমি কুঁক্ড়োকে ঠিক করে দিচ্ছি।" কিন্তু ফিঙ্গের মনের ভয় তাতে গেল না। সে মাথা হেট করে বসে বসে কত কথাই ভাবতে লাগল।

ঊনা কিন্তু ততক্ষণ চুপ করে ছিল না। সে গ্রামের লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরে, যার ঘরে যত ভাঙ্গা দা, কুড়ুল, কাস্তে, খন্তা, কোদাল, হুড়কো, ছিট্‌কিনী আর হাতুড়ি, আর পেরেক ছিল, সব চেয়ে ঝুড়ি ভরে নিয়ে এল। তারপর সেইগুলো ভিতরে পূরে পূরে সে দুদিন ধরে খালি পাটিসাপ্‌টাই তয়ের করল। ফিঙ্গে অবাক হয়ে চেয়ে দেখে, আর বলে, "ও কি কর্‌ছ?" ঊনা বলে, "যাই করি না কেন,—তুমি চুপ করে থাক।"

পিঠা হয়ে গেলে ঊনা তিন গামলা ছানাও তয়ের কর্‌ল। তারপর ফিঙ্গাকে অনেক পরামর্শ দিয়ে, অনেক সন্ধান শিখিয়ে রেখে, সে সব ঠিক ঠাক করে রাখল, এখন কুঁক্‌ড়ো এলেই হয়।

পরদিন দুপুর বেলায় কুঁক্‌ড়ো এসে উপস্থিত হয়েছে। এসেই ভয়ঙ্কর গর্জ্জনে আকাশ পাতাল কাঁপিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "ফিঙ্গে কোথায়?" ঊনা বল্ল, "সে ত বাড়ী নাই। কুঁক্‌ড়ো বলে নাকি একটা ছোকরা তাকে খুঁজতে সমুদ্রের ধারে গিয়ে ভারী বড়াই করছিল, তাই শুনে ফিঙ্গে বিষম রেগে লাঠি হাতে তাকে মারতে বেরিয়েছে। যদি তাকে দেখতে পায় তবে আর বেচারাকে আস্ত রাখবে না।"

তা শুনে কুঁক্‌ড়ো ভারী আশ্চর্য্য হয়ে বল্ল, "আমিই ত কুঁক্‌ড়ো, তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছি।" সেকথায় ঊনা হো হো করে হেসেই কুটিপাটি। তারপর অনেক ক্ষণ নাক সিঁটকিয়ে কুঁক্‌ড়োর পানে তাকিয়ে থেকে সে বল্ল, "এই টিকটিকির মত জোয়ানটি হয়ে তুমি ফিঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ করবে? অমন কাজও করতে নাই বাছা। কেন ফিঙ্গের হাতে প্রাণ দিবে? আমার কথা শুনে চল, আমি তোমাকে বাঁচিয়ে দিচ্ছি। ততক্ষণ একটা কাজ কর দেখি; বড্ড হাওয়া আসছে, ফিঙ্গে বাড়ী নাই, কে ঘর খানিকে ঘুরিয়ে দিবে? দেখত তুমি পার কি না।"

কুঁক্‌ড়ো ভাবল, "বাবা! হাওয়া থামাতে হলে ফিঙ্গে এই ঘরটাকে ঘুরিয়ে দেয় নাকি? এখন আমি যদি 'না' বলি তবে ত দেখছি আমার বড্ড নিন্দা হবে!" তখন সে আগে খুব করে তার ডান হাতের মাঝের আঙ্গুলটা মটকিয়ে নিল। আঙ্গুলটাতেই তার যত জোর ছিল, ওটি না হলে সে কিছুই করতে পারত না। আঙ্গুল মটকান হয়ে

গেলে সে দুহাতে ঘরখানিকে জড়িয়ে ধরে তাতে এমনি পাক দিল, যে দেখতে দেখতে পাহাড়ের চূড়া শুদ্ধ ঘরখানি ঘুরে গেল।

এতক্ষণ ফিঙ্গে কি করছে ? সে ঊনার পরামর্শে তার নিজের খোকা সেজে, কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে, আর কুঁকৃড়োর কাণ্ড দেখে সেই কাঁথার ভিতরে ভয়ে ঘেমে আর কেঁপে অস্থির হচ্ছে।

এ দিকে ঊনা আবার কুঁকৃড়োকে বল্ল, "বেশ বাপু! লক্ষ্মীছেলে তুমি। আহা! ঘরে এক ফোঁটা জল নাই, তোমাকে কি দিয়ে একটু মিঠাই খেতে দি ? পাহাড়টার নীচে জল থাকে, ফিঙ্গে পাহাড় সরিয়ে তাই তুলে আনে। আজ ত সে বাড়ী নাই এখন উপায় কি হবে ? দেখ ত বাপু তুমি পাহাড়টা ঠেলে, একটু জল আনতে পার কিনা।"

কুঁকৃড়ো আবার খুব করে তার আঙ্গুল মটকিয়ে নিয়ে, সেই পাহাড়ের নীচে গিয়ে এমনি গুঁতো মারল যে তাতে দশ হাত গভীর এক প্রকাণ্ড দীঘি হয়ে গেল, আর তাতে জলও হল তেমনি। তা দেখে ঊনা আরেকটু হলেই 'মাগো!' বলে চেঁচিয়ে ফেল্‌ছিল, কিন্তু সে নাকি ভারী বুদ্ধিমতী মেয়ে, তাই তাড়াতাড়ি সামলে গিয়ে বল্ল, "চল এখন তোমাকে কিছু পিঠে খেতে দি'গে!"

এই বলে ঊনা কুঁকৃড়োকে ঘরে এনে দিয়েছে সেই পিঠা খেতে। সে বেটাও এমনি লোভী,—একেবারে তার দশটা তুলে নিয়ে মুখে দিয়েছে। দিয়েই সে 'উঃ-হুঃ-হুঃ !!' বলে এমনি ভয়ঙ্কর চেঁচিয়ে উঠল যে, আরেকটু হলেই তাতে ঘরের ছাত উড়ে যেত। বেজায় ব্যস্ত হয়ে সেই পিঠে চিবাতে গিয়ে তার চারটে দাঁত ভেঙ্গে রক্তারক্তি হয়ে গিয়েছে, কাজেই না চ্যাচাবে কেন ?

ঊনা তখন বল্ল, "আরে, অত চেঁচিয়ো না, খোকার ঘুম ভেঙ্গে যাবে। আমি ভাবছিলাম তুমি জোয়ান লোক, ঐ পিঠে খেতে তোমার ভাল লাগবে। ফিঙ্গে আর খোকাও পিঠে খুব খায়।"

বলতে বলতেই সেই 'খোকাটা' কাঁথার ভিতর থেকে ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে বল্ল, "এঁয়্যা-া-া! বদ্দ খিদে পেয়েথে! পিতে থাবো!" খোকার গলার সে আওয়াজ শুনেই ত কুঁকৃড়োর পিলে চমকে উঠেছে! ঊনা অবশ্যি খোকার জন্য ভাল পিঠে করে রেখেছিল, তাই থেকে তাকে কয়েকটা খেতে দিল। কুঁকৃড়ো ত আর তা জানে না, সে দেখল, যাতে তার নিজের দাঁত ভেঙ্গে গেছে, 'খোকা' তাই কপা-কপ্‌ খাচ্ছে।

কাজেই সে ভাবল, "বাবা গো, খোকাই যদি অমনি করে এই পিঠে খেতে পারে, তবে তার বাবা না জানি কি করতে পারে! ভাগ্যিস্ সে বেটা বাড়ী নেই!"

এমন সময় 'খোকা' আবার বল্ল, "পাথল দে! দল বা'ল কব্বো!" উনা তার হাতে এক তাল ছানা, আর কুঁকড়োকে একটা সাদা পাথর দিয়ে বল্ল, "খোকার ঐ এক খেলা, —পাথর চিপে জল বার করে। তুমিও একখানা পাথর টিপে দেখত।" কুঁকড়ো সেই পাথর প্রাণপণে টিপেও তা থেকে জল বার করতে পারল না। খোকার ছানা থেকে অবশ্যি খুবই জল বেরুতে লাগল। তা দেখে কুঁকড়ো ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বল্ল, "বাবা গো! আমি এই বেলা এখান থেকে পালাই! এই খোকার বাবা এলে আর আমাকে আস্ত রাখবে না! আমার খালি দেখতে ইচ্ছা করছে যে এই খোকার দাঁতগুলো কেমন যা দিয়ে সে ঐ পিঠেগুলো খায়।"

ফিঙ্গে কুঁকড়োর আঙ্গুল কামড়িয়ে নিচ্ছে।

এই বলে সে তাড়াতাড়ি গিয়ে যেই 'খোকার' মুখে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিয়েছে, অমনি খোকাও কটাস্ করে তার সব কটি আঙ্গুল একেবারে গোড়াশুদ্ধ কামড়িয়ে নিয়েছে। সেই আঙ্গুলেই নাকি ছিল কুঁকড়োর জোর, কাজেই সে আঙ্গুল কাটা যেতে সে হায় হায় করে মাটিতে পড়ে গেল। 'খোকা'ও তখন লাফিয়ে উঠে তার সেই দেড় শ হাত লম্বা শালের ছড়ি গাছি দিয়ে তার হাড় ভাঙ্তে আর কিছু মাত্র দেরী করল না।

জুজু।

তোমরা ছুটে পালিও না। জুজু আমাদের ঘরের দরজায় আসেনি; আমি শুধু জুজুর গল্প বলতে যাচ্ছি। আজকাল জুজুর নাম খুব কমই শোনা যায়, কিন্তু আগে তেমন দস্যি ছেলেও তার নাম শুনলে চুপ মেরে যেত। অথচ আমি একটি লোকের কথাও জানি না, যে জুজু দেখেছে, বা কারুর ছেলেকে জুজুতে ধরে নিয়ে যাবার কথা শুনেছে। জুজু কি পুরুষ না মেয়ে সে কথাও ঠিক করে বলা একটু শক্ত, তবে অনেকেরই মত এই যে, সে একটা বুড়ী। আর, তার যে একটা ভারী ভয়ানক থলে আছে, এ কথায় কখনো কেউ সন্দেহ করে না। সেই থলের ভিতর পূরে সে দুষ্টু ছেলেদের ধরে নিয়ে কোথায় কোন দেশে যে যায়, আর কি যে করে, তার কথা সময় পেলে আরেক দিন বলব।

আজ কিন্তু আমি আমাদের দেশের জুজুর কথা বলতে যাচ্ছি না। আজ যার কথা বলব, সে হচ্ছে আফ্রিকা দেশের জুজু আমি একটা কাগজে তার কথা পড়েছি। সে দেশের লোকেরা নানা রকম যাদুকে বলে 'জুজু'। এমন জুজুর ভয় আর বোধ হয় কোন দেশের লোকেরই নাই। জুজুর ভয়ে চোরেরা চুরী করতে পারে না, সিপাইরা যুদ্ধ করতে চায় না।

আলুর ক্ষেতে চোর আসে, তার জন্য ভাব না কি? চাষা 'জুজু' করে রাখবে। সে ভারী আশ্চর্য্য রকমের জুজু। যে পথে সেই আলুর ক্ষেতে যেতে হয়, তার মাঝখানে বা পাশে একটা খুঁটি পুঁতে, তার গায় একটা সাদা মোরগ পেরেক দিয়ে বিঁধিয়ে রাখলেই আর চোরের বাবারও সাধ্য থাকে না যে সে আলু চুরী করে। মোরগটি যদি একজন পাকা জুজুওয়ালার কাছ থেকে কেনা যায়, তবে ত সোনায় সোহাগা। জুজু-ওয়ালা এমনও করে দিতে পারে যে, চোর ক্ষেতে এসে ছুরী ত করতে পারবেই না, তার বদলে সেখানে আটকা পড়ে গিয়ে তাকে নূতন ক্ষেতের জন্য জঙ্গল সাফ করে দিতে হবে। চাষার হুকুম ছাড়া আর সে বেটা সে কাজ ছেড়ে যেতেই পারবে না, এমন বন্দোবস্তও হতে পারে।

হাতী শিকার করতে হবে? তার জন্যও খুব ভাল ভাল জুজু আছে, সে সব প'রে গেলে আর কোন ভয় থাকে না। বড় বড় শিকারীর গায়ের টুকরাও নাকি সে দেশের খুব ভাল জুজু। একবার একজন সাহেব শিকারীর ক্ষমতা দেখে

একজায়গার লোকেরা এত খুসী হয়েছিল যে আরেকটু হলেই তারা তাঁকে টুকরা টুকরা করে গলায় পর্‌ত।

একজনে কাঠ কাটে, আরেক জন সেই কাঠ চুরী করে নিয়ে যায়, কাজেই কাঠের জুজু করতে হয়। সে জুজুতে ঢের গাছ গাছড়ার দরকার। সেই গাছগাছড়ায় মন্ত্র পরে তাকে কাঠগুলোর উপর রেখে, পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে সেই কাঠের চার ধারে গণ্ডী কেটে দিলেই, আর কারু সে কাঠ চুরী করবার যো থাকে না। যদি কেউ করতে আসে, তবে তার মজাটা ভাল মতেই টের পায়।

জুজুওয়ালারা 'জুজু' কর্‌ছে।

গাছ গাছড়া দিয়ে জুজু করা সহজ, কিন্তু খুব কঠিন এবং ভয়ঙ্কর জুজুর কথাও শোনা যায়। আফ্রিকায় তাকুম বলে একটা যায়গায় পর্ব্বতের গহ্বরের ভিতরে একটা ভারী ভয়ঙ্কর জুজু করা আছে। সেই জুজুকে সে দেশের লোকেরা এতই ভয় করে যে এবারকার যুদ্ধে জর্ম্মানরা তাদের দেশী সৈন্যগুলোকে কিছুতেই সে পথ দিয়ে নিয়ে যেতে পারল না।

অনেক দিন আগে তাকুম দেশের একজন রাজা এই জুজু করে রেখে গিয়েছিলেন। তিনিই ছিলেন সে দেশের লোকদের প্রথম রাজা। অনেক দূর থেকে তিনি তাদের নিয়ে সে দেশে এসেছিলেন। তাঁর মত বড় রাজা আর সেকালে ছিল না, তাঁর কাছে এসে সকলকেই

হার মানতে হত। তাঁর রাজ্যের লোকের কোন দুঃখ ছিল না; ধনে জনে তাদের সুখের ঘর পরিপূর্ণ ছিল।

কিন্তু রাজার মনে তাতে সুখ হল না। তিনি ভাবলেন, "হায়! এরা যে সুখ পেয়ে পেয়ে কাজের বার হয়ে গেল। আর ত এরা শত্রু এলে তেমন করে যুঝতে পারবে না। আমি গেলে এসব কে রাখবে?"

এর মধ্যেই চারধারে বিষম দুরন্ত শত্রু সব জেগে উঠছিল। তাদের ব্যবসা ছিল যুদ্ধ আর ডাকাতি, আর তাদের চোখ ছিল তাকুমবাসীদের উপরে। রাজা আর থাকতে না পেরে তাঁর দেশের প্রধান প্রধান লোকদের ডাকলেন। তাঁর কথায় তারা পাহাড়ের গহ্বর কেটে বড় করতে লাগল। হুকুম বেরুল যে, স্ত্রীই হোক আর পুরুষই হোক, কাজ করবার ক্ষমতা থাকলেই তাকে এস গহ্বর কাটতে হবে। বছরের পর বছর চলে যেতে লাগল, গহ্বর ক্রমেই বড় আর গভীর হয়ে চল্ল। এদিকে শত্রুরা এক এক দল করে এসে দেশ আক্রমণ করছে, আর দেশের যোদ্ধারা প্রাণপণ করে তাদের থামিয়ে রাখছে। কিন্তু কত দিনই বা রাখবে!

শেষে গহ্বর তয়ের হল। রাজা বল্লেন, "আমি এই গহ্বরে যাব; আমার বংশের রক্ত যাদের শরীরে আছে, তারা সকলেই আমার সঙ্গে যাবে; তা ছাড়া ভাল ভাল যোদ্ধা ছাড়া দেশের আর যত স্ত্রী পুরুষ ছেলে মেয়ে, সকলকেই আমরা নিয়ে যাব। আমরা গহ্বরে ঢুকলে পর বাকী যারা থাকবে, তারা পাথর দিয়ে গেঁথে গহ্বরের মুখ বন্ধ করে দিয়ে, তারপর থেকে যুদ্ধ ছাড়া আর কোন কাজই করবে না। তাদের বিবাহ হবে অন্য যোদ্ধা জাতের মেয়েদের সঙ্গে; যুদ্ধ করে তাদের জিতে আনতে হবে। তাদের ছেলেপিলেগুলোকে তারা জন্মাবধি যুদ্ধ শিখিয়ে বীর করে তুলবে।"

এই বলে রাজা যোদ্ধা ছাড়া আর সকলকে নিয়ে সেই গহ্বরে চলে গেলেন। তখনি প্রকাণ্ড দেওয়াল গেঁথে গহ্বরের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হল; কোনরূপ খাবার জিনিস তাঁদের সঙ্গে দেওয়া হল না।

সে দেশের লোকের বিশ্বাস এই যে, আজও সেই লোকগুলির আত্মারা মিলে সে দেশ রক্ষা করছে। এখনো নাকি রাত্রিকালে সে সব পর্ব্বতে তারা আলো জ্বালে। তাই এখনো কোন শত্রু সে পথে আসতে সাহস পায় না; তাকুমের প্রথম রাজার সেই ভয়ঙ্কর জুজুর ভয় এখনো তাদের মনে জেগে আছে।

আমাদের দেশেও এমনিতর ঢের জুজু এক সময়ে ছিল, এখনো যে নাই, একথাও আমি বলছি না। তবে, এগুলো ক্রমেই কমে আসছে। লোকে যতই জানতে শুনতে থাকে, ততই তাদের এসকলে বিশ্বাস চলে যায়।

ত্রৈলোক্যনাথ।

অসময়ে ত্রৈলোক্যনাথকে বাসায় দেখে, সকলেই নানাপ্রকার প্রশ্ন কত্তে লাগল এবং তাহার নিকট সমস্ত ঘটনা শুনে একজন বল্ল, "সওদাগর আপিসে, রেল কোম্পানী প্রভৃতিতে বিলাত হতে যে সব সাহেব আসে, তারা সকলেই ভদ্র-ঘরের ছেলে, তারা লোকের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করে, বিশেষতঃ যে সব কর্ম্মচারী কর্ত্তব্যপরায়ণ তাদের প্রতি খুব ভাল ব্যবহার করে; ত্রৈলোক্যনাথ এইবার ইনেস্‌পেক্টর হবে।" আর একজন বল্লে "রেখে দাও তোমার ভদ্রঘরের ছেলে! যে ব্যাটারা দেশে খেতে পায় না, তারাই সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে, ভারতবর্ষে আসে,—তারা আবার ভদ্রতা জানে, আর লোকের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করবে! ত্রৈলোক্যনাথের কপালে কিছু আছে। আমার মতে কাল থেকে ওর কাজে গিয়ে কাজ নাই, এই মাসের মাইনে কটা টাকার আশা ছেড়ে দিক্; জামিনের পনর টাকা আমরা দিয়েছি, ও টাকা আমাদের যা'ক।" তখন দুই দল হয়ে, ভয়ানক তর্কযুদ্ধ আরম্ভ হল, সে দিন আর শেয়ালদার মাঠে খেলতে যাওয়া হল না।

অনেক তর্ক বিতর্কের পর ঠিক হ'লো, "সাহেব ভদ্র লোক হলে, ত্রৈলোক্যনাথের নিশ্চিত উন্নতি, আর ছোট লোক হলে, ত্রৈলোক্যনাথের কপালে ঘুঁষি লাথী। কাজে যেতেই হবে, অনুমানের উপর কোন কাজ করা উচিত না; বা বিনা নোটিসে কাজ ছাড়া উচিত না। যা কপালে থাকে হবে।" পরদিন নিয়মিত সময়ে ত্রৈলোক্যনাথ কাজে গেল। গাড়ি যখনই ভবানীপুর আপিসের কাছ দিয়ে যায়, ত্রৈলোক্যনাথের প্রাণ দুর দুর করে, আপিস ছাড়ালে যেন ত্রৈলোক্যনাথের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে। এই ভাবে সমস্ত দিন কাট্‌ল, সাহেব ত্রৈলোক্যনাথকে ডাক্‌লেন না বা মারলেন না। ক্রমে ত্রৈলোক্যনাথের ভয় কমে গেল। বাসার সকলে তাহাদের মীমাংসার কোন ফল হলো না দেখে নিরাশ হলো। কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথকে যে কোন শাস্তি ভোগ কর্ত্তে হলো না তার জন্যে সকলেই আনন্দিত হলো।

ত্রৈলোক্যনাথ শীতকালে কাজ আরম্ভ করেছিল, তখন তত কষ্ট হয় নাই, তারপর গরমও এক প্রকার সয়ে গেছে, কিন্তু বর্ষা আর সহ্য হলো না। উক্ত ঘটনার ৭।৮

দিন পরে একদিন ত্রৈলোক্যনাথ জ্বর নিয়ে, কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বাসায় এলো। জ্বর ১০৬ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠ্‌ত, ১০২ ডিগ্রীর নীচে নাম্‌ত না। তখন ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে থাকতেন, ইনি বর্ত্তমান ভাইস্‌চ্যান্সেলার মাননীয় দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী ও বিখ্যাত অস্ত্র চিকিৎসক ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর পিতা, ইহাঁর দর্শনী ছিল ৪৲ কিন্তু ছাত্র দিগকে দুই টাকায় দেখতেন। ইহাঁকে ডাকা হলো। ইনি প্রথম দিন ত্রৈলোক্যনাথকে ছাত্র বিবেচনায় দুই টাকাই নিলেন। দ্বিতীয় দিন দেখে বল্লেন, নিউমোনিয়া হয়েছে এবং রোগীর বাড়ীর অবস্থা চাকরী প্রভৃতি সমস্ত খবর জিজ্ঞাসা করে 'ফী' নেওয়া বন্ধ কল্লেন। ডাক্তার সর্ব্বাধিকারীর চিকিৎসায় এবং ছেলেদের সেবা শুশ্রূষায় ২০ দিন পরে ত্রৈলোক্যনাথ অন্ন পথ্য পেল।

ইতিপূর্ব্বেই ডাক্তার বাবুর সার্টিফিকেট নিয়ে ছুটীর দরখাস্ত করা হয়েছিল। ত্রৈলোক্যনাথ আরোগ্য হলে ডাক্তার বাবু বল্লেন, "তুমি এখন বাড়ী যাও, তোমার এ শরীর নিয়ে ট্রামের কণ্ডাক্টরী করা চল্‌বে না। যদি একান্তই কাজ ছাড়তে না চাও, তা হ'লে শীতকালে এসে আবার কাজ করো। তাঁর পরামর্শ মত চাকরী পরিত্যাগের জন্য লেখা হলো। সেই দিনই ট্রাম কোম্পানী হতে ত্রৈলোক্যনাথের নামে একখানি চিঠি এলো, তাতে লেখা ছিল, "তোমাকে 'প্রমোশন' দিয়া শিয়ালদহ লাইনে ইন্‌সপেক্টরের পদে নিযুক্ত করা হইল, তুমি অগৌণে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে।" কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের আর ইনেসপেক্টরী করা হলো না।

অনুসন্ধান করে জানা গেল, লণ্ডন সাহেব সেদিন উপরে গিয়েই, হেড ক্লার্ক বাবুকে ডাকিয়ে, জিজ্ঞাসা করেছিলেন "৮১নং কণ্ডাকটরের নাম কি এবং তার কাজ কর্ম্ম কি রকম?" ত্রৈলোক্যনাথের নম্বর ছিল ৮১। হেড ক্লার্ক বল্লেন—ত্রৈলোক্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গত নভেম্বর মাসে কাজ আরম্ভ করেছে, এই ৮।৯ মাসের মধ্যে কোন প্রকার অপরাধ করে নাই বা কার্য্যে অনুপস্থিত হয় নাই। গত ফেব্রুয়ারী মাসে শ্যামবাজারের লাইনের ৫১৫৷৴১০ সমেত একটী থলে পেয়ে শ্যামবাজার আপিসে জমা দিয়েছিল। সাহেব তখন হুকুম দিলেন "এর পরে ইনেস্‌পেক্টরের পদ খালি হলেই ত্রৈলোক্যনাথকে নিযুক্ত করবে।" আমরা তারপর ত্রৈলোক্যনাথের আর কোন খবর জানি না—কিন্তু তার কথা মনে হ'লেই তার সেই সাধুতা আর কর্ত্তব্যে দৃঢ়তার কথাই ভাবি। সে সামান্য ট্রামের কাজ কর্‌ত কিন্তু তার মনটি কত বড় ছিল!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র মজুমদার।

বরফের খেয়াল।

জলকে খুব ঠাণ্ডা কর্‌লে সে জমে বরফ হ'য়ে যায়, একথা সকলেই জানে। যে বরফ দিয়ে আমরা সরবৎ বানাই আর কুল্পী জমাই, সেই বরফ দেখ্‌তে কাঁচের ডেলার মত—কলে জল ঠাণ্ডা ক'রে মানুষে সেই বরফ বানায়। কিন্তু আমি যে বরফের কথা বল্‌ছি সে মানুষের তৈরী নয়—ঠাণ্ডা দেশে জল জমে আপনা থেকেই এ বরফ তৈরী হ'য়ে থাকে।

বাতাস ঠাণ্ডা হ'তে হ'তে যখন তার জলের কণা সব জমে আসে তখন যে বরফের বৃষ্টি হয় সেই বরফ দেখ্‌তে সাদা তুলোর মত; তাকে বলে 'স্নো' (Snow)। কিন্তু যদি বৃষ্টি না হয় আর বাতাস খুব স্থির থাকে আর সেই সঙ্গে খুব বেশী ঠাণ্ডা পড়ে তখন সে বরফ আর ডেলা বেঁধে পড়্‌তে পারে না। সে মিহি গুঁড়োর মত বাতাসে ভাস্‌তে ভাস্‌তে যখন মাটিতে পড়ে—তখন কে বল্‌বে যে সেটা বরফ! তখন তার যে কত রকম চেহারা খোলে! বরফের কণায় কণায় দানা বেঁধে যখন পাঁপ্‌ড়ির মত হ'য়ে জমতে থাকে—তখন দেখায় ঠিক যেন স্ফটিকের ঝাড়, স্ফটিকের ফুল, স্ফটিকের পাতা। তার কারিকুরি এত সুন্দর যে মনে হয় কেউ ইচ্ছা ক'রে সখের জন্যই সব গড়ে রেখেছে। কিন্তু বরফের এ চেহারা বেশীক্ষণ থাকে না—একটু রোদ বা বাতাস লাগ্‌লেই তার সব কারিকুরি মুছে যায়। আর খুব বেশী বরফ জম্‌লে সে নিজের চাপেই জমাট বেঁধে শক্ত হয়ে যায়।

বরফ যে শুধু ওস্তাদ কারিকর, তা নয়—গানবাজনা বিষয়েও সে একজন ভাল সমঝ্‌দার। জল যেখানে ঝর্‌তে ঝর্‌তে জমে যায় সেখানে বরফ ঝাড়ের মত ঝুল্‌তে থাকে। আল্‌প্‌স্‌ পাহাড়ের যেখান দিয়ে নেপোলিয়ান্‌ ইটালি আক্রমণ কর্‌তে গিয়েছিলেন, সেই সেণ্ট বার্ণার্ডের পাহাড়ে শীতকালে ৬০।৭০ হাত লম্বা বরফের ঝাড় দেখা

যায়। সেই ঝাড়ের ভিতরে যখন হুহু ক'রে বাতাস খেল্‌তে থাকে, তখন সেই ঝাড়গুলো বাঁশীর মত বাজ্‌তে থাকে! সেই 'বাঁশীর' আওয়াজ এমন গম্ভীর আর ভয়ানক শোনায় যে সেখানকার লোকে সেই শব্দকে "ভূতের গান" মনে ক'রে ভয় পায়। বাতাস যখন ঝড়ের মত ছুট্‌তে থাকে—বাঁশীর চীৎকারে বহুদূর পর্য্যন্ত লোকের ঘুম ভেঙ্গে যায়!

বরফ ঝাড়ের বাঁশী।

এ সব বরফের খেয়াল। পাহাড়ের উপর বিশ হাত পুরু বরফ জমে আছে—হঠাৎ কথা নেই বার্ত্তা বার্ত্তা নেই হুড়্‌হুড়্‌ ক'রে সে বরফ গড়িয়ে ঘর বাড়ী চেপে নীচে পড়্‌ল! বরফ যাকে চাপা দেয় তাকে খুব যত্ন ক'রে রক্ষা করে। কত হাজার বছর আগে সেকালকার কোন্ জানোয়ার বরফে চাপা প'ড়ে ম'রেছে মানুষ আজও কত সময়ে তার চিহ্ন পায়, তার গায়ের লোম পর্য্যন্ত যেমন ছিল তেমনি আছে! খাবার জিনিষ অনেক দিন পর্য্যন্ত ভাল রাখ্‌তে হ'লে—অনেক সময় তাকে বরফের মধ্যে গুঁজে রাখা হয়। এই রকমে আস্ত গরু ভেড়া পর্য্যন্ত বরফের মধ্যে জমিয়ে অনেক রাখা যায়। সাইবিরিয়া ভয়ানক ঠাণ্ডা দেশ, সেখানের লোকেরা বাঁশে ক'রে দুধ জমিয়ে রাখে। সেই লাঠির মত শক্ত দুধ তারা কেটে কেটে ইঞ্চি হিসাবে বিক্রী করে!

শীতকালের সকালে এক এক সময় দেখ নি নিঃশ্বাস কেমন ধোঁয়ার মত হয়ে বেরোয়। যাঁরা মেরুর দেশে গিয়েছেন তাঁরা বলেন সেখানে নিশ্বাসের জলকণা জমে গোঁফের মধ্যে বরফ হ'য়ে ঝুল্‌তে থাকে—সেই বরফকে ক্রমাগত ঘষে ঘষে ঝেড়ে ফেল্‌তে হয়।

বরফ যখন সখ ক'রে সমুদ্রে ঘুরে বেড়ায় সেটা মানুষের পক্ষে খুবই বিপদের

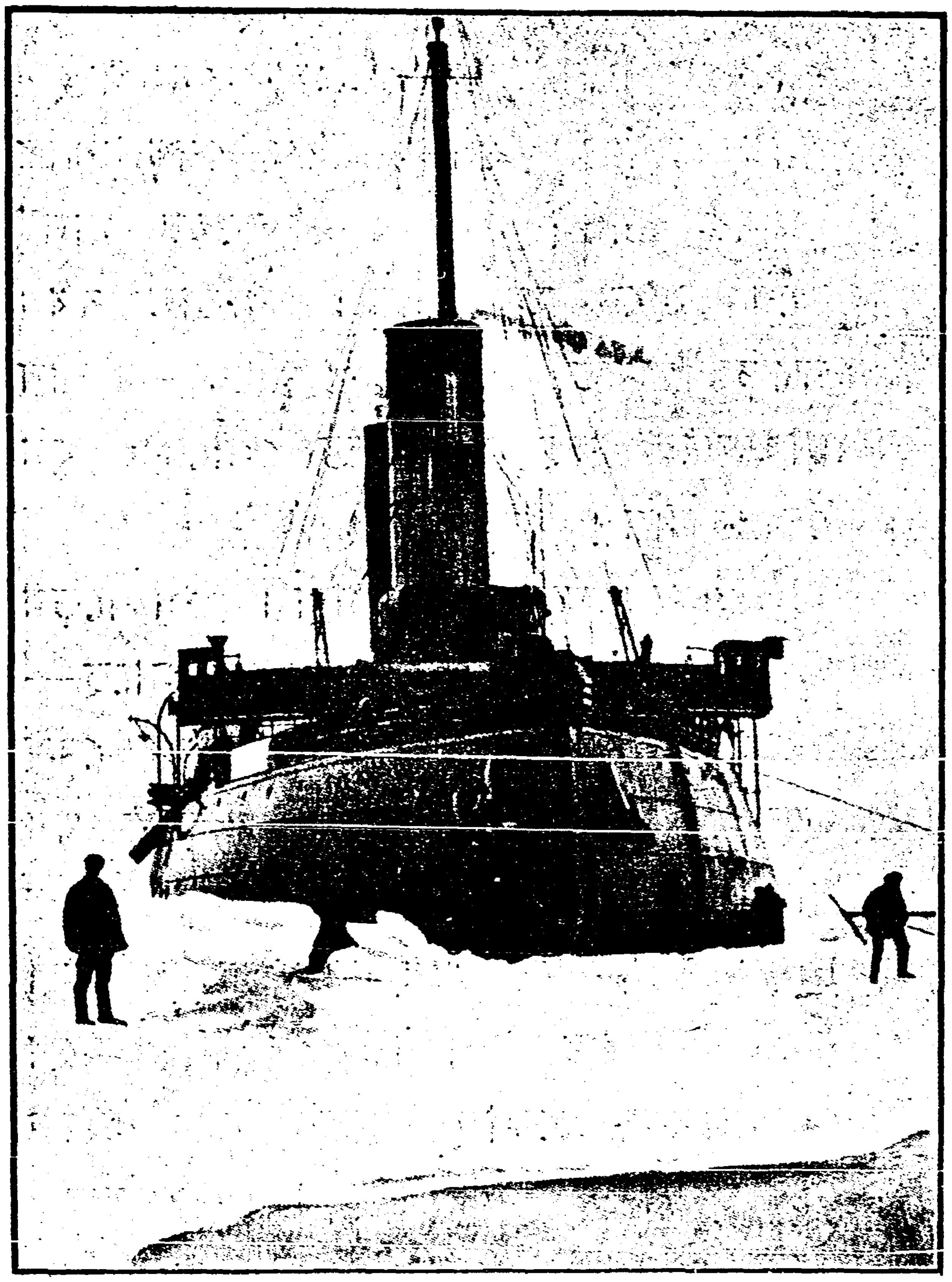

কথা; কারণ তার গুঁতোয় প্রতি বছরেই অন্তত দুচারটা জাহাজ ডুবি হয়। খুব ঠাণ্ডা দেশে অনেক সময় বরফ জমে একেবারে সমুদ্রকে-সমুদ্র ঢেকে ফেলে—জাহাজের আর চলা ফেরার পথ থাকে না। শীতকালে যখন বল্‌টিক সাগর জ'মে যায়—তখন রুশিয়ার বন্দর গুলার কাজ কর্ম্ম বন্ধ হ'য়ে আসে; এইজন্য রুশিয়ানরা একটা মস্ত জাহাজ বানিয়েছে, তার কাজ কেবল বরফ ভেঙে ভেঙে অন্য জাহাজের পথ ক'রে দেওয়া। এমন ভয়ানক মজবুৎ জাহাজ আর কোথাও নাই! সমস্ত শীতকাল ধরে এই জাহাজকে বরফের সঙ্গে রীতিমত লড়াই করতে হয়।

আবোল তাবোল।

গান জুড়েছেন গ্রীষ্মকালে ভীষ্মলোচন শর্ম্মা—
আওয়াজখানা দিচ্ছে হানা দিল্লী থেকে বর্ম্মা!
গাইছে ছেড়ে প্রাণের মায়া গাইছে হেঁকে প্রাণপণ,
ছুট্‌ছে লোকে চারদিকেতে ঘুর্‌ছে মাথা ভন্‌ভন্‌!
মর্‌ছে কত জখম হ'য়ে কর্‌ছে কত ছট্‌ফট্‌;
বল্‌ছে হেঁকে 'প্রাণটা গেল গানটা থামাও ঝট্‌পট্‌'!

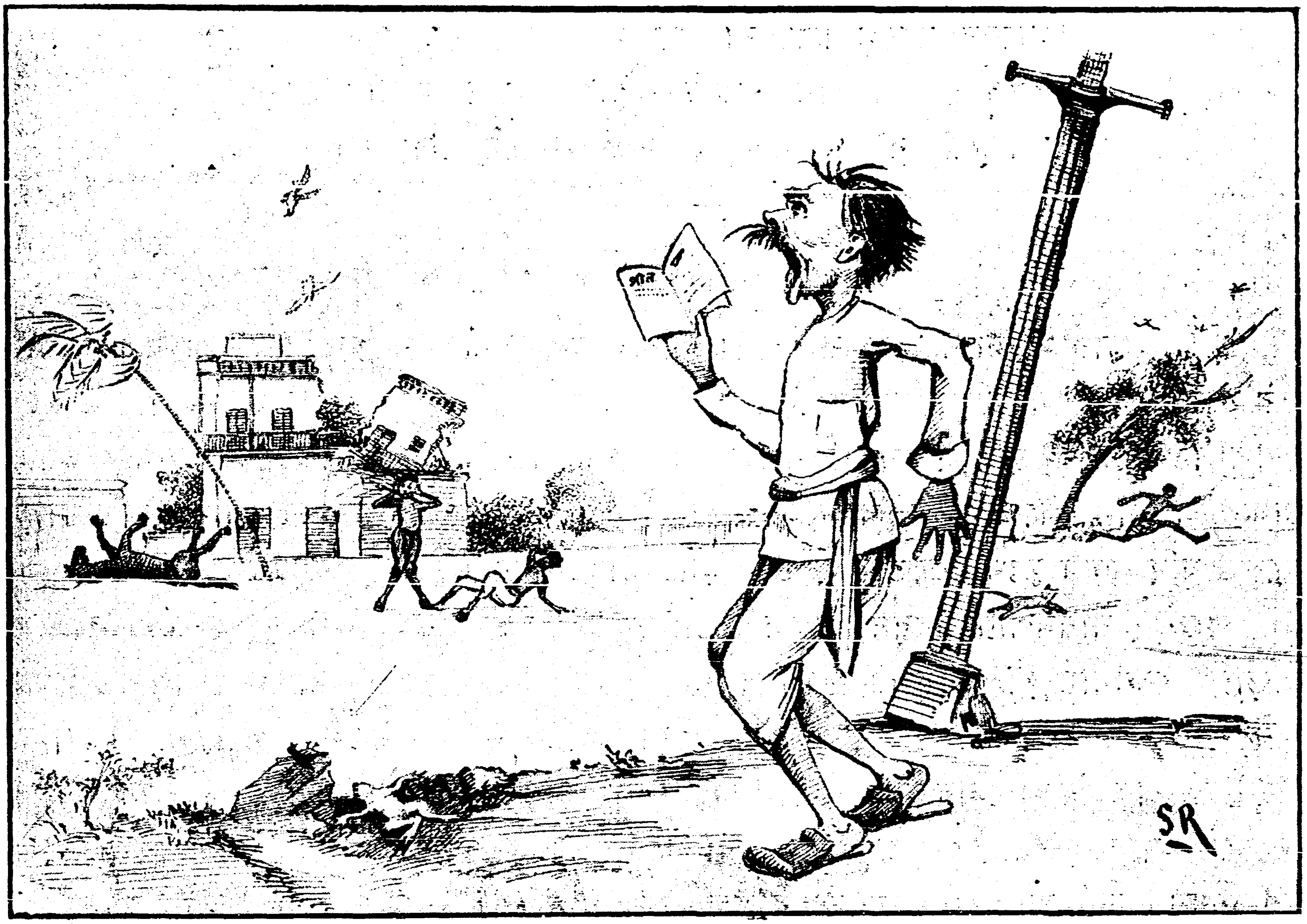

বাঁধন ছেঁড়া মহিষ ঘোড়া পথের ধারে চিৎপাত ;
ভীষ্মলোচন গাইছে তেড়ে নাইক তাহে দৃক্‌পাত।
চার পা তুলি জন্তুগুলি পড়্‌ছে বেগে মূর্চ্ছায় ;
লাঙ্গুল খাড়া পাগল পারা বল্‌ছে রেগে "দূর ছাই"।
জলের প্রাণী অবাক মানি গভীর জলে চুপ্‌চাপ্‌—
গাছের বংশ হ'চ্ছে ধ্বংস পড়্‌ছে দেদার ঝুপ্‌ঝাপ্‌।
শূন্যমাঝে ঘূর্ণা লেগে ডিগ্‌বাজী খায় পক্ষী,
সবাই হাঁকে আর না দাদা থাম্‌নারে ভাই লক্ষ্মী।
গানের দাপে আকাশ কাঁপে দালান ফাটে বিল্‌কুল,
ভীষ্মলোচন গাইছে ভীষণ খোস্‌মেজাজে দিল্‌খুল।

এক যে ছিল পাগ্‌লা ছাগল এম্নি সেটা ওস্তাদ—
গানের তালে শিং বাগিয়ে মার্‌লে গুঁতো পশ্চাৎ।
আর কোথা যায় একটি কথায় গানের মাথায় ডাণ্ডা,
'বাপ্‌রে' ব'লে ভীষ্মলোচন একেবারে ঠাণ্ডা!

গল্পস্বল্প।

গত মাসের সন্দেশে 'উদোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে' বলে কয়েকটা গল্প ছিল। এমনি-তর একটা গল্প সেই চীনাখালির সেই যদুরায়ের সম্বন্ধেও শুনতে পাওয়া যায়। একজন ধোপা ছিল, ভারী দুষ্টু; সে একবার যদুরায়দের বাড়ীর একটি চাকরকে অপমান করে। চাকর অপমান খেয়ে কাঁদ কাঁদ হয়ে এসে রায়মশায়কে বল্ল, "কর্ত্তা, আপনাদের চাকর হয়েও যদি এমন দুঃখ পেতে হয়, তবে আর দাঁড়াই কোথায়?"

শুনেই রায়মশায় বিষম রেগে বল্লেন, "বটে? এমন কথা? আরে তাই ত, দাঁড়াবি কোথায়?" তারপর বিশাল এক লাঠি হাতে তিনি ধোপার বাড়ীতে গিয়ে, এক বুড়োকে ধরে মারেন আর কি! বুড়ো তাতে বেজায় থতমত খেয়ে বল্ল, "দোহাই কর্ত্তা, আমার কোন দোষ নেই, আমি আপনার চাকরকে কিচ্ছু বলিনি। তাকে গাল দিয়েছে আমার ভাগ্নে, সে বাড়ী নাই, বাজারে চলে গিয়েছে।"

তখনই রায়মশায় সেই লাঠি বগলে করে বাজারের দিকে ছুটলেন, আর, পথে সেই দুষ্টু ধোপাকে দেখতে পেয়ে, তাকে খুব করে ঠেঙ্গালেন। ধোপা মার খেয়ে কাছারিতে গিয়ে নালিশ করল,—রায়মশায়ের নামে নয়, দশরথ বলে আরেক জনের নামে। হাকিমের বিচারে সেই দশরথের একটাকা জরিমানা হল!

ধাঁধা।

কাজ নিয়ে স্বরু করি শেষ মোর জলে,
আগে পিছে কাল মোর সাথে সাথে চলে।
তবু যদি নাহি বোঝ আরো রাখ শুনে,
চোখে চোখে রাখে লোকে কহ কোন্ গুণে?

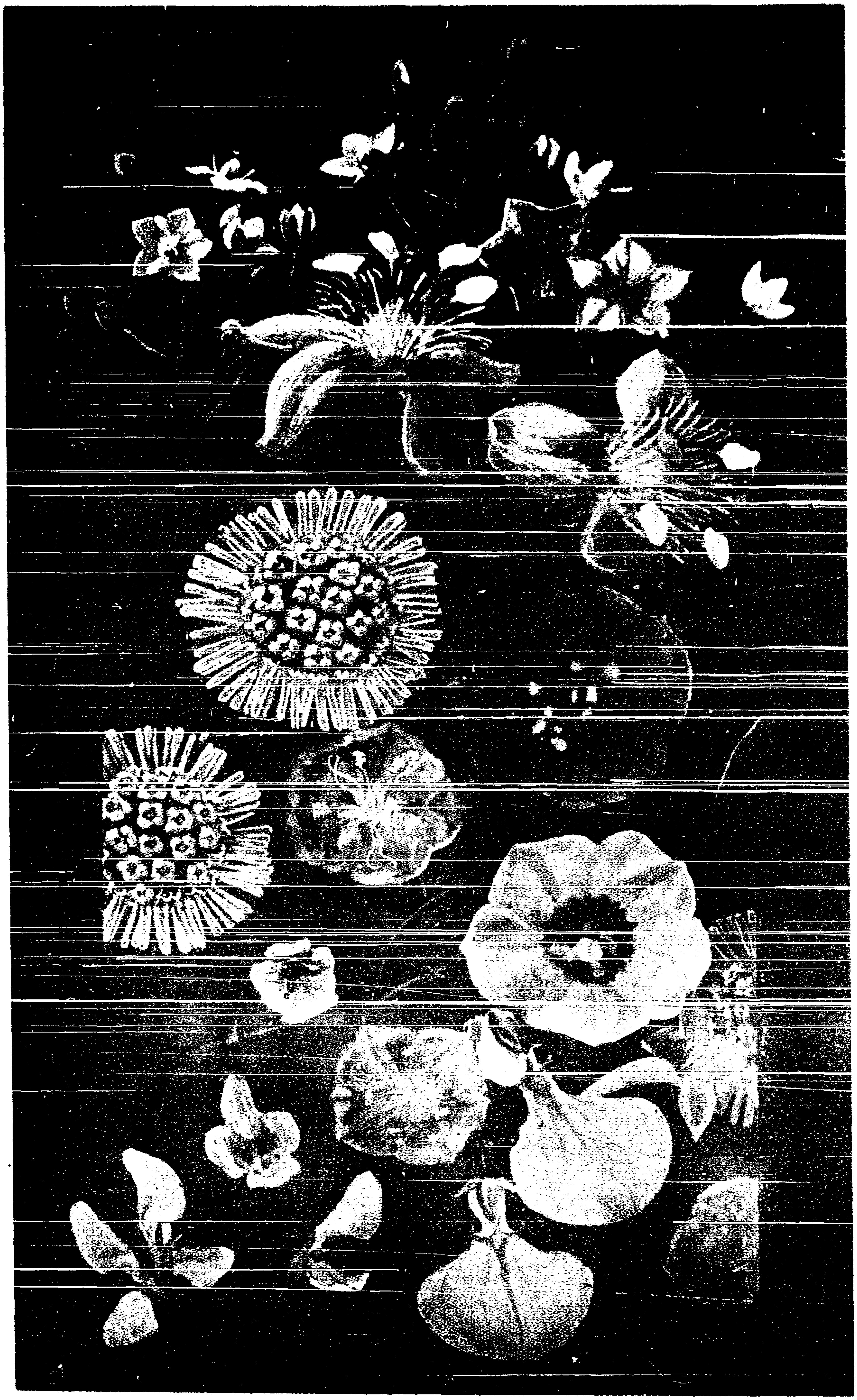

পথের ধারের অজানা ফুল

কয়েকটি ছোট ফুল অণুবীক্ষণ দিয়ে আঁকা।

সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং ষষ্ঠ সংখ্যা
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

তৃতীয় বর্ষ   আশ্বিন, ১৩২২

চাঁদের বিপদ।

চাঁদটাকে ভাই দেখেছিলুম, থালার মত গোল
এই যে দু'দিন আগে,
আজ্‌কে যেন আমার চোখে, কেমনতর ঠেকে
নতুনতর লাগে।
খানিকটা তার খসে গেছে, ওর ওভাই, কেমন করে
নাইক তাত জানা।
চাঁদের বুড়ী অসাবধানী, ফেলে দিয়ে ভাই, বুঝি
ভেঙ্গেছে তার কাণা।
বৃষ্টি পড়ে ধুয়ে গেছে, হতেও পারে তাও
অনেকখানি সুধা ;
চকোর পাখী জব্দ এবার, কেমন করে, ভাই
মিটাবে তার ক্ষুধা ?
আয় নারে ভাই, ছুটে যাই, খুঁজি চারিদিকে
পাতি পাতি ক'রে
সুধার রাশি কোথায় জড়, চাঁদের কণাটুকু
কোথায় আছে পড়ে ?

কৃষ্ণের কথা।

পূতনা বলিয়া একটা বড়ই ভীষণ রাক্ষসী কংসের রাজ্যে বাস করিত। ছোট ছোট ছেলেদিগকে কৌশলে বধ করাই ছিল ইহার ব্যবসায়। রাত্রিকালে কোন খোকা খুকী এই হতভাগিনীর দুধ পান করিলে আর তাহাদের রক্ষা ছিল না। সে সব খোকা খুকীর দেহ তখনই চূর্ণ হইয়া যাইত।

যখন জানা গেল যে কংসকে মারিবার লোকের জন্ম হইয়াছে, অমনি সে দুষ্ট এই পূতনাকে ডাকিয়া বলিল যে "যত ষণ্ডা ষণ্ডা খোকা দেখিবে, সকলকেই বধ করিতে হইবে।" তদবধি সেই হতভাগিনী কেবলই লোকের ছোট ছোট খোকা মারিয়া বেড়ায়। এমনি করিয়া কত খোকার প্রাণ যে সে হরণ করিল, তাহার সংখ্যা নাই।

নন্দের একটি খোকা হইয়াছে শুনিয়া, এই রাক্ষসী এক দিন গোকুলে আসিয়া উপস্থিত হইল! তখন কিন্তু তাহার রাক্ষসী মূর্ত্তি ছিল না। সে এমনি সুন্দর একটি মেয়ে সাজিয়া, এমনি সুন্দর বেশ ভূষা করিয়া, এমনি মিষ্ট হাসি হাসিয়া আসিয়াছিল যে, তাহাকে দেখিয়া সকলে ভাবিল, নিশ্চয় স্বয়ং লক্ষ্মী গোকুলে আসিয়াছেন। সে যে দিকে যায়, সকলে তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিয়া জড়সড় ভাবে সরিয়া দাঁড়ায়। দুষ্ট রাক্ষসী ধীরে ধীরে গিয়া সূতিকা ঘরে ঢুকিল, কেহই তাহাকে নিষেধ করিল না। সে ঘরে যশোদা ছিলেন, বলরামের মা রোহিণীও ছিলেন; তাঁহারা তাহাকে দেখিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

রাক্ষসী এক পা দু পা করিয়া আসিয়া বিছানার পাশে বসিল ও হাসিতে হাসিতে, যেন কতই আদরে, খোকাটিকে কোলে তুলিয়া দুধ খাওয়াইতে লাগিল। যশোদাও কিছু বলিলেন না, রোহিণীও কিছু বলিলেন না; রাক্ষসীর মায়ায় তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

কিন্তু খোকা সে মায়ায় ভোলে নাই। যিনি স্বয়ং বিষ্ণু, রাক্ষসীর মায়া তাঁহার কাছে খাটিবে কেন? রাক্ষসী হাসিতে হাসিতে খোকাকে দুধ খাইতে দিল, খোকা সেই দুধের সঙ্গে অভাগীর প্রাণ অবধি চুষিয়া লইল! তখন যে রাক্ষসী চ্যাঁচাইয়াছিল, তেমন চীৎকার আর গোকুলের কেহ কোন দিন শুনে নাই। তাহারা সকলে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে তখনই ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া দেখিল—কি ভীষণ ব্যাপার! বিকট রাক্ষসী মৃত্যু যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, তিন গব্যূতি (৬ ক্রোশ) পরিমিত স্থানের গাছ

পালা তাহার দেহের চাপনে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে! রাক্ষসীর এক একটা দাঁত যেন একেকটা লাঙ্গলের ফাল, নাকের ছিদ্র যেন পর্ব্বতের গুহা, চোখ দুটা যেন দুটা কুয়া! সেই রাক্ষসীর বুকের উপর শুইয়া খোকা আনন্দে হাত পা ছুঁড়িতেছে! তখনই সকলে খোকাকে কোলে তুলিয়া লইল, আর ক্রমাগত 'ষা'ট্ ষা'ট্' বলিতে বলিতে কত দেবতার নাম যে করিল তাহার অন্তই নাই। উহারা যদি জানিত যে সেই খোকাটাই রাক্ষসীটাকে মারিয়াছে, তবে না জানি কত আশ্চর্য্য হইত।

আর এক দিন খোকাকে একটা গাড়ীর নীচে, একটি ছোট্ট খাটে শোয়াইয়া রাখা হইয়াছিল। বোধ হয় এই ভাবে তাহাকে প্রায়ই শোয়াইয়া রাখা হইত। সে দিন বাড়ীতে কিসের উৎসব ছিল, সকলে তাহাতেই মত্ত, খোকার কথা আর কাহারও মনে নাই। খোকার কিন্তু এদিকে বড়ই ক্ষুধা হইয়াছে, তাহার দরুণ সে পা ছুঁড়িয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছে। পা ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে একবার তাহার লাথি লাগিয়া, হাঁড়ি কলসীতে বোঝাই সেই প্রকাণ্ড গাড়ীখানা উল্টিয়া গেল। সে সব হাঁড়ি কলসী তখনই খান খান হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল, আর শব্দও অবশ্য যেমন তেমন হইল না। তাহা শুনিয়া সকলে ছুটিয়া আসিয়া দেখিল যে, খোকা চিৎ হইয়া পড়িয়া পা ছুঁড়িতেছে, তাহার পাশে গাড়ীখানা উল্টান, আর হাঁড়ি কলসী চূর্ণ হইয়া তুমুল কাণ্ড উপস্থিত। এত বড় গাড়ী কি করিয়া উল্টিল, একথা সকলেই তখন ব্যস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। সেখানে আর কয়েকটি বালক ছিল, তাহারা খোকাকে দেখাইয়া বলিল যে, "এই খোকা পা ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে গাড়ী উল্টাইয়া ফেলিয়াছে; আমরা দেখিয়াছি।" শুনিয়া সকলে হাঁ করিয়া একবার খোকার দিকে, একবার গাড়ীখানার দিকে তাকাইতে লাগিল!

খোকাটি একটু বড় হইলে তাহার 'কৃষ্ণ' নাম রাখা হইল। রোহিণীর খোকার নাম যে 'বলরাম', তাহাও এই সময়ে রাখা হয়। কি দুরন্ত দুটি খোকাই তাহারা ছিল!

যখন কৃষ্ণ আর বলরাম এক সঙ্গে হামাগুড়ি দিয়া বেড়াইতে শিখিলেন, তখন হইতে আর এক মুহূর্ত্তের জন্যও কাহারও নিশ্চিন্ত থাকিবার যো রহিল না। ছাই আর গোবর দেখিলেই দুটি খোকা অমনি তাহা লইয়া গায়ে মাখাইবে, যশোদার সাধ্য কি যে তাহাদিগকে বারণ করেন। একটু চোখের আড়াল হইলেই তাহারা গোয়ালঘরে ঢুকিয়া ছোট ছোট বাছুরগুলির লেজ ধরিয়া টানা টানি আরম্ভ করিত। ইহাদের পিছু পিছু ছুটা ছুটি করিয়া যশোদা নাকালের একশেষ হইতে লাগিলেন। শেষে এক দিন তিনি আর কিছুতেই ইঁহাদিগকে সামলাইতে না পারিয়া রাগের ভরে বকিতে বকিতে লাঠি

খোকা কৃষ্ণ গাছ ভাঙ্গিতেছে।

হাতে কৃষ্ণকে তাড়া করিলেন। তারপর তাঁহাকে ধরিয়া, মোটা দড়ি দিয়া একটা উদূখলের সঙ্গে বাঁধিয়া বলিলেন, "পালা দেখি এখন!"

এই বলিয়া যশোদা নিশ্চিন্ত মনে ঘরের কাজে গিয়াছেন, আর কৃষ্ণও অমনি সেই উদূখল টানিয়া উঠান পাড়ি দিতে আরম্ভ করিয়াছে। উদূখল টানিতে টানিতে তিনি দুটি অর্জ্জুন গাছের মধ্য দিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু গাছ দুটি খুব কাছা কাছি থাকায় উদূখলটি সেখান দিয়া গলিতে না পারিয়া আটকাইয়া গেল। তখন কৃষ্ণের টানাটানিতে সেই প্রকাণ্ড গাছ দুটি মহাশব্দে ভাঙ্গিয়া পড়ায় সকলে ভাবিল, না জানি কি হইয়াছে। তাহারা নিতান্ত ব্যস্ত ভাবে ছুটিয়া আসিয়া দেখিল যে খোকা দুই গাছের মাঝখানে বসিয়া, তাহার ছোট ছোট দাঁত কটি বাহির করিয়া হাসিয়া অস্থির; তাহার পেটের সঙ্গে দড়ি দিয়া উদূখল বাঁধা। সেই হইতে কৃষ্ণের একটি নাম হইল 'দামোদর', কি না 'পেটে-দড়ি' (দাম=দড়ি, উদর=পেট) যা হোক, সে প্রকাণ্ড গাছ ভাঙ্গা যে সেই খোকার কাজ, একথা কেহ বুঝিতে পারিল না। বুড়ারা বলিল, "এখানে বড়ই উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে দেখিতেছি; গাড়ী উল্‌টিয়া যায়, বিনা ঝড়ে গাছ ভাঙ্গিয়া পড়ে। এখানে আর থাকা উচিত নয়; চল আমরা বৃন্দাবনে চলিয়া যাই।" এই বলিয়া তখনই সকলে গোকুল ছাড়িয়া বৃন্দাবনে চলিয়া গেল।

কুঁজো আর ভূত।

কানাই বলে একটি লোক ছিল, তার পিঠে ছিল ভয়ঙ্কর একটা কুঁজ। বেচারা বড্ড ভাল মানুষ ছিল, লোকের অসুখ বিসুখে ওষুদ পত্র দিয়ে তাদের কত উপকার করত। কিন্তু কুঁজো বলে তাকে কেউ ভালবাসত না।

কানাইয়ের ঝুড়ির দোকান ছিল; আর কোন ঝুড়িওয়ালা তার মত ঝুড়ি বুনতে পারত না। তারা তাকে ভারী হিংসা করত, আর তার নামে যা তা বলে বেড়াত। তা শুনে লোকে ভাবত কানাই বড় দুষ্ট লোক; তাকে দেখতে পেলে সকলে মুখ ফিরিয়ে থাকত। বেচারার দুঃখের সীমাই ছিল না।

এত বড় কুঁজ নিয়ে মাথা গুঁজে চলতে কানাইর বড়ই কষ্ট হত। একদিন সে একটু দূরে এক জায়গায় ঝুড়ি বেচতে গেল, আর দিন থাকতে ঘরে ফিরতে পারল না। পথে একটা পুরাণো বাড়ীর কাছে এসে এমনি অন্ধকার হল, আর তার এতই কাহিল

বোধ হল যে, আর চলা অসম্ভব। সে জায়গাটা ভারী বিশ্রী; লোকে প্রাণান্তেও সে পথে রাত্রে আসতে চায় না, বলে, ওটা ভূতের বাড়ী। কিন্তু কানাইর বড্ডই পরিশ্রম হয়েছে, চলবার আর সাধ্য নাই। কাজেই সে সেখানে পথের পাশে একটু না বসে আর কি করে।

লস্থন্ হ্যায়, মরীচ্ হ্যায়, চ্যাং ব্যাং শুঁট্‌কী হ্যায়।

কতক্ষণ সে এভাবে বসেছিল তার কিছু ঠিক নাই। বসে থাকতে থাকতে তার মনে হল যেন সেই পুরাণো বাড়ীটার ভিতর থেকে আওয়াজ আসছে। অনেকগুলো গলা মিলে, আহা, কি সুন্দর সুরেই গাইছে! শুনে কানাইর প্রাণ জুড়িয়ে গেল। সে অবাক হয়ে খালি শুনতেই লাগ্‌ল। গানের সুরটি অতি আশ্চর্য্য, কিন্তু কথা খালি এইটুকু ঃ—

"লূণ হ্যায়, তেল হ্যায়, ইম্‌লী হ্যায়, হীং হ্যায়!"

শুনতে শুনতে কানাই একেবারে মেতে গেল, সে ভাবল যে তার ও গানটা না গাইলেই চলছে না। কাজেই সেও খুব করে গলা ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গে ধরল ঃ—

"লূণ হ্যায়, তেল হ্যায়, ইম্‌লী হ্যায়, হীং হ্যায়।"

এইটুকু গেয়েই ঝাঁ করে তার বুদ্ধি খুলে গেল, সে আরো উঁচু সুরে গাইল ঃ—

"লস্থন হ্যায়, মরীচ হ্যায়, চ্যাং ব্যাং শুঁট্‌কী হ্যায়!"

কানাই এই কথাগুলো খুব গলা ছেড়েই গেয়েছিল; সে গলার আওয়াজ যে সেই বাড়ীর ভিতরের গাইয়েদের কানে গিয়ে পোঁছিয়ে ছিল, তাতে আর কোন ভুল নাই। সে গাইয়েগুলো ছিল অবশ্যি ভূত। তারা সেই নূতন কথাগুলো শুনে এতই খুসী

হল যে, তখনি ছুটে কানাইর কাছে না এসে আর থাকতে পারল না। তারা এসে কানাইকে কোলে করে নাচতে নাচতে সেই বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গেল, আর আদরটা যে করল! মিঠাই যে তাকে কত খাওয়াল, তার অন্তই নাই। তারপর সকলে মিলে নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে গাইতে লাগল ঃ—

"লূণ হ্যায়, তেল হ্যায়, ইম্‌লী হ্যায়, হীং হ্যায়,
লসুন্ হ্যায়, মরীচ্ হ্যায়, চ্যাং ব্যাং শুঁট্‌কী হ্যায়।"

কানাইকেও তাদের সঙ্গে নেচে নেচে গানটি গাইতে হল। তখন হঠাৎ তার মনে হল, "কি আশ্চর্য্য! আমি কুঁজ নিয়ে চলতে পারি না, আমি আবার নাচ্‌লুম কি করে?" বলতে বলতেই তার হাত খানি পিঠের দিকে গেল,—একি? তার সে কুঁজ যে আর নাই! একজন ভূত বল্ল, "কি দেখছিস্ বাপ? ওটা আর ওখানে নাই; ঐ ছ্যাখ্ তোর পাসে পড়ে আছে!"

সত্যি সত্যি সে কুঁজ আর কানাইর পিঠে ছিল না, সেটা তার পাশে পড়েছিল। আহা! কানাইর তখন কি আনন্দই হল! আর, হাল্‌কা আর আরাম বোধ হল এমনি, যে, সে তখনি সেইখানে মেঝেতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর যখন পর দিন সকালে তার ঘুম ভাঙ্গল, তখন সে দেখল যে সেই বাড়ীর বাইরে রাস্তার ধারে শুয়ে আছে; ভূতেরা তাকে একটি চমৎকার নতূন পোষাক পরিয়ে সেখানে এনে রেখে গিয়েছে। তখন সে তাড়াতাড়ি উঠে মনের সুখে বাড়ী চলে এল। সেখানকার লোকেরা তার মুখের পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকায়, কেউ তাকে চিনতে পারে না। সে যে তাদের সেই কুঁজো কানাই, ভূতেরা তার কুঁজ ফেলে তার এমনি সুন্দর চেহারা করে দিয়েছে, একথা তাদের বোঝাতে তার অনেক ক্ষণ লেগেছিল।

তারপর দেখতে দেখতে কানাইর কুঁজের গল্প দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। যে শুনল, সেই ভাবল যে এমন আশ্চর্য্য কথা আর কখনো শোনেনি। এখন আর লোকে তাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে থাকে না; তারা হাসতে হাসতে ছুটে এসে তার সঙ্গে কথা কয়, আর বাড়ীর লোককে তার সেই আশ্চর্য্য খবর শোনাবার জন্য তাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যায়। কত লোক শুধু সেই গল্প শুনবার জন্যই তার ঝুড়ি কিনতে আসে। ঝুড়ি বেচে সে বড় লোক হয়ে গেল।

এমনি করে দিন যাচ্ছে। তারপর এক দিন কানাই তার ঘরের দাওয়ায় বসে ঝুড়ি বুনছে, এমন সময় একটি বুড়ী সেই পথে এসে তাকে জিজ্ঞাসা করল, "হ্যাঁগা!

কেবলহাটি যাব কোন্ পথে ?" কানাই বল্ল, "এই ত কেবলহাটি ; তুমি কি চাও ?" বুড়ী বল্ল, "তোমাদের গ্রামে নাকি কানাই বলে কে আছে, ভূতেরা তার কুঁজ সারিয়ে দিয়েছিল। তার মন্তরটা তার কাছে থেকে শিখে নিতে পারলে আমাদের মানিকের কুঁজটাও সারিয়ে নিতুম।"

কানাই বল্ল, "আমিই ত সেই কানাই ; ভূতেরা আমারি কুঁজ সারিয়ে দিয়েছিল। এর ত আর মন্তর টন্তর কিছু নাই,—তারা রাত জেগে গান গাইছিল, আমি পথের ধারে শুয়ে শুয়ে তাদের গানে নতুন কথা যুড়ে দিয়েছিলাম ; তাইতে তারা খুসী হয়ে আমার কুঁজ সারিয়ে নতুন পোষাক পরিয়ে দিয়েছিল।" বুড়ী তখন খুঁটে খুঁটে সব কথা কানাইর কাছে থেকে জেনে নিয়ে, তাকে অনেক আশীর্ব্বাদ করে সেখান থেকে চলে গেল।

সেই বুড়ীর ছেলে যে মাণিক, তার পিঠে ছিল কানাইর কুঁজের চেয়েও ঢের বড় একটা কুঁজ। লোকটা এমনি দুষ্ট আর হিংসুকে ছিল যে পাড়ার লোকে তার জ্বালায় অস্থির থাকত। সেই মাণিকের কুঁজ সারাবার জন্য তার বাড়ীর লোকেরা এক দিন রাত্রে তাকে গাড়ী করে এনে ভূতের বাড়ীর কাছে রেখে গেল। সেখানে পড়ে পড়ে মাণিক ভাবছে, কখন ভূতেরা গান ধরবে, আর তাতে সে কথা যুড়ে দিবে, আর তার কুঁজ সেরে যাবে। তারপর যেই ভূতেরা বলেছে,

"নূণ হ্যায়, তেল হ্যায়, ইম্‌লী হ্যায়,——

অমনি মাণিক আর তাদের শেষ করতে না দিয়ে চেঁচিয়ে বল্ল,—

"গুরুচরণ ময়রার দোকানের কাঁচা গোল্লা হ্যায় !!"

তখন গানের তাল ভেঙ্গে ত গেলই, কাঁচাগোল্লার নাম শুনে অনেক ভূতের বমি অবধি হতে লাগল। ভূতেরা এ সব জিনিসকে বড্ড ঘৃণা করে, এর নাম অবধি শুনতে পারে না। কাজেই তারা তাতে বেজায় চটে দাঁত খিঁচুতে খিঁচুতে এসে বল্ল, "কে রে তুই, অসভ্য বেতালা বেটা, আমাদের গান মাটি করে দিলি ? দাঁড়া তোকে দেখাচ্ছি !" এই বলে তারা কানাইর সেই কুঁজটা এনে মাণিকের কুঁজের উপরে বসিয়ে এমনি করে যুড়ে দিল যে আর কিছুতেই তাকে তুলবার যো নাই।

পরদিন মাণিকের বাড়ীর লোকেরা এসে তাকে দেখে অবশ্যি খুবই আশ্চর্য্য আর দুঃখিত কিন্তু গ্রামের লোকেরা বল্ল, "বেটা যেমন দুষ্টু, তেমনি সাজা হয়েছে।"

অদ্ভুত ব্যাপার।

মাছির পিঠে পোকা বেড়ায়, মাছি মানুষের পিঠে চড়ে বেড়ায়, তাকে নিয়ে মানুষ আবার হাতী ঘোড়া চড়ে বেড়ায়। যা হোক আমি মাছির পোকা বা হাতীর কথা বলতে যাচ্ছি না; আমি শুধু বলতে চাচ্ছি যে, সংসারময়ই এমনি তর ব্যাপার দিন রাত ঘটছে। চাঁদ আমাদের পৃথিবীর চারধারে ঘোরে, পৃথিবী তাকে নিয়ে সূর্য্যের চারধারে ঘোরে, সূর্য্য নাকি আবার এদের সকলকে নিয়ে আরেকটা কিসের চারধারে ঘোরে,—অন্ততঃ পণ্ডিতেরা এই রকম সন্দেহ করছেন।

সূর্য্য যে এক জায়গায় বসে নাই, এ কথা অনেক দিন থেকেই জানা আছে। সে আকাশের কোন্ দিক পানে ছুটে চলেছে, তাও জানতে বাকি নাই। আমরা সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে সেদিক পানে যত এগোচ্ছি, সে দিককার তারাগুলো ততই ক্রমে ফাঁক ফাঁক হয়ে আসছে, আর তার উল্টো দিককার আকাশের তারাগুলো ক্রমে একটু বুঁজে আসছে। পথে চলবার সময়ও আমরা ঠিক এমনি দেখতে পাই; পথের দুধারের ঘরগুলো যত দূরে থাকে ততই যেন তারা কাছাকাছি হয়ে থাকে, আমরা যত তাদের কাছে যাই, ততই যেন তারা সরে সরে দাঁড়ায়। আকাশের তারাগুলোর কোন কোনটার যদি এমনি ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়, তবে আমরা অবশ্যই মনে করে নিতে পারি যে আমরা তাদের পানে ছুটে চলেছি।

ছুটে যে চলেছি, তাতে আর ভুল নাই, কিন্তু একটা কিছুর চারধারে যে ঘুরছি, এ কথাটা অনেকটা আন্দাজের উপরেই বলা হচ্ছে। কিন্তু পণ্ডিতেরা যা আন্দাজ করেন, সে কথাকে নিতান্ত অমান্য করা চলে না। তাঁদের কেউ কেউ আজকাল বলছেন যে, ক্যানোপাস্ (Canopus) বলে একটা অতি বিশাল তারা আছে, সূর্য্য তারি চারধারে ঘুরছে।

কি অদ্ভুত ব্যাপার! চাঁদ যে আমাদের পৃথিবীর চারধারে ঘুরছে, এ কথাটা আমাদের কাছে তেমন আশ্চর্য্য ঠেকে না। আমাদের এই বিশাল পৃথিবী, তার চার ধারে ঐ ছোট্ট থালার মত চাঁদটি ঘুরবে, সে আর কত বড় কথা? অবশ্যি, আমরা জানি যে চাঁদ নিতান্ত ছোট জিনিস নয়, সে পৃথিবীর ৫০ ভাগের এক ভাগের সমান, তাতে ভারী ভারী পর্ব্বত আছে। তবু সে ত আর দেখতে তেমন বড় দেখায় না, আড়াই লাখ মাইল দূরে থেকে আমরা তাকে থালাটির মতই মনে করি।

কিন্তু পৃথিবী যে সূর্য্যের চারধারে ঘোরে, এ কথাটা প্রথমে এতই আশ্চর্য্য ঠেকেছিল যে, কেউ তা বিশ্বাস করতে চায় নি। এই যে বিশাল পৃথিবী, যার চারদিক ঘুরে আসতে ২৫০০০ মাইল হাঁটতে হয়,—এত বড় যে হিমালয় প্রভৃতি পর্ব্বত, সেগুলো যার গায় ফুস্কুড়ির মতন বই নয়—সে নাকি আবার ঐ সূর্য্যটির চারধারে ঘোরে!

যা হোক, এসব কথা এখন আমাদের হজম হয়ে গেছে। এখন আমরা জানি যে সূর্য্য এই সওয়া নয় কোটি মাইল দূরে আমাদের কাছে অতটুকু ঠেকলেও সে আসলে চৌদ্দ লক্ষ পৃথিবীর সমান বড়। এই পৃথিবী এক সময়ে ওরি পেটের ভিতরে ছিল। সুতরাং ওর চারধারে যে সে ঘুরছে, এটা তেমন নিন্দের কথা নয়।

আমরা ক্রমেই বড় বড় কথা বলছি। চাঁদের চেয়ে পৃথিবী ৫০ গুণ বড় আর আড়াই লক্ষ মাইল দূরে। পৃথিবীর চেয়ে সূর্য্য চৌদ্দ লক্ষ গুণ বড় আর সওয়া নয় কোটি মাইল দূরে। এ থেকে এই কথাটা সহজেই মনে আসে যে, সূর্য্য যে জিনিসটির চারধারে ঘুরবার কথা হচ্ছে, না জানি সেটি কত বড়, আর কত দূরে!

তারাগুলি যে প্রত্যেকে একেকটি সূর্য্য, এ কথা অবশ্য তোমরা সকলেই জান, না জানলে এই বেলা এ কথাটা শিখে নাও। ওদের সকলেই সূর্য্য; একেকটা আমাদের এই সূর্য্যের চেয়েও ঢের বড়। ঐ ক্যানোপাস্ তারাটি আমাদের সূর্য্যের প্রায় চব্বিশ লক্ষটির সমান বড়, প্রায় চৌদ্দ লক্ষটির সমান ভারী, আর প্রায় পঞ্চাশ হাজারটির সমান উজ্জ্বল।

এই তারাটি এখান থেকে প্রায় ২৮৬৮৩২৫৩৪৪০০০০০০ মাইল দূরে। আলোক প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১৮ হাজার মাইল চলে, সেই আলোকের ক্যানোপাস্ থেকে এখানে পৌঁছাতে ৪৮৯ বৎসর লাগে।

এত বড় কথা আমরা শুধু মুখেই বলতে পারি, কিন্তু ভেবে দেখতে পারি না। সূর্য্য ক্যানোপাসের চারদিক ঘুরে আসতে হলে এর দ্বিগুণ চওড়া জায়গার দরকার। সে খুবই বড় জায়গা তাতে আর ভুল কি? কিন্তু এই যে ব্রহ্মাণ্ড, সে এর চেয়েও ঢের বড়,—এ জায়গা তার এক কোণের সমান হবে কি না, সন্দেহ। ক্যানোপাসের চেয়েও ঢের দূরে দূরে তারা আছে; সে যে কত দূরে, আজও কেউ তা মেপে উঠতে পারে নি।

আকাশে গ্রহ তারা ছায়াপথ প্রভৃতি যা কিছু আমরা দেখতে পাই, সব জড়িয়ে আমরা তাকে বলি 'ব্রহ্মাণ্ড'। আমরা তার কথা ভাবতে গিয়ে, হার মেনে, খালি

এই টুকুই বলতে পারি যে 'কি আশ্চর্য্য!' 'কি বিশাল!' কিন্তু ভগবানের সৃষ্টি এর চেয়েও বিশাল।

এ কথাটা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। আমরা যাকে ব্রহ্মাণ্ড বলছি, সে জিনিসটা খুবই বড় হলেও, ভগবানের সৃষ্টি এর ভিতরেই শেষ হয়ে যায় নি। পণ্ডিতেরা মনে করেন যে তাঁরা যেন এই ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে এমনিতর আরো দু একটি ব্রহ্মাণ্ড একটু একটু দেখতে পান। এমনিতর আরো কত ব্রহ্মাণ্ড যে আছে, তা কে বলতে পারে? আমাদের নজর খুব কম দূর অবধিই চলে।

বিড়ালীর বৃন্দাবন যাত্রা।

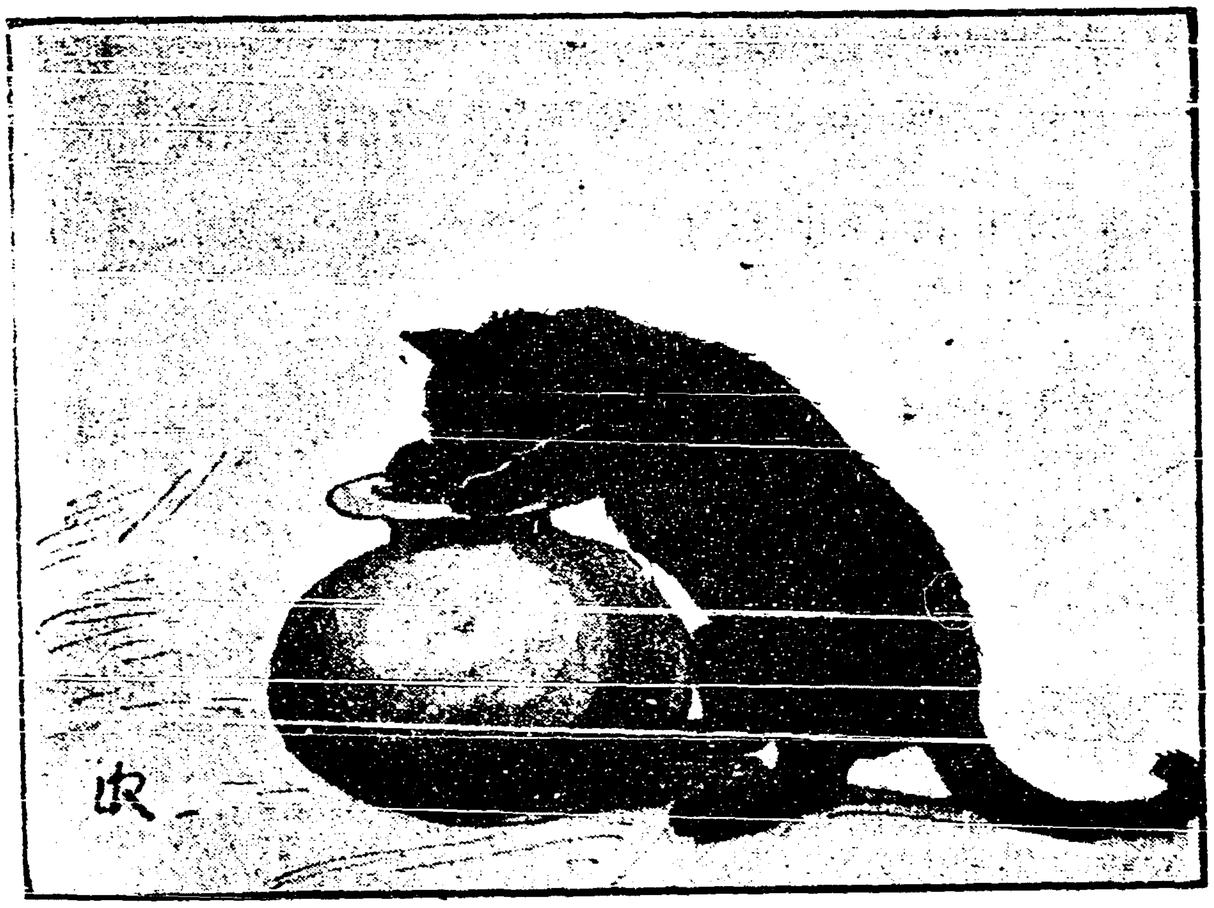

ভাগ্যমন্ত কোনো এক গোয়ালার ঘরে,
দধি দুগ্ধ ক্ষীর-সর আছে থরে থরে;
দেখিয়া বিড়ালী হলো লোভেতে অস্থির,
কেমনে খাইবে সেই দধি দুগ্ধ ক্ষীর।
এদিক ওদিক চে'য়ে চোরের মতন,
এক লাফে খালি ঘরে করিল গমন।

সুগন্ধ ক্ষীরের ভাঁড় পাইয়া সম্মুখে,
চাটিতে লাগিল চক্ চক্ মনোসুখে।
ক্ষীরের যে ভাঁড় তার মুখ সরু ছিল,
কষ্টেসৃষ্টে তার মধ্যে মাথা ঢুকাইল।
একেত ক্ষীরের গন্ধে লোভে অন্ধপ্রায়,
তাতে আছে চক্ষু ঢাকা দেখিতে না পায়।

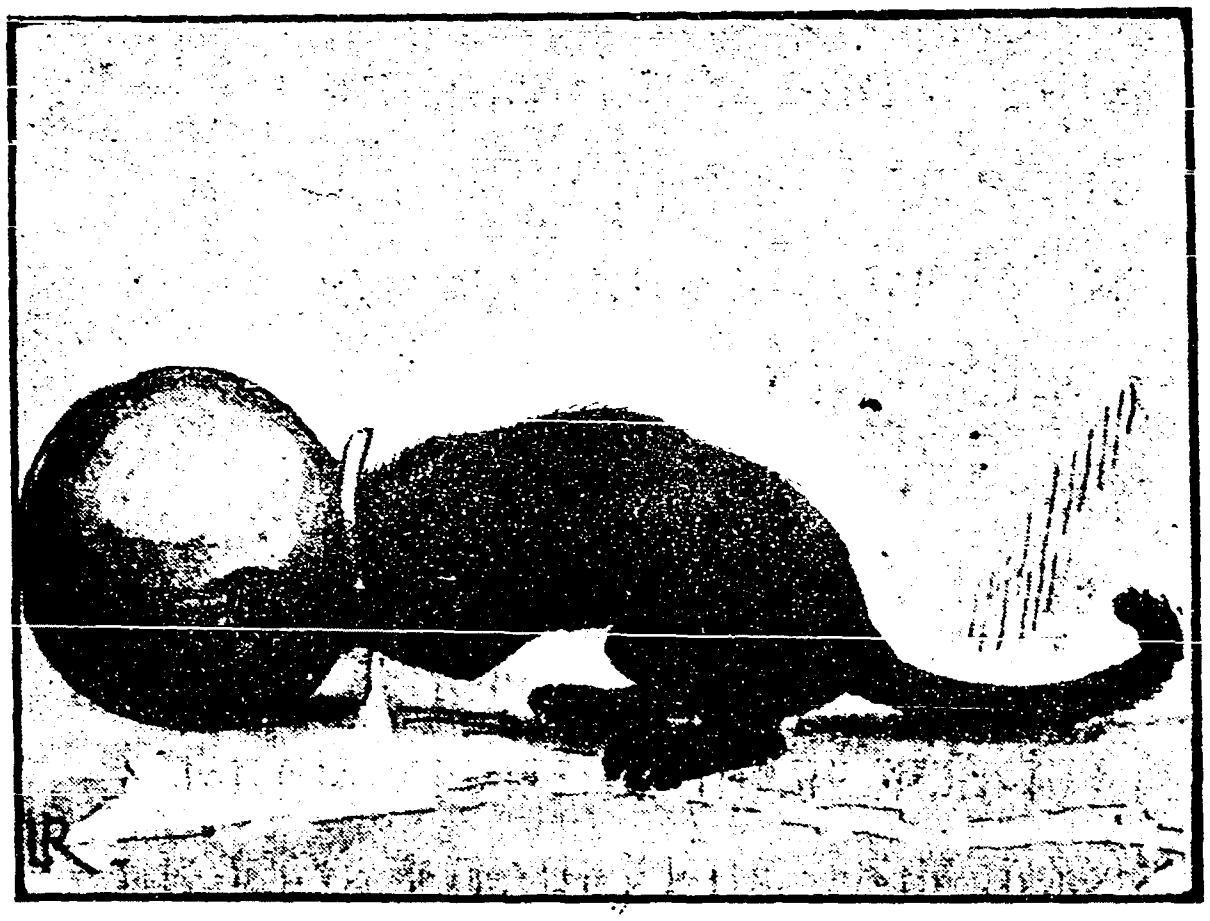

চক্ চক্ চক্ শব্দ করিয়া শ্রবণ,
গোয়াল-গৃহিণী ঘরে আসিল তখন ;

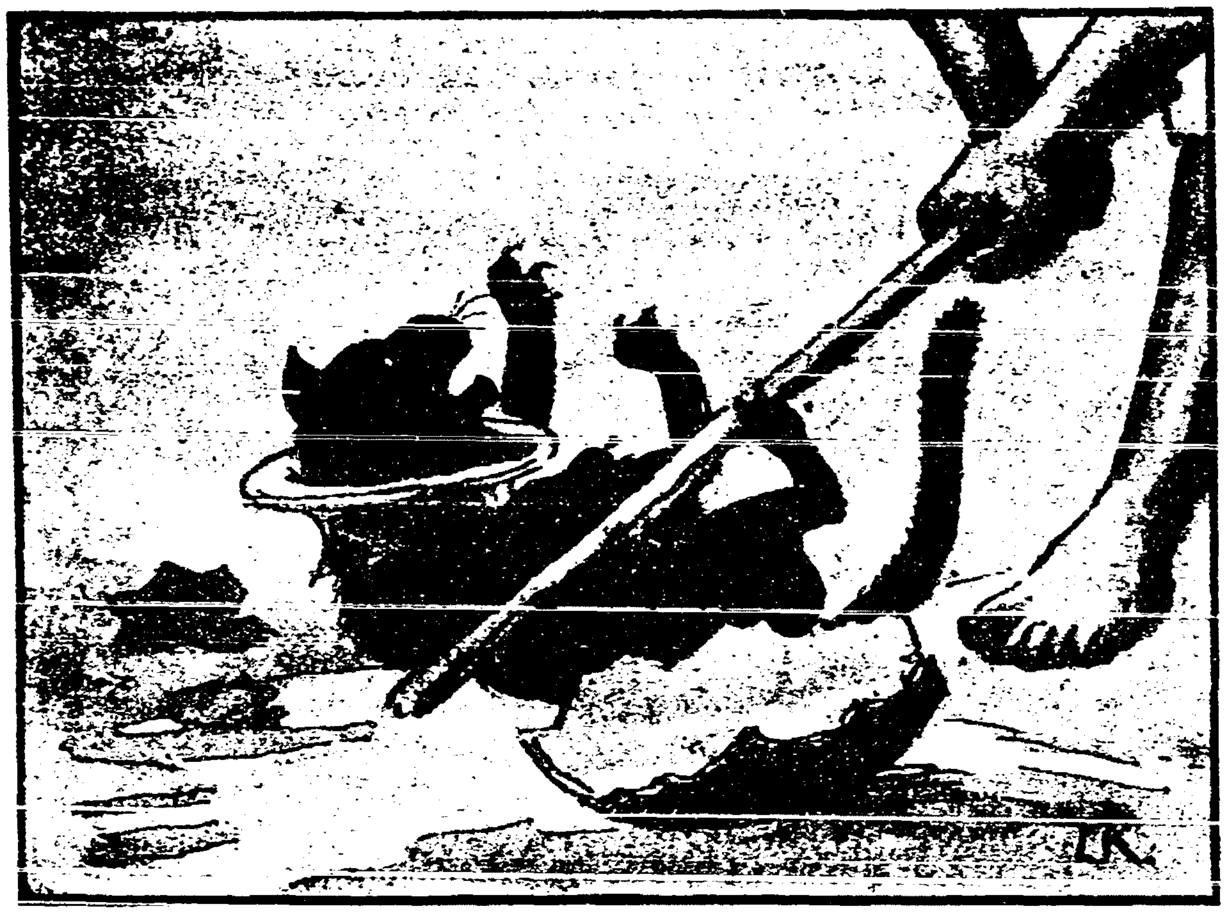

যথাযোগ্য শিক্ষা তারে দিল পরিপাটী

বিড়ালীর কাণ্ড দেখি লয়ে এক লাঠি,
যথাযোগ্য শিক্ষা তারে দিল পরিপাটী।
অকস্মাৎ বজ্রাঘাৎ বিড়ালীর মাথে,
ভাঙ্গিল সুখের স্বপ্ন ভাঁড় ভাঙ্গা সাথে।
ভাঙ্গা কলসীর কাণা গলায় রহিল,
উচ্চ পুচ্ছ করি পুসি ছুটিয়া চলিল।
বহু দূর গিয়া এক বট বৃক্ষ তলে,
বিশ্রামে বসিল হায় পিঠ যায় জ্ব'লে।
ক্ষীরের মিষ্টতা আর লাঠির প্রহার,
কোন্‌টা কেমন মিষ্ট করিছে বিচার।
হেন কালে সেথা এক শেয়ালী আইল,
বিড়ালীকে সম্বোধিয়া কহিতে লাগিল,—
“ওগো মাসী, হাসিখুসী দেখি না যে মুখ,
মুখ দেখে মনে হয় প্রাণে বড় দুখ।
গলায় হাঁড়ির কাণা একি চমৎকার !
কি সাধে পরেছ বল হেন অলঙ্কার।”
বিড়ালী বলিছে “বাছা কি বলিব আর !
ভাবিয়া দেখিনু চিত্তে অসার-সংসার ;
মিছা সংসারের ফাঁদে পড়ে কেন থাকি,
শেষকালে প্রাণপণে হরি বলে ডাকি।
বৈরাগ্যে আমার এবে পরিপূর্ণ মন,
কলসী বাঁধিয়া গলে যাচ্ছি বৃন্দাবন।”
শেয়ালী বলিছে—“মাসী পিঠে কেন দাগ ?
মুখে ক্ষীর মেখে কেবা করেছে সোহাগ ?”
বেড়ালী দেখিল সব বুঝেছে শেয়ালী,
খাটিল না খাটিল না মিছা চতুরালী।
মেউ মেউ করি সেই পিছু পানে হটে,
কথা কাটাকাটি হ'ল দুই শঠে শঠে।

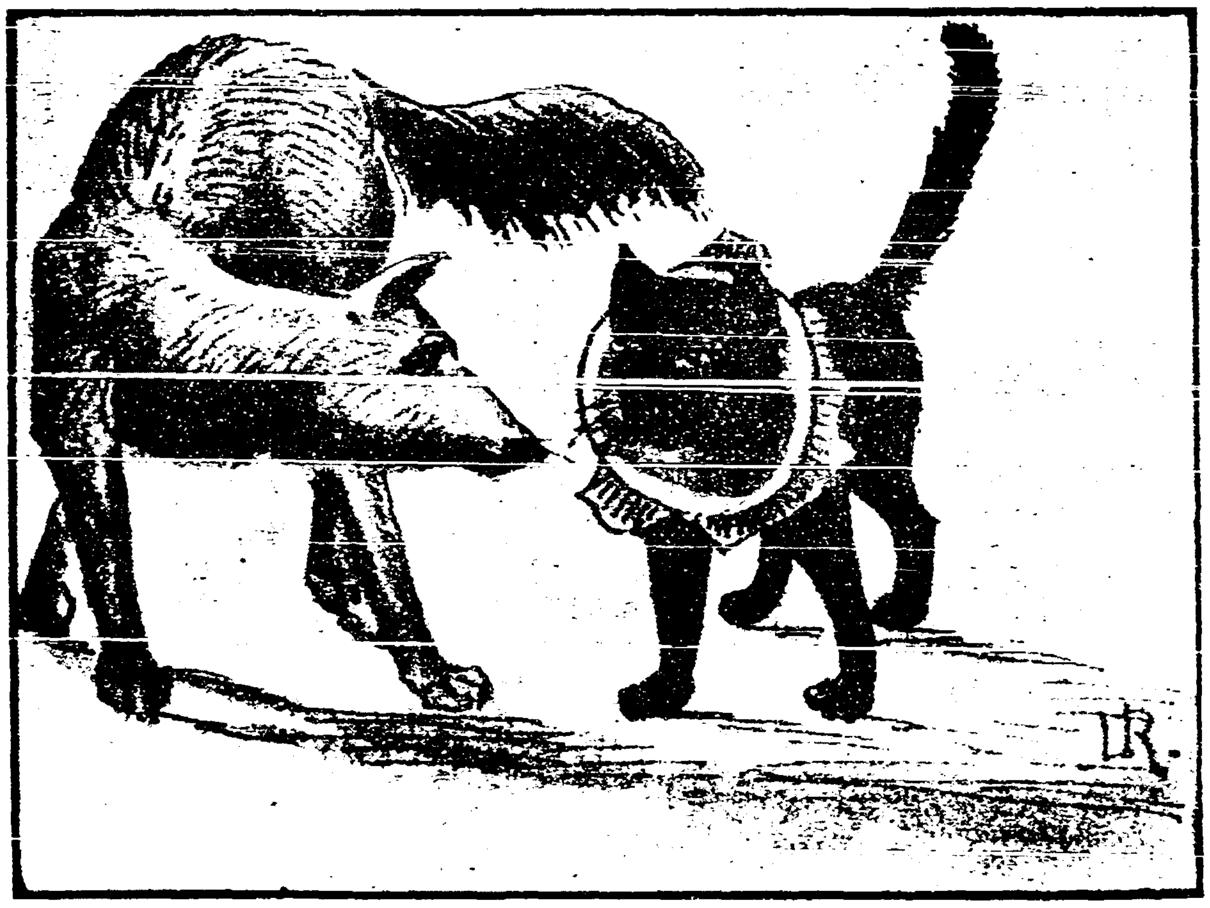

“কলসী বাঁধিয়া গলে যাচ্ছি বৃন্দাবন”

শেয়ালী বলিছে “মাসী বৃথায় কন্দল,
ভাঙ্গা ভাঁড় গলে দেখি বুঝেছি সকল।

দধি দুগ্ধ ক্ষীর সব চুরী ক'রে খাওয়া,
মা'র খে'য়ে দুঃখ পে'য়ে বৃন্দাবনে যাওয়া।
কাহার না পায় হাসি শু'নে হেন বাণী,
চোরের মুখেতে সদা ধর্ম্মের কাহিনী।

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা।

ঠাকুরদা'।

এক গ্রামে একটি বুড়ো ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁর নাম ছিল ভবানীচরণ ভট্টাচার্য্য। গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে তাঁর খুব ভাব ছিল, তারা তাঁকে বলত ঠাকুরদা'। তাদের কাছ থেকে শিখে দেশ শুদ্ধ লোকেও তাঁকে ঐ নামেই ডাকত।

ছেলেরা ঠাকুরদার কাছে খুবই আদর পেত, আর তাঁকে জ্বালাতন করত তার চেয়েও বেশী। ঠাকুরদা ভারী পণ্ডিত আর বুদ্ধিমান ছিলেন। খালি এক বিষয়ে তাঁর একটু পাগলামি ছিল; পিয়াদার নাম শুনলেই তিনি ভয়ে কেঁপে অস্থির হতেন। ছেলেরা সে কথা খুবই জানত, আর তা নিয়ে ভারী মজা করত।

ঠাকুরদা রোজ তাঁর চণ্ডীমণ্ডপের সামনে বসে পুঁথি লিখতেন। সেই সময়ে মাঝে মাঝে পাড়ার এক একটা দুষ্টু ছেলে দাড়ি পরে, লাল পাগড়ি এঁটে, মালকোচ্ছা মেরে, লাঠি হাতে এসে ঘরের আড়াল থেকে গলা ভার করে বলত, "ভওয়ানী ভট্‌চাজ্ কৌন্ হ্যায়?" ঠাকুরদা তাতে বিষম থতমত খেয়ে ঘাড় ফিরিয়েই যদি লাল পাগড়ির খানিকটা দেখতে পেতেন, তবে আর সে পাগড়ি কার মাথায়, সে কথার খবর নেবার অবসর তাঁর থাকত না। তিনি অমনি এক দৌড়ে বাড়ীর ভিতর গিয়ে একেবারে দিদিমার কাছে হাজির হতেন! ছেলেরা বলে যে তখন নাকি প্রায়ই ঠাকুরদাকে স্নান করতে হত; কিন্তু সে বোধ হয় তাদের দুষ্টুমি।

যাহোক, এমন বিষম ভয়ের কাণ্ডটা যে ছেলেদের কাজ, এ কথা মুহূর্ত্তের তরেও ঠাকুরদার মাথায় আসত না। তিনি ছেলেগুলোকে বাস্তবিকই খুব ভালবাসতেন। তাঁর কুলগাছটিতে কুল পাকলে তাদের সকলকে ডেকে একটি একটি করে কুল প্রত্যেকের হাতে দিতেন, কাউকে বঞ্চিত করতেন না,—একটির বেশীও কখনো কাউকে দিতেন না। সেই পরগণার ভিতরে আর এমন মিষ্টি কুল কোথাও ছিল না। কাজেই, একটি খেয়ে ছেলেদের যেমন ভাল লাগত, আর খেতে না পেয়ে তাদের তেমনি কষ্ট হত।

ঠাকুরদা'কে পেয়াদায় ডেকেছে।

তথাপি, এমন কথা শোনা যায়নি যে, ঐ ঠাকুরদার দেওয়া একটি ছাড়া আর একটি কুল কেউ কখনো তাঁর গাছ থেকে খেতে পেরেছে। তাঁর চণ্ডীমণ্ডপ থেকে সেই কুলগাছটি পরিস্কার দেখা যেত। সে দিকে কাউকে যেতে দেখলেই তিনি 'কেরে-এ-এ?' বলে এমনি বিষম হাঁক দিতেন যে কি বলব! তখন আর হাত পা সাম্‌লে ছুট দিবারও উপায় থাকত না! দু মাইল দূরে থেকে লোকে সেই হাঁক শুনে বলত, 'ঐ রে! ঠাকুর দা' তাঁর কুল আগলাচ্ছেন!'

খালি একবার ছেলেরা ঠাকুরদার কাছ থেকে এক পোয়া সন্দেশ আদায় করেছিল। ঠাকুরদা চণ্ডীমণ্ডপের সামনে বসে এক মনে পুথি লিখছিলেন; তিনি দেখতে পান নি যে এর মধ্যে ওপাড়ার বোসেদের বানরটা কেমন করে ছুটে এসে সেখানে উপস্থিত হয়েছে, আর তাঁর পঁয়ত্রিশ বছরের পুরাণো বাঁধানো হুঁকোটি নিয়ে গিয়ে গাছে উঠেছে। তারপর তামাক খেতে গিয়ে দেখেন, কি সর্ব্বনাশ! বানরটাকে তিনি কত ঢিল ছুঁড়ে মারলেন, কত লম্বা লম্বা সংস্কৃত বকুনি বকলেন, কিছুতেই তার কাছ থেকে হুঁকোটি আদায় করতে পারলেন না; লাভের মধ্যে সে বেটা তাঁকে গোটা দশেক ভেংচি মেরে, হুঁকো শুদ্ধ পাশের বাড়ীর আম বাগানে চলে গেল।

সে দিন ছেলেরা না থাকলে, ঠাকুরদা'র আবার তাঁর হুঁকোর মুখ দেখবার কোন আশাই ছিল না। তিনি তাদের সন্দেশ কবুল করে, অনেক কষ্টে তাদের দিয়ে বানরের হাত থেকে হুঁকোটি আদায় করালেন। তার পর দিনই নিজে গিয়ে বেচু ময়রার দোকান থেকে তাদের জন্য এক পোয়া সন্দেশ কিনে আনলেন। সে সন্দেশ খেয়ে নাকি তারা মুখ সিট্‌কিয়েছিল। ঠাকুরদা তার কারণ জিজ্ঞাসা করতে তারা বল্ল, "সন্দেশটা বড্ড মিষ্টি।" ঠাকুরদা তখন খুব গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বল্লেন, "তাই ত, আমি ত জানতুম না যে তোমরা তেতো সন্দেশ খাও, আমি মিষ্টি সন্দেশই কিনে এনেছি!"

পয়সা খরচ নিয়ে ঠাকুরদার একটু বদনাম কিন্তু ছিল। ঐ যে হুঁকোর খাতিরে ছেলেদের এক পোয়া সন্দেশ কিনে খাইয়েছিলেন, তা ছাড়া আর তাঁর জীবনে তিনি কখনো কাউকে কিছু কিনে খাওয়ান নি। লোকে বলত, তাঁর ঘরের ভিতরে তিন জালা টাকা পোতা আছে। কিন্তু নিজে তিনি এমন ভাবে চলতেন, যেন অনেক কষ্টে তাঁর দুটি খাবার জোটে, সেও বুঝি বা এক বেলা বই দু বেলা নয়। এক দিন দিদিমা ডাল রাঁধতে গিয়ে তাতে একটু বেশী ঘী দিয়ে ফেলেছিলেন; সেই অপরাধে নাকি ঠাকুরদা দু মাস তাঁর সঙ্গে কথা কন নি।

ছেলেরা তাঁর সেই সন্দেশ খেয়ে অবধি তাঁর উপর একটু চটেছিল। না চটবেই বা কেন? সেই হতভাগা বানরটার কাছ থেকে হুঁকো আদায় করতে গিয়ে কি তারা কম নাকাল হয়েছিল? কুড়ি জন মিলে তিনটি ঘণ্টা ধরে তারা সে দিন কত গাছই বেয়েছে, কত ছুটাছুটিই করেছে, কত কাদাই লাগিয়েছে, কত বিছুটির ছ্যাঁকাই খেয়েছে। তার পুরস্কার হল কি না, অমনিতর এক পোয়া সন্দেশ!

তখন ছিল পূজার সময়। কুমারদের বাড়ীতে অনেক ঠাকুর গড়া হচ্ছিল, তার তামাসা দেখবার জন্য সকাল বিকালে ছেলেদের প্রায় সকলেই সেখানে যেত। সেই খানে তাদের একটা মস্ত মিটিং হল। ঠাকুরদা'কে জব্দ করতে হবে। তিনি যেমন সন্দেশ খাইয়েছেন, তাঁকে দিয়ে কিছু বেশী হাতে টাকা খরচ করাতে পারলে তবে তার দুঃখটা মিটে। কিন্তু এমন লোকের পয়সাত সহজে খরচ করান যেতে পারে না; তার কি উপায় হতে পারে?

কত জনে কত কথা বলতে লাগল। কেউ বল্ল, "চল ঠাকুরদা'র কুলগাছ কেটে ফেলি," কেউ বল্ল, "তাঁর হুঁকো লুকিয়ে রাখি," কিন্তু এসব কথা কারুর পছন্দ হল না। এমন কুলগাছটি কাটলে ভারী অন্যায় হবে। হুঁকো লুকিয়ে রাখলেও ত শেষটা তাঁকে ফিরিয়ে না দিলে চলবে না। তা ছাড়া এ সব করলে আর তাঁর টাকা খরচ করান হল কই? ঠাকুরদা'কে আসলে ছেলেরা ভালবাসত, নাহক তাঁর লোকসান করতে কারু ইচ্ছা ছিল না; কাজেই এ সব কথায় সকলের অমত হল। এমন ভাবে তাঁকে দিয়ে টাকা খরচ করাতে হবে যে, সেটা তাঁর ক্ষতির মধ্যে ধরা না যেতে পারে।

ছেলেরা দেখল, কাজটি তেমন সোজা নয়। বুড়ো কুমার এর মধ্যে এসে বুদ্ধি যুগিয়ে না দিলে, তাদের পক্ষে এর একটা মতলব ঠিক করাই ভাল হত। বুড়ো যে যুক্তি বল্ল, সে ভারী চমৎকার। ছেলেরা তার কথায় যারপর নাই খুসী হয়ে ঘরে চলে গেল, ঠিক হল যে পর দিনই সেই কাজটি করতে হবে।

রাত থাকতেই ঠাকুরদা'র ঘুম ভাঙে। তখন তিনি শুয়ে শুয়ে সুর ধরে শোলোক আওড়ান; তারপর ভোর হবার একটু আগে উঠে, স্নান তর্পণ সেরে, শেষে গিয়ে চণ্ডী মণ্ডপের সামনে বসেন। সে দিনও দয়েল ডাকবার আগেই তিনি জেগে সবে বলেছেন, "ব্রহ্মা মুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী—" অমনি বাইরে কে যেন ডাকল, "ভওয়ানী ভট্‌চাজ্ ঘর মে হ্যায়?"

আর ঠাকুরদা'র শোলোক আওড়ান হল না। স্নান আহ্নিক তিনি আজ খিরকীর পুকুরেই সারলেন। চণ্ডীমণ্ডপের সামনে বসে পুথি লেখার কাজটিও আজ বন্ধ রইল,

তার চেয়ে দিদিমার রান্না বান্নার খবর নেওয়াই ঠাকুরদা'র বেশী দরকার মনে হয়েছে। এমনি ভাবে দুপুর অবধি কেটে গেল। এর মধ্যে যখন আর কেউ 'ভওয়ানী ভট্চাজ' বলে ডাকল না, তখন ঠাকুরদা' সাহস পেয়ে ভাবলেন, "একটু বাইরে গিয়ে দেখে আসি না কেন ?"

এই বলে আস্তে আস্তে বাইরে এসে ঠাকুরদা' দেখলেন—কি সর্ব্বনাশ!—কি চমৎকার!—তাঁর মণ্ডপের মাঝখানে দুর্গা প্রতিমা ঘর আলো করে বসে আছেন! ঠাকুরদা'র আর পা সরল না। তিনি সেইখানেই মাথায় হাত দিয়ে বসে ভাবলেন, "হায়, হায়! কোন্ সয়তান এমন কাজ করল ? এই প্রতিমা আমার ঘরে রেখে গেছে, এখন এঁকে পূজা না করলে মহাপাপ হবে, আর পূজা করতে গেলেও যে তিনশ'টি টাকার কম লাগবে না! বাবা গো, আমি কোথায় যাব!

যাহোক, ঠাকুরদা' কৃপণ হলেও অতি ধার্ম্মিক আর পণ্ডিত লোক ছিলেন। তিনি তখনই ভাবলেন, "আর দুঃখ করে কি হবে ? ঘরে টাকা রেখেও আমি দেবসেবায় হেলা করছিলাম, তাই দেবতা আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। ভালই হল, এখন থেকে আমি ফি বছর দুর্গোৎসব করব।"

ততক্ষণে ছেলেরাও দুটি একটি করে প্রাণপণে হাসি চাপতে চাপতে এসে উপস্থিত হয়েছে। কাজটিত তাদেরি; তারাই ঠাকুরদা'কে পিয়াদার ভয় দেখিয়ে বাড়ীর ভিতরে পাঠিয়ে সেই অবসরে প্রতিমাটিকে এনে মণ্ডপের ভিতরে রেখে গেছে। তাদের মুখের দিকে চেয়ে আর ঠাকুরদা'রও সে কথা বুঝতে বাকি রইল না। তখন তিনি বল্লেন, "ভালই করেছ দাদা, বুড়ো পাপীর সুমতি জন্মিয়ে দিয়েছ। তোমরা বেঁচে থাক। আমি খালি ভাবছি—এত বড় ব্যাপার, আমার লোকজন কিচ্ছু নাই, আমি কুলোব কি করে ?"

ছেলেরা ভেবেছিল, ঠাকুরদা' লাঠি নিয়ে তাদের তাড়া করবেন! তার বদলে তিনি এমন কথা বলবেন, তা আর মোটেই ভাবেনি। তারা তাতে ভারী খুসী হয়ে বল্ল, "তার জন্যে চিন্তা কি ঠাকুরদা' ? আমরা সব করে দিচ্ছি; আপনি শুধু বসে বসে হুকুম দিন্।" অমনি ঠাকুরদা'র মুখ ভরে হাসিটি ফুটে উঠল, তাঁর চোখ দুটি বুজে এল। ছেলেদের মাথায় হাত বুলিয়ে, গালটিপে আর নাকে কানে চিম্‌টি কেটে তিনি তাদের বিদায় করলেন।

এবারে ঠাকুরদা' যে সন্দেশ এনেছিলেন, তা খেয়ে আর কারু নাক সিটকাতে হয়নি।

চুরীর মজা।

তামা বড় ভাই, নাতু ছোট ভাই। তাদের মন ভাল, কিন্তু তারা দুষ্টু ছেলেদের সঙ্গে খেলা করে, তাই অনেক সময় তারাও মন্দ কাজ করে। ঘরের কাজ করতে তাদের ভাল লাগে না; তারা চায় খালি নাচতে আর ঘুরে বেড়াতে আর দু পায় লম্বা লম্বা বাঁশ বেঁধে হাড়গিলার মত ছুটতে। তারা যখন নাচে, তখন আর সকলে হাঁ করে চেয়ে দেখে; তারা যখন পায় বাঁশ বেঁধে ছোটে, তখন কেউ তাদের ধরতে পারে না।

এক দিন তারা দুভাই বেড়াতে বেড়াতে তাদের গ্রাম থেকে ঢের দূরে সমুদ্রের ধারে চলে গিয়েছে। সেখানে একটা বাগান, তার ভিতরে কি চমৎকার ফল! পেকে, লাল হয়ে, ফলগুলি পাঁচিলের উপর দিয়ে ঝুঁকে পড়েছে দেখেই তামা আর নাতুর মুখে জল এল।

তামা বল্ল, "যদি পায় বাঁশ বেঁধে আসতাম তা হলে হাত বাড়িয়েই কি মজা করে ফল খেতাম!"

নাতু বল্ল, "রাত্রে এলে আরো মজা হত; তখন বাগানের লোকেরা ঘুমিয়ে থাকত।"

পরের জিনিস চুরী করতে নাই, এ কথা হয় ত তাদের মা বাপ তাদের শেখায়নি, না হয়, দুষ্টু ছেলেদের দলে পড়ে তারা তা ভুলে গিয়েছিল। তাই সে দিন রাত্রে তারা দুভাই পায় বাঁশ বেঁধে আবার সেই বাগানে ফল খেতে এল। খেতে খেতে তাদের পেট ভরে গেল, কিন্তু তবু তাদের লোভ মিটল না; যাবার সময় তারা বল্ল, "কালকে আবার আসব।"

পর দিন রাত্রে তারা আবার এল, তারপর দিনও এল। এদিকে বাগানের লোকেরা বলছে, "তাই ত, গাছে এত ফল ছিল, সে সব কোথায় গেল? চোর আসে নাকি?"

সে দিনও রাত্রে তামা আর নাতু এসেছে। তারা জানে না যে সে দিন গাছের পাতার আড়ালে লোক বসে আছে। তামা আর নাতু যেই ফল খেতে যাবে, অমনি সেই লোকগুলো 'ধর ধর!' 'মার মার!' বলে তাদের কি তাড়াই করল! নাতুকে ত তারা ধরে বেঁধে নিয়ে গেল। কিন্তু তামা ছিল ভারী চালাক আর চটপটে; সে তার লম্বা লম্বা বাঁশের পা বাড়িয়ে বোঁ করে ছুট দিল। কিন্তু বেচারা যে দিকে যায়, সেই দিকেই বাগানের লোক এসে পথ আগলে দাঁড়ায়। তারা তাকে তাড়িয়ে সমুদ্রের

ধারে এনে একেবারে ঘিরে ফেল্ল। লোকগুলো যেন যমের দূত; রেগে দাঁত খিঁচাচ্ছে আর বলছে, "কাট্ বেটার বাঁশ!" "ফেল্ বেটাকে জলে!"

তামা তা শুনে হো হো করে হাসতে আর নাচতে লাগল। জলে ফেলবার কথা শুনেই তার প্রাণ চমকে গিয়েছে, কিন্তু সে দেখাচ্ছে যেন তাতে তার খুব মজাই হবে। লোকগুলো তা দেখে বল্ল, "না রে, জলে ফেলা হবে না; বেটা সাঁতরে পালাবার ফন্দি এঁটেছে।"

এই বলে তারা তার পায়ের বাঁশ দুটো কেটে ফেল্ল। তারা ভেবেছিল, তামা মাটিতে পড়লেই তাকে ধরে মারবে, কিন্তু তামা তার আগেই এমনি এক লাফ দিল যে কেউ তাকে ধরবার ফুরসুৎই পেল না। ততক্ষণ তামা প্রাণপণে ছুটে অন্ধকারের ভিতর মিলিয়ে গেল,—আর কে তাকে ধরবে?

সে রাত্রে আর তামার ঘরে ফেরা হল না, একটা ঝোপের ভিতরে ঢুকে কাঁপতে কাঁপতে তার রাত কেটে গেল। তার পরের দিনও সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি সেই লোকগুলো তাকে খুঁজে বেড়িয়েছিল, কাজেই তামার আর সেই ঝোপ থেকে বের হওয়া হয়নি। তারপর যখন আবার রাত হল, লোকগুলো তাকে না পেয়ে হয়রান হয়ে ঘরে চলে গেল, তখন সে চুপি চুপি ঝোপ থেকে বেরিয়ে বল্ল, "আঃ! বাঁচলাম!"

কিন্তু নাতু কোথায়? আহা, বেচারাকে ধরে নিয়েছে, আর না জানি তাকে কি কষ্ট দিচ্ছে! নাতুকে না নিয়ে তামার ঘরে ফিরতে কিছুতেই ইচ্ছা হল না। অন্ধকারের ভিতর দিয়ে, ঐ দূরে, একটা ঘর দেখা যাচ্ছে, নাতুকে ধরে সেই ঘরটার ভিতরে নিয়ে গেছে। তামা নিজের প্রাণের দিকে না চেয়ে চুপি চুপি সেইখানে গিয়ে উপস্থিত হল। ঘরের ভিতরে খুব নাচ গান চলেছে, কিন্তু বাইরে থেকে কিছু দেখবার যো নাই,—দরজা বন্ধ। তামা অনেক কষ্টে পাঁচিল বেয়ে উঠে চালের খড় একটু সরিয়ে উঁকি মারল।

উঁকি মেরে সে সকলের আগেই দেখল নাতুর মুখখানি, একেবারে তার নিজের মুখের কাছে। নাতুকে চালের সঙ্গে ঝুলিয়ে রেখে সকলে মিলে নাচতে লেগেছে।

নাতু বেচারা ত প্রাণের আশা ছেড়েই দিয়েছিল, এর মধ্যে হঠাৎ তামাকে দেখতে পেয়ে ভারী খুসী হয়ে বল্ল, "দাদা!"

তামা বল্ল, "ওরা কি করেছে তোকে?"

নাতু বল্ল, "আমাকে ঝুড়ির সঙ্গে বেঁধে এইখানে ঝুলিয়ে রেখেছে, কিচ্ছু খেতে টেতে দেয় নি। দাদা, আমাকে বোধ হয় না খাইয়ে মারবে। কি হবে, দাদা?"

তামা বল্ল, "রোস্, দেখি। আচ্ছা, ওরা খুব নাচছে,—না?"

নাতু হেসে বল্ল, "হাঁ!"

তামা বল্ল, "বিচ্ছিরী নাচে বুঝি?"

নাতু বল্ল, "বেটারা কিচ্ছু জানে না। আমরা এর চেয়ে ঢের নাচতে পারি।"

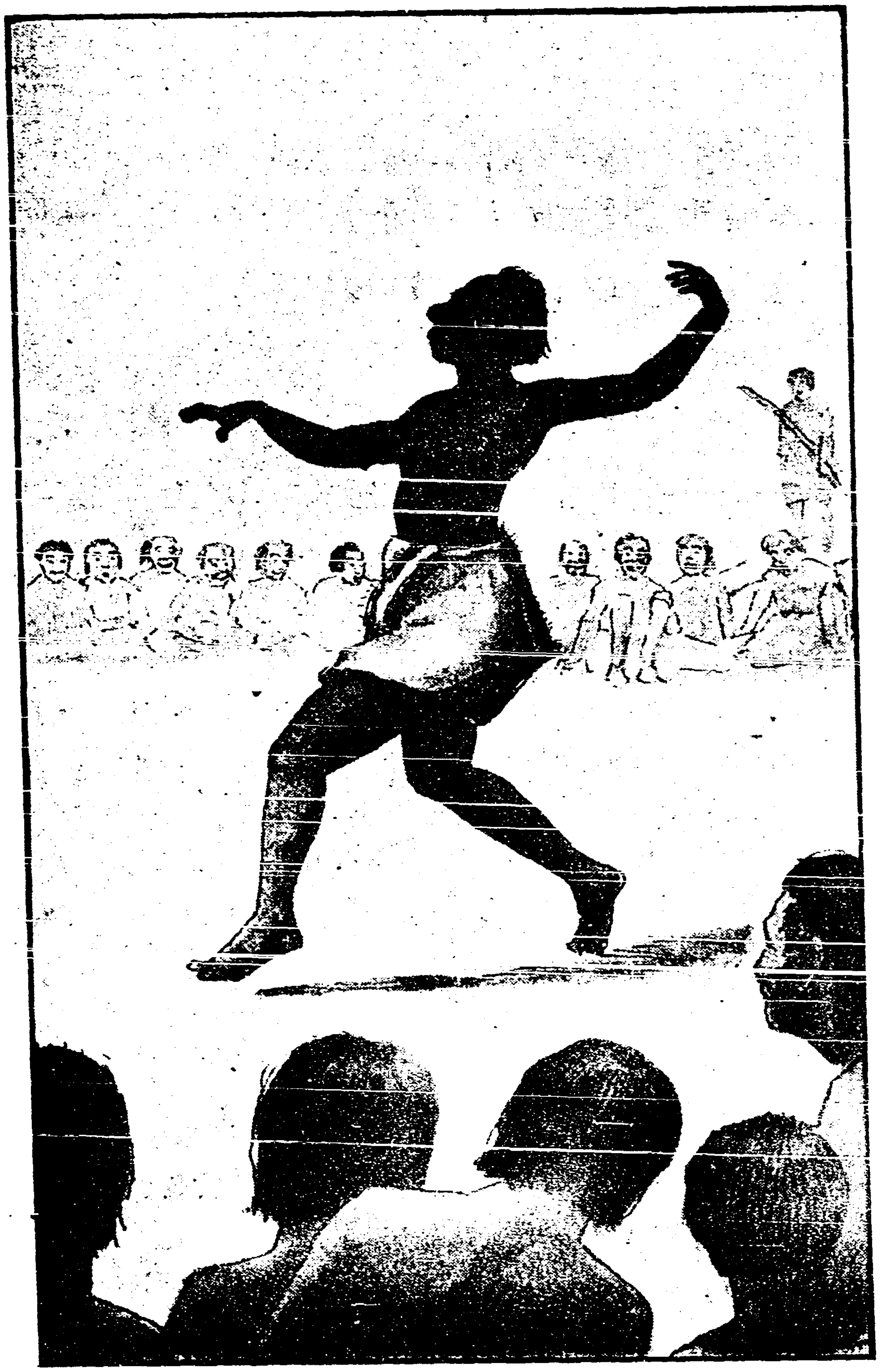

নাতুর নাচ।

তখন হঠাৎ তামার মাথায় একটা মতলব যোগাল। সে নাতুকে তার কথা বেশ করে বুঝিয়ে দিয়ে, তাকে সব সঙ্কেত শিখিয়ে রেখে, সেখান থেকে নেমে এল।

এ দিকে নাতু তার ঝুড়িতে বসে সে লোকগুলোর নাচ দেখছে, আর নাক সিঁটকাচ্ছে। শেষে সে বল্ল, "বাঃ কি নাচই নাচা হচ্ছে! যেন ব্যাঙের বাজী!"

সকলে শুনে ত অবাক। তাদের নাচ তখনই থেমে গেল, রাগে গা কাঁপতে লাগল। নাতুর তাতে ভয় মাত্রও নাই, সে আবার বল্ল, "না জানি তোমাদের কে নাচতে শিখিয়েছিল! আমি হলে এর চেয়ে ঢের ভাল করে শেখাতে পারতাম।"

এ কথা আর সে লোকগুলো কিছুতেই সইতে পারল না। তারা তখনই নাতুকে তার ঝুড়ি থেকে নামিয়ে, দাঁত কড়মড়িয়ে বল্ল, "নাচ্‌ত বেটা, দেখি! যদি ভাল নাচতে না পারিস্, তোর হাড় গুঁড়ো করব।"

নাতুকে ঘরের মাঝখানে ছেড়ে দিয়ে তারা তার চার দিক ঘিরে বসল; নাতু নাচতে লাগল। লোকগুলো ভেবেছিল, নাতুর নাচ নিয়ে তারা খুবই হাসি ঠাট্টা করবে,

তারপর তাকে সাজা দিবে। কিন্তু তার নাচ দেখে আর কারো মুখে হাসি বেরুল না। তেমন নাচ তাদের কেউ নাচতে ত জানেই না, কখনো দেখেও নি। খঞ্জন পাখী তার কাছে কোথায় লাগে! তারা অবাক হয়ে খালি পিছনে হটে নাতুকে বেশী বেশী জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে, আর বলছে, "আহা! নাচ, নাচ!"

নাচতে নাচতে নাতুর গা বেয়ে ঘাম পড়তে লাগল, সে বল্ল, "বড্ড গরম আর পারি না।" অমনি তারা তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিল। এবারে নাতু ঘরময় ঘুরে ঘুরে নাচছে। সে কি চমৎকার নাচ! সকলের মুখে আর বাহবা ধরে না। নাচ দেখে তারা এমনি ভুলে গেছে যে এর মধ্যে কখন নাতু নাচতে নাচতে দরজার কাছে এসে তড়াক্ করে বাইরে লাফিয়ে পড়েছে, সে খেয়ালই তাদের নাই।

ততক্ষণে নাতু ঝাঁ করে বাইরে থেকে দরজাখানি আবার বন্ধ করে দিয়েছে। তামা একটা মস্ত কাঠের হুড়কো আর দড়ি নিয়ে সেইখানে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিল। দুভাই মিলে চোখের পলকে সেই হুড়কো আর দড়ি দিয়ে দরজাটিকে এমনি আঁটন এঁটে দিল যে, আর কারুরই ঘর থেকে বেরুবার যো রইল না। তারপর তারা দু ভাই মিলে প্রাণ পণে দে সেখান থেকে বাড়ীর পানে ছুট। ছুটতে ছুটতে নিজের ঘরে এসে তবে তারা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। সেই অবধি আর তারা কখনো চুরী করে ফল খেতে যেত না।

ক্ষুদে মানুষ।

ছেলে বেলায় ক্ষুদে মানুষের কথা শুনতাম। তারা আঁকসী দিয়ে বেগুন পাড়ে, মাটির নীচে বাস করে, আর, বোকা মানুষকে বাগে পেলে তার মাথা খারাপ করে দেয়। যাহোক, আমাদের দেশে এমন কথা শোনা যায়নি যে, কেউ কখনো ক্ষুদে মানুষ দেখেছে, যদিও আমাদের পুরাণে ক্ষুদে মানুষের উল্লেখ আছে।

সেই ক্ষুদে মানুষদের নাম ছিল 'বালখিল্য'। তাঁদের একেক জন বড় ভারী ভারী মুনি ছিলেন, কিন্তু দেখতে তাঁদের কেউ আমার বুড়ো আঙ্গুলটির চেয়ে বড় ছিলেন না। তাঁদের হাজার হাজার জন মিলে একেকটা গাছের ডালে ঝুল্‌তে ঝুল্‌তে তপস্যা করতেন। একবার তাঁদের সকলকে শুদ্ধ সেই গাছের ডাল নিয়ে গরুড় পাখী উড়ে গিয়েছিল; তা ছাড়া তার নখে পর্ব্বতপ্রমাণ একটা হাতী আর একটা কচ্ছপও ছিল।

তাঁরা যে বুড়ো আঙ্গুলের মতই ছিলেন, এ কথাও আমি ঠিক করে বলতে পারি না। কশ্যপ মুনির যজ্ঞের জন্য আর সকলে বোঝা বোঝা কাঠ বয়ে এনেছিল, আর বালখিল্য ঠাকুরেরা সকলে মিলে এনেছিলেন এক গাছি খড়। সে খড়গাছিকে যে যজ্ঞের জায়গায় নিয়ে পৌঁছাবেন, তাও তাঁদের ভাগ্যে ঘটল না। পথে কাদা ছিল, তার উপর দিয়ে গরু চলে যাওয়ায় তাদের ক্ষুর বসে গিয়ে গর্ত্ত হয়েছিল। খড় নিয়ে আস্‌তে আস্‌তে বেচারারা সেই একটা গর্ত্তের মধ্যে গড়িয়ে পড়ে আর উঠতে পারেন না! এ থেকেই বুঝতে পারা যায় যে, তাঁরা বুড়ো আঙ্গুলের মত এত বড় ত ছিলেনই না, পিঁপড়ের মত ছিলেন কিনা, সে বিষয়েও খুবই সন্দেহ।

তথাপি, তাঁদের একেক জন বড়ই ভারী গোছের মুনি ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে বেয়াদবী করলে স্বয়ং ইন্দ্রকে অবধি বেজায় সাজা পেতে হত।

বিলাতেও এমনি সব ক্ষুদে মানুষের গল্প শুনতে পাওয়া যায়। তাদের এক রকম ছিল নাকি যথার্থই মানুষ, তারা আফ্‌রিকায় বাস করত। আন্তেয়ূস্ নামে একটা দৈত্যের সঙ্গে তাদের বন্ধুতা ছিল, সেই দৈত্যের ভয়ে কেউ তাদের কোন অনিষ্ট করতে পারত না। হার্কিউলিস নামে মহাবীর সেই দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে মারেন। এ সব নাকি হচ্ছে অতি প্রাচীন কালের কথা; এখনকার লোকে আর এ সব কথায় বিশ্বাস করে না। আজকাল কিন্তু আবার শোনা যাচ্ছে যে সত্যি সত্যিই নাকি আফ্রিকার পশ্চিম ভাগে একজাতের ছোট্ট ছোট্ট (৪ ফুট লম্বা) মানুষ আছে। তারা গভীর বনে গা ঢাকা দিয়ে বাস করে।

আর এক রকম ক্ষুদে মানুষ বা বামনের গল্প আছে, তারা ঠিক মানুষও নয়, অথচ ভূতও নয়,—কতকটা এই দুয়ের মাঝামাঝি। এদের আমার দুই জাত, এক ভাল, আর মন্দ। মন্দগুলিই হল আসল ক্ষুদে মানুষ (বা ক্ষুদে ভূত, যা বল); ভালগুলি হল পরী। ক্ষুদে ভূতেরা নাকি মাটির নীচে থাকে, সেখান থেকে দিনের বেলায় তাদের বেরিয়ে আসবার হুকুম নাই; যদি আসে, তবে অমনি পাথর হয়ে যায়। কাজেই বেচারারা আর কি করে? তারা মাটির নীচে সব গুহা, গর্ত্ত, গলিঘুচিতে ঘুরে বেড়ায় আর যত সোনা রূপা মণি মাণিকের সন্ধান নিয়ে সব জিনিস এনে লুকিয়ে রেখে দেয়।

এরা নাকি কারিগরিতে বড়ই মজবুত। দেবতাদের যত আশ্চর্য্য অস্ত্র আর সুন্দর সুন্দর গহনা, তার বেশীর ভাগই এদের তৈরী। তারা যা চায়, তাই দিয়ে দেবতারা সে সব জিনিস তাদের কাছ থেকে কিনে নেন। ক্ষুদে মানুষগুলির স্বভাবটা খুবই দুষ্ট,

কিন্তু মাঝে মাঝে তারা মানুষের উপকারও করে। এদের দুটিতে সেই যে মুচির জুতা সেলাই করে দিত, তার গল্প বোধ হয় তোমরা পুস্তকে পড়েছ।

পরীরা নাকি থাকে আকাশে, পৃথিবী আর স্বর্গের মাঝখানে। সেখানে থেকে পৃথিবীতে উড়ে এসে তারা ফুলগুলিকে ফুটিয়ে দেয়, পাখীদের সঙ্গে খেলা করে, আর প্রজাপতিদের ঘাড়ে চড়ে হাওয়া খেয়ে বেড়ায়। চাঁদনী রাতে তারা সকলে মিলে ঘাসের উপর নাচে, আর লক্ষ্মী খোকা খুকীদের ঘরের জানালায় এসে উঁকি মারে।

পরীদের মন যখন খুসী থাকে, তখন তারা গান গায়। সে গান একবার শুনলে নাকি আর তা ছাড়া আর কিছুই ভাল লাগে না, আবার সে গান না শোনা অবধি ভেবে ভেবে সারা হয়ে যেতে হয়।

পরীরা নাকি অমনি খুব ভাল, কিন্তু আবার চটেও নাকি খুব সহজে। সে দেশে যারা পরীতে বিশ্বাস করে, তারা পারতে তাদের নাম নিতে চায় না। 'পরী' বলতে হলে তারা বলবে 'ভাল মানুষ,'—নইলে, কি জানি, যদি পরীরা চটে? পরীরা খুসীও হয় আবার খুবই সহজে। রাত্রে তাদের জন্য শুধু একটু দুধ জানালার কাছে রেখে দিলেই তারা প্রাণপণে তোমার দুঃখ দূর করতে চেষ্টা করবে।

পরীরা কিনা খুব নাচে, তাই তাদের জুতা বড্ড শীগ্গির শীগ্গির ছিঁড়ে যায়, কাজেই তাদের ভাল মুচি না হলে চলে না। পরীদের মুচির মত ভাল কারিগর আর এই সংসারে নাই।

পরীরা নাকি অনেক সময় ছোট্ট খোকা খুকী ধরে নিয়ে যায়। ঘরের লোকেরা তা টের পায় না, কেন না, পরীদের নিজের একটি খোকা বা খুকী তার বদলে বিছানায় শোয়ান থাকে।

কি ভাগ্য ভাই, পরী বলে আসলে কিছু নাই, নইলে তারা হয় ত কখন আমাদের দেশে এসে কারু খোকা খুকী নিয়ে চলে যেত। পরী না থেকে খুব ভালই হয়েছে বলতে হবে, তবে, আমার অনেক সময় মনে হয় যে মাঝে মাঝে পরীর মত ছোট্ট হয়ে ফুলের ভিতর লুকোচুরী খেলতে আর ব্যাঙের ছাতার তলায় বসে বিশ্রাম করতে পেলে মজা মন্দ হত না। না জানি তখন ফুলের কি আশ্চর্য্য শোভাই দেখতে পেতাম! যুঁই ফুলটিকে দেখতাম জবা ফুলটার মত, আর জবা ফুলটাকে দেখতাম খুকুমণির খেলবার ছাতাটির মত। মাঠে বেড়াবার সময় আমরা ঘাস মাড়িয়ে গোঁয়ারের মত চলে যাই, কত সুন্দর ফুল হয় ত আমাদের পায়ের তলায় পড়ে নষ্ট হয়, তা ভেবেও

দেখি না। বুড়ো আঙ্গুলের মত ছোট্ট হতে পারলে, সেই সব ফুলের অন্য রকম শোভা দেখতে পেতাম শুধু চোখে দেখলে বোঝা যায় না যে তারা কত সুন্দর। বুড়ো আঙ্গুলের মত ছোট্ট হতে পারলে এই ফুলগুলিকে ঢের (১০০ গুণেরও বেশী) বড় দেখা যেত।

যা হোক, ভগবান যে আমাদের তেমন ছোট্ট করেন নি, সে খুব ভালই হয়েছে। একালে ত আর বড় বড় দৈত্য আমাদের বন্ধু হয়ে আমাদের বাঁচাতে আসবে না; এখন আমরা অত ছোট হলে আমাদের ইঁদুরেই খেয়ে ফেলবে, বিড়ালের ত কথাই নাই।

ঘরের চালে কই মাছ।

একবার পূজার ছুটীর পরে একটি পাড়াগাঁয়ের জমীদারের ছেলে কল্‌কাতায় হিন্দু স্কুলে পড়িতে এসেছিল। তার নাম রাজচন্দ্র। হিন্দু স্কুলে অধিকাংশই কল্‌কাতার ছেলেরা পড়ে; এদের পাড়াগাঁয়ের কোন জ্ঞানই নাই। এদের কাছে রাজচন্দ্র নানা রকম আজগুবী গল্প করত এবং অনেক ছেলে তাহা সত্য বলে বিশ্বাস করত।

একদিন রাজচন্দ্র বল্‌ছে, "ভাই! আমাদের বাড়ী একটা প্রকাণ্ড আটচালা ঘর আছে, তাকে নাট-মন্দির বলে। পূজার সময় সেখানে যাত্রা, থিয়েটার, কবিগান এই সব হয়। একবার পূজার কএক দিন আগে, আমরা সকলে নাটমন্দিরে বসে পরামর্শ কচ্ছি, এমন সময় নাটমন্দিরের চালের বাঁশের মধ্যে খড় খড় করে শব্দ হল। বাবা বল্লেন, "কি রে! কি শব্দ হয়?" দিনু বলে আমাদের একজন পুরান চাকর আছে, সে বয়সে বাবারও বড়। সে বল্লে, "কর্ত্তা! চালের বাঁশে বোধ করি কই মাছ আছে।" সেই কথা শুনে সমস্ত লোক হা হা করে হেসে উঠল, বাবাও হাস্‌তে লাগলেন। দিনু অপ্রস্তুত না হয়ে বল্ল, "কর্ত্তা! হাস্‌ছেন কেন? এখনই আমি আপনাকে বাঁশ পেড়ে কেটে দেখাচ্ছি, এ সব আমাদের দেখা।" এই বলে দিনু, একেবারে আটচালার চালে উঠে, সেই বাঁশটাকে টেনে নীচে ফেলে দিল, তারপর কুড়ুল দিয়ে যেই বাঁশটাকে ফেড়েছে, ভাই! কি বল্‌ব! সেই বাঁশের ফাঁকে ফাঁকে

কই মাছ। সকলে দেখে অবাক্! বাবা বল্লেন, "বাড়ীর ভিতর নিয়ে যা, আজ আর বাজার থেকে মাছ আনিস্ না, এই মাছ আজ খাওয়া যাবে।"

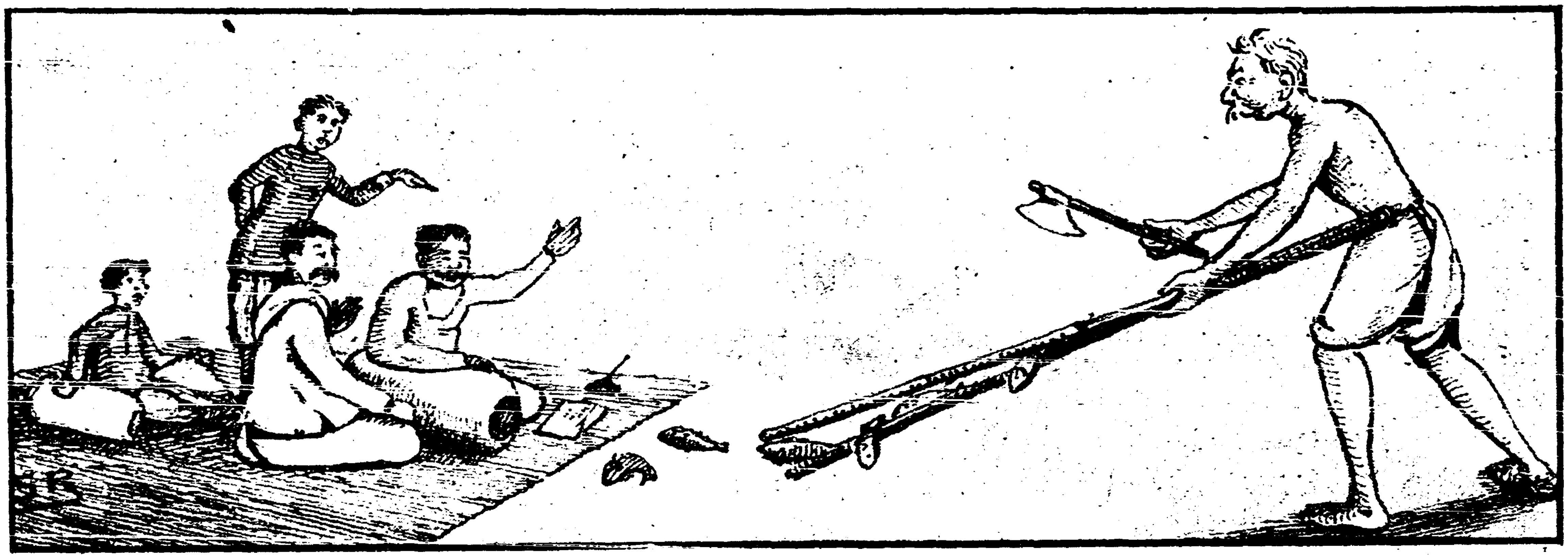

বিনুবল্লে, "কর্ত্তা! এই চালের সকল বাঁশেই মাছ আছে।" বাবা বল্লেন, "তাহলে এবার পূজায় মায়ের ভোগে এই মাছই দেওয়া যাবে।" পূজার সময় আটচালার চালে নূতন বাঁশ দিয়ে, পুরান বাঁশগুলি নামিয়ে, ফেড়ে কই মাছগুলি বার করা হ'লো— নিমন্ত্রিত লোক জন সেই মাছ খেয়ে কত তারিফ কল্ল, জলের মাছ এমন মিষ্টি হয় না।"

একটি ছেলে জিজ্ঞাসা কল্ল, "ভাই বাঁশের ভিতর কি করে মাছ গেল?" সে বল্লে— "আরে তা বুঝি জান না! ঘর বাঁধবার আগে, বাঁশ কেটে রোদে দেয়, তারপর সেই শুক্‌নো বাঁশ জলে ভিজিয়ে দেয়; একে বলে বাঁশ সিজিন করে। বাঁশ এই রকম করে সিজিন কল্লে, তোমাদের এই যে সেগুন কাঠের কড়ি বরগার চাইতেও মজবুত হয়। বাঁশ যখন শুখোয় তখন ফেটে ফেটে যায়, সেই ফাটার ভিতর দিয়ে জলের সঙ্গে কই মাছের ডিম বাঁশের ভিতর ঢুকেছিল, তারপর ডিম ফুটে ক্রমে মাছ বড় হয়েছে।"

আর একদিন রাজচন্দ্র গল্প কচ্ছে, "ভাই! আমার মামার বাড়ী যে একখানা গোয়াল ঘর আছে, সে এইখান থেকে আলিপুরের চিড়িয়াখানা যত দূর তত বড়, তাতে কত যে গরু অগুন্‌তি! মামা বাড়ীর সকলেই দুধ খায়, দুধে নায়, দুধে আঁচায়, কেউ জল ছোয় না।"

ঐ ক্লাসে ময়মনসিংয়ের একটি ছেলে পড়্‌ত, তার নাম মানদা। তার বাবা হাই-কোর্টে উকীল। ছেলেটি ভারী চালাক, লেখা পড়ায়ও খুব ভাল। সে পূজার ছুটীতে তার বাবার সঙ্গে বাড়ী গিয়েছিল, পূজার পরে তার আস্‌তে অনেক বিলম্ব হয়ে গেল। সে ক্লাশে এসেই রাজচন্দ্রের কথা আর তার আজগুবি গল্পের কথা শুনে ভাব্‌ল 'বাছা ধনকে জব্দ কচ্ছি।'

মানদা রাজচন্দ্রের সামনে এগিয়ে বল্ল, "ভাই! তোমার মামার গোয়ালের কথা শুনে আমার খুব আনন্দ হয়েছে, কিন্তু আমার মামারও একটা আশ্চর্য্য জিনিষ আছে, তোমরা শুন্‌লে বিশ্বাস করবে না।" তখন সকলেই বলে উঠ্‌ল, 'কি ভাই, কি জিনিষ?'

মানদা বল্‌তে লাগ্‌ল, "আমার মামার খাসিয়া পাহাড়ে অনেক কমলা নেবুর বাগান আছে। তোমরা সিলেটের নেবু বলে যে সব কমলা নেবু খাও, ওগুলি সিলেটে জন্মে না। তোমরা ম্যাপে দেখ্‌তে পাবে খাসিয়া পাহাড়ের নীচে চেরাপুঞ্জী বলে বলে একটা জায়গা আছে। সেখানে মামার একটা কাছারী আছে, কমলা নেবু পাহারা দেওয়া, চালান দেওয়া প্রভৃতির জন্য কতকগুলি সিপাই বরকন্দাজ সেখানে থাকে। "পৃথিবীর মধ্য চেরাপুঞ্জীতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৃষ্টিপাত হয়" একথা তোমরা কেবল বইতেই পড়েছ, আমি নিজে দেখেছি, ২০ দিন ২৫ দিন কখনও বা এক মাস যাবত অনবরত বৃষ্টি হতে থাকে, ধান শুখোয় না, কাপড় শুখোয় না, তখন লোকের যে কি কষ্ট তা আর কি বলব! কিন্তু মামার প্রজা ও সিপাই বরকন্দাজদের বেশী কষ্ট হয় না, তার কারণ মামার একটা প্রকাণ্ড আক্‌শী আছে, সেটা এত বড় যে তা দিয়ে মেঘ ছোঁয়া যায়। যখন মেঘ করে আকাশ অন্ধকার হয়ে থাকে, আর অনবরত বৃষ্টি হতে থাকে, তখন মামা তাঁর সিপাই বরকন্দাজদের হুকুম দেন; তারা ৪০।৫০ জন মিলে, সেই আক্‌শীটা তুলে, মেঘ সরিয়ে খানিকটা রোদ বার করে। সেই রোদে সকলে ধান শুখোয়, কাপড় শুখোয়, আর আরাম ক'রে রোদ পোহায়।"

রাজচন্দ্র বল্ল, "ভাই! আকাশ ছোঁয়া যায় এত বড় আক্‌শী কি হয়?"

মানদা বল্ল, "আমি তো ভাই পূর্ব্বেই বলেছি, না দেখ্‌লে তোমরা বিশ্বাস করবে না।"

রাজচন্দ্র মনে মনে চটেছিল, 'আমার গল্পের উপর গল্প!' সে বল্ল—"আচ্ছা, বলি, আঁকশীটা রাখ্‌ত কোথায়?"

মানদা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্ল, "কেন? তোমার মামার গোয়াল থাক্‌তে রাখবার ভাবনা কি?"

তখন সমস্ত ছেলে হাত তালী দিয়ে হো হো করে হেসে উঠ্‌ল। সেই থেকে রাজচন্দ্র আর আজগুবী গল্প বল্‌ত না।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র মজুমদার।

বনের ফুল।

মাঠে বেড়াবার সময় আমরা যে সব ছোট ছোট গাছ মাড়িয়ে চলে যাই, তাতে কত সুন্দর সুন্দর ফুল থাকে; ছোট বলে আমরা তাদের তেমন খবর নিই না। সেটি যে তাদের দোষ নয়, আমাদেরই দেখবার দোষ, এবারকার রঙ্গিন ছবিটি দেখলে হয় ত তোমরা সেকথা বুঝতে পারবে।

দুঃখের বিষয়, এর সবগুলোর নাম আমি জানতে পারিনি। শাদা তারার মত ফুলগুলো হচ্ছে কালকাসন্দার। আর গুলোর কি নাম, তা জানবার জন্য আমি আমাদের খোট্টা চাকরটিকে ডাকলাম, কিন্তু সে বেচারা দেখলাম আমার চেয়েও বেশী জানে। যা দেখাই, তাকেই সে বলে, "ই সাগ আছে; হামি লোক খাই!"

যা হোক, শেষে আমি একটি মালীকে ধরে এর অনেকগুলোর নাম শিখে নিয়েছি। উপরকার ছোট ছোট শাদা ফুলগুলোর নাম সেও বলতে পারেনি, টুকটুকে লাল ফুলটার নামও না। গোঁফওয়ালা বড় শাদা ফুলগুলোর নাম 'জগ্‌মোহিনী'। দিব্যি নাম। ফুলটিও যে দেখতে খুব সুন্দর, তাতে ভুল নাই। কালকাসন্দাকে এই মালী বলে 'ঘুক্‌লা'। হল্‌দে ফুলটি 'লাতা,' নীলগুলো 'টারিয়া'। ধুতুরার ফুলের মত ফুলটি হচ্ছে 'ঝিকৃটা'। নীচেকার বাঁ দিকের কোণের সীম ফুলের মত বেগুনী গোছের ফুলগুলির নাম 'সুন্‌সুনিয়া'; তার ডাইনের লাল ফুলগুলি 'মায়া,' সেও দেখতে কতকটা সীম ফুলেরই মত।

এর মধ্যে ভাল ভাল ওষুধও আছে। কালকাসন্দায় চুলের খুব উপকার হয়; সুন্‌সুনিয়ায় বাত সারে।

খুব অল্প ফুলের ছবিই দিতে পেরেছি। আমাদের ওঠানে এক রকম গাছ ঢের দেখতে পাই; তার ফুলগুলো দেখতে ভারী অদ্ভুত, কিন্তু তেমন রংচঙে নয়। ফুলের চেয়ে তার নিদ্রাটি দেখতে আরো সুন্দর। সন্ধ্যা হতেই সে তার পাতাগুলি বুঁজিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, আবার সকাল বেলায় পাতা মেলে জেগে ওঠে। এ গাছ নাকি আমাশার খুব ভাল ওষুদ।

এ সব ফুল আবার যখন তখন ফোটে না। যেগুলোর ছবি দিয়েছি, তারা সকলেই ফোটে সকাল বেলায়। বিকালে খুঁজলে এদের অনেককেই পাওয়া যায় না। এক

রকম শাদা ফুল দেখতে পাই, সে দুপুর বেলায় ফোটে। সকাল বিকালে দেখবে সে দল গুটিয়ে নিদ্রা যাচ্ছে। রাত্রেও কোন কোন ফুল ফোটে, কিন্তু তাদের খবর নিবার অবসর আমার হয় নি।

সিন্ধুক ঘর।

"চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা" কিন্তু চোরকে জব্দ করার বিদ্যাটি তার চাইতেও বড়! আমেরিকার চোরেরা নাকি অন্য সব চোরের চাইতে সেয়ানা। সুতরাং চোর ঠকাবার আয়োজনটাও সেখানে যেমন অদ্ভুত এমনটি আর কোথাও দেখা যায় না। সেখানকার চোরেরা আগুণ দিয়ে লোহা কাটে, তালার মধ্যে বোমা ফাটিয়ে ভারি ভারি সিন্ধুক ভেঙে ফেলে।

এই যে বাড়ীর ছবিটি দেখ্‌ছ ওর মাথার ঐ চূড়োটা কি জান? ওটা একটা প্রকাণ্ড সিন্ধুক! সিন্ধুকটি এমন ভাবে তৈরী যে খুব পাকা ওস্তাদ চোরেও তার কিছু কর্‌তে পারে না। সিন্ধুকের এক একটি খোপ এক একটি ইস্পাতের ঘর, তার চারদিকে পাঁচ দশ হাত পুরু ইঁট পাথরের দেয়াল। বড় বড় যুদ্ধের জাহাজে যেরকম লোহার বর্ম্ম আঁটা থাকে সেই রকম পুরু আর মজবুৎ লোহার পাত দিয়ে সিন্ধুকটি তৈরী করা হ'য়েছে। সব সিন্ধুকঘরই ঐরকম চূড়োর মত থাকে তা নয় অধিকাংশ ঘরই মাটির নীচে। তার মধ্যে চোর আটকাবার বন্দোবস্ত যে কত রকম থাকে, যে হতভাগা চুরী কর্‌তে গেছে, সেই তার মজাটা বুঝেছে! কোথাও এমন কল আছে যে দরজায় হাত দিলেই চারিদিকে ঘণ্টা বাজ্‌তে থাকে—আপনা থেকে

সব আলো জ্বলে ওঠে। অনেক সিন্ধুকের ডবল দেয়াল থাকে—তার মধ্যে ফাঁক—চোর সেখানে ঢুক্‌তে গেলে কোথা থেকে হুড়্‌হুড়্‌ ক'রে জল এসে তাকে ভাসিয়ে নেয়। কোনখানে ফুটন্ত জলের পিচ্‌কারি চারিদিকে খেল্‌তে থাকে—চোর বেচারার পালাবার পথটি পর্য্যন্ত বন্ধ হ'য়ে যায়! আজকাল আবার এমন কলও হ'য়েছে যাতে আপনা হ'তেই চোরের ফটোগ্রাফ পর্য্যন্ত উঠে যায়! চোর পালালেও তার নিস্তার নেই—সেই ফটো দেখে পুলিশের লোকে তার সন্ধান করে!

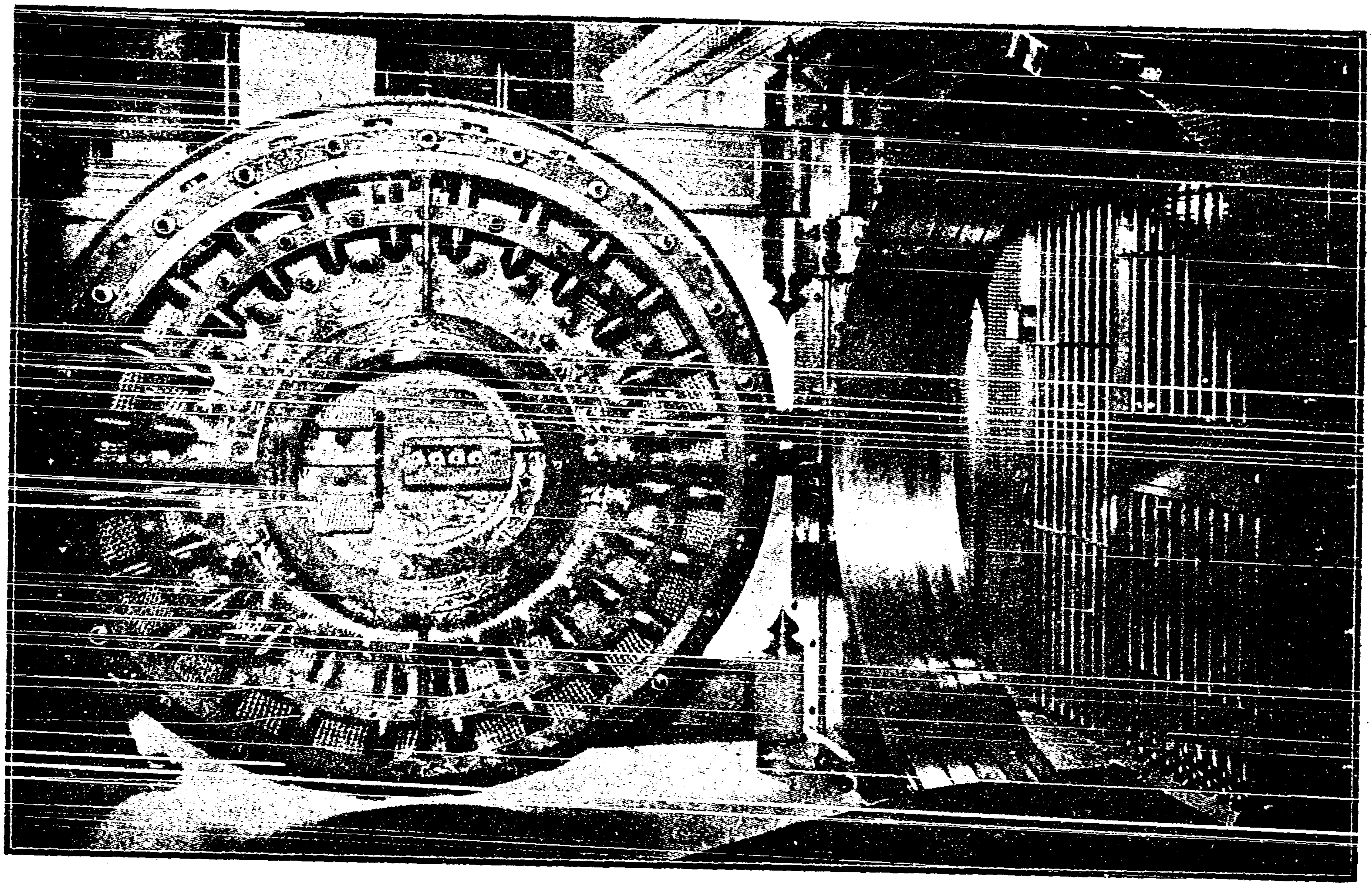

যেমন আশ্চর্য্য সিন্ধুক, তার দরজাগুলিও তেমনি অদ্ভুত! ছবিতে একটা দরজার চেহারা দেখ। দরজাটি পাঁচ হাত উঁচু, প্রায় সাতশ' মণ ভারি। দরজার গায়ে ২৪টি হুড়্‌কা বসান—এক একটি হুড়্‌কার ওজন এক মণের বেশী। দরজা বন্ধ করবার আর খুল্‌বার নানারকম সঙ্কেত আছে—চাবি আর প্যাঁচের কায়দাও নানারকম। আবার সঙ্কেত আর চাবি জানা থাক্‌লেই যে খোলা যায়, তাও নয়। খোল্‌বার সময়টি না হওয়া পর্য্যন্ত চব্বিশটে হুড়্‌কো দরজায় এমন কামড় দিয়ে এঁটে থাকে, সিন্ধুকের মালিকেরও সাধ্যি নেই যে তাকে খোলে।

হাজার লোকে ক্রমাগত শাবল দিয়ে গুঁতোলেও এ সিন্ধুকের কিছু হবে না—এতে আগুণ ধরে না—ভূমিকম্পেও যে কিছু কর্‌তে পার্‌বে এমন সম্ভাবনা নেই। যত রাজ্যের লোকে তাদের টাকাকড়ি দামী গহনা দলিল পত্র সব এনে সিন্ধুকঘরের জিম্মায় রেখে নিশ্চিন্ত থাকে—সিন্ধুকওয়ালারাও তার জন্য তাদের কাছে ভাড়া আদায় করে বেশ দু পয়সা রোজগার করে।

গল্পস্বল্প।

পূতনা কৃষ্ণকে মারতে গিয়েছিল, তার বদলে তার নিজেরই প্রাণটি গেল। গ্রীস্ দেশের পুরাণেও কতকটা এমনিতর একটা গল্প আছে। জুপিটারের পুত্র মহাবীর

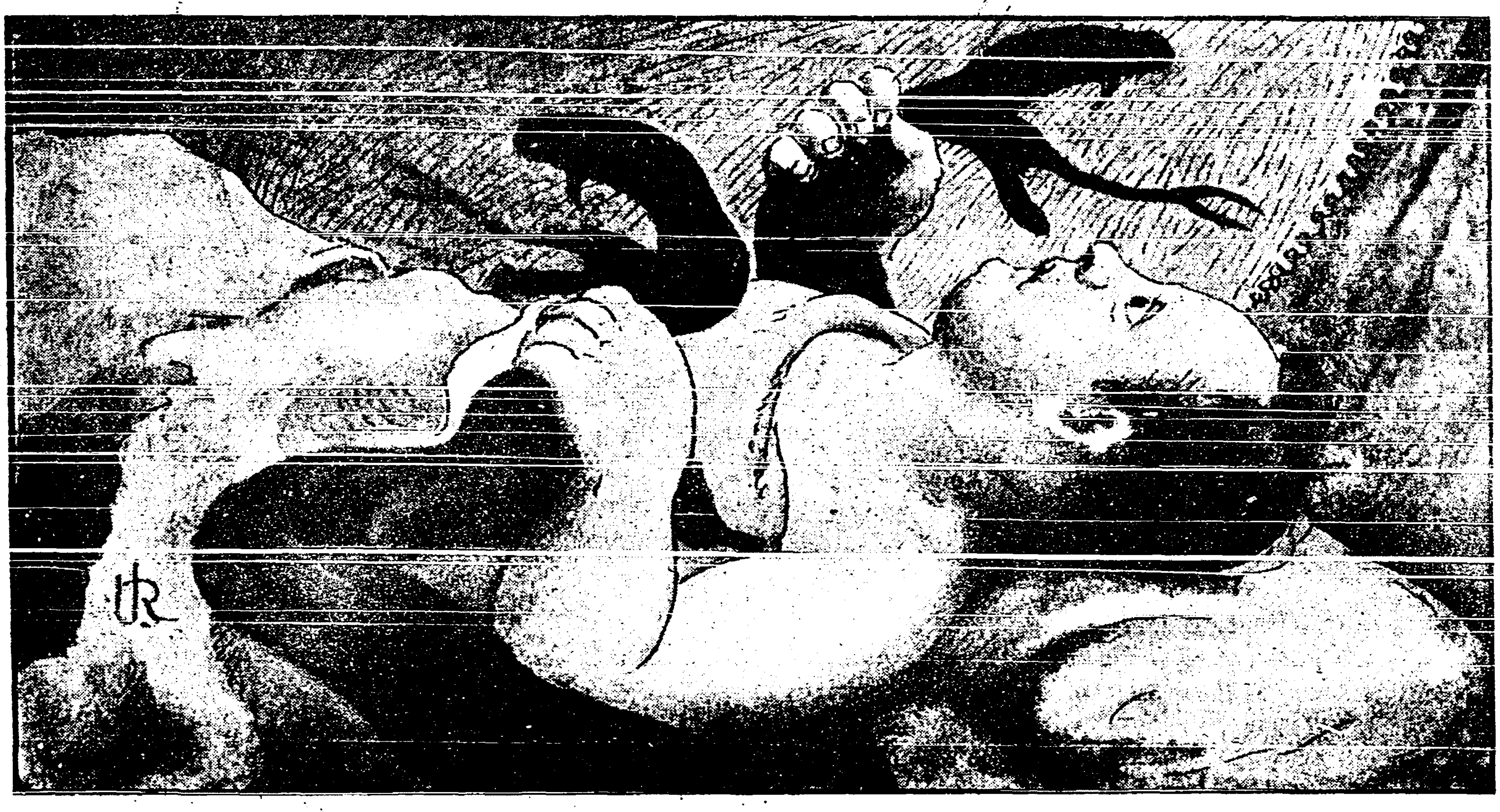

হার্কিউলিসের যখন জন্ম হয়, তখন তাঁর বিমাতা জুপিটারের পাটরাণী জুনো তাঁকে মারবার জন্য ভয়ঙ্কর দুটা সাপ পাঠিয়ে দেন। সাপ দুটো এসে হার্কিউলিস্‌কে জড়িয়ে যেই মারতে যাবে, অমনি তিনি তাঁর ছোট ছোট হাত দুখানি দিয়ে তাদের গলা টিপে ধরলেন। আর সাপের বাছাদের হারকিউলিস্‌কে মারতে হল না। খোকার হাতের সেই গলা টিপ্‌নী খেয়েই তারা হাঁ করে মরে রইল।

কৃষ্ণ পাছে বড় হয়ে কংসকে মারেন, এই ভয়েই কংস তাঁকে মারবার জন্য এত চেষ্টা করেছিল। এর বহুকাল পূর্ব্বে ইন্দ্র ও পবনকে মারবার জন্য এমনি চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তার ফল হয়েছিল উল্টা। গল্পটা এই ঃ—

কশ্যপের দুই স্ত্রী ছিলেন, দিতি আর অদিতি। দিতির পুত্রেরা দৈত্য, আর অদিতির পুত্রেরা দেবতা (আদিত্য)। কালক্রমে দৈত্য আর দেবতাদের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ হয়ে, দৈত্যদের প্রায় সকলেই মারা যায়। তখন দিতি এই প্রার্থনা করেন যে, 'আমার এমন একটি বলবান পুত্র হোক, যে ইন্দ্রকেও মারতে পারে।'

কৃষ্ণের কথা শুনে কংসের যেমন ভয় হয়েছিল, দিতির এই পুত্রটির কথা শুনে ইন্দ্রেরও কতকটা তেমনি ভয় হল। ছেলেটি কিন্তু তখনো জন্মায়নি, এক শত বৎসর ধরে সে অল্পে অল্পে অসাধারণ শক্তিশালী হ'য়ে উঠ্‌বে ; তারপর তার জন্মাবার কথা। এই এক শত বৎসর যদি দিতি খুব শুদ্ধ হয়ে থাকতে পারেন, তবেই ছেলেটি ইন্দ্রকে মারবার মত বলবান হবে।

ইন্দ্রের চেষ্টা যে, যদি দিতি মুহূর্ত্তের তরেও অশুচি হন, তবে অমনি তিনি সেই ফাঁকে ছেলেটিকে কেটে খান খান করবেন। কিন্তু দিতিও অশুচি হন না। এমনি ভাবে প্রায় এক শত বৎসর কেটে গেল। এমন সময় একদিন তিনি পা না ধুয়েই ঘুমিয়ে পড়্‌লেন, কাজেই তখন তিনি অশুচি হওয়ায় ইন্দ্রও সুযোগ পেয়ে বজ্র দিয়ে ছেলেটিকে সাত টুকরো করে কেটে ফেল্লেন। সাত টুকরো হয়েও কিন্তু খোকা মর্‌ল না, বরং সে একটির জায়গায় সাতটি খোকা হয়ে বিষম চ্যাঁচাতে লাগল।

ইন্দ্র তাতে ব্যস্ত হয়ে বল্লেন, "কেঁদ না! চুপ্‌ চুপ্‌—ভয় কি ?" খোকা যাতনায় অস্থির, সে কেন সে কথায় ভুলবে ? সে আরো চ্যাঁচাতে লাগল। ইন্দ্র তাতে বড্ডই চটে, সেই সাতটি টুকরোর প্রত্যেকটিকে আবার সাত টুকরো করে কাটলেন। কিন্তু খোকা তাতেও মরল না ; সে তখন একটির জায়গায় হয়ে গেল ঊনপঞ্চাশটি খোকা। আবার বজ্র মারলে বোধ হয় আরো বেশী হত, কিন্তু ইন্দ্রের আর সে ভরসা হল না।

সেই খোকাই দেবতা পবন। ইন্দ্র তাকে ঊনপঞ্চাশ টুকরো করেছিলেন বলেই ঊনপঞ্চাশ বায়ুর কথা বলে থাকি। ইন্দ্র খোকাটিকে বলেছিলেন, 'কেঁদ না!' (মা রুদ), তাই পবনের এক নাম 'মারুৎ'। ইন্দ্রের কাছে এমন ব্যবহার পেয়ে তাঁর উপর পবনের খুব চটবারই কথা, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তার বদলে দু জনের ভিতরে খুব বন্ধুতা হয়ে গেল।

নূতন ধাঁধা।

১। মানুষ নহি—ঘাঘরা ঘেরা দেহের কিবা ছিরি
ময়ূর নহি বাদল দিনে পেখম ধ'রে ফিরি।
সাহেব লাটে আমার সাথে বেড়ায় হাতে ধ'রে,
কদর বুঝে আদর ক'রে মাথায় রাখে মোরে।

২। দেখেছি তারে রাস্তা ঘাটে বুঝিনে তার কথা—
কাট্‌লে মাথা শোনায় বুলি কেমন ধারা প্রথা!
পেট কাট্‌লে কালো বরণ লেজ কাট্‌লে কাবু
এমন জীবে চিন্‌লে তবে সাবাস বলি বাবু!

৩। এইগুলো চট্‌পট্‌ পড়ে ফেল ত—
এলে খাপড়্ তেনাপার লেবুঝ বতুমিচা লাকন ও।
ঘবায়ঙ্গা ডারমীকু লেজ।
রবা কয় যায়লাতল বেড়ানে।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর।

কাজল।

পার্ব্বতীর তপস্যা।

U. RAY & SONS.

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

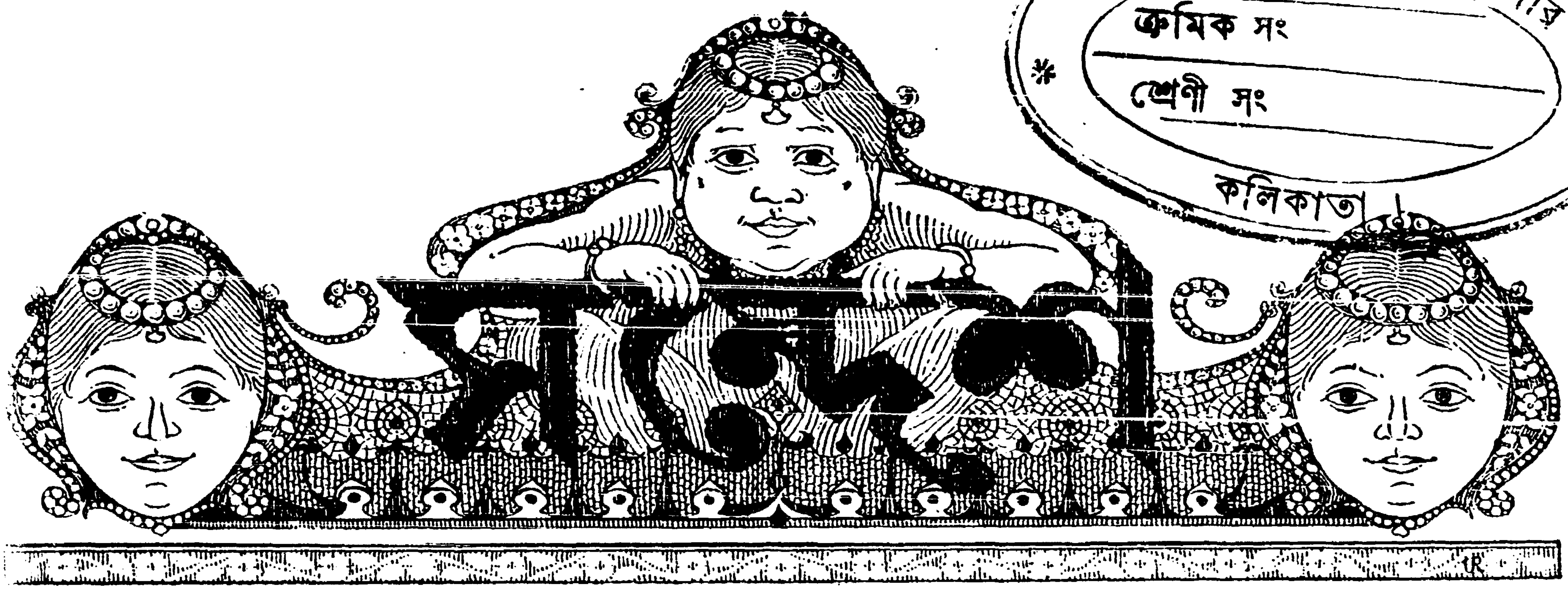

তৃতীয় বর্ষ — কার্ত্তিক, ১৩২২ — সপ্তম সংখ্যা

সাগর।

আমার, ভোর না হতে, ঘুমটি ভাঙ্গে
তোমারি গান শুনে ;
সাগর, ছুটে আসি তোমার পানে
জানিনা কোন টানে।
ওগো, ঢেউয়ের নীলে, মেঘের ভালে,
পূবাকাশের কোলে,
বল, এত সিঁদুর কে ঢেলে দেয়,
নিত্যি সকাল হ'লে ?
সেই, সিঁদুর জলে গা ভাসিয়ে
সূয্যি মামা নায়,
দেখে, আপন ছায়া জলের মাঝে,
অবাক হ'য়ে চায়।
ক্রমে, বাড়্‌ল বেলা সোণার আলোয়
ভর্‌ল সকল দিক,
শাদা, ফেনার মাথায়, বালির 'পরে,
রোদ্দুর ঝিকি ঝিক্‌।

তোমার, নীল আঁচলের ফেনিল পাড়ে
দেয় সে গেঁথে মণি,
হেসে, গলায় তোমার দেয় দুলিয়ে
হীরার মালা খানি।
নাচে, আলোর সাথে, হাওয়ার সাথে,
লক্ষ কোটি ঢেউ,
ফেনা, লাফিয়ে পড়ে, গড়িয়ে পড়ে;
রাখ্‌তে পারে কেউ?
বালি, যোজন যুড়ে রয় যে প'ড়ে
বাহু দুটি মেলে,
তুমি, দৌড়ে এসে ঝাঁপিয়ে এসে,
পড়ছ তাহার কোলে।
যখন, চাঁদ্‌নী রাতে জোছ্‌না ফোটে
তোমার কালো জলে,
যখন, ছড়িয়ে পড়া জলের কণা
মুক্তা হ'য়ে দোলে,
তখন, জল ত তোমার জল নাহি আর!
যেন রূপার ধারা,
কোথা, চাঁদের আলোর পথটি ধ'রে
চল্‌ছে আপনহারা।
যেথা, আকাশ মেশে তোমার সাথে,
ঐ যে তোমার শেষ,
বল, ঐ খানেতে আছে কি গো
রূপ কাহিনীর দেশ?
শুনি, তোমার জলে অতল তলে,
মুক্তা ভরা খনি;
শুনি, আঁধার ঢাকা বুকের নীচে
লুকিয়ে থাকে মণি;

যেদিন, সীমা তোমার মুছিয়ে ফেলে
অন্ধ আঁধার কালো,
সেদিন, ঢেউয়ের মাথায়, ঢেউয়ের মাথায়,
জ্বলে যে তার আলো।

শ্রীসুখলতা রাও।

শিবের বিয়ে।

দুর্গার এক নাম 'পার্ব্বতী', অর্থাৎ, পর্ব্বতের মেয়ে। তাঁর পিতা হিমালয়, মা মেনকা। শিবের সঙ্গে যাতে তাঁর বিয়ে হয়, এজন্য পার্ব্বতী অনেক দিন ধরে কঠিন তপস্যা করেছিলেন, তার ফলে শেষে শিবের সঙ্গেই তাঁর বিয়ে হল।

পার্ব্বতীর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে শিব তাঁকে বিবাহ করতে চাইলেন। কিন্তু বর যে, সেত আর নিজে কনের বাপের কাছে গিয়ে বিয়ে ঠিক করতে পারে না, তা হলে লোকে হাসে! কাজেই শিব সপ্তর্ষিদের ডেকে পাঠালেন। সপ্তর্ষিরাও তখনই সোনার বল্কল পরে, মুক্তামালা গলায় দিয়ে, মণি মাণিকের গহনা ঝলমলিয়ে তাঁর কাছে এসে যোড় হাতে বল্লেন, "আমাদের কি সৌভাগ্য! প্রভু আজ আমাদের স্মরণ করেছেন। আজ্ঞা করুন, আমাদের কি করতে হবে।"

শিব বল্লেন, "আমি হিমালয় পর্ব্বতের মেয়ে পার্ব্বতীকে বিয়ে করতে চাই; তোমরা তাঁর কাছে গিয়ে সব ঠিক ঠাক কর। দেখ যেন ভাল মতে কাজটি করে আসতে পার।"

সপ্তর্ষিরা তখন নিমেষের মধ্যে আকাশে উড়ে, সেই ঝকঝকে হিমালয় পর্ব্বতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। হিমালয় দূরে থেকে তাঁদের দেখতে পেয়ে মেনকাকে বল্লেন, "না জানি ঐ সাতটি সূর্য্য কি করতে আমাদের এখানে আসছে!" বলতে বলতেই তিনি দেখলেন, ওসব সূর্য্য নয়, সাতটি মুনি। তখন তিনি তাড়াতাড়ি তাঁদের কাছে গিয়ে, যোড় হাতে তাঁদের নমস্কার করে, বসতে সুন্দর আসন দিয়ে বল্লেন, "মুনি ঠাকুরেরা কি মনে করে আমাদের এখানে পায়ের ধূলো দিয়েছেন?" মুনিরা বল্লেন, "শিব তোমার কন্যা পার্ব্বতীকে বিয়ে করতে চেয়েছেন, তাই আমরা এসেছি। এমন জামাই আর পাবে না রাজা, শিবের কাছে তোমার পার্ব্বতীর বিয়ে দাও।"

তা শুনে হিমালয়ের আর আনন্দের সীমাই রইল না। তিনি তখনি ছুটে গিয়ে, পার্ব্বতীকে সাজিয়ে গুজিয়ে এনে মুনিদের কোলে বসিয়ে দিয়ে বল্লেন, "এই নিন্, আমার পার্ব্বতীকে।" এমন সুন্দর লক্ষ্মী মেয়ে আর কখনো হয়নি, হবেও না। পার্ব্বতীকে দেখে স্নেহে মুনিদের মন গলে গেল। তাঁরা তাঁর গায় হাত বুলিয়ে; তাঁকে কত আশীর্ব্বাদ করে, বিয়ের সব কথা বার্ত্তা বলে সেখান থেকে পরম আনন্দে হাসতে হাসতে চলে এলেন। স্থির হল যে, আর তিন দিন পরে শিবের সঙ্গে পার্ব্বতীর বিয়ে হবে।

সপ্তর্ষিরা শিবের কাছে এসে এসব কথা জানালে শিব যারপর নাই খুসী হয়ে বল্লেন, "বেশ, বেশ! বিয়ের সময় তোমরা আমার পুরুত হবে কিন্তু। তোমাদের শিষ্যদেরও নিয়ে আসবে।"

মুনিরা সে কথায় 'যে আজ্ঞা' বলে চলে যেতেই শিব বিয়ের আয়োজন করবার জন্য তাঁর ভূত প্রেত নিয়ে কৈলাস পর্ব্বতে চলে এলেন। তার পর তিনি নারদকে ডেকে বল্লেন, "নারদ বিয়ের ঠিক করেছি; কনে হচ্ছেন হিমালয়ের মেয়ে পার্ব্বতী। এখন তুমি একটি কাজ কর ত; দেবতাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করে এস। মুনি ঋষিদেরও বলবে, যক্ষ গন্ধর্ব্বেরাও যেন বাদ না পড়ে। সকলকেই আসতে হবে; যে না আসবে তার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হবে।" নারদ মুনি যেমন তেমন চালাক লোক ছিলেন না, শিবের হুকুম মত সব কাজ করে ফেল্লেন।

ততক্ষণে কৈলাস পর্ব্বতে খুবই ধূমধাম পড়ে গেছে; ভূতেরা ঢাক ঢোল শিঙ্গা শানাই কাঁসর করতাল সব বাজিয়ে সৃষ্টি মাথায় করে তুলেছে। তাদের মুখে আজ আর হাসি ধরে না। ক্রমে দেবতারাও একজন দুজন করে এসে উপস্থিত হলেন। হাঁসে চড়ে ব্রহ্মা এলেন, গরুড়ে চড়ে বিষ্ণু এলেন। ইন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ, কেউ আসতে বাকি রইলেন না। গন্ধর্ব্ব আর অপ্সরারা ত এর ঢের আগেই এসে গান বাজনা যুড়ে দিয়েছে। শিবও সেই কখন থেকে সেজে গুজে প্রস্তুত হয়ে আছেন। বরের বেশে তাঁকে কি সুন্দরই দেখা যাচ্ছে!

তারপর সকলে শিবকে নিয়ে রওয়ানা হলেন। দেবতারা নিজ নিজ দল নিয়ে বরের আগে আগে যেতে লাগলেন, বাজানদারেরা মাথা দুলিয়ে নাচতে নাচতে তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে বাজিয়ে চল্ল।

এদিকে হিমালয়ও চুপ করে বসে থাকেন নি। পার্ব্বতীকে নাইয়ে সাজিয়ে তাঁরাও প্রস্তুত হয়ে আছেন। বাড়ী ঘর সাজিয়ে, তোরণ বানিয়ে, নিশান উড়িয়ে, স্বপ্নপুরীর

মত সুন্দর করা হয়েছে। পর্ব্বতেরা সকলে সেজে গুজে সপরিবারে এসে কাজ কর্ম্মে ব্যস্ত রয়েছেন। শিবকে এগিয়ে আনবার জন্য স্বয়ং গন্ধমাদন পর্ব্বত কখন বেরিয়ে গেছেন। বর এলে তাকে আদর করে আনতে হবে, সে জন্য নিজে হিমালয় ফটকে দাঁড়িয়ে।

বাড়ীর ভিতরেও অবশ্যি কেউ চুপ করে নেই। মেয়েদের আজ বড়ই আনন্দ আর উৎসাহ। পার্ব্বতীর মা মেনকাদেবী ত আনন্দে মাথা ঠিকই রাখতে পারছেন না। তিনি এরি মধ্যে নারদ মুনিকে সঙ্গে করে গিয়ে ছাতে উঠে আছেন,—যার জন্যে মেয়ে এত তপস্যা করলেন, সেই শিবকে সকলের আগে দেখতে হবে। সাধারণ দেবতারাই যখন দেখতে এত সুন্দর, শিব না জানি তবে কত সুন্দর।

এমন সময় গন্ধর্ব্বের রাজা বিশ্বাবসু এলেন। তিনি দেখতে খুবই সুন্দর; তাঁকে দেখে মেনকা বল্লেন, "এই বুঝি শিব!" নারদ তাতে হেসে বল্লেন, "না, না! ও ত আমাদের বাজানদার; ও কেন শিব হবে?" তা শুনে মেনকা ত থতমত খেয়ে চুপ করে গেলেন, ভাবলেন, "বাজানদারই দেখতে এমন শিব না জানি তবে কেমন!"

তারপর এলেন যক্ষদের নিয়ে কুবের; তিনি গন্ধর্ব্বের রাজার চেয়ে দ্বিগুণ সুন্দর। মেনকা বল্লেন, "তবে এই শিব!" নারদ বল্লেন, "না!" শুনে মেনকা আরো আশ্চর্য্য হলেন।

তারপর এলেন বরুণ, তিনি কুবেরের চেয়ে দ্বিগুণ সুন্দর, তারপর এলেন যম, তিনি বরুণের চেয়ে দ্বিগুণ সুন্দর; তারপর এলেন ইন্দ্র, তিনি যমের চেয়েও দ্বিগুণ সুন্দর। মেনকা এঁদের একেকজনকে দেখে ভারী খুসী হয়ে বল্লেন, "এ নিশ্চয় শিব!" নারদ তাতে না বল্লে, তিনি অপ্রস্তুত হয়ে মাথা চুলকাতে লাগলেন।

এমনি করে সূর্য্য, চন্দ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, বৃহস্পতি সকলকে দেখেই মেনকা বল্লেন, "এই শিব।" যখন শুনলেন যে এঁদের কেউ শিব নন্, শিব এঁদের চেয়েও বড়, তখন তাঁর এতই আশ্চর্য্য বোধ হল যে, তিনি আর ভাবতেই পারলেন না, সেই শিব তবে কত সুন্দর।

এমন সময় ভূত প্রেত ব্রহ্মদৈত্যি সব নিয়ে শিব এসে উপস্থিত। এত ভূত আর মেনকা কখনো এক সঙ্গে দেখেননি; তাদের সেই বিকট ভেঙচি দেখেই তাঁর মাথা ঘুরে গেল। তাদের সঙ্গে যে আবার পাঁচ মুখো একটা কে বাঁড়ে চড়ে এসেছে,—মাথায় জটা, পরনে বাঘ ছাল, গায় ছাই মাখা, গলায় মড়ার মাথা—সে কথার খবর নিবার

খেয়ালই তাঁর রইল না। তখন নারদ সেই দেবতাকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বল্লেন, "এই শিব!"

যেই এই কথা বলা, অমনি মেনকা, "ও লক্ষ্মী ছাড়া পোড়ার মুখী পার্ব্বতী! করেছিস কি?" বলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। শিব সে কথা জানতে পেরে ছুটে এসে মেনকার মাথায় জল ঢেলে অনেক হাওয়া করতে শেষে তাঁর জ্ঞান হল।

তখন যে তিনি শিবকে আর নারদকে বকুনিটা বকলেন! নারদের অপরাধ ছিল এই যে তিনি বলেছিলেন, "শিব বড় ভাল, তাঁর সঙ্গে পার্ব্বতীর বিয়ে হবে।" বকতে বকতে তাঁর সেই সাত মুনির কথা মনে পড়ল যাঁরা পার্ব্বতীর বিয়ে ঠিক করতে এসেছিলেন। অমনি তিনি তাঁদের উপর যারপর নাই চটে বল্লেন, "বেটারা গেল কোথায়? আজ তাদের দাড়ি ছিঁড়তে হবে!" আবার তখনি মাথায় চাপড় মেরে বল্লেন, "আর তাদেরই বা দোষ কি? ঐ অভাগী মেয়েই ত যত নষ্টের গোড়া!" এই বলে তিনি পার্ব্বতীকে কত গালই দিলেন। শেষে তিনি বল্লেন যে "আমি কিছুতেই এই কদাকার বুড়োর কাছে মেয়ে বিয়ে দিব না ওর না। আছে টাকা, না আছে গুণ, না জানে লেখা পড়া, না পারে একটা ঘোড়া কিনে চড়তে!"

তখন সকলে মিলে মেনকাকে কত বুঝালেন, কারো কথায় কিছু হল না। পার্ব্বতী নিজে এসে একবার তাঁকে মিনতি করে দুটো কথা বলেছিলেন, তাতে তিনি দাঁত কড়মড়িয়ে ক্ষেপে উঠে পার্ব্বতীকে এমনি কীল আর কনুইয়ের গুঁতো মারতে লাগলেন যে, নারদ মুনি তাড়াতাড়ি এসে তাঁকে ছাড়িয়ে না নিলে সে দিন ভারী মুস্কিলই হত আর কি!

যা হোক শেষে বিষ্ণু এসে অনেক উপদেশ দিতে মেনকার মন একটু শান্ত হল। ঠিকসেই সময়ে নারদও শিবকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাঁর চেহারা অনেকটা শুধরিয়ে এনে মেনকার সামনে উপস্থিত করলেন। তখন মেনকা দেখলেন যে শিবের মাথায় জটা আর গায় ছাই বলে তাঁকে একটু উস্ক খুস্ক দেখায় বটে, কিন্তু আসলে তিনি সকল দেবতার চেয়ে সুন্দর। মেনকা যতই তাঁর মুখের দিকে তাকান, ততই তাঁর মনে হয় যে, 'আহা, কি মিষ্টি! কি সরল!'

এমনি ভাবে মেনকা অনেক ক্ষণ অবাক হয়ে শিবের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বল্লেন, "আহা! আমার পার্ব্বতীর কপাল বড় ভাল যে এমন স্বামী পেয়েছে!" তা শুনে শিবের ভারী লজ্জা হওয়ায় তিনি জড়সড় ভাবে দেবতাদের কাছে চলে গেলেন।

এদিকে মেয়েদের মহলে ভয়ানক ছুটাছুটির ধূম লেগে গেছে। সবাই বলছে, "আরে, দেখ এসে, পার্ব্বতীর কি সুন্দর বর হয়েছে!" তারা যে যেমন ছিল, তেমনি ভাবে, কেউ রান্না ফেলে, কেউ কলসী কাঁকে, কেউ চুল বাঁধতে বাঁধতে, কেউ ঘোমটা টানতে টানতে কেউ আছাড় খেতে খেতে এসে উপস্থিত হল। শিবকে তারা চন্দন দিয়ে, খৈ দিয়ে, আরো কত রকমে পূজা যে করল তা কি বলব। তাঁকে নিয়ে হাসি তামাসা কত হল, তার ত অন্তই নাই। মেনকা অবধি এসে তাতে যোগ না দিয়ে থাকতে পারলেন না। তিনি শিবের পিছনে গিয়ে, তাঁর গলায় কাপড় জড়িয়ে টানতে আরম্ভ করেছিলেন, দেবতারা দেখে ফেলায় হাসতে হাসতে ঘরে পালিয়ে গেলেন।

তারপর শিবকে রেশমী কাপড় পরিয়ে, তাঁর গলায় সোনার ফুলের মালা কপালে তিলক দিয়ে তাঁকে আর পার্ব্বতীকে বিয়ের জায়গায় নিয়ে যাওয়া হল। মুনিরা বেদ পড়তে লাগলেন। ব্রহ্মা তাঁদের দিয়ে বিয়ের সকল কাজ করিয়ে নিলেন। তারপর তাঁর কথায় মেয়েরা এসে শিব আর পার্ব্বতীর কপালে খৈ ছড়িয়ে দিতে লাগল। আর, গন্ধর্ব্ব আর অপ্সরারা মিলে গান বাজনা যে খুবই করল, তার ত কথাই নাই।

এমনি করে শিব আর পার্ব্বতীর বিয়ে হয়ে গেল। হিমালয় দেবতাদের সকলকে এমনি আদর অভ্যর্থনা করলেন যে, তাঁদের লাজে মাথা হেট করে থাকতে হল। তাঁরা হিমালয়কে কত আশীর্ব্বাদ যে করলেন, তার লেখা জোখা নাই। তখন মেনকা লাজে জড়সড় হয়ে তাঁদের কাছে এসে বল্লেন, "ঠাকুর! আপনাদের কাছ আমি ভারী পাগলামি করেছি, আমার বড় অপরাধ হয়েছে, আমাকে মাপ করতে হবে।" দেবতারা হেসে বল্লেন, "আপনার কোন চিন্তা নাই; আপনি যা করেছেন তাতে আমরা আমোদই পেয়েছি। আপনার দিন দিন সৌভাগ্য বাড়তে থাকুক।"

তখন আবার বাজনা বেজে উঠল, সকলে সেজে প্রস্তুত হল, দেবতারা মনের সুখে বর কনে নিয়ে কৈলাসে যাত্রা করলেন। হিমালয় আর মেনকা সকলকে নিয়ে তাঁদের গন্ধমাদন পর্ব্বত অবধি এগিয়ে দিয়ে, ঘরে ফিরে এসে ভাবলেন, "হায়, সব যে অন্ধকার! কোথায় গেল আমাদের পার্ব্বতী?"

জ্বালাতন।

পোকার জ্বালায় অস্থির হলাম,—আর ব্যাঙের জ্বালায়। মাস দুই আগে ব্যাঙগুলো মাছির মত ছোট্ট ছোট্ট ছিল; তখন তাদের দেখলে ভারী মায়া হত। ঠিক বুড়ো ব্যাঙ্‌দের মতই তারা লাফিয়ে লাফিয়ে হাওয়া খেতে বেরুত; ধরতে গেলেও তেমন ব্যস্ত হত না, হাতের তেলোয় তুলে বসিয়ে দিলেও ভয় পেত না। এখন সেগুলো বড় হয়েছে, এখন সিঁড়ি বেয়ে ঘরে উঠতে পারে। ঘর যেন আমাদের নয়, যেন তাদেরি ঘর। ভারী গম্ভীর হয়ে তারা তার ভিতরে বেড়িয়ে বেড়াবে, আমাদের গ্রাহ্যও করবে না। তাড়াতে গেলে ব্যস্ত হয়ে গলি ঘুচির ভিতরে ঢুকতে যাবে কিন্তু বাইরে যাবার নামও করবে না। এদের মারবার সাধ্য নাই, মুখখানি দেখলেই দয়া হয়। যেন বেচারারা কিছু জানে না, কারো মন্দ ভাবে না। মাঝে মাঝে ওরা ঘরের কোণে এসে দু পাশের দেয়ালে পা ঠেকিয়ে বেয়ে উঠবার বিষম চেষ্টা করে। তখন তাদের দেখলে বড়ই হাসি পায়। আর, যখন ছুটতে গিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে হাত পা ছোড়ে, তখনও মজা কম হয় না। কাজেই তাদের আর মারা যায় কি করে? ওদের জব্দ করার এক উপায় হচ্ছে খালি, কাগজ দিয়ে ধরে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া। তখন

তারা ভারী আশ্চর্য্য হয়ে, খানিক কি যেন ভাবে, তারপর আবার লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে থাকে, যেন কিছু হয় নি।

পোকার কথা আর কি বলব? আগে এদের বড় দেখতে পাই নি; বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে এসে উপস্থিত হয়েছে। এদের জ্বালায় রাত্রে আলো জ্বালিয়ে খাবার যো নাই; লাফিয়ে এসে ভাতে পড়তে চায়। এত রকমের পোকাও হয়! গঙ্গা ফড়িং, পিঁপ্ড়ে, সাপের মাসী, গাঁধি, রাউটী,—কত নাম করব? দশটার মধ্যে একটারও নাম জানি না হয় ত। চেহারাই বা কত রকমের, রংই বা কত রকমের, গন্ধই বা কত রকমের, রীতি নীতিই বা কত রকমের; তার উপর আবার কামড়ের জ্বালাও আছে। গাঁধির আবার কামড়াতেও হয় না; তোমায় শুধু ফুঁকেই ফোস্কা ধরিয়ে দিতে পারে। মাঝে মাঝে এক একটা ফড়িং আসে, সে এমনি গোঁয়াড় যে, লাফিয়ে এসে ঘাড়ে ব'সে, গোধা পায়ের লাথি লাগিয়ে চলে যাবে।

একদিন একটা ফড়িং এসেছিল, সেটা দেখতে এমনি অদ্ভুত যে কি বলব। চুপ করে বসে থাকলে কখনো তাকে দেখে বলতে পারবে না যে সে খানিকটা গাছের ছাল নয়, সে একটা ফড়িং। হাত পা গুলো গাছের ডালের মত, পাখাগুলো গাছের ছালের মত, রংটি অবিকল শুকনো গাছের মত।

জানোয়ারের মধ্যে যেমন ব্যাঙ্, পোকার মধ্যে তেমনি গোবরে পোকা। ওগুলোর কাণ্ড দেখলে আমার বড্ড হাসি পায়। বোঁ-ওঁ-ওঁ!! করে এসে ঘরে ঢুকবে—ঢুকেই অমনি দেয়ালে ঢুঁ খেয়ে চিৎ হয়ে মেঝেয় পড়ে প্রাণপণে হাত পা ছুঁড়তে থাকবে। তখন তাড়াতাড়ি বাটি চাপা দিলেই, বেটারা জব্দ হয়। জব্দ হয় বটে, কিন্তু সে কথা মানার দস্তুর তাদের নাই। চাপা দিবার খানিক পরেই দেখবে, সে তোমার বাটি ঠেলে নিয়ে চলেছে। সারা রাত যদি অমনি ভাবে বাটি চাপা দিয়ে রাখ, তবে সারা রাতই শুনবে খালি বাটি ঠেলার খস্ খস্ শব্দ।

একদিন একটা গোবরে পোকা এসেছিল, সেটা প্রায় দু ইঞ্চি লম্বা। দেখতে কালো, তার উপরে এই বড় বড় শাদা ফুট্‌কি। মাথায় দুটো দাঁড়া, সে কি ভয়ানক! তাকে বাটি চাপা দিতে অনেক বেগ পেতে হয়েছিল। তোমার হাতে বাটি দেখলেই সে তোমার মতলব এঁচে নিবে, তারপর কি ছুটই দিবে! ছুটে গিয়ে কপাটের আড়ালে ঢুকে, সেখান থেকে উঁকি মেরে তোমাকে দেখতে থাকবে। এগুলোর কামড়ে নাকি বিষ আছে, তার ঘা শীগ্গির শুকোয় না।

২

রাত্রে এই সব, আর দিনের বেলায় মাছি আর বোলতা। মাছির কথা আর কি বলব ? সে ত সকলেই জানে। এরাই নাকি গায়ে হাতে করে ভয়ানক ভয়ানক বেয়ারামের বীজ এনে আমাদের গায় আর খাবারের ভিতর রেখে যায়। তবেই ভাব, এরা আমাদের কি রকম শত্রু। দুপুর বেলায় একটু ঘুমুতে গেলে এরা এসে নাকে মুখে সুড়সুড়ি দিয়ে ক্ষেপিয়ে তোলে। ক্ষুদে মাছিগুলো আবার এর চেয়েও দুষ্টু। আমি লিখছি, আর ওরা পিন্ পিন্ পিন্ পিন্ করে এসে খালি আমার নাকের আর চোখের ভিতর ঢুকতে চেষ্টা করছে। চোখে চসমা আছে, তাতেও ওদের গ্রাহ্য নাই ; চসমার পাশ দিয়ে একেবারে চোখের ভিতরে গিয়ে উপস্থিত হয়। তখন তাকে মারবারও যো নাই, তাহলে চসমা ভেঙ্গে যাবে। সেদিন ঠিক এমনি করে চোখের ভিতর থেকে ক্ষুদে মাছি তাড়াতে গিয়ে এক বাবুর থাপ্পড় লেগে তাঁর চস্‌মা উড়ে গিয়েছিল।

পিঁপ্‌ড়েগুলোও কম নয়। আমি দেখতে পাচ্ছি, আমার ঘর ময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এক্ষুণি একটা এসে আমাকে, উঃ, কি কামড়ই দিল। এক এক সময় আট দশটা মিলে এক সঙ্গে কামড়াতে আসে।

এদের সকলের চেয়ে অবশ্যি বোলতাকেই আমার বেশী ভয় করে। আজ অন্য দিনের চেয়ে এদের একটু কম আনাগোনা দেখছি ; তবু এরির মধ্যে দু তিন জন এসে আমার খবর নিয়ে গেছে। চার বছর আগে একটা বোলতা আমাকে কামড়িয়েছিল, এখনো তার দাগটি আমার হাতে আছে। ছেলে বেলায় এদের কত কামড়ই খেয়েছি। তখন থেকেই এই পোকাগুলোকে আমি ভারী ভয় করি। একবার একটার তাড়া খেয়ে এমনি ছুট দিয়েছিলাম যে সিকি মাইল আমার পিছু পিছু তাড়িয়েও সেটা আমাকে ধরতে পারে নি। আমাদের বাড়ীর কর্ত্রীকে যে বোলতায় কামড়িয়েছিল, তার কথা এখনো তিনি মাঝে মাঝে দুঃখের সহিত বলেন।

কাজেই বোলতা ঘরে এলেই আমরা একটু ব্যস্ত হই ; কখন কাকে কামড়ায়, তার ঠিক কি ? এর ওষুদ হচ্ছে পাখা হাতে নিয়ে বসা, আর বোলতা খামখা বেশী কাছে এলে তাকে ঠাঁই করে মারা। তখন সে মাটিতে পড়ে ফড়্ ফড়্ করে ঘূরতে থাকে, বেশী লাগলে অজ্ঞান হয়ে যায়, কিন্তু সহজে মরে না। খানিক বাদেই দেখবে, সে উঠে বসেছে ; আর খানিক বাদে উড়তে থাকবে। তখনো হয় ত তার মাথা ঘোরা একেবারে সারবে না ; হয় ত সে মাতালের মত টল্‌তে টল্‌তে উড়বে, আর দেয়ালে

টক্কর খেতে খেতে ভাববে 'বড্ড সামলে গেছি!' যাহোক, আর একটু পরেই সে বেরিয়ে চলে যাবে।

যদি বোলতা মরে যায়, তবে অমনি পিঁপ্ড়েরা এসে তাকে নিয়ে যাবার আয়োজন করবে। একটা বোলতাকে নিয়ে যেতে কটা পিঁপ্ড়ে লাগে আমি তার হিসাব করতে

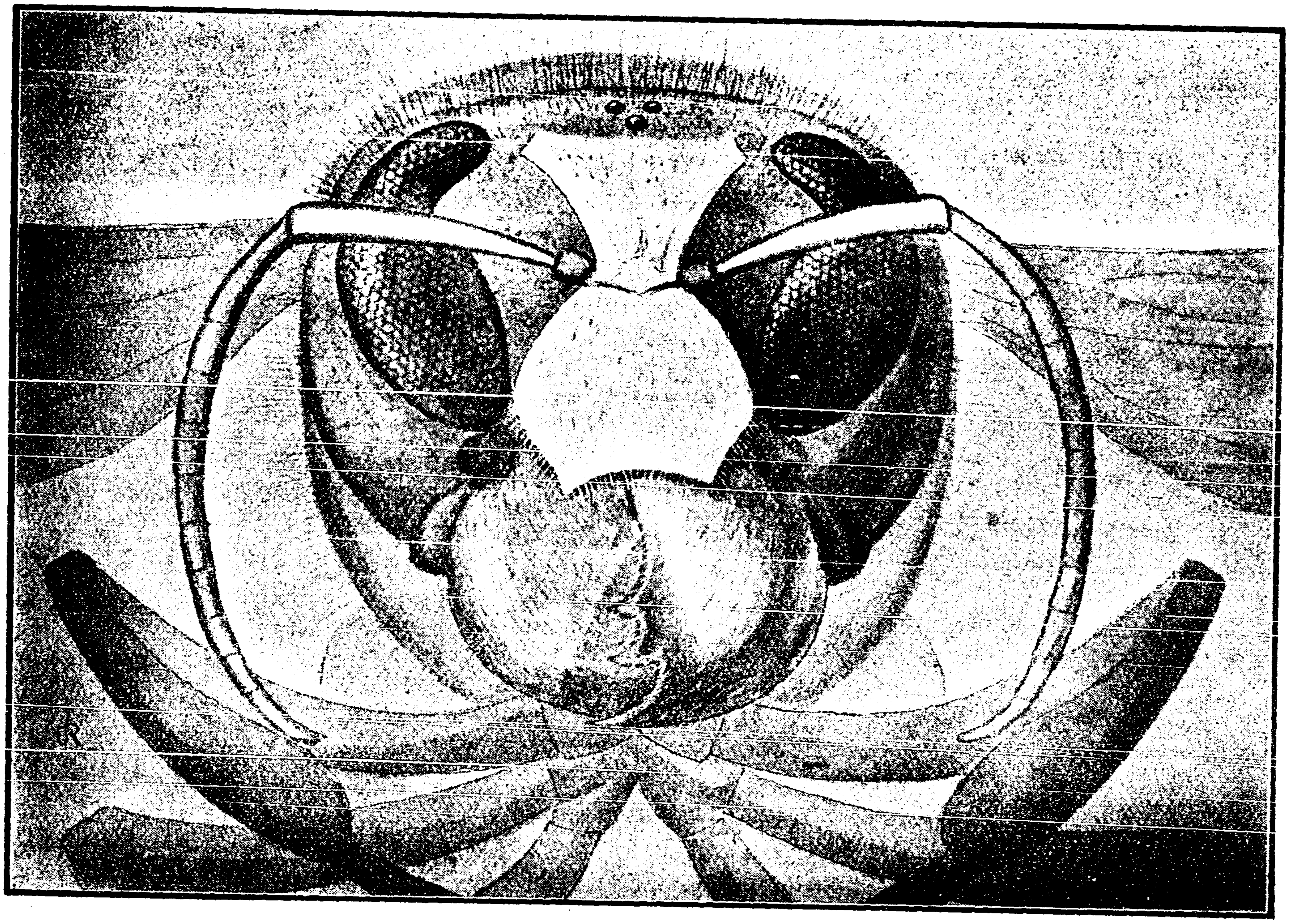

বোল্‌তার মুখ (অনুবীক্ষণ দিয়ে বড় করে দেখান হয়েছে)

চেয়েছিলাম, কিন্তু দেখলাম যে কাজটি বড়ই কঠিন। ৪০।৪৫টা পিঁপ্ড়ে একটা বোলতাকে ধরেছে, কিন্তু তাদের সকলে এক দিক পানে টানছে না। একদল যে দিকে টানছে, আরেক দল টানছে ঠিক তার উল্টো দিকে। তার মধ্যে আবার দশ বারো জন বোলতাটার উপরে উঠে খালি পাইচারি করছে। তারা টানছে ত নাই, লাভের মধ্যে অনর্থক বোঝা বাড়াচ্ছে। আমি জানতাম যে, পিঁপ্ড়েরা ভারী বুদ্ধিমান জীব;

এখন দেখছি, তারা মাঝে মাঝে নিতান্ত বোকার মত কাজও করে। কাজেই আমার আর হিসাব করা হল না ; শুধু এইটুকু বুঝলাম যে বুঝে শুনে টানলে ৪০।৪৫টার চেয়ে ঢের কম পিঁপ্‌ড়েতে একটা বোলতাকে সমান জমির উপরে টেনে নিয়ে যেতে পারে।

অনেক সময় বোলতাটা মরবার আগেই পিঁপ্‌ড়েগুলো এসে তাকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে। তখন বোলতাটা তাদের এক এক জনকে এমনি লাথি মারে যে, তাতেই তাদের দু তিনশ হাত (পিঁপ্‌ড়ের হাতে) দূরে গিয়ে ছিটকিয়ে পড়তে হয়।

আমি যে বোলতাগুলোর কথা বলছি, তারা দেখতে ভারি সুন্দর। গায়ের রংটি, তোমরা যাকে চকোলেট রং বল, তেমনি। কপাল আর দুটি শুঁড়ের গোড়া দুটি হলদে, খানিক চকোলেট। দু পাশে দুটি বড় বড় চোখ, তার প্রত্যেকটি হাজার হাজার চোখ দিয়ে তয়ের হয়েছে। তা ছাড়া মাথার উপরে আরো তিনটি ছোট ছোট চোখ আছে।

ভুতো আর ঘোঁতো।

(ছোট্টদের জন্য।)

ভূতো ছিল বেঁটে আর ঘোঁতো ছিল ঢ্যাঙ্গা ; ভূতো ছিল শেয়ানা, আর ঘোঁতো ছিল বোকা। দু জনে মিলে গেল কুল গাছ থেকে কুল পাড়তে। ঘোঁতো কি না ঢ্যাঙ্গা, সে দু হাতে খালি কুলই পাড়ছে। ভূতো কি না বেঁটে, তাই সে কি না কুল নাগাল পায় না, সে শুধু ঘোঁতোর পাড়া কুল খাচ্ছে।

কুল পাড়া হয়ে গেলে ঘোঁতো বল্ল, “কুল কৈ রে ?” ভূতো বল্ল, “নাই ! খেয়ে ফেলেছি !” ঘোঁতো বল্ল, “বটে রে ? তবে দাঁড়া, লাঠি আনছি !”

বলেই অমনি ঘোঁতো গেল গাছ কাটতে ; গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে ; লাঠি দিয়ে ভূতোকে মারতে ; সে কেন কুল খেয়ে ফেল্ল,—একটাও রাখল না ?

গাছ বল্ল, “এই যে ঘোঁতো ! কেমন আছ ? কোথা যাচ্ছ ?” ঘোঁতো বল্ল, “গাছ কাটতে ; গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে ; লাঠি দিয়ে ভূতোকে মারতে ; সে কেন কুল খেয়ে ফেল্ল, একটাও রাখল না ?” গাছ বল্ল, “আমাকে কাটবে ? কি দিয়ে কাটবে ? কুড়ুল কই ?”

ঘোঁতো গেল কুড়ুল আনতে। কুড়ুল বল্ল, "এই ঘোঁতো! কেমন আছ? কোথায় যাচ্ছ?" ঘোঁতো বল্ল, "কুড়ুল আনতে; কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে; গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে; লাঠি দিয়া ভূতোকে মারতে; সে কেন কুল খেয়ে ফেল্ল, একটাও রাখল না?" কুড়ুল বল্ল, "আমাকে নিবে? শানাবে কিসে? পাথর কই?"

ঘোঁতো গেল পাথর আনতে। পাথর বল্ল, "এই যে ঘোঁতো! কেমন আছ? কোথায় যাচ্ছ?" ঘোঁতো বল্ল, "পাথর আনতে; পাথর দিয়ে কুড়ুল শানাতে; কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে; গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে; লাঠি দিয়ে ভূতকে মারতে; সে কেন কুল খেয়ে ফেল্ল, একটাও রাখল না?" পাথর বল্ল, "আমাকে নিবে? ভিজাবে কি দিয়ে? জল কই?"

ঘোঁতো গেল জল আনতে। জল বল্ল, "এই যে ঘোঁতো! কেমন আছ? কোথায় যাচ্ছ?" ঘোঁতো বল্ল, "জল আনতে; জল দিয়ে পাথর ভিজাতে; পাথর দিয়ে কুড়ুল শানাতে; কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে; গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে; লাঠি দিয়ে ভূতোকে মারতে; সে কেন কুল খেয়ে ফেল্ল, একটাও রাখল না?" জল বল্ল, "আমাকে নিবে? হরিণ আসবে, আমাতে নামবে, গা ভিজবে তবে ত হবে।"

ঘোঁতো গেল হরিণের কাছে। হরিণ বল্ল, "এই যে ঘোঁতো! কেমন আছ? কোথায় যাচ্ছ?" ঘোঁতো বল্ল, "হরিণ আনতে; হরিণ দিয়ে জল তোলাতে; জল দিয়ে

পাথর ভিজাতে; পাথর দিয়ে কুড়ুল শানাতে; কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে; গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে; লাঠি দিয়ে ভূতোকে মারতে; সে কেন কুল খেয়ে ফেল্ল, একটাও রাখল না?" হরিণ বল্ল, "আমাকে নিবে? কুকুর কই? আমাকে ধরবে কে?"

ঘোঁতো গেল তাদের কুকুর ভোলাকে ডাকতে। ভোলা বল্ল, "এই যে ঘোঁতো! কেমন আছ? কোথায় যাচ্ছ?" ঘোঁতো বল্ল, "ভোলাকে ডাকতে; ভোলাকে দিয়ে হরিণ ধরাতে; হরিণ দিয়ে জল তোলাতে; জল দিয়ে পাথর ভিজাতে; পাথর দিয়ে কুড়ুল শানাতে; কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে; গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে; লাঠি দিয়ে ভূতোকে মারতে; সে কেন কুল খেয়ে ফেল্ল, একটাও রাখল না?" ভোলা বল্ল, "আমাকে নিবে? তবে মাখন আন, নখে মাখি!"

ঘোঁতো গেল মাখন আনতে। মাখন বল্ল, "এই যে ঘোঁতো! কেমন আছ? কোথায় যাচ্ছ?" ঘোঁতো বল্ল, "মাখন আনতে; ভোলাকে দিতে, নখে মেখে হরিণ ধরতে; হরিণ দিয়ে জল তোলাতে; জল দিয়ে পাথর ভিজাতে; পাথর দিয়ে কুড়ুল শানাতে; কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে; গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে; লাঠি দিয়ে ভূতোকে মারতে; সে কেন কুল খেয়ে ফেল্ল, একটাও রাখল না?" মাখন বল্ল, "আমাকে নিবে? তবে বিড়াল আন, চেটে তুলুক।"

ঘোঁতো গেল তাদের মেনীর কাছে। মেনী বল্ল, "এই যে ঘোঁতো! কেমন আছ? কোথায় যাচ্ছ?" ঘোঁতো বল্ল, "মেনিকে খুঁজতে, মাখন চেটে ভোলাকে দিতে, নখে মেখে হরিণ ধরতে; হরিণ দিয়ে জল তোলাতে; জল দিয়ে পাথর ভিজাতে; পাথর দিয়ে কুড়ুল শানাতে; কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে; গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে; লাঠি দিয়ে ভূতোকে মারতে; সে কেন কুল খেয়ে ফেল্ল, একটাও রাখল না?" মেনী বল্ল, "আমাকে নিবে? দুধ দাও তবে খাই আগে।"

ঘোঁতো গেল গাইয়ের কাছে। গাই বল্ল, "এই যে ঘোঁতো! কেমন আছ? কোথায় যাচ্ছ?" ঘোঁতো বল্ল, "গাইয়ের কাছে, দুধ আনতে; মেনী তা খেয়ে মাখন চেটে, ভোলাকে দিতে, নখে মেখে হরিণ ধরতে; হরিণ দিয়ে জল তুলাতে; জল দিয়ে পাথর ভিজাতে; পাথর দিয়ে কুড়ুল শানাতে; কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে; গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে; লাঠি দিয়ে ভূতোকে মারতে; সে কেন কুল খেয়ে ফেল্ল, একটাও রাখল না?" গাই বল্ল, "দুধ নিবে? খড় আন তবে খাই আগে!"

ঘোঁতো গেল চাষার কাছে। চাষা বল্ল, "এই যে ঘোঁতো! কেমন আছ? কোথায় যাচ্ছ?" ঘোঁতো বল্ল, "চাষার কাছে খড় আনতে; গাইকে দিয়ে, দুধ পেতে; মেনী তা খেয়ে, মাখন চেটে, ভোলাকে দিতে, নখে মেখে হরিণ ধরতে; হরিণ দিয়ে জল তোলাতে; জল দিয়ে পাথর ভিজাতে; পাথর দিয়ে কুড়ুল শানাতে; কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটাতে; গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে; লাঠি দিয়ে ভূতোকে মারতে। সে কেন কুল খেয়ে ফেল্ল, একটাও রাখল না?" চাষা বল্ল, "খড় নিবে? আটা আন, পিঠে খাব।"

ঘোঁতো গেল মুদীর কাছে। মুদী বল্ল, "এই যে ঘোঁতো। কেমন আছ? কোথায় যাচ্ছ?" ঘোঁতো বল্ল, "মুদীর কাছে, আটা আনতে, চাষাকে দিয়ে খড় নিতে; খড় নিয়ে গাইকে দিয়ে দুধ পেতে; মেনী তা খেয়ে, মাখন চেটে ভোলাকে দিতে, নখে মেখে, হরিণ ধরতে; হরিণ দিয়ে জল তোলাতে; জল দিয়ে পাথর ভিজাতে; পাথর দিয়ে কুড়ুল শানাতে; কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে; গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে; লাঠি দিয়ে ভূতোকে মারতে। সে কেন কুল খেয়ে ফেল্ল, একটাও রাখল না?" মুদী বল্ল, "নদী থেকে এই চাল্‌নী ভরে জল আন, নইলে আটা পাবে না!"

চাল্‌নী নিয়ে খুসী হয়ে ঘোঁতো গেল নদী থেকে জল আনতে। জল ত তাতে থাকে না, তুল্‌তে গেলেই পড়ে যায়! যত তোলে, ততই পড়ে। বেলা হল, বেলা গেল, সন্ধ্যা এল; ঘোঁতো তবু খালি চাল্‌নী ডোবাচ্ছে,

আর তুলছে, আর খালি জল ঝর ঝর করে পড়ে যাচ্ছে। ঘোঁতো বল্ল, "কি মুস্কিল! এখন কি হবে?"

সেখানে কতগুলো হাঁস ছিল, তারা প্যাঁক্ প্যাঁক্ করে ডাক্‌ছিল। তা শুনে ঘোঁতো বল্ল, "আরে তাইত, ঠিকই ত বলেছে। চাল্‌নীতে পাঁক মাখিয়ে নিতে হবে, তাহলেই ফুটো বন্ধ হয়ে যাবে আর জল ধরবে। নদীর ধারে পাঁক ছিল, ঘোঁতো তাই নিয়ে চাল্‌নীতে মাখাল; ফুটো বন্ধ হয়ে গেল, আর জল পড়তে পেল না। ঘোঁতো তখন হাসতে হাসতে জল নিয়ে মুদীর কাছে ফিরে এল। মুদী তাতে খুসী হয়ে ঘোঁতোকে ঢের আটা দিল। আটা নিয়ে ঘোঁতো গেল চাষার কাছে; চাষা তাতে খুসী হয়ে ঘোঁতোকে খড় দিল। খড় নিয়ে ঘোঁতো দিল গাইকে; গাই তা খেয়ে খুসী হয়ে ঢের দুধ দিল। দুধ নিয়ে ঘোঁতো দিল মেনীকে; মেনী তা খেয়ে খুসী হয়ে, মাখন চেটে ভোলাকে দিল। ভোলা সে মাখন নখে মেখে হরিণ ধরে আনল। হরিণ গিয়ে জলে নেমে গা ভিজিয়ে এল। ভোলা তার গা থেকে জল নিয়ে পাথরে দিল, সেই পাথরে কুড়ুল শানাল, সেই কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটল, সেই গাছ দিয়ে লাঠি বানাল, সেই লাঠি নিয়ে দাঁত কড়মড়িয়ে ছুটে গেল কুলগাছ তলায়, ভূতোকে মারতে। ভূতো কি ততক্ষণ গাছ তলায় বসে আছে? সে তার কত আগেই ছুটে পালিয়েছে!

সেকেলে মজা।

কৃষ্ণের কথা শুনতে গিয়ে তোমরা বৃন্দাবনের ছেলেদের খেলার কথাও কিছু কিছু শুনেছ। শ্রীমদ্ভাগবতে তার কথা আরো বেশী করে লেখা আছে। সে রকম খেলা যদি তোমরা খেলতে আরম্ভ কর, তবে না জানি তোমাদের গুরুজনেরা কি বলবেন, আর তোমরাও না জানি তার মজাটা কেমন বুঝবে!

চড়াইভাতির দিনেই বৃন্দাবনের রাখালদের খেলাটা জম্‌ত ভাল। সে দিন ভোর হতে না হতেই শিঙ্গা বাজিয়ে তাদের জাগিয়ে দেওয়া হত। অমনি সকলে সেজেগুজে শিঙ্গা ফুক্‌তে ফুক্‌তে আর বাঁশী বাজাতে বাজাতে বাছুরগুলিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ত। প্রত্যেকের হাতে একেকটি লাঠি, আর বগলে এক একটি ছোট্ট "শিকে," তার মধ্যে হয় ত কিছু খাবার জিনিস। সাজ সজ্জার ঘটাও খুবই; মাকড়ী, বালা, ফুল, ফল, পাতা, কুঁচ, কাচ,—যার যা যুটেছে, তাই পরে এসেছে।

একটি করে শিকা বা জালের থলী সকলেরই আছে, আর সেইটির উপরেই সকলের চোখ। চুপ চাপ আরেক জনের শিকেটি চুরী করে নিতে পারলে বড়ই মজা হয়। সে যদি তা টের পায়, তবে অমনি শিকেটি ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে। সেটি গিয়ে যাদের কাছে পড়বে, তাদেরও আমোদ কম হবে না। তারা তখন খুব একচোট হেসে নিয়ে, যার শিকে তার কাছে ছুঁড়ে দিবে।

যারা বাঁশী এনেছে, তারা ত এর মধ্যেই তাকে বাজিয়ে বন মাথায় করে তুলেছে, কিন্তু শিঙ্গেওয়ালাদের সঙ্গে টক্কর দিয়ে পেরে উঠছে না। তারা বন ত মাথায় তুলেছেই, তার উপরে কাণও ফাটাবার যোগাড় করেছে। যাদের বাঁশী বা শিঙ্গা নাই, তারা আর কি করবে? তারা মৌমাছি আর কোকিলগুলোকে নকল করছে, আর চ্যাচাচ্ছে।

অবশ্যি, গান বাজনা ত আর সকলের আসে না, তাই অন্য রকমের আমোদের চেষ্টারও ত্রুটি হচ্ছে না। পাখী উড়ে যাবার সময় মাটিতে যে তার ছায়া পড়ে, সেটাকে ছুটে ধরতে যাওয়া যে কি মজার খেলা, তা তোমরা পরীক্ষা করে দেখতে পার। যাদের এ খেলা কঠিন বোধ হয়, তারা হাঁস তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে, না হয় বকগুলোর কাছে গিয়ে তাদের মত গম্ভীর হয়ে জলের ধারে বসে থাকছে। আর এক দল গিয়েছে ময়ূরগুলোর সঙ্গে নাচতে, তাদেরও আমোদ হচ্ছে খুবই।

এ সব খেলার ভিতরে খুবই আমোদ, তাতে আর ভুল নাই, কিন্তু সকলের চেয়ে মজা যার ভিতরে, সে খেলা হচ্ছে একটু অন্য রকমের। বানরগুলোর লেজ যখন গাছ থেকে ঝুলে থাকে, তখন তাকে খপ করে ধরতে পারলে আর মজার সীমাই থাকে না। সে বেটারা অবশ্যি তখন বেজায় ব্যস্ত হয়ে গাছে উঠে যেতে থাকে। তখন ভরসা করে লেজে ধরে থাকতে পারলে আর গাছে উঠবার জন্য মেহন্নতের দরকার হয় না, সে কাজ বানরের টানেই বিনি পয়সায় হয়ে যায়। তবে, একটু ভরসা করে ধরে থাকা চাই। বানরগুলো ত আর সেটা পছন্দ করে না, কাজেই তারা বিষম ভ্যাঙ্চায়। সে ভেংচিতে ভয় না পেয়ে, তার একটার জায়গায় দশটা ভেংচি ফিরিয়ে দিতে হয়। বৃন্দাবনের ছেলেরা এ সব কাজে খুবই মজবুত; তারা প্রাণ ভরে বানরের ভেংচির বদলে ভেংচি দিচ্ছে। সেকালের বানরগুলো দেখছি নিতান্তই বোকা; তারা খালি ভেঙ্‌চাতেই জান্‌ত, কামড়াতে পার্‌ত না। ছেলেরা তাই তাদের সঙ্গে খুব আমোদ করছে, আর গাছের ডালে ডালে তাদের মতন করে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে।

ছেলেদের মধ্যে আবার অনেকে আছে একটু গোল গাল, নাদুস্ নুদুস্; তাদের অত পরিশ্রম পোষায় না। তারা ঝরণার ধারে গিয়ে, ব্যাঙ্ তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। ব্যাঙ্-গুলো তাতে জ্বালাতন হয়ে লাফিয়ে ঝরণা ডিঙ্গিয়ে গেলে, ছেলেরাও সঙ্গে সঙ্গে লাফ দেয়। তখন তাদের কেউ ঝরণা পার হয়, কেউ কাদায় গড়াগড়ি যায়।

কিন্তু এতেও মেহন্নত আছে। যাদের অতটুকুও পোষায় না, তারা প্রতিধ্বনির সঙ্গে হাসি ঠাট্টা আর গালাগালি করছে। এ খেলায় যে খুবই মজা, আমি সে কথার সাক্ষী দিতে পারি, কেন না আমি নিজে এ খেলা খেলে দেখেছি। সহুরে ছেলেরা প্রতিধ্বনির আমোদ খুব কমই পেয়ে থাকে। কিন্তু, পাড়াগাঁয়, বিশেষতঃ বড় বড় নদীর ধারে প্রতি-ধ্বনি চমৎকার শুনতে পাওয়া যায়। আমাদের ছেলে বেলায় যখন এত রেল ছিল না, তখন প্রায় আমাদের নৌকায় এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে হত। সেই সময়ে একটা নদীতে সন্ধ্যা বেলায় আমরা প্রতিধ্বনির যে তামাসা দেখতাম, তার কথা শুনলে হয় ত এখন অনেকে আশ্চর্য্য হবে। সেই নদীর ধারে এত লম্বা লম্বা কথার প্রতিধ্বনি শুনেছি যে তেমন আর কোথাও শুনতে পাই নি। তার একটা কথা এখনো মনে আছে,—'আরে, তোমরা না হলে ত তামাক খাওয়াই মিছে!' এর প্রত্যেকটি কথা প্রতিধ্বনি পরিস্কার বলেছিল। কোন কোন জায়গায় আবার একটা কথার দু তিনটা প্রতিধ্বনি শোনা যেত।

যা হোক, কুঁড়ে লোকের কথা এখনো শেষ হয় নি। প্রতিধ্বনির আমোদ দেখতে হলেও ত চ্যাঁচাতে হয়; যাদের ততখানি খাটতেও ইচ্ছা নাই তারা কি করছে? তারা জলের ধারে গিয়ে নিজের ছায়াটাকে ভ্যাঙ্‌চাচ্ছে। এও মন্দ খেলা নয়,—কি বল?

আটকৌড়ে।

কাল আমাদের নতুন খোকার 'আটকৌড়ে' হয়ে গেল।

এযে কি ব্যাপার, তা তোমরা কিছু জান কি? নতুন খোকার অন্নপ্রাশনে নান্দীমুখ করে যে উৎসবের প্রথা আছে তাতো কিছুদিন বিলম্বে হয়, সে নমাস ছমাসের ব্যাপার, তখন আনন্দ একটু মিইয়ে আসে, কিন্তু আট দিনের দিন, আট রকম গরম গরম ভাজার সঙ্গে নগদ সিকি দুআনি দক্ষিণা দিয়ে যে টাটকা আমোদের অনুষ্ঠান হয় সেটি কিন্তু বড় চমৎকার। খোকা বাবু শুক্ল পক্ষের এক বুধবারে গোধূলির শুভ লগ্নে আমাদের ঘরে এসেছেন আর কাল এক বুধবারে তাঁর আটকৌড়ে হল। পরিবারের ও পাড়ার যত গুলি ছেলে মেয়ে ছিল সবাই নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন, যাঁরা আস্‌তে পারেন নি তাঁরাও ভাগে বাদ যান্ নি, তাঁদের পাওনা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল, আমোদে বাদ পড়েছিলেন, সেইটিই আসল লোকশান। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে বুড় খোকা খুকি যে ছিলেন না, তা বল্‌তে পারিনে, তার মধ্যে একজন চশমাধারী মাষ্টার মহাশয়, আর একজন এক মাথা ঢাকা চুল, একটি 'দিদিমণি'।

সন্ধ্যা যখন হয় হয়, ঘরে প্রদীপ জ্বালা হয়েছে এম্নি সময়ে আটকৌড়ে হ'ল। ছেলেমেয়েরা একখানি কুলোর চারিদিকে ঘিরে দাঁড়াল, হাতে সবারি এক একখানি ছোট ছোট লাঠি। সবাই মিলে তারস্বরে বল্লে,—"আটকৌড়ে বাটকৌড়ে ছেলে আছে ভাল"—সঙ্গে সঙ্গে ছেলের বাপের দাড়ীর সম্বন্ধে কি একটা বিধান করলে, নাড়া দেবার কথাই বল্লে বোধ হয়, আর যা হাসির রোল উঠ্‌ল, তা শুনে স্থির থাকে সাধ্য কার? শুধু চীৎকার নয় লম্ফ ঝম্প নৃত্য গীত বাদ্য সবই একত্রে চল্‌তে থাকে, কুলো খানি যতক্ষণ খণ্ড খণ্ড হয়ে না যায় ততক্ষণ তার উপর উৎপীড়ন সমভাবেই চলে, যতক্ষণে কুলোর সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের গলা না ভাঙে ততক্ষণ বীরত্বের অভিনয় সাঙ্গ হয় না। কুলোর কুলোত্ব গত হলেই ছেলেরা ক্ষান্ত হয় তখন লুটের পালা আরম্ভ হয়। আটভাজার সঙ্গে কতকগুলি কড়ি আর আটটি পয়সা মিশিয়ে, হরির লুটের মত

ছড়িয়ে দেওয়া হয়, ছেলে মেয়েরা হুড়োমুড়ি করে এই কড়িভাঙা আর পয়সা কুড়িয়ে নেয়। এই আটটি পয়সা কুড়িয়ে নেবার জন্যে সবারি উৎসাহ সমধিক ; এরপর যদিও গোটা গোটা সিকি দুআনি কি আধুলি দক্ষিণা পায় তবুও ছড়িয়ে দেওয়া, এই সবে মাত্র আটটি পয়সার কে কয়টি অধিকার করবে তারি জন্যে ভারী ঠেলা ঠেলি, হুড়োমুড়ি লড়াই চলে! যে ছেলে একটির বেশী দুটি পয়সা কুড়িয়ে পায়, তার আর আহ্লাদের পারাপার থাকে না, সে মনে জানে তার মত মস্ত বাহাদুর দুনিয়ায় আর একটি নাই। টাকার চেয়ে সুদের আর পাওনার চেয়ে ফাউএর আদর অধিক, পাওনার চেয়ে উপরি পাওনার দিকে সবারি লোভটা বেশী, তাই প্রাপ্য সিকি দুআনির থেকে জোর করে লুটে নেওয়া এই পয়সাটির জন্যে সকলেরি বেশী আগ্রহ দেখা যায়। তবে পয়সা ত সবে আটটি, আর লুটবার লোক অনেকগুলি, তার চার গুণেরও অধিক বই অল্প নয়। কাজেই লুণ্ঠন ব্যাপার সত্বরই সমাধা হয়ে যায়। এই হরির লুট কুড়বার অধিকার সবারি সমান, পাঁচুর মায়ের পাঁচুরাম আর কর্ত্তামহাশয়ের বড় খোকা বাবু, সবাই সমান চীৎকার করে’ এ ওর গায়ে পড়ে, ঠেলা দিয়ে গুঁতো মেরে সমানে লুটতে পারেন, তাতে কোন বাধা হয় না, আর বিদায় দক্ষিণাও একই পায়। এ দিনে ছেলে বলেই ছেলের আদর, চাকর মনিব বিচার আর কেউ করে না।

প্রথম কুলোত ভাঙা হ’ল, কিন্তু কেন যে কুলোই ভাঙে আর কিছু ভাঙে না তা বল্‌তে পারিনে। অলক্ষ্মীকে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় করবার নিয়ম আছে, তাই বোধ হয় কুলো ভেঙে ছেলেদের সব অলক্ষণ দূর করা হয়। ভাঙা চোরা, লুটতরাজের ব্যাপার শেষ হলে, শাস্তি না হয়ে বকশিষের পালা আরম্ভ হয়। তখন হুড়ো মুড়ি করে সবাই হাঁপাচ্ছে, মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে, কপাল দিয়ে ঘাম ঝরছে, গলা ভেঙ্গেছে তবুও মুখে খই ফুটছে, হাসিতে চোখ সব জ্বল জ্বল করছে ; আর চারি দিকে যে কলরব চলেছে তাতে কান পাতে কার সাধ্যি ? তবু ঐ পাগলা ছেলেদের অকারণ হাসির সঙ্গে না হেসেও থাকা যায় না, আবার তাদের থামাতে গিয়ে, “আরে থাম্, আরে থাম্” বলতে বলতে তাদের মত না চেঁচামেচি করলেও চলে না। এই জন্যে বুদ্ধিমান লোক সঙ্গদোষ পরিহার করে—এই সব পাগল দস্যুদের সঙ্গে কারবার করতে গেলে বাধ্য হয়েই চাল চলন বদ্‌লাতে হয়।

খোকার বাবার যিনি বড়দিদি, বাড়ীর সব বড় মেয়ে, সবারি বড় পিসিমা, তিনিই পুরস্কার বিতরণ করলেন। আসনের উপর খুব গম্ভীর ভাবে জোড়াসন হয়ে, টাকার

থলি হাতে করে বসে ছিলেন, ছেলেরা হাঁড়িতে করে এক হাঁড়ি আটভাজা আর সরায় করে আট রকমের মিষ্টান্ন নিয়ে তাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়াচ্ছিল, পাছে ভুল হয় বলে, বেশ করে দেখে শুনে, তিনি একটি করে দু আনি তাদের সবার উপর রেখে দিচ্ছিলেন, আর ছেলেরা কেউ তাঁকে নমস্কার, কেউ সেলাম আর কেউ বা রীতিমত ইংরাজী দস্তুর মাথা ঝাঁকা দিয়ে দে দৌড়। এবারে মাষ্টার মহাশয়ের পালা। তিনি একেবারেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত; হাঁড়ি আর দক্ষিণা নিয়ে যখন বিদায় হচ্ছেন তখন ছেলেদের মধ্যে একজন চেঁচিয়ে বল্লে, "মাষ্টার মহাশয় খোকাকে পেরণাম করতে হয়। মাষ্টার মহাশয়ও অম্নি তক্ষুণি খোকার কাছে সাষ্টাঙ্গ হতে যাচ্ছিলেন, বাড়ীর বৃদ্ধা দাসী বল্লে, "ঠাকুর ক্ষেপলে নাকি?" তখন তিনি ফ্যাল ফ্যাল করে চাইতে চাইতে চলে গেলেন।

ক্রমে খোকার ঘর খালি হয়ে এল এত কলরবেও কিন্তু সে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হয়নি। যাঁর দৌলতে এত শত হল তার সম্বন্ধে দুটি কথা না বল্লে সবই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। নতুন এই অতিথিটির বয়স সবে আট দিন। কালো বাঙ্গালীর ছেলে হয়েও তিনি গোরা, টুক্‌টুকে মুখখানি, কচি কচি রাঙা হাত পাগুলিতে চুমো না খেয়ে থাকা যায় না, মাথায় এক মাথা কালো রেশমের গুচ্ছের মত কোঁকড়ান চুল, বড় চোখ দুটি রাত্তির দিনই ঘুমচ্ছে। স্বপনে রাঙা ঠোঁট দুখানি দুধ খাবার নকল করে, আর জেগে উঠে আসলে সেইটি করে আবার ঘুমোয়। পৃথিবীর আলোর সঙ্গে তাঁর কাজল দেওয়া কালো চোখের এখনও ভাল করে পরিচয় হয়নি, কিন্তু তিনি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ঘরের মধ্যে এম্নি আলোই জাগিয়ে রেখেছেন যার আনন্দে সবারি মুখ উজ্জ্বল হয়ে আছে।

'খোকার দিদিমণি'।

লম্বা আর বেঁটে।
লম্বা লোক দুটি কাশ্মীরী, এরা দুই ভাই।

শেয়ালের ঘী খাওয়া।

এক বনে এক শেয়াল আর তার শেয়াল্‌নী থাকত। একদিন শেয়াল্‌নী শেয়ালকে বল্ল—"ওগো, বড্ড ঘী খেতে ইচ্ছে করছে।" শেয়াল ভাব্‌ল "তাইত! এখন ঘী পাই কোথা? গিন্নির সাধটা মিটাই কি করে?" তখন হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল বনের ধারেই শালগ্রাম ঠাকুরের একটি মন্দির আছে। রোজ সকালে পূজারি এসে ঘীয়ের বাতি জেলে শালগ্রামের পূজা করে, তাই জালায় করে ঘী মন্দিরেই রেখে দেয়। বাস্‌, তা হলে আর ঘীয়ের জন্য ভাবনা কি? শেয়াল গিন্নিকে নিয়ে তখনি গিয়ে মন্দিরের কাছে উপস্থিত। সেটা তখন বিকাল বেলা, তখন মন্দিরে পূজারি আসবার কোনই সম্ভাবনা নাই, তবু শেয়ালনীকে বনের পাশে রেখে শেয়াল বল্ল—"দাঁড়াও আমি গিয়ে দেখে আসি রাস্তা পরিষ্কার আছে কি না তারপর তোমাকে নিয়ে যাব।"

শেয়াল এদিক সেদিক উঁকি ঝুঁকি মেরে ক্রমে মন্দিরে গিয়ে ঢুক্‌ল। তারপর জালার কাছে যখন গেল তখন আর কি সে লোভ সাম্‌লাতে পারে?—"নিজে ত আগে খানিকটা খেয়ে নি তারপর শেয়ালনীকে ডেকে আনব এখন" এই ভেবে জালায় মুখ ঢুকিয়ে দিল। ঘী পড়ে গিয়েছে তখন জালার তলায়, শেয়াল গলা বাড়িয়ে খুবই চেষ্টা করতে লাগ্‌ল। জালার গলায় ঘী মাখা বেজায় পিছ্‌লে, চেষ্টার ঠেলায় শেয়াল হঠাৎ একেবারে জালার ভিতরেই ঢুকে পড়ল। জালায় ঢুকেই প্রথম এক চোট্‌ খুব ঘী খেয়ে নিল, তারপর বিষম ভাবনা হল বেরুবে কি করে।

এদিকে বনের ধারে অনেক ক্ষণ অপেক্ষা করে করে শেয়ালনী ভাবল—"তাই ত! হলো কি, শেয়াল যে গেল আর ত ফিরে আস্‌ছে না—যাই, একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি।" শেয়ালনী মন্দিরের উঠানে, পেছনে, এদিকে ওদিকে অনেক খুঁজেও কিছু দেখ্‌তে না পেয়ে শেয়ালকে ডাক্‌ল—"কোথা গেলে গো? ঘীয়ের সন্ধানে এসে দেখছি একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে পড়লে।" জালার ভিতর থেকে গম্ভীর স্বরে শেয়াল উত্তর দিল—"এই যে আমি এখানে আছি—মন্দিরের ভিতরে।" শেয়ালনী মন্দিরের ভিতরে গিয়েও কিছু দেখ্‌তে না পেয়ে আবার ডাকল। তখন শেয়াল বল্ল—"গিন্নি! আমি ত ঘী খেতে খেতে জালার ভিতরে ঢুকে পড়েছি—এখন উপায়!" এই কথা শুনে শেয়ালনী "হায় ক্যা হুয়া, হায় ক্যা হুয়া" বলে কাঁদতে লাগল। শেয়াল বল্ল—"গিন্নি, কেঁদে ত আর আমাকে উদ্ধার করতে পারবে না! এখন তুমি এক কাজ

কর—শালগ্রাম ঠাকুরটিকে নিয়ে মন্দিরের পেছনে পূজার ফুলের গাদায় গুঁজে রেখে দাও, তারপর এখান থেকে সরে পড়, আমি আমার একটা উপায় করব। কথায় বলে—'বুদ্ধির্যস্য বলংতস্য' আমার জন্য তুমি ভেব না।" শেয়ালনী কি আর করে! শালগ্রাম ঠাকুরের কাছে স্বামীর মঙ্গল কামনা করে ঠাকুরটিকে মুখে করে নিয়ে ফুলের গাদায় গুঁজে রাখল তারপর চোখের জলে গাল ভাসিয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বনে চলে গেল।

এদিকে শেয়াল সমস্ত রাত জালার ভিতরে বসে ভেবে ভেবে একটা ফন্দি এঁটে নিল। পরের দিন ভোর বেলা পূজারি ঠাকুর এসে মন্দিরে ঢুকে দেখে শালগ্রাম নাই। কি সর্ব্বনাশ! ঠাকুর কি হলো? পূজারি ত মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। তখন জালার ভিতর থেকে গম্ভীর স্বরে শেয়াল বল্ল—"দেখ পূজারি! তুমি মন দিয়ে আমার পূজা কর না সেজন্য আমার অভিমান হয়েছে তাই আমি এই জালার ভিতরে এসে লুকিয়ে রয়েছি। এখন এক কাজ কর—উঠানের মাঝখানে খানিকটা জায়গা গোবর দিয়ে লেপে পরিষ্কার কর, তারপর জালাটা সেখানে নিয়ে রাখ, কিন্তু সাবধান! জালার ভিতরে চেয়ে দেখোনা। জালাটা

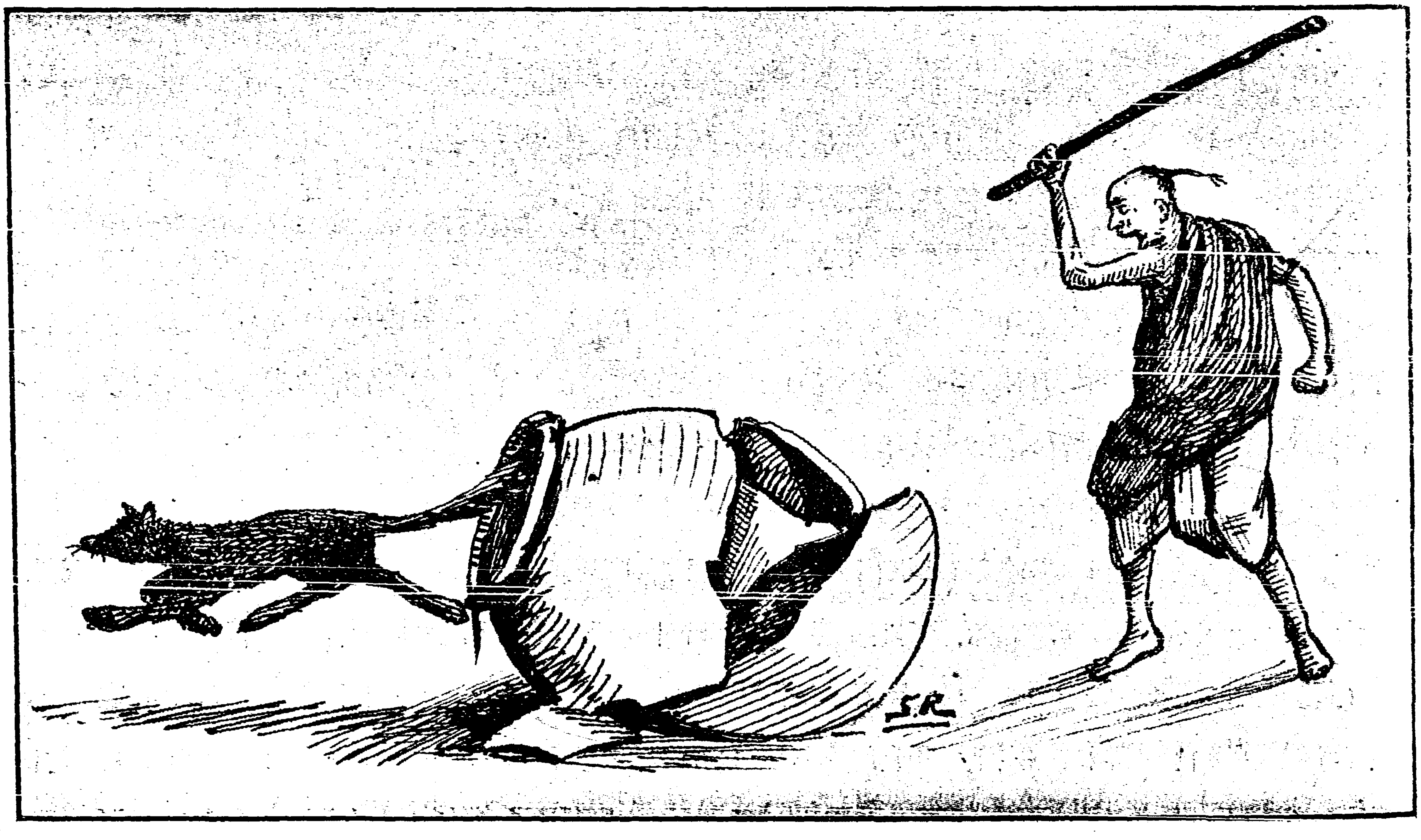

ফ্লামিঙ্গো ।

রেখে একটা লাঠি দিয়ে তার উপর ঘা দিতে থাক তখন সুবিধা বুঝে আমি জালা থেকে বের হয়ে আবার মন্দিরের ভিতরে আমার আসনে গিয়ে বসব।”

পূজারি শালগ্রাম ঠাকুরের কথামত উঠান পরিষ্কার করল তারপর জালাটি নিয়ে সেখানে রেখে লাঠি দিয়ে ঠুক্‌তে লাগল। এদিকে শেয়াল যখন দেখল যে লাঠির ঠোকায় জালাটি ক্রমে ফেটে চৌচির হয়েছে তখন হঠাৎ হুড়মুড় করে জালা ভেঙ্গে বাইরে এসেই ঊর্দ্ধশ্বাসে দে ছুট্‌। যাবার সময় বলে গেল—“ঠাকুর! তোমার শালগ্রাম মন্দিরের পেছনে ফুলের গাদায় গুঁজে রেখেছি। ঘী খেতে খেতে জালায় ঢুকে পড়েছিলাম বড্ড ভয় হয়েছিল যে তোমার হাতেই প্রাণটা যাবে। যা হোক্‌, শালগ্রামের কৃপায় এযাত্রা রক্ষা পেয়েছি।” পূজারি ঠাকুর তা শুনে হাঁ করে রইলেন।

নন্দগুপী।

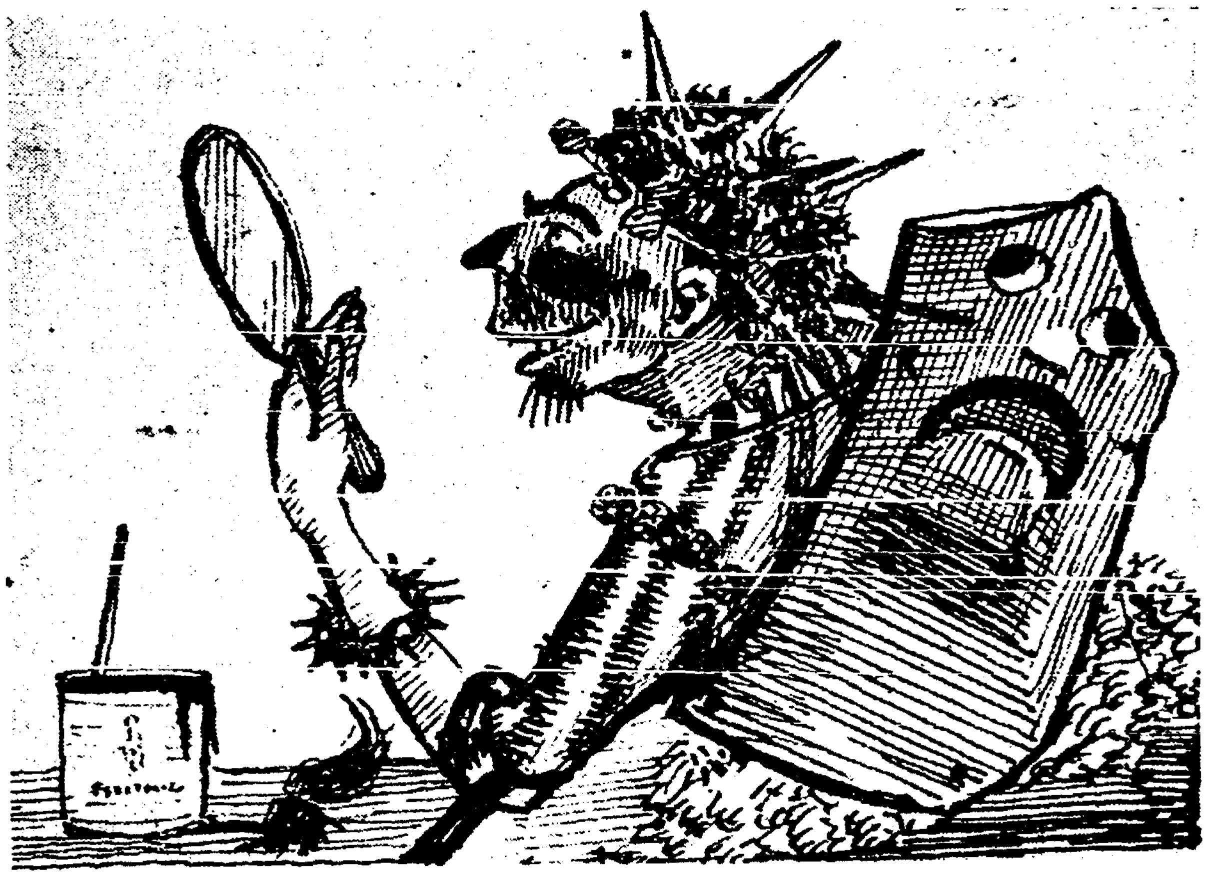

হঠাৎ কেন দুপুর রোদে চাদর দিয়ে মুড়ি
চোরের মত নন্দগোপাল চল্‌ছে গুড়ি গুড়ি?
লুকিয়ে বুঝি মুখোস্‌খানা রাখ্‌ছে চুপি চুপি?
আজকে রাতে অন্ধকারে টেরটা পাবেন গুপী!
আয়না হাতে দাঁড়িয়ে গুপী হাস্‌ছে কেন খালি?
বিকট রকম পোষাক ক’রে মাখ্‌ছে মুখে কালী!

এম্নি ক'রে লম্ফ দিয়ে ভেংচি যখন দেবে
নন্দ কেমন আঁৎকে যাবে—হাস্‌ছে সে তাই ভেবে।
আঁধার রাতে পাতার ফাঁকে ভূতের মতন কেরে?
ফন্দি এঁটে নন্দগোপাল মুখোস্ মুখে ফেরে!

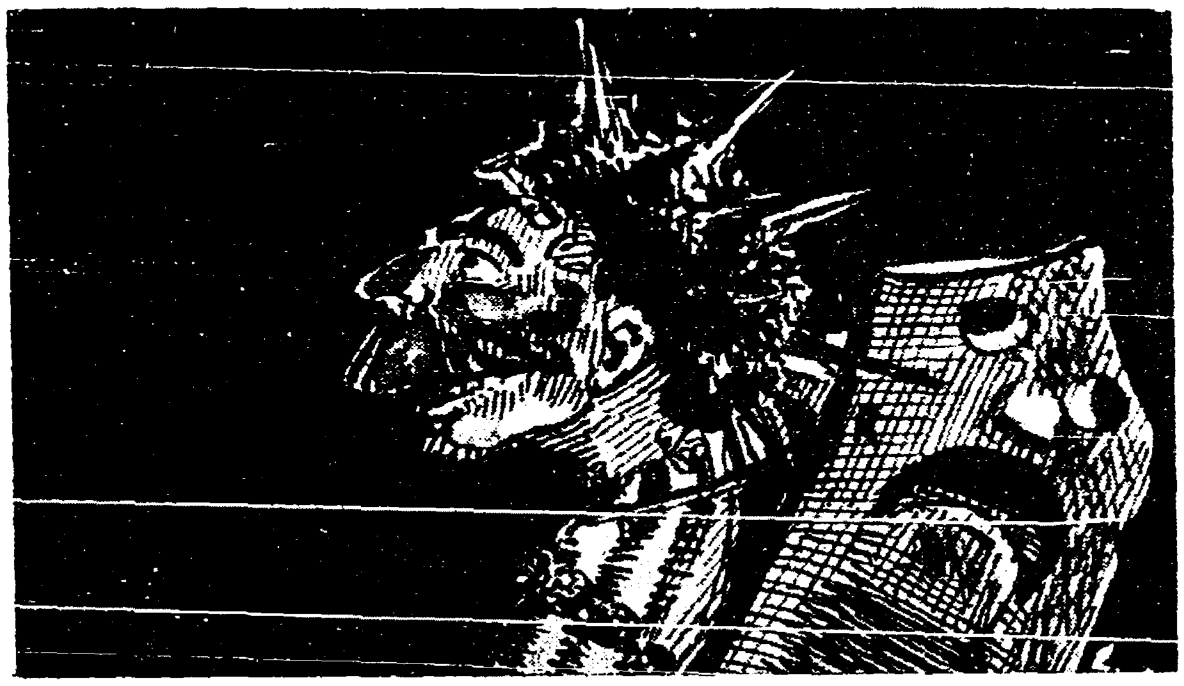

কোথায় গুপী, আস্নুক না সে ইদিক্ পানে ঘুরে—
নন্দ দাদার হুঙ্কারে তার প্রাণটি যাবে উড়ে॥
হোথায় কেরে মূর্ত্তি ভীষণ মুখটি ভরা গোঁফে
চিম্‌টে হাতে জংলা গুপী বেড়ায় ঝাড়ে ঝোপে!
নন্দ যখন বাড়ীর পথে আস্‌বে গাছের আড়ে,
"মার্ মার্ মার্ কাট্‌রে" বলে পড়্‌বে তাহার ঘাড়ে!

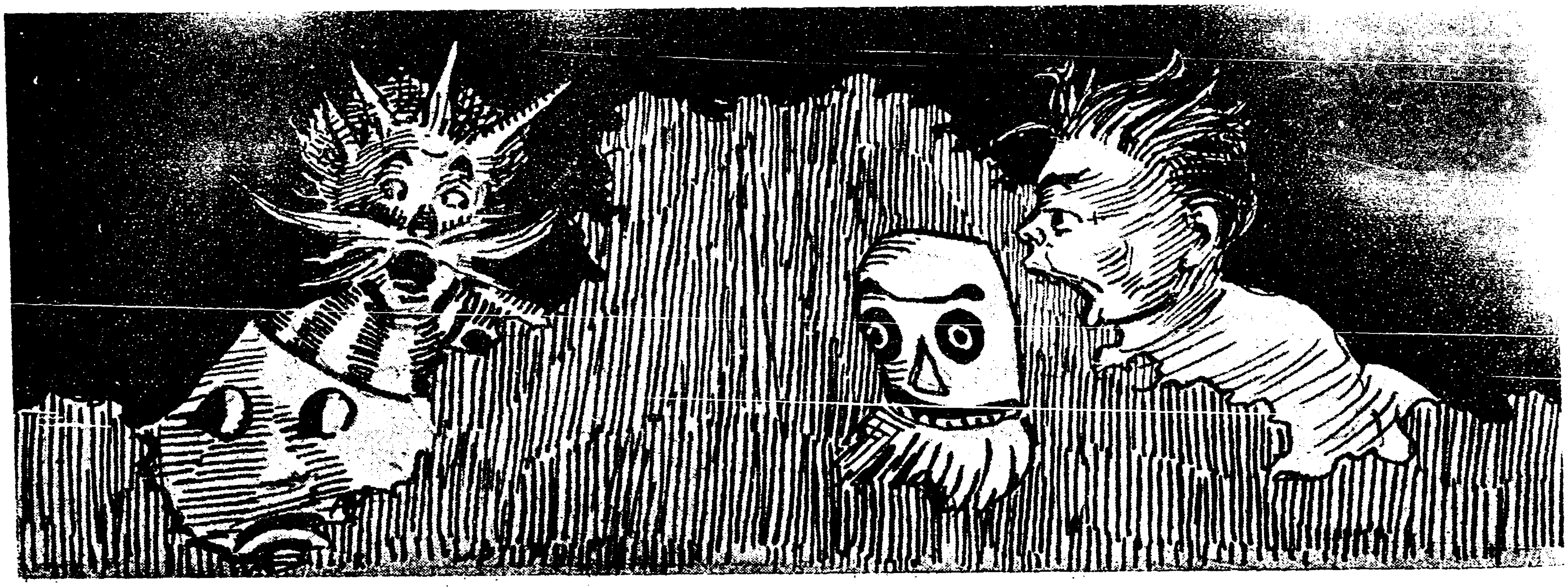

নন্দ চলেন এক পা দু পা আস্তে ধীরে গতি
টিপি' টিপি' বলেন গুপী সাবধানেতে অতি—
মোড়ের মুখে ঝোপের কাছে মার্‌তে গিয়ে উঁকি
দুই সেয়ানে এক্কেবারে হঠাৎ মুখোমুখি!
নন্দ তখন ফন্দি ফাঁদন কোথায় গেল ভুলি
কোথায় গেল গুপীর মুখে মার্ মার্ মার্ বুলি!
নন্দ পড়েন দাঁতকপাটি মুখোস্ টুখোস্ ছেড়ে
গুপীর গায়ে জ্বরটি এল কম্প দিয়ে তেড়ে।
গ্রামের লোকে দৌড়ে তখন বদ্যি আনে ডেকে
কেউ বা নাচে কেউ বা কাঁদে রকম সকম দেখে।
নন্দগুপীর মন্দ কপাল এম্‌নি হ'ল শেষে
দেখ্‌লে তাদের লুটোপুটি সবাই মরে হেসে!

আজব ডাক্তারী।

তোমরা সেই গুলিখোর ডাক্তারের গল্প শোন নি? সেই যে এক কেরাণীবাবু আর এক গাই ট্রেণে কাটা পড়েছিল—ডাক্তার এসে বাবুর আধখানা আর গাইয়ের আধখানা এমনি জুড়ে দিলেন যে গাই-বাবু অম্‌নি উঠে খটাখট্ ক'রে আফিসে চ'লে গেলেন; আর সেই থেকে সন্ধ্যাবেলায় বাড়ী ফিরে এসে আড়াই সের ক'রে দুধ দিতেন।

তোমরা বল্‌বে "সেত সত্যি নয়—গল্প"! তা ঠিক, এটা একটা আষাঢ়ে গল্প। কিন্তু আমি যে সে দিন দুজন ডাক্তারের কথা পড়েছি, তাঁদের কাজ কর্ম্মও, ঠিক এতটা না হ'লেও, অনেকটা এমনিতরই অদ্ভুত। ভাঙ্গা মানুষ জুড়ে দেওয়াই হ'চ্ছে এঁদের ব্যবসা। এঁদের একজনের নাম মোরেস্তিঁ (Morestin) আর একজনের নাম তুফিয়ে (Tuffier)। পারী নগরের খুব বড় একটা হাঁসপাতালে এঁরা কাজ করেন।

বিস্তর লোকের নাক মুখ এঁরা গড়ে দিয়েছেন, তার মধ্যে একটির কথা আমি পড়েছি—সে একটি সৈন্য। যুদ্ধের সময় বোমা লেগে তার থুৎনী, ঠোঁট, নাক, চুয়াল আর গালের অনেকটা উড়ে গিয়েছিল। সেই লোক এখন আর দশ জনের মত গোঁফে

তা দিয়ে চুরুট ফুঁকে বেড়িয়ে বেড়ায়। তার মুখে কয়েকটা দাগ আছে বটে, কিন্তু তা দেখে কেউ বলতে পারবে না যে তার তেমন কিছু হয়েছিল।

মুখ নাই, নাক নাই, গাল নাই, চুয়াল নাই, থুৎনী নাই, এমনি তুরবস্থা নিয়ে বেচারা হাঁসপাতালে এসেছিল। তখন তাকে মানুষ বলে চিনবারই জো ছিল না। আশার কথা শুধু এই ছিল যে, তার এমন কিছু ক্ষতি হয়নি, যার দরুন তাকে মরতেই হবে। দিন কতক ওযুধ লাগাবার পর তার ঘা গুলো একটু পরিস্কার হয়ে এল। তখন ডাক্তার মোরেস্তিঁ তার পিঠ থেকে খানিকটা মাংস কেটে নিয়ে তাকে একটা গাল বানিয়ে দিলেন। পিঠের চামড়া কেটে তার জন্যে তুখানি সুন্দর ঠোঁটও বানান হল। চুয়াল, থুৎনী আর নাকের উপায় কি হবে? সে সব তয়ের হল পাঁজরের হাড় দিয়ে। সে সব জায়গায় অবশ্য চামড়াও বসান চাই, শুধু হাড়ে ত কুলাবে না। সেই চামড়া এল কপাল থেকে আর পেট থেকে। নাকের চামড়া চাই পাতলা, তার পক্ষে কপালের চামড়াই ভাল। গালে আর দাড়িতে একটু পুরু চামড়া হলেও চলে, তাই সেখানে পেটের চামড়া দেওয়া হ'ল।

তুচার দিনের ভিতরেই এ সব চামড়া আর মাংস যে যার জায়গায় যুড়ে গেল; ক্রমে ঘাও শুকিয়ে এল। এর মধ্যে বাস্তবিক তেমন অসম্ভব কথা কিছু নাই। আমাদের দেশের ডাক্তারেরাও কত সময় রোগীর ঘা সহজে না শুকালে, সেই ঘার উপর তাজা চামড়ার টুকরো কেটে কেটে বসিয়ে দেন। সেই চামড়া দেখতে দেখতে ঘায়ের উপর বসে যায়, তারপর রোগীও ভাল হয়ে ওঠে। ডাক্তার মোরেস্তিঁও কতকটা সেই কাজই করেছিলেন; তবে, অবশ্যি, এমনি করে যে একজন লোকের নাক মুখ গড়ে তোলা, সেটা তাঁর খুব বাহাতুরী বলতে হবে।

একবার এমনিতর ঘায়ে চামড়া বসান নিয়ে ভারী হাসির কাণ্ড হয়েছিল। আমেরিকার এক হাঁসপাতালে, মুখে মস্ত ঘা নিয়ে একজন নিগ্রো এসে উপস্থিত হল। তার ঘা কিছুতেই শুকাচ্ছিল না, কাজেই এখন হাঁসপাতালের ডাক্তার করলেন কি, আর একজনের গা থেকে খানিকটা চামড়া কেটে সেই ঘায়ের উপর বসিয়ে দিলেন। তারপর ঘা দেখতে দেখতে শুকিয়ে উঠল, আর, তখন দেখা গেল কি মজা হয়েছে। নিগ্রোরা হয় কালো; যে লোকটির চামড়া কেটে সেই নিগ্রোর মুখের ঘায় বসান হয়েছিল, সে ছিল সাহেব, কাজেই খুব ফরসা। সেই ফরসা লোকের চামড়াটুকু ঘা শুকাবার পর নিগ্রো বেচারার মুখের উপর একটা শাদা দাগের

মত হয়ে রইল,—ঠিক যেন চাঁদ-কপালে বাছুর। সে বেচারা হাঁসপাতাল থেকে বেরিয়ে আর দলে মিশতে পারে না, সকলে হাসে! তখন সে ভারী চটে সেই ডাক্তারের নামে এই বলে নালিশ করল যে, "এই ব্যক্তি আমার চেহারা মাটি করে দিয়েছে, তার দরুণ আমি দলে মিশতে না পারায় আমার যারপর নাই ক্ষতি হচ্ছে; সুতরাং এর কাছ থেকে আমাকে খেসারৎ আদায় করে নিতে আজ্ঞা হোক।" এমনি করে সে সেই ডাক্তারের কাছ থেকে কিছু টাকা আদায় করে নিয়ে তবে ছেড়েছিল।

যে কথা বলছিলাম। ডাক্তার মোরেস্তিঁ ত মাংস চামড়া বসিয়ে সেই সৈন্যটির নাক মুখ গড়ে দিলেন, আর সে নাক মুখ এমনি সুন্দর হল যে কারু বলবার যো নাই যে তার আসল নাক মুখ নয়। তারপর যে দিন প্রথমে তার হাতে আরশী দিয়ে তাকে নিজের মুখখানির দিকে চেয়ে দেখতে বলা হল, তখন যে সে কেমন আশ্চর্য্য আর খুসী হয়েছিল, সে কথা আমরা ভেবে নিতে পারি। কিন্তু এত খুসী হয়েও বেচারার মনে এক কথার জন্য ভারী দুঃখ রয়ে গেল,—তার ইয়া বড় বড় গোঁফ ছিল, তার জন্য লোকে তাকে খুব হিসাব করে চলত, এখন আর সে গোঁফ নাই।

ডাক্তার তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোন কথার আপত্তি আছে নাকি?" সে বল্ল, "আজ্ঞে, আমার গোঁফ যোড়া?" ডাক্তার বল্লেন, "তার জন্য কোন ভাবনা নাই।" এই বলে তিনি তার ঘাড় থেকে চুল শুদ্ধ খানিকটা চামড়া কেটে নিয়ে তার ঠোঁটের উপর বসিয়ে দিলেন। এখন আর তার গোঁফের দুঃখ রইল না, তবে, তার আগের মত জমকালো গোঁফ হবে কিনা, সে বিষয়ে ডাক্তার কোন ভরসা দেন নি।

ফ্লামিঙ্গো।

জানোয়ারের মধ্যে যেমন জিরাফ পক্ষীর মধ্যে তেমনি ফ্লামিঙ্গো। শরীরের আন্দাজে ঠ্যাং দুটি বেখাপ্পা রকম লম্বা আর তেমনি লম্বা গলাটি। পৃথিবীর নানা জায়গায়—আমেরিকায়, আফ্রিকায়, এমন কি আমাদের দেশেও কোন কোন জায়গায় এ পাখী দেখা যায়। এরা জলের ধারে দল বেঁধে থাকে। আমেরিকার কোন কোন জায়গায় এক সঙ্গে হাজার হাজার ফ্লামিঙ্গো বাস করে এমন অনেক সময়েই দেখা যায়।

জলের মধ্যে ঠোঁট ডুবিয়ে শামুক গুগ্‌লি চিংড়ি আর ছোট ছোট মাছ ধ'রে খেতে ফ্লামিঙ্গোরা খুবই ভালবাসে; কিন্তু তা যদি না জোটে, তা হ'লে ধান শস্য খুদ এমন কি, রান্না পায়েস পর্য্যন্ত খেতে তার আপত্তি নেই।

ফ্লামিঙ্গোর গায়ের রং সব দেশে এক রকম নয় তবে প্রায়ই সাদা না হয় লাল্‌চে গোছের হয়। সবচেয়ে সুন্দর রং আমেরিকার ফ্লামিঙ্গোদের উজ্জ্বল। গোলাপী রঙের পালক—লাল চোখ, লাল ঠোঁট, লাল পা। জলে হেঁটে বেড়ান, সাঁতার কাটা, আকাশে ওড়া এসব বিষয়ে ফ্লামিঙ্গোরা খুব ওস্তাদ। কিন্তু শরতের শেষে যখন তাদের পালক প'ড়ে নূতন পালক ওঠে—তখন বেচারাদের দুরবস্থার এক শেষ! তারা না পারে উড়্‌তে, না পারে সাঁতার কেটে পালাতে—এই সময়ে মানুষেরা তাড়া ক'রে সহজেই তাদের ধ'রে আনে আর তাদের পালক নিয়ে বাজারে বিক্রী করে।

যেমন অদ্ভুত পাখী তেমনি অদ্ভুত তার বাসা। পা দিয়ে কাদার ঢিপি বানিয়ে তার মধ্যে গর্ত্ত ক'রে নীল রঙের ডিম পেড়ে রাখে। ডিমে তা দিবার সময় পা গুটিয়ে সেই ঢিপির উপর বস্‌তে হয়।

গল্পসল্প।

একটা ভুল হয়ে গেছে, এই বেলা সেটাকে সুধরে নি। গতবারে কতগুলো ছোট্ট ছোট্ট ফুলের ছবি বড় করে এঁকে দেওয়া হয়েছিল। যখন সে সব ফুলের কথা লেখা হয়, তখনো ছবি আঁকা আরম্ভ হয় নি। তখন ভেবেছিলাম যে ছবিগুলোকে একশ গুণ বড় করে আঁকব, তাই সেই কথাই লিখেছিলাম। কিন্তু শেষে আঁকবার সময় দেখা গেল যে, একশ গুণ বড় করে আঁকতে গেলে বড় ফুলগুলোর একটিও সন্দেশের ঐ ছবিটুকুর ভিতরে ধরবে না, আর তত বড় করে আঁকার কিছুমাত্র দরকারও নাই। কাজেই তখন ছবিগুলোকে অনেক ছোট করতে হল, কিন্তু লেখাতে সেই কথাটুকু সংশোধন করে দিতে আর মনে হল না। সন্দেশের ঐ ছবিগুলো আসলে ১৩ গুণ বড় করে আঁকা হয়েছিল।

১৩ গুণ বড়, ১০০ গুণ বড়, এ সব কথার মানে একটু তলিয়ে বুঝতে হবে। একটি ছবি যদি ১ ইঞ্চি লম্বা আর ১ ইঞ্চি চওড়া হয়, তবে তার একশ গুণ বড় ছবিটি কত লম্বা চওড়া হবে? সে ছবিটি হবে ১০ ইঞ্চি লম্বা আর দশ ইঞ্চি চওড়া। ছোট ছোট

কাগজ এক ইঞ্চি লম্বা আর এক ইঞ্চি চওড়া করে কেটে সাজিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে যে ১০ ইঞ্চি লম্বা ১০ ইঞ্চি চওড়া জায়গার ভিতরে তার একশটি ধরে।

এ হল শুধু ছবির কথা, জিনিসের কথা নয়। ছবি শুধু লম্বা আর চওড়াই হতে পারে, কিন্তু জিনিস হয় লম্বা, চওড়া, আর উঁচু। এক ইঞ্চি লম্বা আর এক ইঞ্চি চওড়া ছবিটির চেয়ে, দশ ইঞ্চি লম্বা আর দশ ইঞ্চি চওড়া ছবিটি হবে একশ গুণ বড়। আর, এক ইঞ্চি লম্বা এক ইঞ্চি চওড়া এক ইঞ্চি উঁচু জিনিসটির চেয়ে, দশ ইঞ্চি লম্বা দশ ইঞ্চি চওড়া দশ ইঞ্চি উঁচু জিনিসটি হবে হাজার গুণ বড়।

পার্ব্বতী শিবের সঙ্গে কৈলাসে চলে গেলে তাঁর মা বাপের মনে বড়ই দুঃখ হয়েছিল। সেই অবধি নাকি তাঁরা সারা বছর ধরে পার্ব্বতীর কথা ভেবে কষ্টে দিন কাটান, তার পর তিনটি দিনের জন্য পার্ব্বতী তাঁদের দেখতে এলে তাঁদের খুবই আনন্দ হয়। আমাদের দেশের লোকে বলে যে সেই তিনটি দিনই দুর্গোৎসব।

গতবারে ভীষ্মলোচন শর্ম্মার কথা বলা হ'য়েছিল। একটা পাগ্‌লা ছাগল গুঁতো মেরে বেচারার গান মাটি করে দিয়েছিল। আমরা একটা ভেড়ার কথা জানি তার বুদ্ধিটাও এমনি ত্যাড়া গোছের ছিল। খামখা লোকের পিছনে ঢুঁ মারা তার একটা বদভ্যাস ছিল। খুব মাতব্বর গোছের লোক হয়ত একটা গম্ভীর কাজ কর্‌তে যাচ্ছে—এমন সময় কোত্থেকে ভেড়াটা এসে মার্‌লে এক ঢুঁ! এক বেচারা নিরীহ লোক কি একটা কাজে জমীদারের কাছারিতে এসেছে। সে কাছারির সাম্‌নে দাঁড়িয়ে সেলাম করতে গিয়ে সবেমাত্র নীচু হ'য়েছে, এমন সময় হঠাৎ ভেড়ার মেজাজ বিগ্‌ড়ে গেল। নিরীহ লোকটির আর সেলাম করা হ'ল না! তার বদলে ভেড়ার গুঁতোর সঙ্গে সঙ্গে সে চমৎকার একটি ডিগ্‌বাজী খেয়ে গেল। এই ভেড়ার অত্যাচারের অনেক গল্প শোনা যায়—কিন্তু শেষটায় ভেড়াটা একটি ভদ্রলোককে তাড়া কর্‌তে গিয়ে জব্দ হয়েছিল। অন্যলোককে তাড়া কর্‌লে তারা ছুটে পালায় কিন্তু সে ভদ্রলোকটি পালাবার লোক নন। তিনি চট্‌ করে ভেড়ার শিং দুটো এম্‌নি ক'সে ধর্‌লেন যে ভেড়ার সাধ্য কি আর কিছু করে! অনেক টানাটানি ঠেলাঠেলিতে লাভের মধ্যে হ'ল এই, ভেড়ার শিং দুটো ভেঙে গেল।

নূতন ধাঁধা।

হাঁড়ি মুখ কোথায় গেল—একেবারে দিলখুশ হাসি !

ভা রী গ ম্ভী র

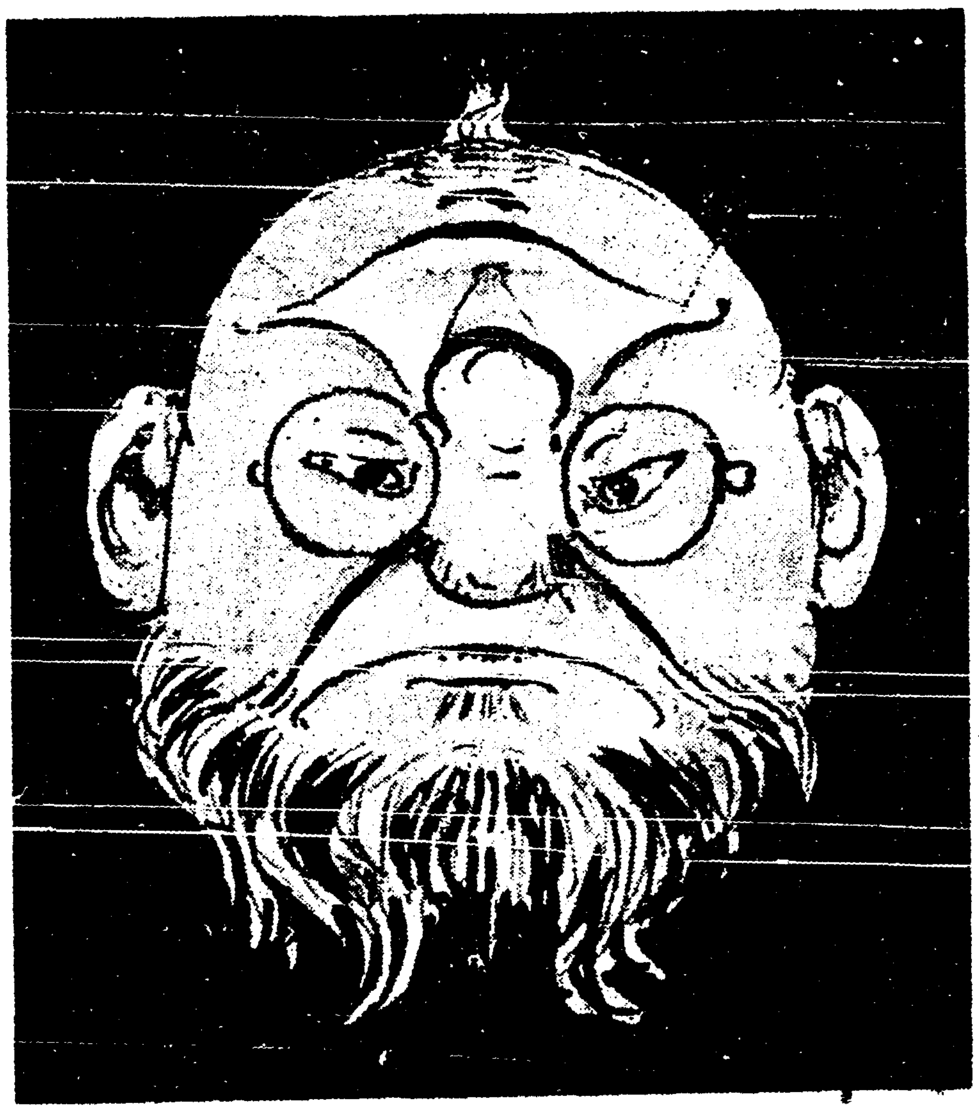

বে জা য় স্ফূ র্তি

এইত দেখ্‌ছ কেমন খিট্‌খিটে বদ্‌ মেজাজী লোকটি—কিন্তু উল্‌টিয়ে দেখ ত !

২। লাউ নয় সে কুমড়াও নয় কিন্তু চালে থাকে
দেখ্‌বে তারে নদীর চরে কিম্বা খাঁচার ফাঁকে।
কাঁচায় পচায় সদাই দেখি পাক্‌তে নাহি শুনি
চশমা চোখে খুঁজতে গিয়ে ডবল ক'রে গুণি॥

গত মাসের ধাঁধার উত্তর।

১। ছাতা। ২। কাবুলি।

৩। এ লেখা পড়্‌তে না পারলে বুঝব তুমি চালাক নও।
জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ।
নেড়া বেলতলায় যায় কবার।

শ্রেণী সং
কলিকাতা।

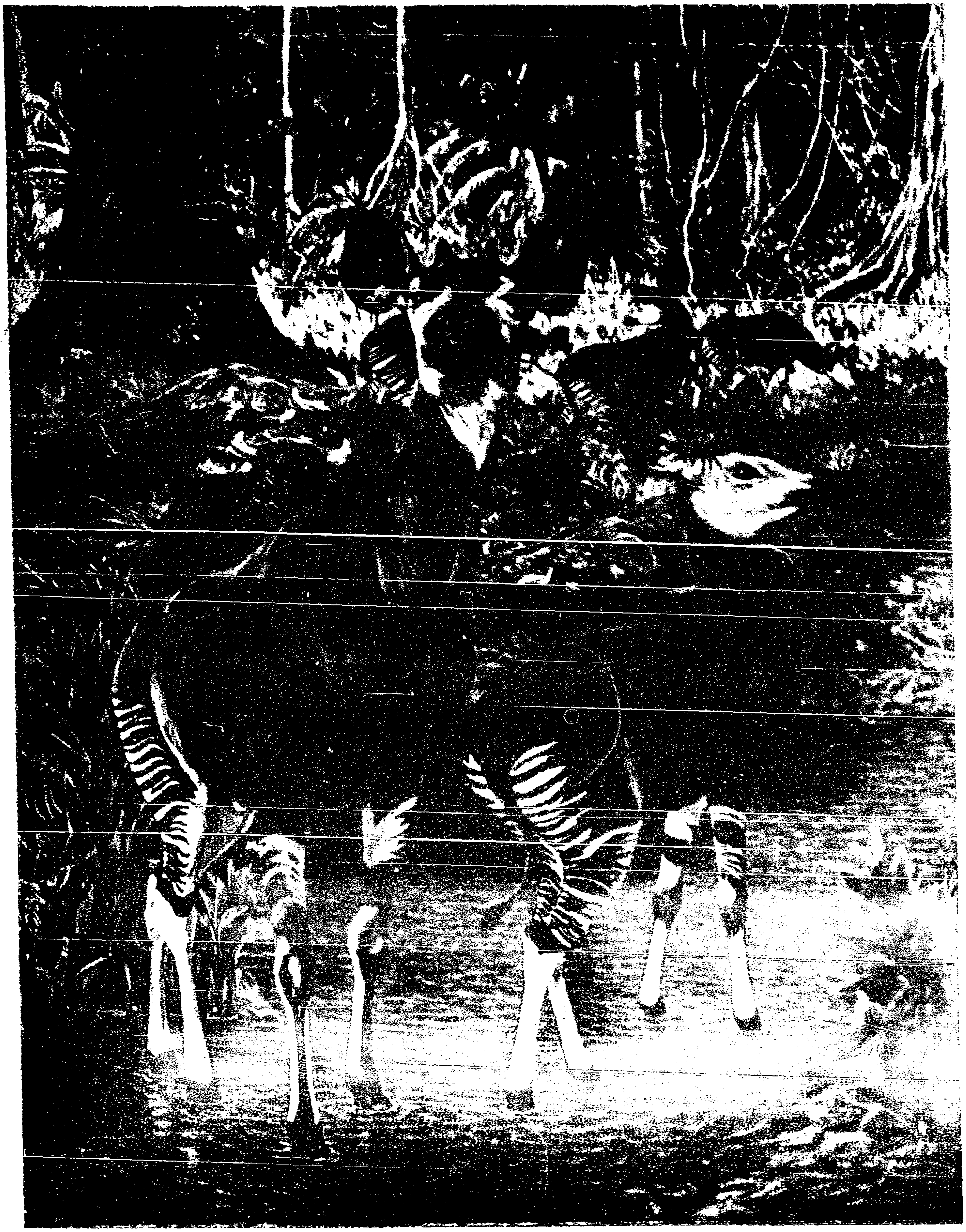

'ওকাপি'

পৃষ্ঠা ২৪•

সন্দেশ

তৃতীয় বর্ষ　　　　অগ্রহায়ণ, ১৩২২　　　　অষ্টম সংখ্যা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

ছুটির পরে।

অনু কহে, "অজুদাদা ! প'ড়ে গেলাম মুস্কিলে ;
ফুরিয়ে গেল পূজার ছুটি যেতেই হবে ইস্কুলে।
অজু কহে "বলিস্ কিরে ? দেখ্‌তে দেখ্‌তে একটি মাস
ফুরিয়ে গেল—ভাতের সাথে ফুরায় যেমন ভেট্‌কি মাছ !
অনু কহে "কাটে যেমন শীতের রাত্রি হঠাৎ-ই—
মাষ্টারেরই পায়ের শব্দে বেজাই ভোরে নটাতেই"।

এখন উপায় ? কোথায় পুঁথি, কোথায় কাগজ কলম গো ?
শুন্‌লেই হ'ত কাকার কথা গেলেই হ'ত কলম্বো।
তা না কোথায় বাবার কথায় কাছের গোড়ায় সুট্ ক'রে,
চ'লে গিয়ে ফিরে এলাম একেবারে হুট্ ক'রে।
পার্‌লাম নাক ভাল ক'রে চড়্‌তে গাছে, সাঁতরাতে ;
দুদিন বাদেই পড়্‌লাম ফাঁদে, হবেই পুঁথি হাতড়াতে।

হেন কালে এলেন মাষ্টার ! পড়্‌ল শ্বাসটা বুক থেকে—
কাজে কাজেই হাজির দু ভাই, মনের মাঝে দুখ্ ঢেকে।
"পড়্‌তে যাযা বলেছিলাম প'ড়েছ ত ছুটিতে ?"
শুনে বাণী অঁ্যা-ওঁ খানিক ; বন্ধ জবাব টুঁটিতে।
সংস্কৃতে কহেন মাষ্টার, দিচ্চি আজ্‌কে "পিট্যতাম্" !
পড়্‌ল বটে দু ভাই তখন,—কিন্তু ভূমে চিৎপটাং।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

দুষ্ট দমন।

বৃন্দাবনে আসিয়া কৃষ্ণ আর বলরাম শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় পরম সুখে দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন। রাখালগণের সঙ্গে তাঁহাদের যার পর নাই বন্ধুতা জন্মিল। রাখালদিগের মত করিয়া কাপড় পরিতে, মাথায় ময়ূরপুচ্ছ বাঁধিতে, বাঁশী বাজাইতে গরু চড়াইতে তাঁহাদের বড়ই ভাল লাগিত। ভোরে উঠিয়া সকাল বেলার খাবারটি কাপড়ে বাঁধিয়া নিয়া তাঁহারা তাহাদের সঙ্গে গরু চড়াইতে আর খেলা করিতে বাহির হইতেন, সারা দিনের ভিতরে আর ঘরে ফিরিতেন না। বনের ভিতরে যত পাখী আর জন্তু ছিল, তাহাদের সকলের ডাকই তাঁহারা ডাকিতে পারিতেন। বড় বড় যত গাছ ছিল সকলের নীচেই, যত ঝরণা সবগুলির ধারে ধারেই খেলা করিতেন। খেলায় আর সকলে তাঁহাদের নিকট হার মানিত।

একদিন তাঁহারা সকলে মিলিয়া যমুনার তীরে গরু চরাইতেছেন, এমন সময় কংসের চাকর একটা দুষ্ট দৈত্য তাঁহাদিগকে মারিতে আসিল। দুষ্ট বাছুর সাজিয়া আসিয়াছে, ভাবিয়াছে, তাহা হইলে আর কেহ তাহাকে চিনিতে পারিবে না, তারপর সুযোগ পাইলেই সে কৃষ্ণ বলরামকে মারিয়া ফেলিবে। কিন্তু কৃষ্ণ কি সে ফাঁকিতে ভুলিবার ছেলে ? তিনি দৈত্যটাকে দেখিয়াই চুপি চুপি বলরামকে বলিলেন, "দাদা, দেখ, একটা দৈত্য বাছুর সাজিয়া আসিয়াছে ! দাঁড়াও, একটু মজা করি।"

এই বলিয়া কৃষ্ণ আস্তে আস্তে সেই বাছুরটার কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন, যেন তিনি কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। তারপর হঠাৎ দু হাতে দুষ্ট বাছুরের পিছনের পা আর লেজ ধরিয়া তাহাকে ভোঁ ভোঁ শব্দে এমনি ঘুরান ঘুরাইতে লাগিলেন যে,

হতভাগার অর্দ্ধেক প্রাণ তাহাতেই বাহির হইয়া গেল। ঘুরাইতে ঘুরাইতে শেষে তিনি দুষ্টকে উপরের দিকে ছুঁড়িয়া মারিলে, সে অনেক উঁচুতে উঠিয়া তারপর একটা কয়েৎ-বেল গাছের উপরে পড়িল। তারপর গাছের সবগুলি ফল শুদ্ধ সে মাটিতে পড়িলে দেখা গেল যে তাহার বাছুরের বেশ ঘুচিয়া গিয়াছে, প্রাণও বাহির হইয়া গিয়াছে। তখন তাহার সেই পর্ব্বতপ্রমাণ দেহ দেখিয়া রাখাল বালকদের আর আশ্চর্য্যের সীমাই রহিল না।

আর একদিন তাঁহারা সকলে গরুগুলিকে জলের ধারে নিয়া দেখিলেন যে, সেখানে পর্ব্বতের মত উঁচু একটা বক বসিয়া আছে। বক কেন এত বড় হইবে? সেটা ছিল একটা অসুর। দুষ্ট তাঁহাদিগকে দেখিবা মাত্রেই খপ্ করিয়া এক ঠোকরে কৃষ্ণকে তুলিয়া লইল। হায় হায়! কি হইবে? বলরাম প্রভৃতি বালকেরা কাঁদিয়া অস্থির হইলেন, দুঃখে তাঁহাদের বুক ফাটিতে লাগিল।

এদিকে কৃষ্ণকে গিলিতে গিয়া দুষ্ট দৈত্য কি বিপদেই পড়িয়াছে। সে জানিত না যে এই খোকটি এমনি ভয়ানক গরম! তাঁহাকে মুখে করিয়া তাহার তালু অবধি জ্বলিয়া যাইবার গতিক। সে তখনই বিষম ওয়াক্ শব্দে কৃষ্ণকে মুখ হইতে ফেলিয়া দিল। তারপর সে আবার যেই তাঁহাকে ঠোকরাইতে যাইবে, অমনি তিনি দু হাতে তাহার দুই ঠোঁট ধরিয়া দুষ্টকে কলার পাতের মত চিরিয়া দুভাগ করিয়া ফেলিলেন। কেহ বলেন যে, দৈত্য কৃষ্ণকে গিলিয়া পেটের জ্বালায় বমি করিতে করিতে মারা যায়, কৃষ্ণও সেই সঙ্গে বাহির হইয়া আসেন।

এই দৈত্যটা ছিল সেই পূতনার ভাই; ইহার নাম বকাসুর। ইহাদের আর একটা ভাই ছিল, তাহার নাম অঘাসুর। বকের মৃত্যুতে এই অসুরটা কৃষ্ণ বলরাম আর রাখালদের উপর বড়ই চটিয়া গিয়াছিল। তারপর একদিন তাঁহারা সকলে বনের ভিতরে চড়াইভাতী খাইতে আসিয়াছেন, এমন সময় সেই দুষ্ট এক যোজন লম্বা আর পাহাড়ের মত উঁচু, বিশাল অজগর সাজিয়া আসিয়া তাঁহাদের পথের উপর হাঁ করিয়া পড়িয়া রহিল। সে এমনি বিষম হাঁ যে, তাহার একদিক মাটিতে, আর একদিক মেঘে ঠেকিয়া রহিয়াছে। দাঁতগুলি যেন এক একটা পর্ব্বতের শৃঙ্গ, মুখের ভিতরটি ঘোর অন্ধকার পর্ব্বতগুহার মত। লক্‌লকে জিব্‌খানি মাটিতে পড়িয়া আছে,—ঠিক যেন একটি প্রশস্ত রাজপথ। চোখ দুটা দাবানলের মত জ্বলিতেছে; নিশ্বাস বহিতেছে, যেন বৈশাখের ঝড়।

রাখালবালকেরা সেই ভয়ঙ্কর সাপের হাঁ দেখিয়া তাহাকে সাপ বলিয়া চিনিতে পারিল না। তাহারা ভাবিল, এ বুঝি তাহাদের বৃন্দাবনেরই পথ। কৃষ্ণ অবশ্য

সাপটাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার সঙ্গীদিগকে বারণ করিবার আগেই তাহারা সেই ভীষণ হাঁর ভিতর দিয়া সাপের পেটের মধ্যে ঢুকিয়া গেল। ঢুকিবার সময় হাসিতে হাসিতে বলিল, "বাঃ কি মজা! ঠিক যেন সাপের মুখে ঢুকিতেছি!"

সেদিন কৃষ্ণ না থাকিলে কি আর উপায় ছিল? তিনি তখনই নিজেও গিয়া অজগরের মুখের মধ্যে ঢুকিলেন। তারপর সেই দুষ্টের গলার ভিতরে থাকিয়া তিনি ক্রমে বড় হইতে আরম্ভ করিলে, আর বাছার বড়াই করিবার যো রহিল না। দেখিতে দেখিতে তাহার দম আটকাইয়া গেল, চক্ষু দুটি বাহির হইয়া আসিল, মরণ যাতনায় ছট্‌ফটি আরম্ভ হইল। তারপর পলকের ভিতরে তাহার মাথা ফাটিয়া প্রাণবায়ু বাহির হইবা মাত্র, সেই পথে রাখালদেরও বাহিরে আসিতে আর কোন বাধা রহিল না।

সেই সাপের চামড়াটা তারপর অনেক দিন অবধি বৃন্দাবনে ছিল। বৃন্দাবনের ছেলেরা তাহার ভিতরে ঢুকিয়া লুকাচুরী খেলিত। সেখানকার বৃদ্ধেরা যখন তাহাদিগকে বলিত যে "কৃষ্ণ এমনি করিয়া তাঁহার ছেলেবেলায় এই সাপটাকে মারিয়াছিলেন," তখন আর তাহাদের মুখে কথা থাকিত না।

পূতনা, বাছুর সাজা অসুর, বকাসুর, অঘাসুর, এরা সকলেই ছিল কংসের লোক। সেই দুষ্টই নানা উপায়ে কৃষ্ণকে মারিবার জন্য দিন রাত চেষ্টা করিত। ইহা ছাড়া আরো কতগুলি দৈত্য নানা স্থানে ছিল, তাহারা কংসের লোক না হইলেও লোকের উপর কম অত্যাচার করিত না। ধেনুক নামে এইরূপ একটা দৈত্য একটা তাল বনে বাস করিত, তাহার চেহারাটা ছিল ঠিক একটা গাধার মত। তালবনে হরিণের অভাব ছিল না; সেই সব হরিণ মারিয়া খাওয়াই ছিল সেই দৈত্যের কাজ।

একদিন কৃষ্ণ বলরাম রাখালদের সঙ্গে গরু চরাইতে চরাইতে সেই তালবনে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। দৈত্যের ভয়ে কেহ সে বনে তাল পাড়িতে যায় না। সেগুলি পাকিয়া গাছ বোঝাই করিয়া রহিয়াছে, তাহাদের গন্ধে মুখ জলে ভরিয়া আসে। রাখালেরা কৃষ্ণ বলরামকে বলিল, "আহা! কি সুন্দর গন্ধ! পাড়িয়া দাও না দাদা, আমরা খাই। আমাদের পাড়িতে ভয় করে,—দৈত্য বেটা মারিবে।"

কৃষ্ণ বলরাম তখনই তাহাদের জন্য তাল পাড়িতে আরম্ভ করিলেন, আর সেই তাল পড়িবার শব্দে দৈত্য গাধাটাও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইতে তিল মাত্র বিলম্ব করিল না। দুষ্ট আসিয়াই ধুপ্‌ধাপ্ শব্দে বলরামের বুকে বিষম লাথি মারিতে আরম্ভ করিয়াছে! বলরামের কিন্তু তাহাতে ভয় মাত্র নাই; তিনি গাধার পিছনের পা ধরিয়া তাহাকে এমনি ঘুরান ঘুরাইলেন যে তাহাতেই তাহার প্রাণ বাহির হইয়া গেল। তারপর তাহাকে তাল গাছের উপরে ছুঁড়িয়া মারিলে তালও পড়িল বিস্তর। সেই গাধার ভাই বন্ধু আরো অনেক গাধা দৈত্য ছিল। তাহারা তখন আসিয়া বলরামকে আক্রমণ করিলে, তিনি তাহাদেরও এক একটাকে ধরিয়া তালগাছের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন। তখন গাছ হইতে এত তাল পড়িল যে, রাখালেরা কত খাইবে?

ধেনুককে মারিয়া তাঁহারা সকলে ভাণ্ডীব নামক একটা বটগাছের তলায় আসিয়া খেলা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা জানিতেন না যে প্রলম্ব নামে একটা দৈত্যও রাখালের বেশে আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে খেলায় জুটিয়াছে, আর ভাবিতেছে যে, কোন ফাঁকে কৃষ্ণ বলরামকে লইয়া ছুট দিবে। যাহা হউক, কৃষ্ণের আকার প্রকার দেখিয়া

দুষ্ট তাঁহার কাছে ঘেঁষিতে ভরসা পাইল না; তখন হইতে তাহার চোখ রহিল বলরামের উপরে।

খেলা অনেক রকমের হইল। সকলের শেষের খেলাটির নাম 'হরিণ ক্রীড়া'। দুজনে এক সঙ্গে লাফাইতে লাফাইতে ছুট দেয়; যে আগে বটগাছটাকে ছুঁইতে পারে তাহার জিত হয়। অপর বেচারা তখন তাহাকে কাঁধে লইয়া ফিরিয়া আসে, তারপর আবার তাহাকে বটগাছের কাছে নিয়া নামাইয়া দেয়। খেলায় কৃষ্ণ বলরাম প্রভৃতি কয়েকজন জিতিলেন। অন্যেরা ইঁহাদিগকে কাঁধে চড়াইয়া শেষে বটগাছের নিকটে আনিয়া নামাইয়া দিতে লাগিল, কিন্তু বলরামের নিকট যে হারিয়াছিল সেটা ছিল কিনা সেই দুষ্ট দৈত্য, সে তাঁহাকে লইয়া সোজা ছুট দিল।

বলরাম দেখিলেন যে, তিনি রাখাল ভাবিয়া যাহার কাঁধে চড়িয়াছিলেন, সে এখন পর্ব্বতাকার দৈত্য হইয়া তাঁহাকে না জানি কোথায় লইয়া চলিয়াছে। তিনি যারপর নাই ভয় পাইয়া চ্যাঁচাইতে লাগিলেন, "ও কৃষ্ণ! নিয়ে যে গেল! এখন কি করি?" কৃষ্ণ বলিলেন, "ভয় কি দাদা? আপনার ক্ষমতা কি কম? দুষ্টকে মারিয়া ফেলুন!" এ কথায় বলরামের খুবই ভরসা হওয়ায়, তিনি দৈত্যের মাথায় এমনি প্রচণ্ড এক কীল মারিলেন যে তাহাতেই তাহার দুই চোখ বাহির হইয়া গেল, মাথা ফাটিয়া মগজগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল; তারপর দেখিতে দেখিতে দুষ্ট রক্ত বমি করিয়া মারা গেল।

হেলেন্ কেলার।

তোমাদের অনেকে হয় ত এই মেয়েটির নাম শুনে থাকবে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের আলাবামা প্রদেশে এঁর জন্ম হয়। অনেক দিন আগে আমি যখন প্রথমে এঁর কথা পড়েছিলাম, তখন আমার মনে হয়েছিল যে হয় ত এমন আশ্চর্য্য লোক পৃথিবীতে খুব কমই জন্মিয়েছে। সাহস, চেষ্টা, আর ভাল হবার ইচ্ছা থাকলে যে লোকে কত বড় বিপদ পায় ঠেলে ফেলতে পারে, এই মেয়েটির কথা পড়ে তা বেশ বুঝতে পারা যায়।

হেলেন যখন সবে উনিশ মাসের ছোট্ট খুকী, তখন তাঁর মাথার অসুখ হয়। ভগবানের কৃপায় তিনি সেই বিপদ থেকে রক্ষা পেলেন বটে, কিন্তু তাঁর দেখবার আর শুনবার শক্তি চিরদিনের মত চলে গেল। কানে শুনতে না পেলে আর কথা কইতে

শিখবে কি করে? তাই কয়েক বৎসর হেলেন শুধু "ওয়া-ওয়া" ছাড়া আর কিছু বলতে পারতেন না।

বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে হেলেন একটু দুরন্ত হয়ে উঠছেন দেখে, তাঁর বাবা তাঁকে লেখাপড়া শিখাবার জন্য একটি মাষ্টার রেখে দিলেন। মাষ্টারটির নাম মিস্ সালিভান (Miss Sullivan)। তিনি যে কত কষ্ট করে হেলেনকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন, তা শুনলে আশ্চর্য্য হতে হয়। অন্ধ, কালা, বোবা, এমন মেয়েকে যে কি করে লেখাপড়া শিখাতে হয়, তাই বোধ হয় অনেকে জানে না।

শুধু অন্ধ হলে, তাকে লেখাপড়া শিখান তেমন কঠিন কাজ নয়। অন্ধদের পুস্তকের অক্ষর উঁচু উঁচু থাকে, তার উপর হাত বুলিয়ে তারা দিব্যি পড়ে যেতে পারে। মিস্ সালিভান হেলেনের হাতে একটি পুতুল দিলেন, আর তাঁর আঙুল ধরে তা দিয়ে

পু-তু-ল (d-o-l-l), এই অক্ষরগুলো লিখিয়ে দিলেন*। হেলেন সহজেই সেই

* এ হয় ত ঠিক আমাদের লেখার মত করে লেখা নয়, হাতের আঙুলের নানা রকম ভঙ্গী করে অন্ধেরা অক্ষর বোঝাতে শেখে, এ সেই রকম লেখা।

অক্ষরগুলোর চেহারা চিনে ফেল্লেন, কিন্তু, তাতে যে পুতুলের নাম হয়, তা কিছুতেই তাঁকে বোঝান গেল না। আরো কত জিনিসের নাম নিয়ে কিছুদিন ধরে এমনিতর চেষ্টা চল্ল, কিন্তু সকল চেষ্টারই ফল হল সেই একই রকম। হেলেন কথাগুলোর চেহারা চট্ করেই চিনে ফেলেন, কিন্তু সেই সব কথার সঙ্গে যে আবার সেই জিনিস-গুলোর কোন সম্পর্ক আছে—সে কথাগুলো যে সেই জিনিসগুলোর নাম—তা কিছুতেই বুঝতে পারেন না।

মিস্ সালিভান হেলেনকে লেখাপড়া শিখাবার আশা এক রকম ছেড়েই দিয়েছিলেন, এমন সময় একটা ঘটনা হল। হেলেনকে নিয়ে তিনি বেড়াতে বেরিয়েছেন, পথের ধারে একটি লোক কল দিয়ে কূয়া থেকে জল তুল্‌ছে, কলের মুখ দিয়ে সেই জল ঝর ঝর করে গড়িয়ে পড়ছে। মিস্ সালিভান সেই কলের মুখের নীচে নিয়ে হেলেনের হাতখানি ধরলেন, আর জলের নামটি তাঁর আঙ্গুল দিয়ে লিখিয়ে দিলেন। অমনি হেলেনের মনে এল যে, এই রকম করে লিখলে বুঝি ঐ জিনিসটার কথা বুঝতে হয়।

তখন থেকে এক নূতন জগতের দুয়ার হেলেনের সামনে খুলে গেল। তিনি চট্ পট্ সব জিনিসের নাম শিখে নিতে লাগলেন। 'মা', 'বাবা', 'বোন', 'শিক্ষয়িত্রী' প্রভৃতি বহুতর কথা প্রথম দিনেই শিখা হয়ে গেল। হেলেনের দিন আর কখনো এমন সুখে কাটেনি। রাত্রে বিছানায় শুয়েও তিনি সেই সুখের কথা ভাবতে লাগলেন, আর, কখন আরেকটি নূতন দিন আসবে তার জন্য ব্যস্ত হলেন।

তারপর ক্রমে উঁচু অক্ষরে লেখা কাগজে হাত বুলিয়ে জিনিসের নাম শিক্ষা আরম্ভ হল। উঁচু অক্ষরে লেখা পুস্তক ধরতেও আর বেশী দেরী হল না। তত দিনে লোকে কথা কইবার সময় কেন যে তাদের ঠোঁট নড়ে, তার অর্থ হেলেন বেশ বুঝে নিয়েছেন, আর নিজে কথা বলবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। গলার স্বর তাঁর বজায় ছিল, খালি কানে না শোনার দরুণ সেই স্বরের উচিত ব্যবহার করতে শিখা হয় নি।

কিন্তু মিস্ সালিভান অন্ধদের শিখাবার উপায়ই জানতেন, বোবা কালাকে শিখাবার উপায় তাঁর জানা ছিল না। সুতরাং তিনি হেলেনকে নিয়ে একটি বোবা কালার স্কুলে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর নাম মিস্ ফুলার (Miss Fuller)। এঁর সঙ্গে দেখা হতে না হতেই হেলেনের নূতন শিক্ষা আরম্ভ হয়ে গেল। মিস্ ফুলার হেলেনের হাতখানি তাঁর নিজের মুখের উপরে বুলিয়ে এক একটি করে অক্ষর উচ্চারণ করছেন, হেলেন ভারী মনোযোগের সহিত দেখছেন তখন

মিস্ ফুলারের ঠোঁট কি ভাবে নড়ে। এমনি করে এক ঘণ্টার ভিতরে এম্, পি, এ, এস্, টি আর আই (m, p, a, s, t, i) উচ্চারণ করতে শিখে, হেলেন অতি মধুর স্বরে 'মা' আর 'বাবা' বলতে পারলেন। আহা, তাঁর মুখে সেই ডাক প্রথম শুনে না জানি তাঁর পিতা মাতার মন কেমন করেছিল।

এমনি করে মিস্ ফুলারের কাছে এগার দিন গিয়েই হেলেন কাজ চালাবার মতন কথা বলতে শিখে ফেল্লেন। অবশ্যি, তখনো তাঁর কথা তেমন স্পষ্ট হত না। শিক্ষয়িত্রীরা সে কথা বেশ বুঝতে পারতেন, কিন্তু অন্য লোকের বুঝতে একটু কষ্ট হত। তখন হেলেনের বয়স দশ বৎসর মাত্র। তের বৎসর না যেতে যেতেই তিনি গ্রীস, রোম আর তাঁর জন্মভূমি যুক্তরাজ্যের ইতিহাস পড়ে ফেল্লেন, তা ছাড়া, ফরাসী ভাষার ব্যাকরণ শিখে একটু একটু ফরাসীও বলতে লাগলেন। আর দু বছরের মধ্যে অঙ্ক, প্রাকৃতিক ভূগোল আর জর্ম্মাণ ভাষায়ও অনেকটা দখল জন্মাল।

কি কঠিন পরিশ্রম করে যে তিনি লেখাপড়া শিখেছিলেন, তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। অন্ধের ত সাধারণ ছাপার পুস্তক পড়া সম্ভব হয় না, তাদের জন্য উঁচু অক্ষরে ছাপা বিশেষ রকমের বই চাই। ভাল ভাল পুস্তকের সবগুলি আজও সে অক্ষরে ছাপা হয় নি, সুতরাং অনেক সময়েই অন্যের কাছ থেকে শুনে সে সব বই উঁচু অক্ষরে লিখে নিতে হত। দশ বৎসর এমনি ভাবে খেটে তিনি ১৯০৪ সালে বি-এ, উপাধি লাভ করেন। এখন তিনি স্পেন দেশের রাজার কালা বোবা ছেলেটির শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হয়েছেন।

কালা আর অন্ধ।

একদিন দুই বন্ধুতে বেড়াতে বেরিয়েছে। তাদের একজন বিষম কালা, আর একজন একেবারেই অন্ধ। দুই জনে বেড়াতে বেড়াতে এক ধোপার বাড়ী এসে উপস্থিত হয়েছে। সেখানে ধোপার একটা মস্ত কাপড়কাচা গামলা আর একটা গাধা ছিল। তা দেখে কালা বল্ল, "গামলাটা ত বেশ সুন্দর ; চল আমরা এই গামলাটা আর গাধাটাকে নিয়ে চলি।"

এই বলে দুজনে সেই গামলা আর গাধাটাকে নিয়ে চল্ল। পথে কালা দেখল, এক আম গাছে সার বেঁধে লাল লাল পিঁপ্ড়ে চলেছে। তা দেখে সে বল্ল, "বাঃ,

কেমন লাল পিঁপ্ড়ে, এগুলোকেও নিয়ে যেতে হবে।” এই বলে সে কচু পাতায় বেঁধে কতগুলো পিঁপ্ড়ে নিয়ে চল্ল।

সেদিন তাদের বাড়ী ফিরবার আগেই পথের মাঝখানে সন্ধ্যা হয়ে গেল। চারদিকে ভয়ানক বন, তাদের বড্ড ভয় হয়েছে, এমন সময় তারা দেখল যে তাদের সামনেই একটা মন্দির। তখন সেই মন্দিরের ভিতরে গিয়ে দুজনে বসে রইল। তারপর যখন রাত হয়েছে, তখন কালা দেখল যে একটা রাক্ষস সেই দিকে আসছে। সে ত রাক্ষস দেখেই কেঁপে অস্থির। অন্ধ বেচারা চোখে দেখতে পায় না, সে জিজ্ঞাসা করল, “কি হয়েছে ভাই ? তুমি এত কাঁপছ কেন ?” কালা বল্ল, “সর্ব্বনাশ হয়েছে ; এটা রাক্ষসের বাড়ী। ঐ দেখ, রাক্ষসটা এদিকে আসছে !”

অন্ধ সে ত চোখে দেখতে পায় না, কাজেই তার তত ভয়ও হল না। সে কালাকে বল্ল, “রাক্ষস দেখে অত কাঁপছ কেন ? সে কি তোমায় খেয়ে ফেলবে ? সর দেখি, আমি দরজার কাছে বসি। এই বলে কালাকে সরিয়ে সে এসে দরজার কাছে বসল।

খানিক পরেই রাক্ষস এসে উপস্থিত। এসে দেখে, তার বাড়ীর দরজা বন্ধ। তখন সে জিজ্ঞাসা করল, “কেরে তোরা আমার বাড়ীতে ?” অন্ধ কিন্তু খুব চালাক, সে বল্ল, “তোর বাবা খোক্কস !” খোক্কসের নাম শুনে রাক্ষসটা একটু চমকে গিয়ে বল্ল, “আমি ত কখনো আমার বাবাকে দেখিনি !” তাতে অন্ধ বল্ল, “তুই দেখ্‌বি কি করে ? তখন ত তুই ছোট্ট ছিলি।”

তখন রাক্ষস বল্ল, “আচ্ছা, বাবা, তোমার পেটটা দেখিত।” তা শুনে অন্ধ করেছে কি, সেই যে ধোপার বাড়ী থেকে গামলাটা এনেছিল, সেইটে দিয়েছে একটা ফুটো দিয়ে বার করে। রাক্ষস সেই পেট দেখেই ‘বাবা গো !’ বলে দিয়েছে ছুট। অনেক দূর গিয়ে আবার সে থামল। সে কি মন্দির ছেড়ে যেতে চায় ? কত দিন থেকে সে সেখানে আছে, মস্ত মস্ত চার থলে টাকা জমিয়েছে। আবার কিছু ক্ষণ পরে ঘুরে এসে সে বল্ল, “বাবা, তোমার কাণটা দেখি ?” অন্ধ তাতে ভয়ানক রেগে বল্ল, “দেখ্, বার বার জ্বালাতন করছিস্ কেন ? ফের যদি আসবি তবে এমন এক চড় মারব যে, তোকে খুঁজেই পাওয়া যাবে না !”

তখন রাক্ষসটা বল্ল, “বাবা, রাগ করো না ! এই বারটি দেখাও, আর জ্বালাতন করব না।” রাক্ষসদের কাণ মানুষের মত থাকে না, সে হয় লম্বা লম্বা। অন্ধ তাই

আস্তে আস্তে গাধাটাকে এনে ফুটো দিয়ে তার কাণ বার করে দিয়েছে। রাক্ষস তা দেখে বল্ল, "বাবা গো! কি মস্ত বড় কাণ! আমার বাবা কি না, তাই এত বড় কাণ!" বলেই সে সেখান থেকে ছুট!

কিন্তু সে কিছুতেই বাড়ী ছেড়ে যেতে পারছে না। তাই সে আবার এসে বল্ল, "বাবা, তোমার ডাক শুনি?" অন্ধ বল্ল, "দেখ্, তুই আবার এসেছিস? লজ্জা নেই?" রাক্ষস বল্ল, "বাবা, রাগ করো না; এই শেষ বার, আর আসব না।"

এসব কাণ্ড দেখে কালারও একটু সাহস হয়েছে। তখন সে সেই পিঁপড়েগুলোকে দিল গাধার কানের ভিতরে ঢুকিয়ে। গাধা ত যন্ত্রণায় ভয়ানক চিৎকার আরম্ভ করল। সে ডাক শুনে রাক্ষস এমনি ছুট দিল! আর সে ফিরে এল না।

তবু কিন্তু সে একেবারে চলে যায়নি। সে চুপ করে বনের ভিতরে বসে আছে, আর ভাবছে, কখন তার বাবা বেরুবে, আর সে কেমন দেখতে, তাই দেখবে। এ দিকে কালা আর অন্ধ ভাবছে, 'বিপদ কেটে গেল, পথ পরিস্কার হল, এখন আমরা পালাই।' এই ভেবে, চার থলে টাকা গাধার পিঠে চাপিয়ে, দুজনে মন্দির থেকে বেরুল।

তখন রাক্ষস দেখল, তাই ত, এ দুটো যে মানুষ! দেখেই ত সে রেগে অস্থির। "দুটো মানুষ জুটে আমাকে এতটা ভয় দেখিয়েছে! দাঁড়া, এদের জব্দ করতে হবে।" এই বলে সে চল্ল আরো চার পাঁচটা রাক্ষস ডাকতে। কালা তা দেখতে পেয়ে বল্ল, "সর্ব্বনাশ! রাক্ষসটা এইখানে বসে ছিল, আমাদের দেখেই ছুটে কোথায় যেন গেল।" অন্ধ বল্ল, "ও আরো রাক্ষস ডাকতে গিয়েছে। চল, আমরা লুকিয়ে থাকি।"

এই বলে কালা গাধাটাকে টাকা শুদ্ধ একটা গাছে বেঁধে রাখল, আর নিজেরা গিয়ে একটা তাল গাছে উঠল। কালা দেখতে পায়, সে চট্ পট্ গিয়ে ঢের উঁচুতে উঠে বসেছে; অন্ধ বেচারা আস্তে আস্তে হাতড়ে হাতড়ে উঠেছে। এ দিকে রাক্ষসটা আরো পাঁচটা রাক্ষসকে ডেকে নিয়ে এসে উপস্থিত!

তাল গাছের নীচে এসেই রাক্ষসগুলো একটা আরেকটার পিঠে উঠতে লাগল। সকলের নীচে সেই মন্দিরের রাক্ষসটা, তার পিঠে আরেকটা, তার পিঠে আরেকটা,— এমনি করে সব কটাই উঠেছে, শুধু একটা উঠতে বাকি, সেটা উঠলেই অন্ধ বেচারাকে ধরে ফেলবে। কালা তখন উপর থেকে বল্ল, "আরেকটা উঠলেই কিন্তু তোমাকে

ধরবে!” সে কথা শুনেই ত বিষম থতমত খেয়ে অন্ধ দিয়েছে হাত ছেড়ে, আর অমনি সে পড়েছে একটা রাক্ষসের পিঠে। পড়েই সে রাক্ষসের কান দুটো পেয়েছে ঠিক

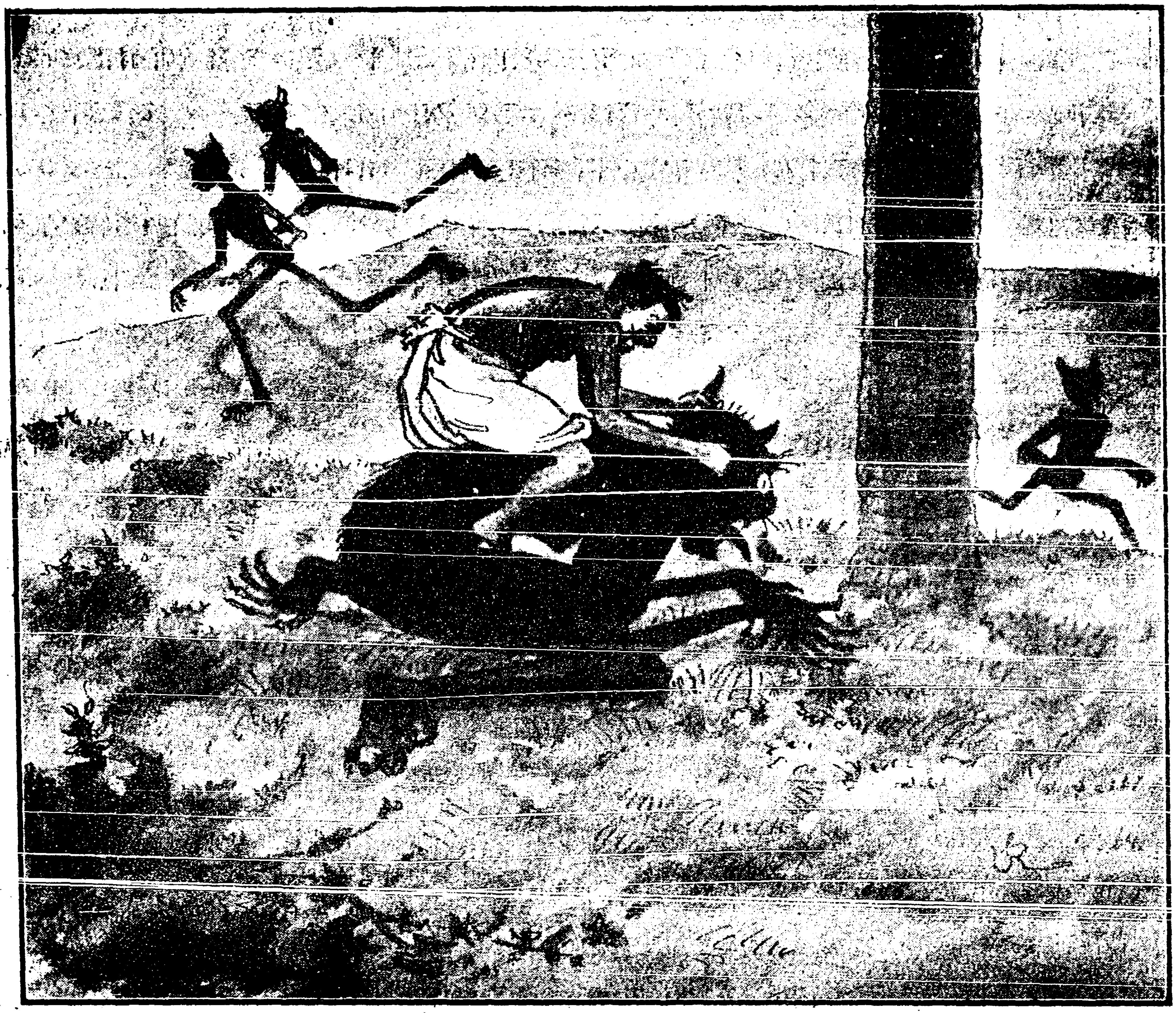

তার হাতের কাছে, আর এমনি শক্ত করে সেই দুই কান ধরেছে যে ধরা যাকে বলে। আর রাক্ষসগুলো তা দেখে কোনটা কোথায় চেঁচিয়ে পালাবে তা ঠিক পাচ্ছে না।

কালা তখন গাছ থেকে নামছে আর বলছে, “শক্ত করে ধরে থাক্, ছাড়িসনে, আমি যাচ্ছি।” সে কথা শুনেই ত ভয়ে রাক্ষসের প্রাণ উড়ে গেল। একজনেই যদি এমনি করে ধরে, তবে আর একজন এসে না জানি কেমন করে ধরবে! এই ভেবে সে দিয়েছে প্রাণ পণে এক টান, আর অন্ধ দিয়েছে তার কান ছেড়ে। তখন রাক্ষসটা এক ছুট যে দিল, সে আর বলা যায় না।

কালা বড় চালাক, আর একটু দুষ্টুও। সে তখন তিন থলে টাকা লুকিয়ে রেখে, একটি মাত্র থলের আধ ভাগ এনে অন্ধকে দিতে গেল। অন্ধ হাতড়ে দেখে বল্ল, "ভাই, টাকা এত কম কেন? আমি ত তখন অনেকগুলো দেখেছিলাম। তুমি আমার পুরাতন বন্ধু হয়ে বুঝি আমার সঙ্গে জুয়াচুরি করছ!" কালা তাতে ভয়ানক রেগে বল্ল, "বটে, তুমি আমাকে জোচ্চোর বল্‌ছ? তোমাকে দেখাচ্ছি মজা।" বলেই সে অন্ধকে মেরেছে এক থাপ্পড়। তখন দুজনে খুবই মারামারি হল। শেষে কালা মেরেছে অন্ধের চোখে ঠাঁই করে এক বিষম ঘুঁসি, আর অন্ধ লাগিয়েছে কালার কানে ঠকাস্ করে তার চেয়ে বড় এক ঘুঁসি। সেই ঘুঁসির চোটে—কি আশ্চর্য্য—অন্ধের চোখ আর কালার কান, দুই গেল ভাল হয়ে।

তখন দুজনের কি আনন্দ! ঝগড়া ছেড়ে দুজনে কোলাকুলি কর্‌তে লাগ্‌ল। তারপর দুজনে টাকাগুলো সমান সমান ভাগ করে নিয়ে, নিজের নিজের বাড়ী চলে এল।

শ্রীইলা রায়।

আফ্রিকা দেশের বন।

আফ্রিকা দেশের বন যে অন্য সব দেশের ভারী ভারী বনের চেয়ে খুব ভয়ানক, তা নয়। কিন্তু এতে এমন অনেক জন্তু আছে যে, তেমন জন্তু আর কোন দেশে দেখতে পাওয়া যায় না। মানুষও আছে ভারী অদ্ভুত রকমের। এই সব মানুষ আর জানোয়ারের কথাই আমি কিছু বলতে চাচ্ছি।

সেই অতি প্রাচীনকাল থেকে ইউরোপের লোকে বলত যে আফ্রিকার বনে ছোট্ট ছোট্ট মানুষ (Pygmies) আছে, তারা লাঠি নিয়ে সারসদের সঙ্গে যুদ্ধ করে। এ সব কথা আজকালকার লোকে বিশ্বাস করত না, তারা ওসব বাজে কথা বলেই উড়িয়ে দিত। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে বাস্তবিকই আফ্রিকার ঘন বনের কোন কোন জায়গায় পৌনে তিন হাত লম্বা এক রকম মানুষ আছে। কোন কোন জায়গায় তারা সারসের সঙ্গে যুদ্ধও করে থাকে।

বছর দশেক আগে একবার লণ্ডনে এই জাতীয় চারিটি পুরুষ আর দুজন স্ত্রীলোক

আফ্রিকার বামন জাতির মেয়ে।

আনা হয়। এদের মধ্যে যারা খুব ঢ্যাঙ্গা, তারা ৪ ফুট ৩ ইঞ্চি লম্বা ছিল, আর যারা বেঁটে, তারা ছিল ৪ ফুট লম্বা। এদের ঘরগুলোও ৪ ফুটের বেশী উচু হয় না। গোসাপের মত হামাগুড়ি দিয়ে তার ভিতরে ঢুকতে হয়।

এদের কেউ কেউ তামাক, আঁখ আর মিষ্টি আলুর চাষ করে, কিন্তু অধিকাংশেরই চাষ বাসের দস্তুর নাই। এরা লোহার অস্ত্র শস্ত্র কিছু কিছু গড়তে পারে, কিন্তু পাথরের অস্ত্রই বেশী ব্যবহার করে। বল্লমই প্রধান অস্ত্র। বিয়ের সময় তারা এই সব বল্লম পণ দিয়ে কনে কিনে আনে। বল্লম ছাড়া তীর ধনুক, ছুরী কাটারী এসব অস্ত্রও

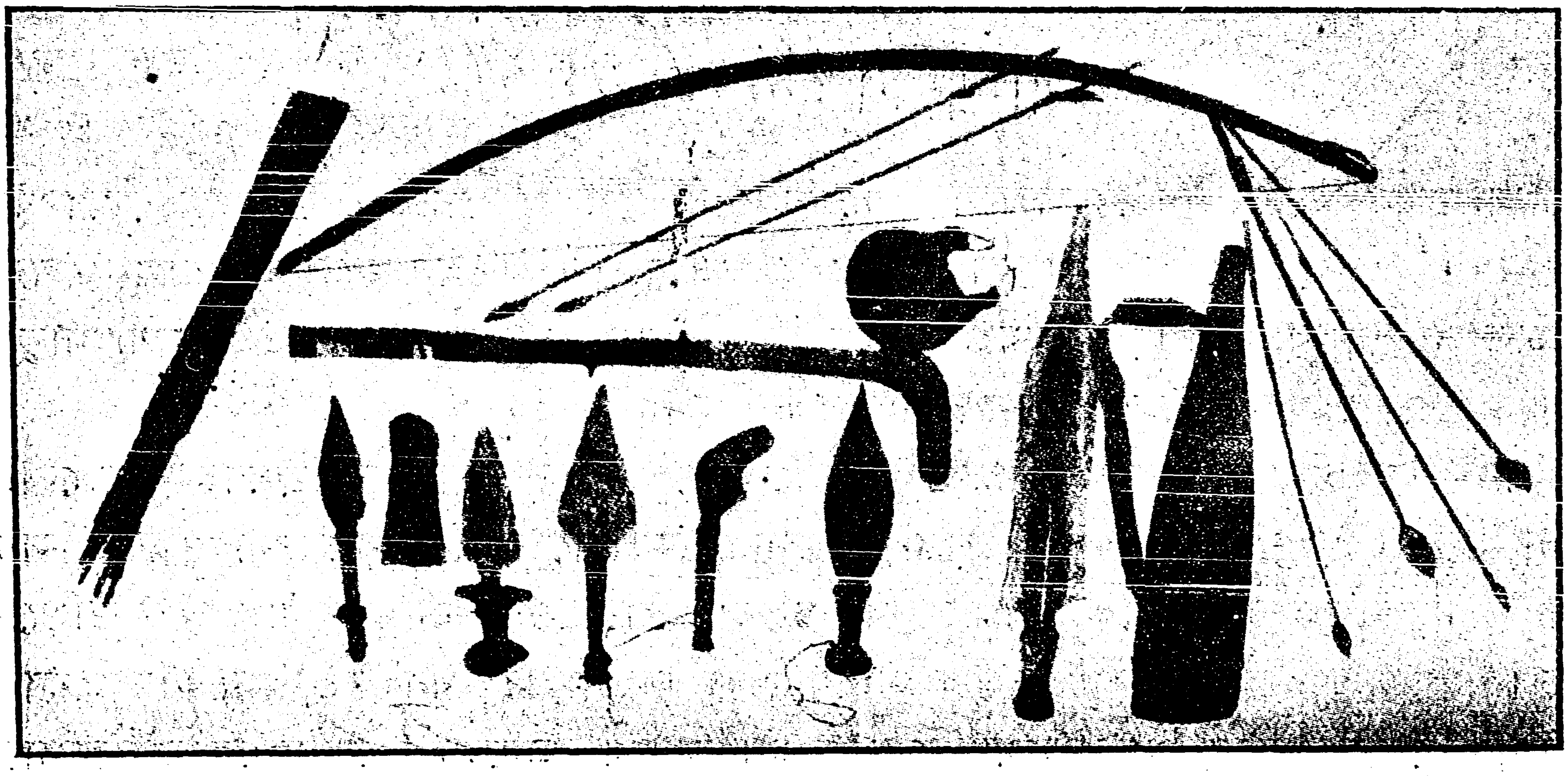

তাদের আছে; সে সব প্রায়ই পাথরের হয়। পাথরের ব'লে মনে করে নিয়ো না

যে সে সব অস্ত্র নিতান্ত ভোঁতা। তা দিয়ে বাঁশ কাঠ অনায়াসে কাটা যায়। অনেক সময় তারা তাদের তীর বল্লমে ভয়ানক বিষ মাখিয়ে নেয়।

এরা ভারী আশ্চর্য্য রকম তীর ছুঁড়তে পারে। পাখী ইঁদুর প্রভৃতি ছোট ছোট জানোয়ার তীর দিয়ে শীকার করে। বড় জন্তুও যে মারেনা তা নয়। হাতী আর শূয়র মারতে তাদের খুবই উৎসাহ। আর একটা জন্তু যে তারা শীকার করে, তেমন জন্তু আর পৃথিবীর কোথাও নাই। এই জন্তুকে তারা বলে 'ওকাপি'। এর কথা পরে বলব, আগে এই মানুষগুলোর কথা শেষ করে নি।

কাপড় পরবার দস্তুর এদের একেবারেই নাই। কাপড় পরা লোককে তাদের ভারী অসভ্য মনে হয়। প্রথমে যখন কয়েকজন সাহেব তাদের দেশে গিয়েছিলেন, তখন তাঁদের পরনে কাপড় চোপর দেখে তারা তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে লুকিয়ে রেখেছিল। তারপর শেষে তারা সাহেবদের বল্ল যে, "তোমরা যদি তোমাদের গায় জড়ান ঐগুলো ফেলে দিয়ে সভ্য ভব্য হও, তবে আমাদের ছেলেমেয়েদের ভয় ভাঙ্তে পারে।" ভয়ানক শীতের সময়ও তারা গায় কিছু জড়ায় না।

এরা প্রায়ই লতাজাল জড়ান গভীর অন্ধকার বনের ভিতরে বাস করে। সে সব বনে সাধারণ লোকের যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। এই জন্যই বোধ হয় এতদিন

এই লোকগুলোর কথা কেউ জানতে পারেনি। জানত খালি সে দেশের অন্যান্য অসভ্য লোকেরা। তারা তাদের খুবই ভয় করে চলে। কিন্তু এই বেঁটে লোকগুলির ভিতরে তেমন ভয়ের কিছু আছে বলে বোধ হয় না। এরা বেশ বুদ্ধিমান আর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। আত্মীয় বন্ধুদের এরা বড়ই ভালবাসে।

এরা যে তেমন হিংসুটে নয়, তা একটা ঘটনা থেকেই বুঝতে পারা যায়। একবার তাদের দেশে খবর গেল যে, কোত্থেকে সব শাদা শাদা লম্বা লম্বা কাপড়পরা মানুষ তাদের দেশের কাছে এসেছে। শুনেই ছেলে বুড়ো পুরুষ মেয়ে সকলে মিলে সেই শাদা লোকগুলোকে দেখতে চল্ল। কত দূর যেতে হবে, কত ক্ষণ লাগবে, পথে কি খাবে, সেদিকে তাদের খেয়ালই নাই। তারপর যখন ক্ষুধায় পেট জ্বলে যেতে লাগল, তখন বেচারাদের প্রাণ যায় যায়। সঙ্গে খাবার নেয় নি, পথেও কিছু পাওয়া যায় না। ঘরে ফিরতে ফিরতে তাদের ত্রিশ চল্লিশ জন ক্ষুধায় মরে গেল।

এখন সেই 'ওকাপি'র কথা বলি। ঐ বেঁটে মানুষদের দেশে, ঘোর বনের ভিতরে ওকাপি থাকে। অতি অল্প দিন যাবৎ এই জন্তু আবিষ্কার হয়েছে। আগে এর কথা কেউ জানত না। ঐ অঞ্চলে যে সাহেবেরা থাকতেন তাঁরা এর চামড়া দেখতে পেতেন, মাংসও দেশী সিপাইদের কাছে পেয়ে মাঝে মাঝে খেতেন, কিন্তু জানোয়ারটি যে আসলে কোন জাতের, তা তাঁরা জানতেন না। তাঁরা শুনতেন, সেটি এক রকম বুনো গাধা, অসভ্যেরা গর্ত্তে ফেলে তাদের ধরে। কেউ বলতেন, ওটা গাধা নয়, এক রকম হরিণ; আবার কেউ বলতেন, ও এক রকমের জিরাফ। আবার কেউ বলেছিলেন যে ওটা প্রাচীন কালের এক রকম জন্তু,—হেলাডোথেরিয়ম্। জন্তুটির নাম যে কি, তাও কেউ জানত না। যা হোক, এর মধ্যে কেউ কেউ আফ্রিকার বনে গিয়ে তার ফটো তুলে আনল। তারপর যখন ১৯০৫ সালে সেই দুটি বেঁটে মানুষ লণ্ডনে এসেছিল, তখন সেই ফটো তাদের দেখান হয়। তারা তা দেখে অমনি বলে উঠল,—'ওকাপি!'

এর মধ্যে ওকাপির মাথা আর চামড়া দেখে পণ্ডিতেরা স্থির করেছিলেন যে, এটা গাধাও নয়, হরিণও নয়, জিরাফও নয়, আর কোন জানা জন্তুও নয়। ও নিজেই এক আলাদা জন্তু,—ওকাপি। সেই কথাটিকে সংস্কৃত (থুড়ি, লাটিন্) ভাষার ছাঁচে ঢেলে পণ্ডিতেরা এখন তার নাম পুথিতে লেখেন, ওকাপিয়া (ocapia)! তারপর সে জন্তু ঢের দেখা গিয়েছে, বিলাতে নিয়ে আসাও হয়েছে, তার ছবিও আঁকা হয়েছে। আমরা

সেই ছবির নমুনা দিলাম, তোমরা বেশ করে দেখে নাও। এর পর যদি কেউ আফ্রিকার সেই বনে যাও, আর এর সঙ্গে দেখা হয়, তবে মনে রাখবে, এর নাম ওকাপি। এর মধ্যে আমাদের চিড়িয়াখানায় যদি ওকাপি আসে, তবে ত আর কথাই নাই।

রাজার মেয়ে।

এক যে ছিল রাজার মেয়ে আঁকব তারে ছবির মত
ধার-না-করা উপমাতে খাঁটি নূতন কবির মত।
ছিল দীর্ঘ চুলের গোছা সত্যযুগের দাড়ির মত
সেই চুলটির বর্ণ ছিল ধানসিদ্ধের হাঁড়ির মত।
দেখতে হ'ত উঁচু খোঁপা অন্তরীপের শুঁড়ার মত,
কাণের গড়ন ছিল তাহার "প" অক্ষরের মুড়ার মত।
গাল ছিল তার টেবা টেবা বিলাতি বেগুনের মত
নলের মত নাসা ছিল পালিশে সেগুণের মত।
অধরোষ্ঠের ধাঁচা ছিল কাঁটালমুচির দলের মত,
কিন্তু ছিল রাঙ্গা সেটি পাকা মাকাল ফলের মত।
চোখের গোলা ছিল তাহার খোসা ফেলা লিচির মত
তারা দুটির বর্ণ ছিল সেই লিচিটির বিচির মত।
চাল কুমড়ার বিচিগুলি যেন তাহার দাঁতের মত;
কলার মাজের মতন গলা, বর্ণে পাকা পাতের মত।
ছিল হাতের আঙ্গুলগুলি মোচার খোলার কলার মত;
পরলে জুতা দেখ্‌তে হ'ত পায়েতে "র"ফলার মত।
শরীর ছিল সোজা খাড়া আমার লেখা ভাষার মত
চক্‌চকানি ছিল রূপের ছাইয়ে মাজা কাঁসার মত।
আওয়াজ ছিল অনুনাসিক যেন চীনে লোকের মত;
আব্দারটা ছিল ঘরে আস্ত চীনে জোঁকের মত।
বুদ্ধি নহে তীক্ষ্ণ—চিলের নখের অগ্রদেশের মত,
হ'ত বিদ্যা পড়ত যদি পত্রিকা সন্দেশের মত।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

রূপী আর ডুব্‌লী।

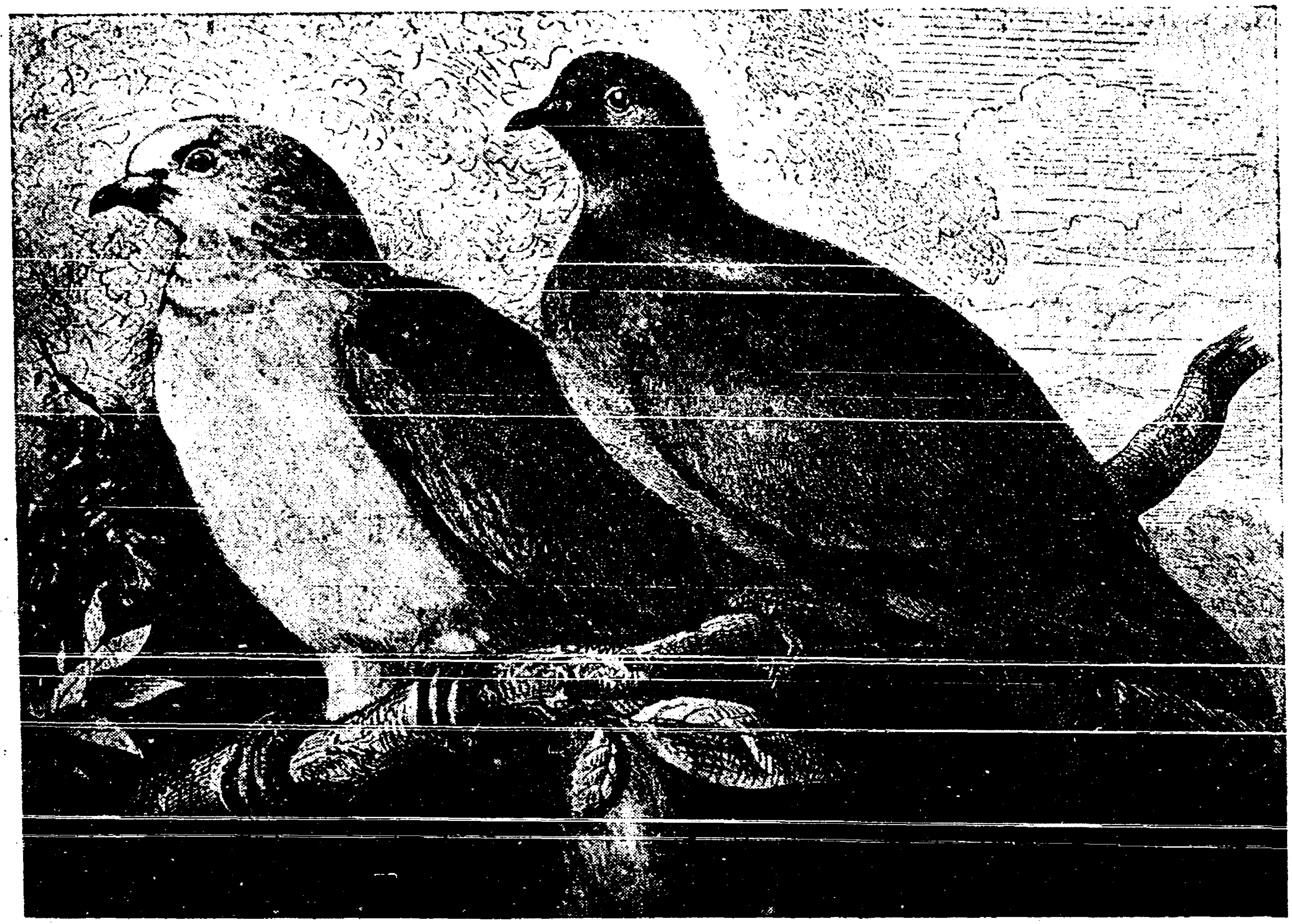

একটি দেখতে ভারী সুন্দর, তার নাম হচ্ছে রূপী। আর একটি রোগাপানা, তার নাম ডুব্‌লী। তারা দুজন যখন আমাদের বাড়ী এসেছিল, তখন তারা উঠে দাঁড়াতে পারত না, খালি হাঁটু গেড়ে বসে থাকত। ডাকতে শেখেনি, খালি চীঁ চীঁ করত। মাথা নেড়া ছিল, তখনো তাতে পালক ওঠেনি। কেউ কাছে গেলে ভারী জড় সড় হয়ে কেবল বলত চীঁ চীঁ, চীঁ চীঁ, চীঁ চীঁ। তারা ছিল আমাদের খুকীর পায়রা, সে তাদের চার আনা দিয়ে কিনেছিল, আর নিজ হাতে খাইয়ে দিত।

তাদের চীঁ চীঁ করতে শুনে খুকী খালি ভাবত, কবে তারা বড় হবে, আর 'বাকুম্' বলবে। কিন্তু, যখন তারা বড় হল, তখন আর তারা 'বাকুম্' বলে না। রূপী খালি বলে 'বটকিট্ঠাকুর্‌র্' 'বটকিট্ঠাকুর্‌র্'! খুকী কিন্তু তাই শুনেই আহ্লাদে আটখানা হয়; সে বলে ঐ তার পায়রার 'বাক্ বাকুম'। তা, খুকী ঠিকই বলেছে। আমি ত কোন পায়রাকে 'বাক্ বাকুম্' বলতে শুনিনি। লোকে যাই বলুক, একটু কান্ পেতে শুনলেই বুঝতে পারবে যে অধিকাংশ পায়রাই 'বটকিট্ঠাকুর্‌র্' বা 'বুড়ো ঠাকরুণ'

বা 'বর্‌বটি কাঁকুর্‌র্‌' এমনি গোছের একটা কিছু বলে। ডুব্‌লী কিন্তু 'বটকিট্টু ঠাকুর্‌র্‌' বলতেও শিখল না। সে বেচারী যত দিন আমাদের এখানে ছিল, তত দিন খালি চীঁ চীঁই বলেছিল। বোধ হয় সে পাইরী ছিল। তারা বটকিট্টু ঠাকুর্‌র্‌ বলতে পারে না।

ক্রমে রূপী এমন সুন্দর হয়ে উঠল যে কি বলব। ধব ধবে শাদা, পিঠের খানিকটা ছেয়ে রঙ্গের, তাতে একটু কারিকুরীর মত আছে। দেখলে মনে হয় ঠিক যেন শাল জড়িয়েছে। দেহখানি তার এমনি ফুট ফুটে, আর তাতে এমন একটি শ্রী আছে যে, একবার দেখলে বার বার দেখতে ইচ্ছা করে। তার উপর যখন সে তোমাকে দেখে ঘাড় বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে, মাথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তোমার পানে বার বার তাকাবে, তখন আর তুমি হাত বাড়িয়ে তাকে 'আয় আয়' বলে না ডেকে থাকতেই পারবে না।

আগে তাদের ডাকলেই তারা আসত। দেয়ালে একটি ঝুড়ি ঝোলান ছিল, তার ভিতরে ছিল তাদের বাসা। এক মুঠো চাউল নিয়ে, সেই ঝুড়ির কাছে গিয়ে হাত বাড়ালেই তারা নেমে এসে হাতে বসে চাউল খুঁটে খেত। একদিন কলকাতার খুব প্রসিদ্ধ একটি কলেজের একজন অধ্যাপক আমাদের বাড়ী এসেছিলেন। পায়রা দুটিকে আমাদের হাতে বসে চাউল খেতে দেখে তাঁর ভারী ভাল লাগায়, তিনিও এক মুঠো চাউল নিয়ে গিয়ে তাদের সামনে হাত বাড়িয়ে দাঁড়ালেন। তিনি ভেবেছিলেন, পায়রারা চাউল খাবার জন্য এসে তাঁর হাতে বসবে, কিন্তু তারা তা না করে এসে বসল তাঁর মাথায়। তখন আর তিনি হাসবেন কি কাঁদ্‌বেন তা ঠিক পান না!

রূপীটা ভারী দুষ্টু। সুন্দর বলে যেন তার দেমাকের সীমাই নাই। ডুব্‌লী বেচারী তার কাছে এলেই সে তাকে ঠুক্‌রিয়ে তাড়িয়ে দেয়। মেঝেতে চাউল রাখলে, দুজনেই তা খেতে আসে, কিন্তু রূপী সে চাউল এমনি করে আগলে রাখে যে, ডুব্‌লী তার কিচ্ছুই খেতে পায় না। এত অপমান খেয়েও ডুব্‌লী কিন্তু রূপীকে খুবই ভালবাসে, একটিবারও তাকে তার কাছ ছাড়া হতে দেখা যায় না। রূপী হাওয়া খেতে বেরুলে ডুব্‌লীও তার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে যায়, তার পর দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়িয়ে দুজনে এক সঙ্গে ঘরে ফিরে আসে।

একদিন আর ডুব্‌লীকে রূপীর সঙ্গে ফিরতে দেখা গেল না। হায়, সে কোথায় গেল? না জানি তার কি হল! রূপীর কি তার জন্য দুঃখ হয়েছিল? সে কথা আমি জানি না, কিন্তু তার পর থেকে আর রূপী হাওয়া খেতে বেরয় নি। তখন থেকে সে কতগুলো মুরগীর দলে গিয়ে জুটল। মুরগীদের সঙ্গে চরতে বেরয়, তাদের সঙ্গে

সন্ধ্যাকালে গিয়ে তাদের ঘরে ঢোকে, সারারাত তাদের ঘরের তাকে ঠিক পাহারাওয়ালার মত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোয়। মাঝে মাঝে দু একটা মুরগীর পিঠের উপরেও উঠে বসে থাকে।

এখন থেকে বোধ হয় সে ভাবল যে সে মুরগীদেরই একজন হয়ে গেছে। তার নিজের যে একটি ঘর আছে, সে কথাত সে ভুলেই গেল, মুরগীদের সঙ্গে ছাড়া আর কোথাও খাবার দিলে সে তাও খেতে রাজী হয় না। মুরগীরা ভুট্টা খেত, রূপী খেত চাউল। এখন থেকে সেও ভুট্টা খেতে শিখে নিয়েছে। মুরগীদের ভুট্টা খেতে দিলেই সে গিয়ে তাদের সঙ্গে খেতে আরম্ভ করে, তারা ঠোকরাতে এলেও পালায় না।

এর মধ্যে একদিন আমাদের বাড়ীর একটি ছেলে হাট থেকে আর একটি ছোট্ট ডুব্‌লী কিনে এনেছে! রূপী প্রথমে তাকে ঠোকরাতে গিয়েছিল, কিন্তু তাকে ছেলে মানুষ দেখে বোধ হয় তার দয়া হল। তার পর থেকে সে তাকে একটু একটু করে হাঁটতে, উড়তে, ক্রমে হাওয়া খেতে বেরুতে শিখিয়েছে। এখন আর রূপী মুরগীদের সঙ্গে মাঠে চরতে যায় না। এখন তার সঙ্গী জুটেছে, আর তাকে সে খুব ভালবাসে। মুরগীদের ঘরে গিয়ে ঘুমোবার অভ্যাসটাও এখন সে ছেড়ে দিয়েছে, এখন তার নূতন সঙ্গীটির পাশে বসে নিজের বাসায়ই রাত কাটায়।

এর মধ্যে একদিন দুজনায় মিলে জলের হাঁড়িতে বসে জল খাবার সময় নূতন ডুবলী পা হড়কিয়ে হাঁড়ির ভিতরে পড়ে গিয়েছিল। রূপী তাকে যেমন করে ঠেলে তুলে দিয়েছিল, তা যদি দেখতে, তবে বুঝতে, কি মজা।

সিপাহীর লণ্ডন দেখা।

জগৎ সিং যুদ্ধে গিয়ে আঘাত পায়। তারপর সে সেরে উঠলে একদিন তাকে লণ্ডন সহর দেখান হয়। তাতে সে ভারি খুসী হয়ে এক সাহেবকে বলছে ;—

দুনিয়াতে যদি স্বর্গ থাকে, সে তবে লণ্ডন সহর। আমরা যেই ষ্টেশনে পঁহুছালাম, অমনি এক কর্ণেল সাহেব হাওয়া গাড়ী করে আমাদের নিয়ে গেলেন। ভর দিন

আমরা হাওয়া খেয়ে বেড়ালাম। আমরা যেখানে যাই, রাস্তার গাড়ী ঘোড়া সব থেমে যায়। কোথাও কেউ পয়সা চায় না, পাস্ দেখতে আসে না। এ বড় খাতির, সাহেব। হিন্দুস্থানে গরীবকে দেখে বড় আদমিরা গাড়ী থামিয়ে পথ ছেড়ে দেয় না।

এত গাড়ী আর কখনো দেখিনি। এক এক জায়গায় চার সার করে গাড়ী চলছে, হরদম। টক্কর খাচ্ছে না, লোককে জখম করছে না।

আমরা পার্লিমেণ্টের ঘর দেখেছি। একটা পোল দেখেছি, সে একটা বোতাম টিপলেই দুখান হয়ে যায়। এক কেল্লা দেখেছি, তাতে রাজার মুকুট আর পুরাণা লড়াইয়ের পোষাক বহুৎ আছে। আমরা খোদ বাদসার কুঠিতে গিয়েছি। ভিতরে যাইনি, বাইরে দাঁড়িয়ে দেখেছি।

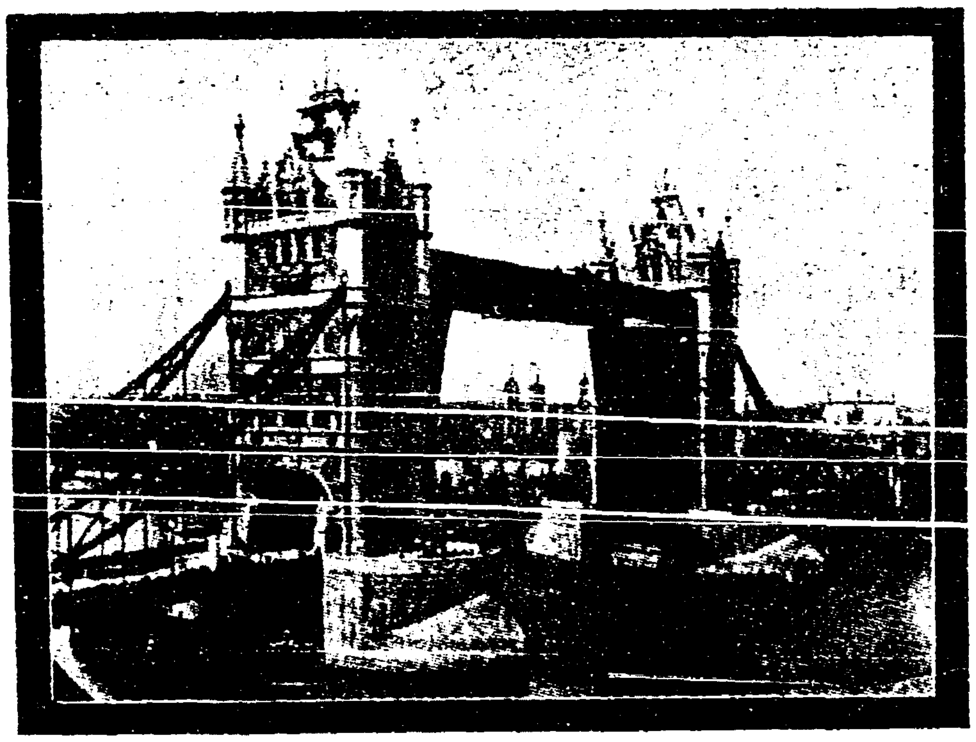

টাওয়ার ব্রিজ্।

বাদসার বাড়ীর কাছে ভারী এক দোকান আছে। সে একলাই এক সহর, কত গলি গলি তার দরোয়াজা। তার আধাতে বহুৎ বহুৎ মেম সাহেব কাপড় কিনছেন। যে কিছু চীজ মানুষ চাইতে পারে, সব দেধার আছে,—সে হাওয়াগাড়ীই হয়, বা ইঞ্জিনই হয় বা সূতার গুলিই হয়।

এক ঘরে বসে সাহেবলোক খবরের কাগজ পড়ছেন, কেউ চিঠি লিখছেন, পয়সা দিতে হচ্ছে না। কাগজ, খাম, কোন চীজের দাম নাই, যে আসছে সেই নিচ্ছে। আমাকে বসে লিখতে দিল। আমার ভাইয়া গঙ্গা সিংকে এক চিঠি, সে লড়াই করছে; আমার বাপ স্বরূপ সিংহকে এক চিঠি, তাঁর সাকিন মোগরাওঁ গাঁও, জিলে জলন্ধর। দোকানওয়ালা আমাকে কার্ড্ এনে দিল, তার এক পিঠে সেই দোকানের তস্‌বীর। কর্ণেল সাহেব আংরেজীতে ঠিকানা লিখে দিলেন। চিঠি ডাকে চলে গেল, পয়সা লাগল না।

আমরা ওয়েষ্ট্‌মিন্‌ষ্টার গীর্জায় বড় বড় জিন্‌রালদের গোর দেখলাম। পরে হোটেলখানায় গিয়ে খানা পিনা করলাম। সেখানে আমাদের দেশের ডাল তরকারী ব্রাহ্মণরা রাঁধে।

খানাপিনা করে চিড়িয়া খানায় গেলাম। এক কাছুয়া দেখলাম তার আটশ বছর উমের।

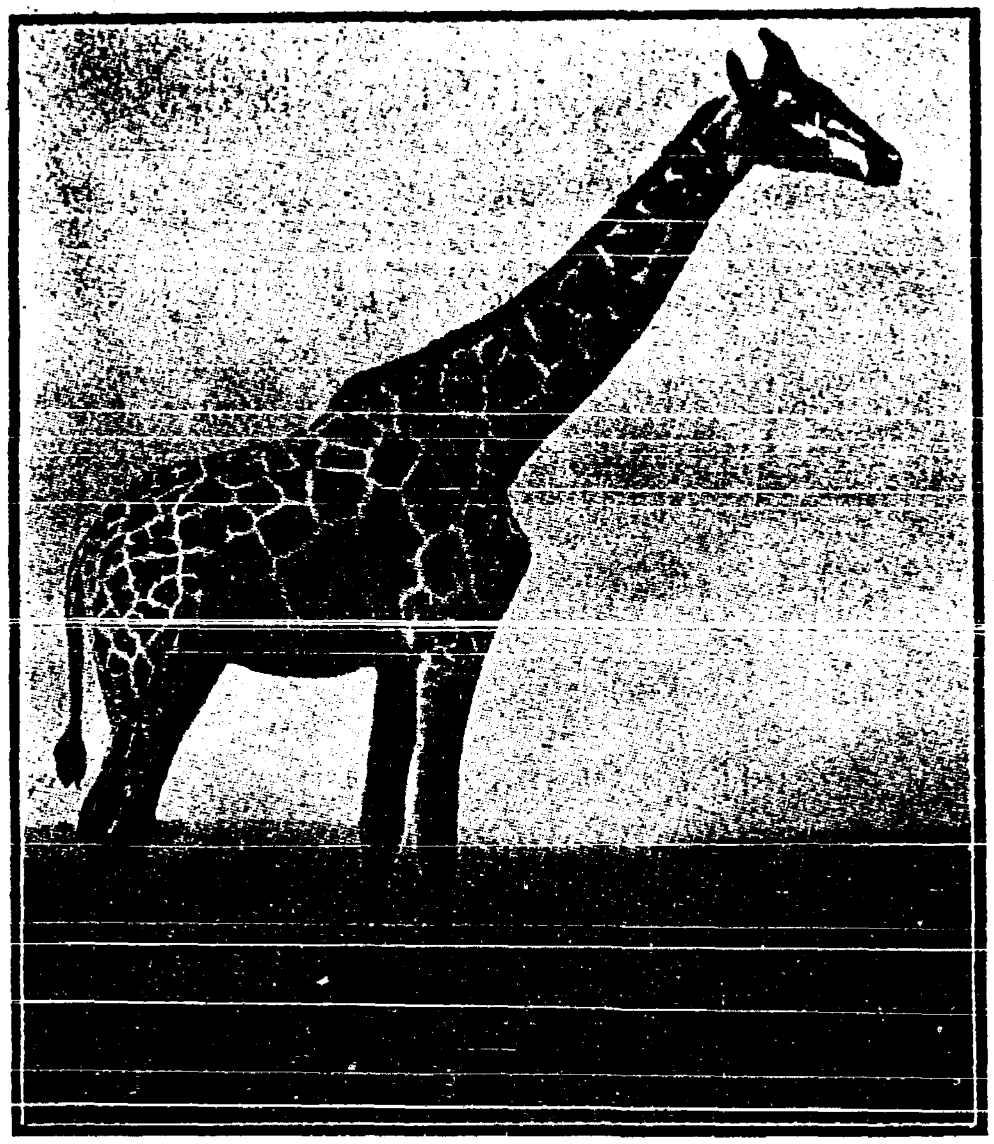

এক সাঁপ আছে, সে এত্তা বড় বকরী খেয়ে মাহিনা ভর নিন্দ যায়। আর এক হরিণ আছে তার দু গজ লম্বা গলা সে গাছের ডাল থেকে পাতা খায়। সিংহ বাঘ উট বহুৎ দেখলাম, আর একটা চূয়া, সে গাছের ছাল খেয়ে থাকে।

সব চেয়ে তাজ্জব তামাসা এই হয়েছিল,—এক জায়গায় হাওয়া গাড়ী থেকে নেমে একটা ছোট্ট কামরায় গেলাম, তাতে অনেক তস্‌বীর। আমি কি একটা ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ দেখি সে ঘর জমিতে বসে গেল।

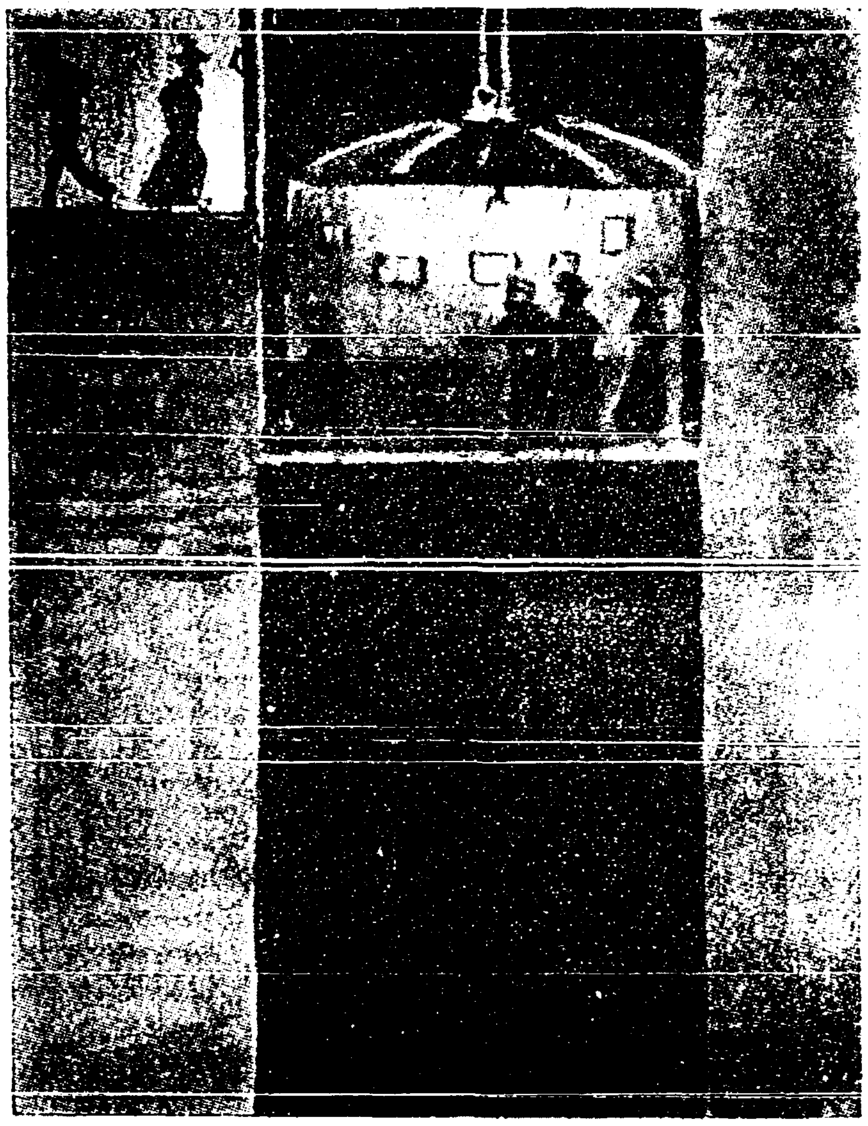

আমরা তাজ্জব হয়ে গেলাম,—দেখলাম, আমরা জমিনের নীচে নামছি। ঘর বস্‌বার সময়, আমার ভারী ডর লাগল। স্বপন ছাড়া এমন হয়, আমি তা বুঝতে পারলাম না।

আমরা যখন মাটির নীচে নেমেছি, তখন একটা ট্রেন

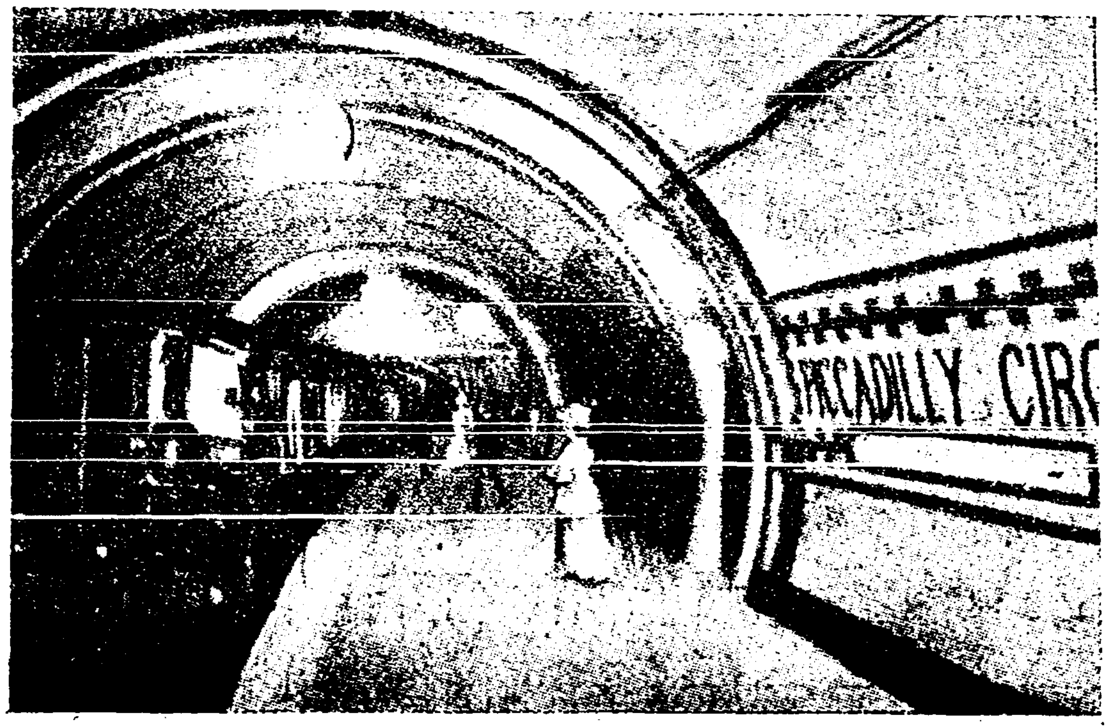

আমাদের বরাবর এল, তার ইঞ্জিন না। সেটা কি করে চল্ল সাহেব? আমরা ট্রেন চড়ে বহুৎ দূর গেলাম। তখন তা থেকে নেমে সিঁড়ি বেয়ে উপরে এসে দেখি, আমাদের হাওয়া গাড়ীর সামনে পহুছে গেছি।

সন্তু সিং তাজ্জব হয়ে বল্ল কি, যে লণ্ডনের ঘর বাড়ীতে সাহেব লোকের সিঁড়ি ভেঙ্গে উপর নীচ করতে হয় না। কর্ণেল সাহেব বল্লেন, এমন সিঁড়ি আছে, সে হরদম চলেছে, তাতে উঠে দাঁড়ালেই উঁচুতে তুলে দেয়। লণ্ডনে না হতে পারে এমন কাজই নাই। সে সহরের যে সে লোক এমন ফিকির জানে যে আমার মুলুকে খালি যাদু-ওয়ালারা তা পারে!

হাওয়া গাড়ী ছেড়ে বড় ষ্টেশনে ফিরবার সময় আমরা সেই রকম সিঁড়ি দিয়ে উঠেছিলাম, যার কথা কর্ণেল সাহেব বলেছিলেন যে সে হরদম চলতে থাকে। সাহেব যা বলেছিলেন, আমরা ঠিক তাই দেখলাম। এসব ঘরের মত চলতি সিঁড়িতে খাড়া থাকতে হয়, কেউ বসতে পায় না। আমীরও পায় না, গরীবও পায় না। অনেক তস্‌বীর আছে, কিন্তু দাঁড়িয়ে দেখতে দেয় না। অংরেজ সাহেবেরা আপন মুলুকে বহুৎ খাটে। এ সহরে কারু ফুরসৎ মিলে না। একথা কি ঠিক, সাহেব, যে লণ্ডনে কুঁড়ে লোক নাই?

বড় ষ্টেসনে এসে আমরা একটা ঘরে গেলাম, তাতে সাহেব আর মেম লোক চা খাচ্ছেন। আমাদের দুটো টেবিল দেখিয়ে দিল, চা খেলাম। কর্ণেল সাহেব আমাদের চা খেলেন। আঁধার হলে ভারী ঝট্‌পট্‌ হাঁসপাতালে ফিরে এলাম। সাহেব, এখন ত লণ্ডন দেখে নিয়েছি। যা দেখেছি, তার চেয়ে বেশী আর কোথাও থাকতে পারে না। আর কোন মুলুক আমি দেখতে চাই না।

আগুন আনবার কথা।

(গ্রীক্ পুরাণের গল্প।)

পৃথিবীর বাল্যকালে তাতে জীব জন্তু অনেক ছিল, কিন্তু তাদের রাজা কেউ ছিল না। তখন তাদের শাসন করবার জন্য প্রোমেথিয়ুস্ আর এপিমেথিয়ুস্ নামে দুটি দেবতা—দুটি ভাই—মিলে মানুষের সৃষ্টি করলেন। দেখতে দেবতাদের মতন করেই তাকে গড়া হয়েছিল, আর তাকে দেখেই প্রোমেথিয়ুসের তার উপরে যারপরনাই স্নেহ জন্মে ছিল। তখন তিনি ভাবলেন যে, একে এমন কিছু দিতে হবে, যা আর কোন জীবের নাই,—যার জন্যে সে সকলের সেরা হয়ে থাকতে পারে।

জগতে এমন কি আছে, যা পেলে মানুষ আর সকল জীবের চেয়ে বড় হতে পারে ? প্রোমেথিয়ুস্ অনেক ভেবে ঠিক করলেন যে, এমন জিনিস একটি বই আর নাই, সে হচ্ছে আগুন। সকল পর্ব্বতের রাজা ওলিম্পস্ পর্ব্বত, তাহার চূড়ায় দেবতাদের বাড়ী। সেইখানে, সেই দেবতাদের কাছে আগুন থাকে ; পৃথিবীতে কেউ তার কথা জানে না। মানুষকে সেই বস্তু এনে দিতে পারলে সে সহজেই তা দিয়ে সকলকে জয় করতে পারবে বটে, কিন্তু তাকে আনা বড়ই কঠিন কাজ। দেবতারা কিছুতেই সে জিনিস কাউকে দিবেন না। কেউ না বলে তা আনতে গেলে তাঁরা তাকে ভয়ানক সাজা দিবেন। তথাপি প্রোমেথিয়ুস্ ভাবলেন, এ জিনিস মানুষের জন্য আনতেই হবে, তার দরুণ কপালে যাই থাকে।

তারপর একদিন অমাবস্যার রাত্রিতে, গভীর অন্ধকারের মধ্যে তিনি চুপি চুপি সেই ওলিম্পস্ পর্ব্বতের উপরে দেবপুরীতে গিয়ে, সেই আগুন থেকে একখানি জ্বলন্ত কাঠ বুকের আড়ালে করে নিয়ে এলেন।

এ কি চুরী হল ? যদি হয়ে থাকে, প্রোমেথিয়ুস্ নিশ্চয় সেকথা জানতেন। কিন্তু তখন তাঁর তা ভাববার অবসর ছিল না। মানুষকে তিনি এত ভালবাসতেন যে, তার জন্য তিনি সবই করতে পারতেন। তিনি সে আগুন না এনে দিলে মানুষের আজ কি দশা হত ? তাই মানুষেরাও তাঁকে সকল দেবতার চেয়ে বেশী ভক্তি করত।

কিন্তু আগুন ত লুকিয়ে রাখা যায় না। ওলিম্পস্ পর্ব্বতের উপর থেকে দেবরাজ জুপিটার তার আলো দেখতে পেয়ে বল্লেন, 'পৃথিবীতে ওটা কিসের ঝিকিমিকি ?' ঝিকিমিকি যে কিসের, সেকথা জানতে তাঁর বেশী দেরী হল না। তিনি একথাও অতি সহজেই বুঝতে পারলেন যে প্রোমেথিয়ুস্ সেই আগুন নিয়ে গেছেন। তখন তাঁর কি ভীষণ রাগই হল। দেবতারা অবধি সে রাগ দেখে কাঁপতে লাগলেন। প্রোমেথিয়ুস্‌কে তখনই ধরে এনে তিনি ককেসস্ পর্ব্বতের উপরে একটা প্রকাণ্ড পাথরের সঙ্গে শিকল দিয়ে বেঁধে ফেল্লেন। তারপর ভয়ঙ্কর একটা শকুনকে ডেকে হুকুম দিলেন যে, 'তুই রোজ গিয়ে তোর ঠোঁট দিয়ে ওর যকৃৎ ক্রমাগত ছিঁড়ে খাবি।' আহা ! এমন দয়ালু দেবতার কি না এই সাজা ! সেই নিষ্ঠুর পাখী দিনের পর দিন তাঁর যকৃতে ধারাল ঠোঁট বিঁধিয়ে তাঁকে কি দারুণ যাতনাই দিত। দিনের বেলায় পাখীতে খেয়ে যকৃতের যতটুকু কমাত, রাত্রে আবার সেইটুকু বেড়ে থাকত। কাজেই প্রোমেথিয়ুসের যাতনার আর শেষ ছিল না।

যুগের পর যুগ এমনি ভাবে চলে গেল। যাঁর দান পেয়ে মানুষের এত সুখ হয়েছিল, তাঁর এমন কষ্ট দেখে তারা কেবল চোখের জলই ফেলেছিল, কিন্তু সে কষ্ট দূর করবার ক্ষমতা কারু হয়নি। তারপর একদিন জুপিটারের পুত্র মহাবীর হার্কিউলিস্ এসে প্রোমেথিয়ুস্‌কে খুঁজে বার করে, তাঁর শিকল ভেঙ্গে দিলেন, পাখীটাকেও মেরে ফেল্লেন। তখন প্রোমেথিয়ুসের যাতনার শেষ হল।

কিন্তু দেবতাদের রাগ তখনো মিটল না। প্রোমেথিয়ুস্‌কে তাঁরা আর কোন সাজা দিলেন না বটে, কিন্তু তাঁরা যেই দেখলেন যে মানুষেরা বড়ই সুখে শান্তিতে বাস করছে অমনি তাঁরা বল্লেন, 'দেখ আমাদের কাছ থেকে আগুন নিয়ে এদের কি বাড়াবাড়ি হয়েছে! দাঁড়াও, এ বড়াই ভাঙ্‌তে হবে।'

তখন তাঁরা সকলে মিলে যুক্তি করে প্যাণ্ডোরা নামে একটি পরমা সুন্দরী কন্যা সৃষ্টি করলেন। তাঁদের দূত মার্কারীকে দিয়ে সেই কন্যাটিকে প্রোমেথিয়ুস্ আর এপিমেথিয়ুসের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল। প্রোমেথিয়ুস্ তাকে দেখেই এপিমেথিয়ুস্‌কে বল্লেন, 'ভাই, সাবধান। দেবতারা যে আমাদের ভালর জন্যে একে পাঠিয়েছেন, তাত বোধ হয় না; একে রেখে আমাদের কাজ নেই।' কিন্তু এপিমেথিয়ুস্ সাদা সিদে লোক ছিলেন, তিনি প্যাণ্ডোরাকে দেখেই ভুলে গেলেন। কাজেই সে তাঁর কাছে রইল।

তার পর দিন বেশ ভালয় ভালয়ই যায়। এর মধ্যে একদিন সন্ধ্যার সময় আবার সেই দেবদূত মার্কারী এসে উপস্থিত। তাঁর মাথায় একটা প্রকাণ্ড বাক্স, তাই নিয়ে যেন কতই কষ্টে, ধূলায় ধূসর হয়ে, খোঁড়াতে খোঁড়াতে আর হাঁপাতে হাঁপাতে তিনি এসেছেন, আর যেন তাঁর পা চলে না। এসেই তিনি বল্লেন, 'এটা নিয়ে ত আর চলতে পারছি না। আপনাদের বাড়ীতে কি আজ এটা রেখে যেতে পারি? আর একদিন এসে নিয়ে যাব।'

এমন কথায় কে 'না' বলে? কাজেই মার্কারী সেই বাক্সটা প্যাণ্ডোরাদের ঘরে রেখে চলে গেলেন। সেই অবধি প্যাণ্ডোরার মনে আর শান্তি নাই; সে খালি বলে, 'এটার ভিতরে কি আছে, দেখতে হবে।' এপিমেথিয়ুস্ তাতে বল্লেন, "ছি! ওটা পরের জিনিস, ওটার ভিতরে কি আছে, কেমন করে দেখবে?" এ কথায় প্যাণ্ডোরার বড্ড রাগ হল। সে এপিমেথিয়ুসের সঙ্গে কথা কয় না, তার মুখ ভার। অন্য দিন সে এপিমেথিয়ুসের সঙ্গে বেড়াতে যায়, আজ আর গেল না; এপিমেথিয়ুস্ তাকে ঘরে

রেখে একলাই বেরিয়ে গেলেন। প্যাণ্ডোরাও তাই চায়। এপিমেথিয়ুস্ চলে যেতেই সে যারপরনাই খুসী হয়ে সেই বাক্সটির কাছে গিয়ে বসল।

কি সুন্দর বাক্সটি। কালো কাঠের তৈরী, তার উপর কি চমৎকার কারিকুরি। ডালার উপরে একখানি মুখ খোদা, সে যেন কথা কইতে চায়। একগাছি সোনালী দড়ি দিয়ে বাক্সটি জড়ান, সেই দড়িতে একটা ভারী শক্ত গোছের গেরো দেওয়া। গেরোটি দেখেই প্যাণ্ডোরা ভাবল, ওটাকে খুলতে হবে। শুধু গেরো খোলায় দোষ কি? বাক্সের ডালা না তুললেই ত হল।

সে গেরো খুলতে গিয়ে প্রথমে প্যাণ্ডোরাকে খুবই বেগ পেতে হয়েছিল। তারপর খুঁটে খুঁটে হয়রান হয়ে যখন সে খুলবার আশা ছেড়ে দিয়েছে, এমন সময় সেটা হঠাৎ আপনিই খুলে গেল। তখন প্যাণ্ডোরার মনে হল যেন বাক্সের ভিতর থেকে কা'রা ফিস্ ফিস্ করে কি সব বলছে। সে আশ্চর্য্য হয়ে ভাবল, "একবার বাক্সের ডালায় কান দিয়ে শুনিই না!" ডালায় কান দিয়ে আর প্যাণ্ডোরা স্থির থাকতে পারল না। এমন মিনতি আর কখনো কেউ তাকে করে নি,—"প্যাণ্ডোরা! প্যাণ্ডোরা! লক্ষ্মীটি! তোমার পায় পড়ি। একটু খুলে দাও, আমরা বাইরে এসে বাঁচি।"

হায়, এ কার মিনতি? এখন কি করা যায়? ডালা খুলবে কি? প্যাণ্ডোরা এমনি-তর ভাবনায় পড়েছে, এমন সময় বাইরে এপিমেথিয়ুসের পায়ের শব্দ শোনা গেল। তিনি এসে দেখলে না জানি কি বলবেন। প্যাণ্ডোরা বিষম থতমত খেয়ে তাড়াতাড়ি বাক্সটি রেখে দিবার আগে একটিবার তার ভিতর উঁকি মেরে দেখতে গেল। অমনি—মা গো! —সেই বাক্সের ভিতর থেকে কি কুৎসিত, কি বিকট, কালো কালো কি সব ফড়িঙ্গের মত ফড়্ ফড়্ করে উড়ে বেরুতে লাগল। প্যাণ্ডারো তাড়াতাড়ি বাক্সের তালা বন্ধ করে দিল, কিন্তু তাতে কি হবে? তার আগেই সেগুলো বেরিয়ে ঘর ছেয়ে ফেলেছে। উঃ! সেগুলোর কামড় কি ভয়ানক! তার কি বিষম যাতনা! এপিমেথিয়ুস্ আর প্যাণ্ডোরাকে তারা পাগল করে তুল্‌ল।

জুপিটার সেই বাক্সের ভিতরে করে রোগ, শোক, হিংসা, রোষ, পাপ, তাপ, এই সব পাঠিয়ে দিয়েছিলেন; তাদের কামড়ে দেবতাকেও পাগল হতে হয়। যাতনা কাহাকে বলে, এপিমেথিমুস বা প্যাণ্ডোরা কেউ তা জানতেন না, এখন ভাল মতেই তার মর্ম্ম বুঝে নিলেন। জীবনের মধ্যে এই প্রথম তাঁদের চখে জল এল; এই প্রথম তাঁদের

ঝগড়া হল। এমন যে মিষ্টি লোক এপিমেথিয়ুস, তিনি দাঁত মুখ খিঁচিয়ে প্যাণ্ডোরাকে বকতে লাগলেন!

আরো কতক্ষণ তিনি তাকে বকতেন, তা জানি না, কিন্তু এর মধ্যে হঠাৎ তাঁর মনে হল যেন সেই বাক্সটার ভিতর থেকে অতি মিষ্ট স্বরে কে তাঁকে বলছে, "ওগো! আমাকে খুলে দাও! আমি তোমাদের যাতনা দূর করে দিব!" কি মিষ্ট কথা! এ কে?

এ হচ্ছে আশা। প্যাণ্ডোরা ভয়ে তাড়াতাড়ি বাক্সের ডালা বন্ধ করে দেওয়াতে সে বেচারা বেরুতে পারেনি। তার মিষ্টি কথাগুলো শুনে এপিমেথিয়ুস্ তখনই প্যাণ্ডোরাকে বাক্সের ডালা তুলতে বল্লেন। অমনি সে তাঁর সুন্দর শাদা পাখা দুটি মেলে তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। সে এসে এপিমেথিয়ুস্ আর প্যাণ্ডোরার বেদনায় হাত বুলিয়ে দিবা মাত্র তাঁরা বল্লেন, "আঃ! কি আরাম!" 'আর তাঁদের যাতনা নাই; আশার হাত লেগে সব দূর হয়ে গেছে।

তখনই আবার আশা সেখান থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। পাপ তাপ গুলো যে তার আগেই গিয়ে সকলকে কামড়াতে আরম্ভ করেছিল, তার জ্বালা ত দূর করা চাই।

সেই অবধি রোগ শোক পাপ তাপ এরা সকলে মিলে জীবের সুখে কাঁটা দিতে ব্যস্ত আছে। দেবতাদের এইটুকু খুবই দয়া বলতে হবে যে তাঁরা সেই জ্বালা দূর করবার জন্য বাক্সের ভিতরে আশাকে পূরে দিয়েছিলেন।

কাজির বিচার।

রামকানাই ভাল মানুষ—নেহাৎ গোবেচারা। কিন্তু ঝুটারাম লোকটি বেজায় ফন্দিবাজ। দুইজনে একই গ্রামে যাবে ব'লে পোঁটলা বেঁধে খাবার নিয়ে বেরিয়েছে—পথে দুজনের দেখা শোনা আলাপ সালাপ হ'ল। ঝুটারাম বল্লে, "ভাই, দুজনেই বোঝা ব'য়ে খামখা কষ্ট পাই কেন? এই নাও, আমার পুঁটুলিটাও তোমায় দি—এখন তুমি সব ব'য়ে নাও—ফিরবার সময় আমি বইব।" রামকানাই ভালমানুষের মত দুজনের বোঝা ঘাড়ে ক'রে চ'ল্ল।

গ্রামের কাছে এসে তাদের খুব ক্ষিদে পেয়েছে; রামকানাই বল্ল, "এখন খাওয়া যাক্—কি বল?" ঝুটারাম বল্ল, "বেশ ত, এক কাজ কর। খাবারের হাঁড়ি দুটোই

খুলে কাজ নেই—মিছামিছি দুটোই নষ্ট কর্‌বে কেন ? এখন তোমারটা থেকে খাওয়া যাক্—ফিরবার সময় আমার খাবারটা খাওয়া যাবে।" রামকানাই তাই কর্‌ল।

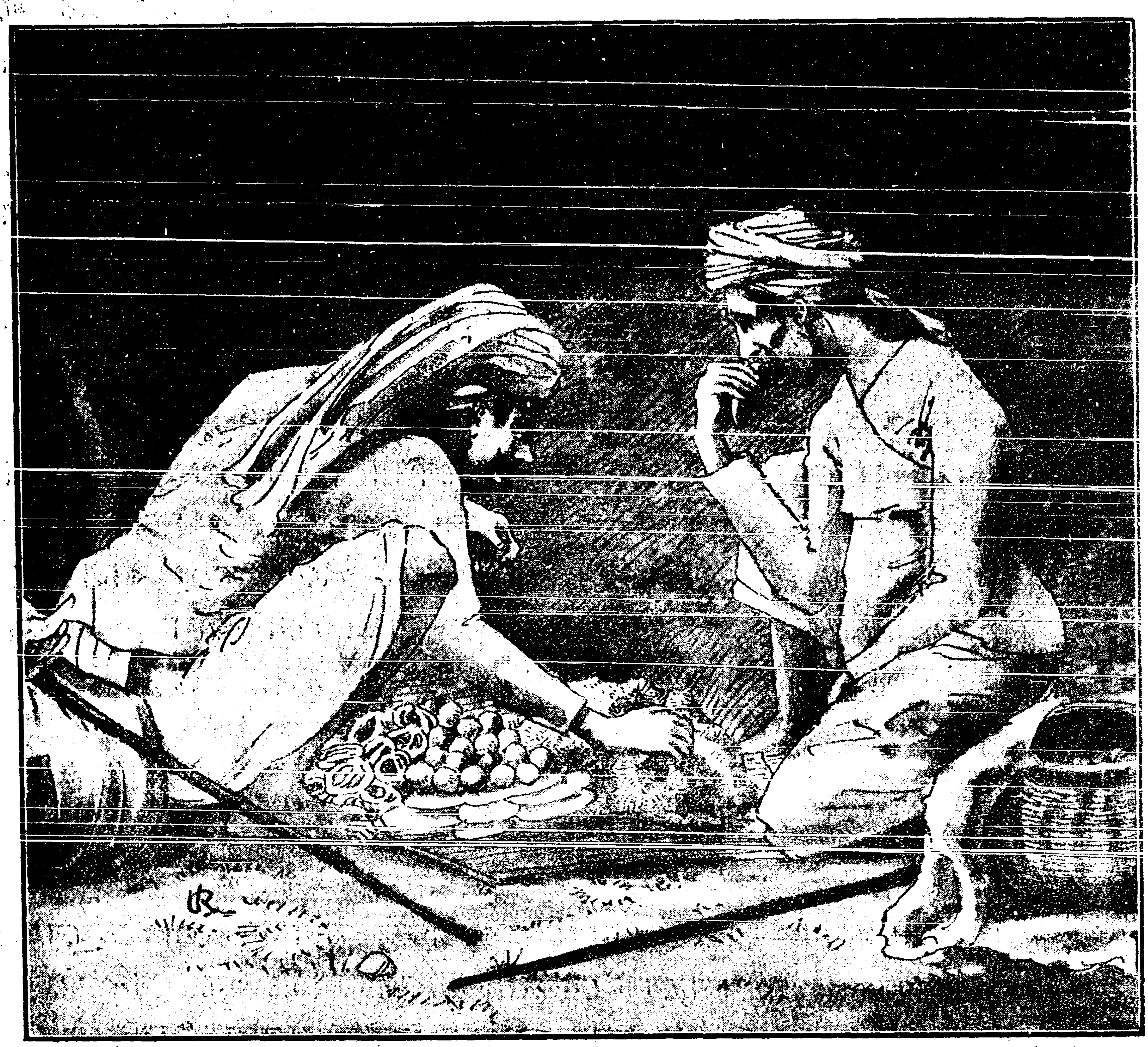

ঝুটারাম ব'ল্ল, "ভাই, তোমার বাড়ী কে কে আছে ?" রামকানাই তার বাবা, মা, ভাই, বোন, স্ত্রী, ছেলেপিলে সকলের কথা বল্‌তে লাগ্‌ল—তার মেয়ে কত বড় হ'য়েছে—তার ছেলে কি করে—সব কথা বল্ল। রামকানাই যত কথা বলে, ঝুটারাম ততই আরো প্রশ্ন করে, আর গপাগপ্ ভাত মুখে দেয়। রামকানাই গল্পেই মত্ত, তার যখন হুঁস্ হ'ল—ততক্ষণে খাবার প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে।

ঝুটারাম খাওয়া দাওয়া শেষ ক'রে গম্ভীরভাবে হাত মুখ ধুয়ে ব'ল্ল, "ভাই, একটি কথা! তুমি যে আমায় খাওয়ালে সে এমন বিশ্রী রান্না, যে কি বল্‌ব! তুমি এমন খারাপ লোক তা আমি জানতাম না, নেহাৎ তুমি বন্ধু মানুষ, তোমায় আর বেশী কি বল্‌ব; কিন্তু এর পর আর তোমার সঙ্গে আমার ভাব রাখা চলে না। আমি চল্লাম।" এই ব'লে সে ভরা-হাঁড়ি কাঁধে নিয়ে হন্ হন্ ক'রে চলে গেল। রামকানাই বেচারার পেটও ভরে নি—ঝুটারামের ভাগ থেকে যে খাবার আশা ছিল, তাও গেল। সন্ধ্যার সময় পেটে খিদে নিয়ে এতখানি পথ হেঁটে কি ক'রে সে বাড়ী ফির্‌বে—তাই ভেবে সে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল।

এমন সময় কাজির পেয়াদা সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। সে রামকানাইকে বল্ল, "কাঁদ কেন?" রামকানাই তাকে সব কথা বল্ল। পেয়াদা বল্ল, "এই কথা! চল দেখি, কাজি সাহেবের কাছে। তিনি এর বিচার কর্‌বেন"। কাজির কাছে হাজির হ'তেই হুজুর বল্লেন, "কি চাও?" রামকানাই তাঁকেও সব কথা শোনাল। কাজি শুনে বল্লেন, "হাঃ—হাঃ—হাঃ—হোঃ—হোঃ—হোঃ—এমন মজা ত কখনও শুনি নি! আরে, তোকে দিয়ে জিনিষ বইয়ে, আবার তোরই ভাত খেয়ে গেল? তোর আক্কেল ছিল কোথায়?—হাঃ হাঃ হা—বোলাও ঝুটারামকো!" পেয়াদা ছুট্‌ল, লোক লস্কর সবাই ছুট্‌ল—তিন মিনিটের মধ্যে ঝুটারামের ঝুঁটি ধ'রে কাজির সাম্নে দাঁড় করাল।

কাজি বল্লেন "আরে, দাঁড়াও, দাঁড়াও! গাঁয়ের মোড়লকে ডাক, শেঠজিকে ডাক, কোটাল বদ্যি গুরুমশাই ঢাক পিটিয়ে সবাইকে ডাক, এমন মজার কথাটা সবাই এসে শুনে যাক্"—দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঘর ভরিয়ে ভীড় জমিয়ে লোকের দল হাজির হ'ল। তখন কাজি বল্লেন, "বাবা ঝুটারাম, এবার তুমি বল দেখি, তোমাতে আর এঁতে কি হ'য়েছিল?" ঝুটারাম ভয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বল্লে, "দোহাই হুজুর, আমি কিচ্ছু জানি না। ওই হতভাগা আমায় ভুলিয়ে ভালিয়ে খানিকটা খাবার খাইয়ে ছিল—সেই থেকে আমার মাথা ঘুর্‌ছে আর কেমন কেমন কর্‌ছে।"

এই কথা শুনে রেগে চীৎকার ক'রে কাজি বল্লেন, "পাজি! আমার মজার গল্পটা মাটি কর্‌লি! খাবার খেলি আর মাথা ঘুর্‌ল একি একটা কথা হ'ল? পেয়াদা, দেখ্‌ত ওর কাছে কি আছে সব কেড়ে রাখ্। ব্যাটার গল্পের মধ্যে যদি একটুকু রস থাকে। ও সব ওই রামকানাইকে দিয়ে দে। ও যা বলেছে, সত্যি হোক্ মিথ্যে হোক্, তার মধ্যে মজা আছে। আরে—হাঃ হাঃ হাঃ—হোঃ হোঃ হোঃ।"

গল্পস্বল্প।

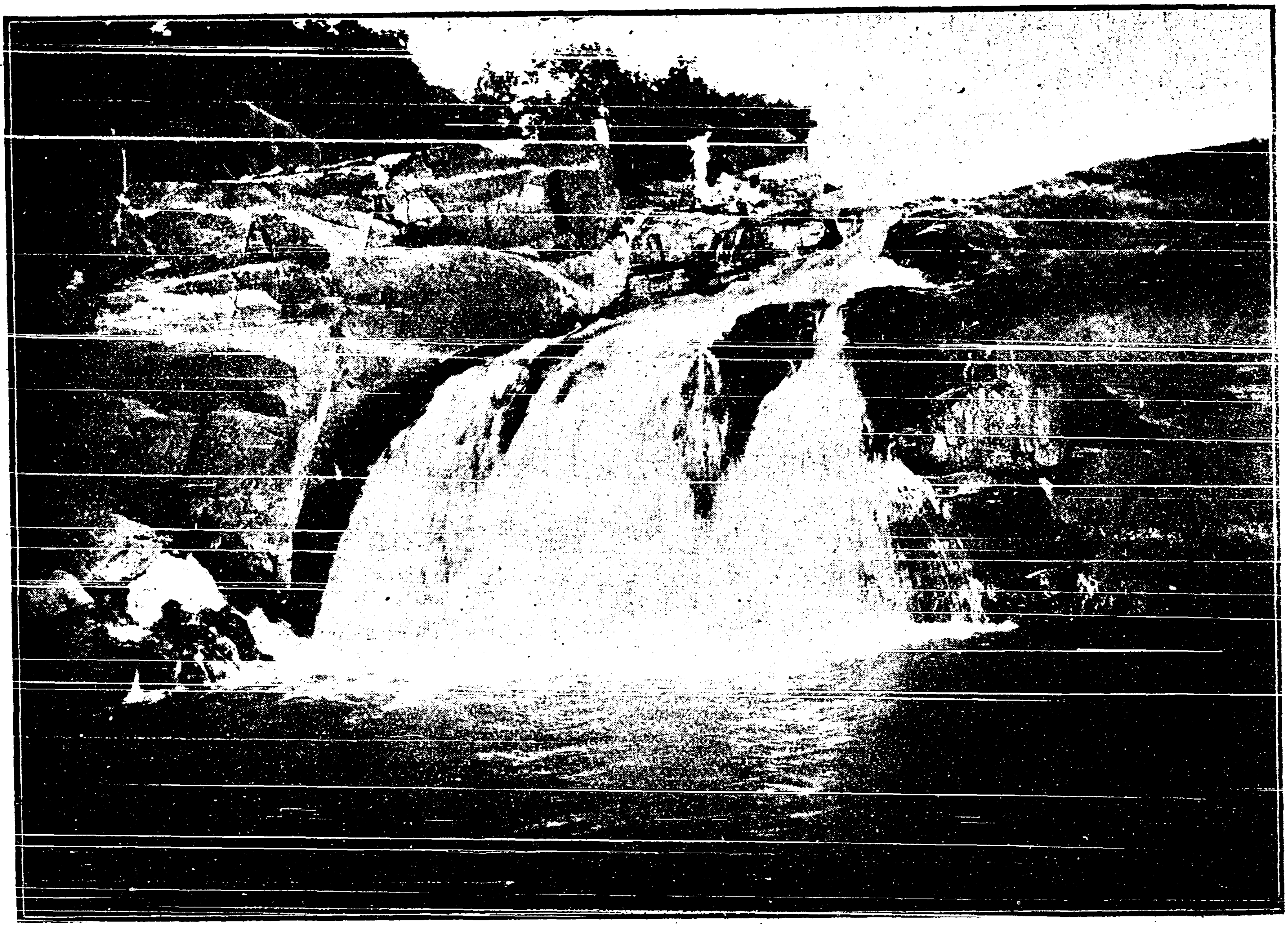

গিরিডি অঞ্চলে উশ্রী বলে একটি নদী আছে। নদীটি একটা বনের ভিতরে এসে পাথরের উপর দিয়ে ঝর ঝর শব্দে নীচে পড়ছে, সে জায়গাটি দেখিতে ভারী সুন্দর। সে দিন এক দল লোক সেই জায়গাটি দেখতে গিয়েছিলেন, তাঁদের সঙ্গে কয়েকটি ছোট ছোট ছেলে মেয়েও ছিল। এই ছোট ছোটদের আমি বল্লাম যে, "তোমরা কি দেখলে, কেমন লাগল, সে সব আমাকে একটু লিখে দাও ত।" সে কথায় তাদের কয়েক জন কিছু কিছু লিখে দিয়েছে।

এই লেখাগুলো দেখে আমি একটা কথা এই বুঝতে পেরেছি যে, কোন একটা জিনিসকে সকলে এক ভাবে দেখে না। তাদের সকলেরই যে খুব ভাল লেগেছিল, তাতে আর কোন ভুল নাই, কিন্তু সেই ভাল লাগার কারণ সকলের বেলায় এক নয়।

যা দেখবার জন্য এত পরিশ্রম করে এত দূর যাওযা হল, তার কথা অনেকেই বেশী লেখেনি ; কিন্তু পথে একটা নালা পার হতে গিয়ে যে অনেকের জুতা ভিজে গিয়েছিল, আর এক বাবুর ভিজেনি ; আর, বনের মধ্যে যে একটা গাছ আছে, ঠিক চেয়ারের মত ; আর, তারা যখন ওপারে যাচ্ছিল, তখন একজন বাবু বারণ করলেন, আর তাদের যাওয়া হল না ; আর, তাদের যে বড্ড ক্ষিদে পেয়েছিল, আর তারা খুব মজা করে খেয়েছিল—'দুইটা লুচির সঙ্গে দুইটা কাঁচা লঙ্কা' ; আর খুব ছুটে চলতে গিয়ে যে একটি মেয়ে নালার ধারে গড়িয়ে পড়ে গিয়েছিল, আর সকলে তা দেখে হেসেছিল—এ সব কথা খুব করে লিখেছে।

একটি মেয়ে ভারী শাদা সিদে, সে সরল ভাবে বলছে, "গাড়ীতে খুব গল্প আর দুষ্টুমি করছিলাম।" আরেক জায়গায় সে বলছে, "গাড়ীর কাছে গিয়ে খুব দৌড়াদৌড়ি করতে লাগলাম, কিন্তু '—' বাবুর এক ধমকের চোটে সব যে যার গাড়ীতে গিয়ে উঠে লক্ষ্মী মেয়ের মত বসলাম। খানিক দূর গিয়ে আগের গাড়ী থেকে খুব হাসির শব্দ শোনা গেল, তাই শুনে আমরা খুব হাসতে লাগলাম, কিন্তু কেন হাসছি তার কারণ জানি না।"

আর একটি মেয়ে বলছে, "আমি ও আর একটি মেয়ে কাঠ যোগাড় করে, উনুন ধরিয়ে, চা তৈরি করলাম। "এটি দেখছি বড্ড কাজের মেয়ে—আর সেই 'আর একটি'ও। তবে একটির সঙ্গে সেই 'আর একটি' পেরে উঠবে কিনা বলতে পারি না। এটি শুনেছি নাকি ভয়ানক কাজের ; সে কাজ করতে গেলে ময়দার থলে হাসতে থাকে,* তরকারীর ঝুড়ি নাচতে থাকে !

একটি ছেলে, সে সকলের ছোট, সে লিখেছে "তিনটে ঝরণা, তার মাঝেরটি দিয়ে খুব জোরে জল পড়ছিল, আর পাশের দুটা দিয়ে মাঝেরটার থেকে একটু একটু আস্তে পড়ছিল।" এই ছেলেটির দিদিও ছোট্ট মেয়ে, সে বলছে, "জায়গাটা আমাদের সকলেরই খুব ভাল লাগল। সেখানে অনেক গাছ পালা আছে, এবং খুব বড় বড় পাথর আছে। সেই পাথরগুলো বেয়ে বেয়ে ঝরণার মতন করে জল পড়ছে, সেগুলো দেখতে খুব সুন্দর।"

যে মেয়েটি হাসবার কারণ না জেনেও খুব হেসেছিল, সে বলছে,—"আর গাড়ী যেতে পারে না, সেই জন্য আমরা আবার নেমে হেঁটে যেতে লাগলাম। রাস্তাটা খুব

* লোকে বলে, হাসতে হাসতে নাকি পেট ফেটে যায়। সেই ময়দার থলিটার পেট যে ফেটেছিল, তাতে আর ভুল নাই। সুতরাং সে নিশ্চয় হেসেছিল, নইলে পেট ফাটবে কেন ?

গল্পস্বল্প।

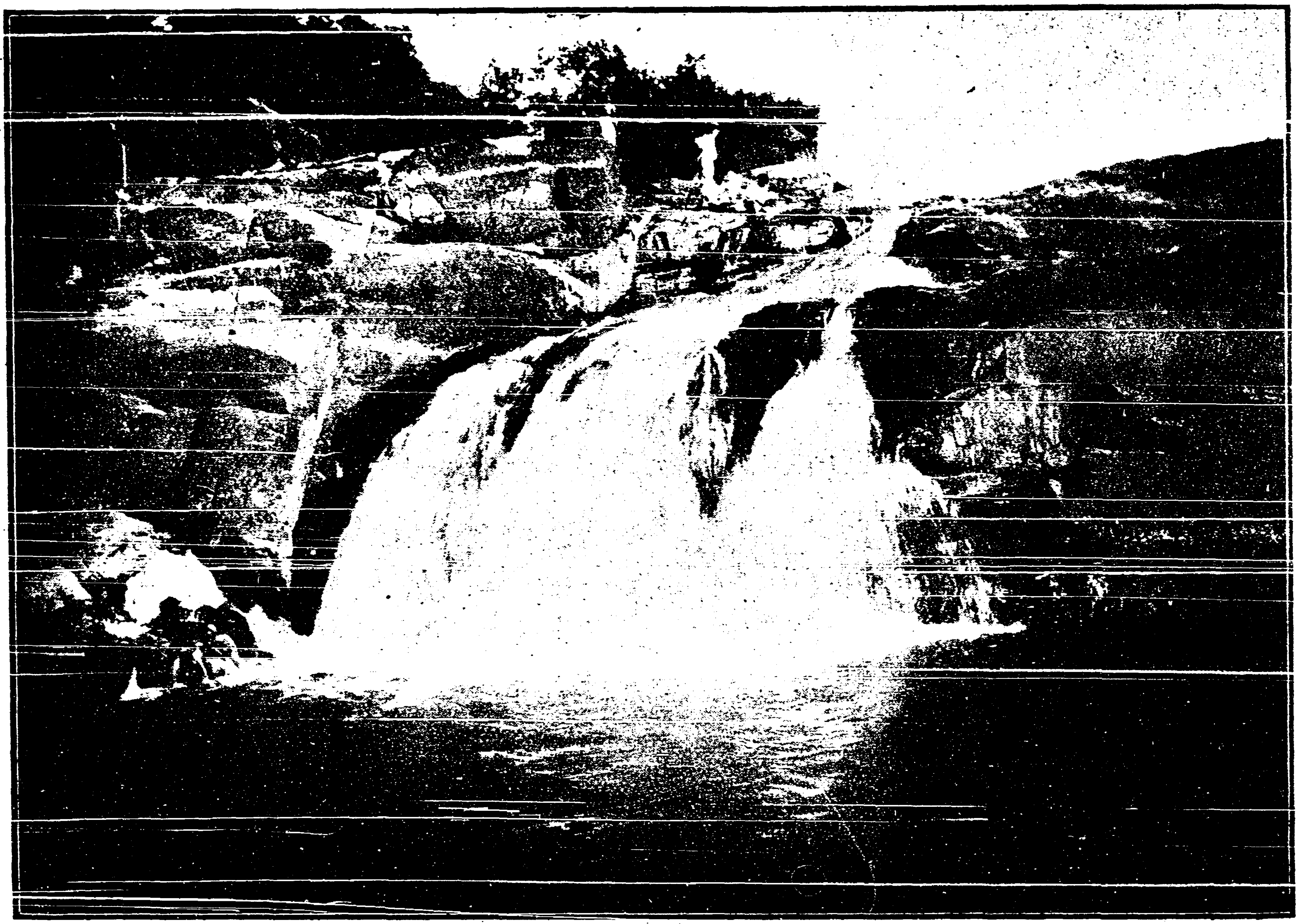

গিরিডি অঞ্চলে উশ্রী বলে একটি নদী আছে। নদীটি একটা বনের ভিতরে এসে পাথরের উপর দিয়ে ঝর ঝর শব্দে নীচে পড়ছে, সে জায়গাটি দেখিতে ভারী সুন্দর। সে দিন এক দল লোক সেই জায়গাটি দেখতে গিয়েছিলেন, তাঁদের সঙ্গে কয়েকটি ছোট ছোট ছেলে মেয়েও ছিল। এই ছোট ছোটদের আমি বল্লাম যে, "তোমরা কি দেখলে, কেমন লাগল, সে সব আমাকে একটু লিখে দাও ত।" সে কথায় তাদের কয়েক জন কিছু কিছু লিখে দিয়েছে।

এই লেখাগুলো দেখে আমি একটা কথা এই বুঝতে পেরেছি যে, কোন একটা জিনিসকে সকলে এক ভাবে দেখে না। তাদের সকলেরই যে খুব ভাল লেগেছিল, তাতে আর কোন ভুল নাই, কিন্তু সেই ভাল লাগার কারণ সকলের বেলায় এক নয়।

যা দেখবার জন্য এত পরিশ্রম করে এত দূর যাওযা হল, তার কথা অনেকেই বেশী লেখেনি ; কিন্তু পথে একটা নালা পার হতে গিয়ে যে অনেকের জুতা ভিজে গিয়েছিল, আর এক বাবুর ভিজেনি ; আর, বনের মধ্যে যে একটা গাছ আছে, ঠিক চেয়ারের মত ; আর, তারা যখন ওপারে যাচ্ছিল, তখন একজন বাবু বারণ করলেন, আর তাদের যাওয়া হল না ; আর, তাদের যে বড্ড ক্ষিদে পেয়েছিল, আর তারা খুব মজা করে খেয়েছিল— 'দুইটা লুচির সঙ্গে দুইটা কাঁচা লঙ্কা' ; আর খুব ছুটে চলতে গিয়ে যে একটি মেয়ে নালার ধারে গড়িয়ে পড়ে গিয়েছিল, আর সকলে তা দেখে হেসেছিল—এ সব কথা খুব করে লিখেছে।

একটি মেয়ে ভারী শাদা সিদে, সে সরল ভাবে বলছে, "গাড়ীতে খুব গল্প আর দুষ্টুমি করছিলাম।" আরেক জায়গায় সে বলছে, "গাড়ীর কাছে গিয়ে খুব দৌড়াদৌড়ি করতে লাগলাম, কিন্তু '—' বাবুর এক ধমকের চোটে সব যে যার গাড়ীতে গিয়ে উঠে লক্ষ্মী মেয়ের মত বসলাম। খানিক দূর গিয়ে আগের গাড়ী থেকে খুব হাসির শব্দ শোনা গেল, তাই শুনে আমরা খুব হাসতে লাগলাম, কিন্তু কেন হাসছি তার কারণ জানি না।"

আর একটি মেয়ে বলছে, "আমি ও আর একটি মেয়ে কাঠ যোগাড় করে, উনুন ধরিয়ে, চা তৈরি করলাম। "এটি দেখছি বড্ড কাজের মেয়ে—আর সেই 'আর একটি'ও। তবে একটির সঙ্গে সেই 'আর একটি' পেরে উঠবে কিনা বলতে পারি না। এটি শুনেছি নাকি ভয়ানক কাজের ; সে কাজ করতে গেলে ময়দার থলে হাসতে থাকে,* তরকারীর ঝুড়ি নাচতে থাকে !

একটি ছেলে, সে সকলের ছোট, সে লিখেছে "তিনটে ঝরণা, তার মাঝেরটি দিয়ে খুব জোরে জল পড়ছিল, আর পাশের দুটা দিয়ে মাঝেরটার থেকে একটু একটু আস্তে পড়ছিল।" এই ছেলেটির দিদিও ছোট্ট মেয়ে, সে বলছে, "জায়গাটা আমাদের সকলেরই খুব ভাল লাগল। সেখানে অনেক গাছ পালা আছে, এবং খুব বড় বড় পাথর আছে। সেই পাথরগুলো বেয়ে বেয়ে ঝরণার মতন করে জল পড়ছে, সেগুলো দেখতে খুব সুন্দর।"

যে মেয়েটি হাসবার কারণ না জেনেও খুব হেসেছিল, সে বলছে,—"আর গাড়ী যেতে পারে না, সেই জন্য আমরা আবার নেমে হেঁটে যেতে লাগলাম। রাস্তাটা খুব

---

* লোকে বলে, হাসতে হাসতে নাকি পেট ফেটে যায়। সেই ময়দার থলিটার পেট যে ফেটেছিল, তাতে আর ভুল নাই। সুতরাং সে নিশ্চয় হেসেছিল, নইলে পেট ফাটবে কেন ?

সরু, আর উঁচু নীচু, আর ঢালু, তার দুই পাশে খুব ঘন বন। মাঝে মাঝে নালা, তাতে পচা জল। কিছু দূর গিয়ে খুব আওয়াজ শুনতে পেলাম, সেটা হচ্ছে ঝরণা থেকে জল পড়ার শব্দ। তার খানিক দূর গিয়ে দেখলাম, খুব জোরে উপর থেকে নীচে শাদা শাদা তুলোর মতন সব জল পড়ছে। আমরা কয়েকজন একটা পাথরে বসে বসে ঝরণা দেখতে লাগলাম, কত উঁচু থেকে জল আসছে। পাশে পাশে ছোট ছোট ঝরণা।”

জায়গাটি যে খুব সুন্দর, এ সব বর্ণনা থেকে তা বেশ বুঝা যাচ্ছে। তবু ত এবারে এ অঞ্চলে বর্ষা না হওয়ায় জল খুবই কম। অন্যান্য বারে এ সময়ে এ স্থানটির অতি চমৎকার শোভা হয়।

ওখানকার বনটি যে খুবই ভয়ানক, তারও কিছু কিছু প্রমাণ এরা পেয়ে এসেছে। একজন বলছে,—“কিছু দূর গিয়ে একটা বাঘের পায়ের দাগ দেখলাম। দাগটা একেবারে টাট্‌কা, এক্ষুণি যেন জল খেয়ে গেল। “—” বাবু খুব চ্যাঁচাতে লাগলেন। তাঁর চ্যাঁচানি শুনে আমাদের আগের দলের লোকেরা চেঁচিয়ে তার উত্তর দিল।”

এমনি করে তাদের ঝরণা দেখা শেষ হয়ে গেল। তাদের সঙ্গে কয়েকটি সাঁওতাল মোট নিয়ে গিয়েছিল। সকলে খেয়ে যা অবশিষ্ট ছিল, তারা তা খেল। তারা ছক্কা খেয়ে খুব খুসী হয়েছিল।” পথে যে বাঘের পায়ের দাগ দেখা গিয়েছিল, তেমন দাগ সেখানে হামেসাই দেখা গিয়ে থাকে, বিশেষতঃ বনের ভিতরের দিকে গেলে। সে দিন কয়েকটি বাবু একটু বনের ভিতরে গিয়ে আরো দাগ দেখতে পেয়েছিলেন, আর বাঘের গন্ধও পেয়েছিলেন। বাবুরা যে চেঁচিয়েছিলেন, সেটা ভয়ে চ্যাঁচান নয়, চ্যাঁচালে বাঘ সরে যাবে, সেই জন্য। তাঁদের কেউ বলেছিলেন, “ও বাঘ! জল খেয়েছ?” কেউ বলেছিলেন, “ও বাঘ! চা খেয়েছ?” কেউ বলেছিলেন,“ও বাঘ! পান খেয়ে যাও।”

এই স্থানটি গিরিডি থেকে সাত মাইল। এই পথটুকু ওরা গাড়ীতে গিয়েছিল। এ দেশের গাড়ী যে কি রকম জিনিস, সেই শাদা সিদে মেয়েটি তার কিছু পরিচয় দিয়েছে। সে বলেছে, “কোচম্যানটার লাফানির চোটে ওর পায়ের ধূলো আমার নাকে আসতে লাগল। আমি নাক ঢেকে বসে রইলাম।”

গত মাসের ধাঁধার উত্তর—চ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

রাফ্‌লেসিয়া ফুল

U. RAY & SONS, CALCUTTA.

তৃতীয় বর্ষ | পৌষ, ১৩২২ | নবম সংখ্যা।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

বড়াই।

গাছের গোড়ায় গর্ত্ত ক'রে ব্যাং বেঁধেছেন বাসা,
মনের সুখে গাল ফুলিয়ে গান ধরেছেন খাসা।
রাজার হাতী হাওদা-পিঠে হেলে দুলে আসে—
"বাপ্‌রে" ব'লে ব্যাং বাবাজি গর্ত্তে ঢোকেন ত্রাসে!
রাজার হাতী মেজাজ ভারি হাজার রকম চাল;
হঠাৎ রেগে মটাৎ ক'রে ভাঙ্‌ল গাছের ডাল।
গাছের মাথায় চড়াই পাখী অবাক হ'য়ে কয়—
"বাস্‌রে বাস্! হাতীর গায়ে এমন জোরও হয়"!
মুখ বাড়িয়ে ব্যাং বলে "ভাই, তাইত তোরে বলি—
আমরা, অর্থাৎ চার-পেয়েরা, এম্নি ভাবেই চলি"॥

রোস্তম্ ও সোরাব্।

অনেক দিন আগে পারস্য দেশে একজন ভারি জবরদস্ত যোদ্ধা ছিলেন তাঁর নাম রোস্তম্। এত বড় যোদ্ধা হলেও তাঁর মনটা ছিল শিশুর মত কোমল। পারস্যের লোকেরা সকলেই তাঁকে খুব ভালবাসত।

রোস্তমের যুদ্ধের ঘোড়াটির নাম ছিল রুকেশ, রুকেশের মত প্রভুভক্ত ঘোড়া সেকালে আর ছিল না। রুকেশকে নিয়ে দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়ান রোস্তমের এক প্রধান কাজ ছিল।

সে সময়ে পারস্যের সম্রাটের সঙ্গে তাতার রাজা আফ্রেসিয়াবের প্রায়ই ভীষণ যুদ্ধ হতো। যখন রোস্তম্ পারস্য দলের সেনাপতি থাকতেন তখন তিনি আফ্রেসিয়াবের দলকে মেরে কেটে লণ্ড ভণ্ড করে তাড়িয়ে দিতেন। আবার রোস্তম্ উপস্থিত না থাকলেই পারস্যের সৈন্যেরা হার্‌ত। এই জন্য যুদ্ধ বাধলেই পারস্যের সম্রাট লোক পাঠিয়ে দেশ বিদেশ খুঁজে রোস্তম্‌কে আনাতেন। রোস্তম্ যুদ্ধ জিতে পুরস্কার কিম্বা প্রশংসার অপেক্ষাও করতেন না, তখন আবার দেশ ভ্রমণে চলে যেতেন।

একবার এই রকমে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে তাতার রাজ্যের সীমানায় এসে সন্ধ্যা হয়ে গেল রোস্তমও একটা গাছের তলায় ঘুমিয়ে পড়লেন। ভোর বেলা রুকেশ তাঁর কানের কাছে ডেকে তাঁর ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিল। জেগে উঠে রোস্তম্ দেখ্‌লেন একজল অশ্বারোহী তাতার সৈন্য তাঁর দিকে আস্‌ছে, তিনি তাড়াতাড়ি অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দলের সর্দ্দারটি তাঁকে সেলাম করতে করতে তাঁর কাছে এসে বল্লেন ঃ—"মহাবীর রোস্তম্, আপনার মঙ্গল হোক্। আমি কুর্দিস্থানের রাজা, আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি। আপনার মতন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা আমার বাড়ী অতিথি হ'লে আমার সম্মান বাড়বে।"

রোস্তম্ তাঁর সঙ্গে রাজবাড়ী গেলেন। সে দিন রাজবাড়ীতে মহা ধুমধাম হলো। রাত্রিতে একটি সুন্দর ঘরে সোনার খাটে রোস্তম্ ঘুমিয়েছেন, হঠাৎ তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি চেয়ে দেখ্‌লেন চমৎকার সুন্দরী একটি মেয়ে তাঁর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে, তার পিছনে লণ্ঠন হাতে একজন চাকর।

ব্যস্ত হয়ে রোস্তম্ জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি কে? কি চাও এখানে?" মেয়েটি বল্‌লে—"আমি রাজার মেয়ে, আপনাকে দেখ্‌তে এসেছি। পৃথিবীর সব চেয়ে বড়

যোদ্ধাকে দেখে জীবন সার্থক করেছি—এখন আমি চল্লাম।” এই বলে রাজকুমারী চলে গেল। তারপর রোস্তমের আর ঘুম হলো না, কেবলই রাজকুমারীর কথা ভাব্‌তে লাগলেন। রোস্তম্ রাজার কাছে গিয়ে রাজকুমারীর সঙ্গে তাঁর বিয়ের প্রস্তাব করলেন। রাজাও খুব খুসী হয়ে মত দিলেন—মহা ধুমধামের সহিত রাজকুমারীর সঙ্গে রোস্তমের বিবাহ বিয়ে হয়ে গেল।

কিছুদিন সেখানে থেকে রোস্তম্ আবার দেশ-ভ্রমণে বাহির হলেন। ইহার কিছুকাল পরে রাজকুমারীর একটি ছেলে হলো, ছেলের নাম রাখ্‌লেন—“সোরাব্”। ছেলে হয়েছে জান্‌তে পার্‌লেই রোস্তম তাকে নিয়ে গিয়ে যুদ্ধ শেখাবেন তাই রাজকুমারী রোস্তম্‌কে সংবাদ পাঠালেন যে তাঁর একটি মেয়ে হয়েছে। রোস্তম্ তাঁর হাতের আংটিটি পরিয়ে দিয়ে বল্লেন্—“এই আংটিটি স্থতো দিয়ে মেয়ের গলায় বেঁধে রাখ্‌লে মেয়ের মঙ্গল হবে।”

দেখ্‌তে দেখ্‌তে সোরাব্ বড় হয়ে উঠ্‌ল, চেহারা খানি তার অতি স্থন্দর, স্বভাবটিও ঠিক বাপেরই মত। সে তার মায়ের কাছে বসে পিতার বীরত্বের কথা শুন্‌ত। শুন্‌তে শুন্‌তে উৎসাহে তার চোখ্ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ত।

এই ভাবে আরো কিছুদিন গেলে পর সোরাব্ এক দিন জেদ ধ’রে বল্ল সে তার বাবাকে খুঁজতে যাবেই যাবে। সোরাবের মা অনেক কাঁদ্‌লেন কিন্তু তাকে বাধা দিলেন না। নিজ হাতে সোরাব্‌কে বর্ম্ম পরিয়ে নূতন অস্ত্রশস্ত্র এবং স্থন্দর ঘোড়া দিয়ে তাকে আশীর্ব্বাদ করে বিদায় করলেন।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে সোরাবের বীরত্বের স্থখ্যাতি পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ল। অনেক দিন নানা দেশ ঘুরে ফিরে সোরাব্ দেশে ফিরে এসে তাতার রাজা আফ্রেসিয়াবের সৈন্য দলে যোগ দিল। মনে মনে ভাবল যে একদিন না একদিন যুদ্ধ কর্‌তে কর্‌তে তার পিতার সঙ্গে দেখা হবে।

রোস্তমের তখন বয়স হয়েছে—তিনি যুদ্ধবিগ্রহ ছেড়ে একটি নির্জ্জন পাহাড়ের উপর স্থন্দর একটি বাড়ী তৈরি করে সেখানেই থাকেন।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সোরাব আফ্রেসিয়াবের প্রধান সেনাপতি হয়ে পড়ল। সোরাবের বীরত্ব দেখে তাতার রাজের খুব আশা হ’ল যে, সে রোস্তমকে যুদ্ধে মার্‌তে পার্‌বে। তিনি সকলকে ব’লে দিলেন, যে যুদ্ধে যদি দুজনের দেখা হয়, কেউ যেন তাদের চেনা করিয়ে না দেয়। কারণ পরিচয় জান্‌তে পার্‌লে হয়ত তারা লড়াই কর্‌বে না।

তার পর আফ্রেসিয়াব আরও অনেক সৈন্য সংগ্রহ করলেন এবং সোরব্‌কে সেনাপতি করে পারস্যে পাঠিয়ে দিলেন। সোরাব পারস্যে গিয়ে একজন একজন করে সম্রাটের সব সেনাপতিদের হারিয়ে দিল।

পারস্যের সম্রাট তখন অত্যন্ত ভয় পেয়ে রোস্তমের নিকট লোক পাঠিয়ে সংবাদ দিলেন যে তিনি এসে শত্রুর হাত থেকে তাঁর দেশ রক্ষা করবার জন্য যুদ্ধ করুন। রোস্তম্‌ কিছুতেই যুদ্ধ করতে রাজি হলেন না, তখন কি আর করেন সম্রাট নিজেই গিয়ে অনেক বলে কয়ে তাঁকে রাজি করলেন।

অক্‌সাস্‌ নদীর তীরে বালির চড়ায় দুই সৈন্যদল একত্র হলো, এক দলের সেনাপতি পিতা অপর দলের সেনাপতি পুত্র, কিন্তু কেউ কাউকে চিন্‌তে পারলেন না। নদীর তীরে বালির উপর উভয় সৈন্যদল ছাউনী করে রইল—পরের দিন সকালে যুদ্ধ হবে। সে রাত্রে সোরাবের চোখে ঘুম নাই সে মনে মনে ঠিক করল যে পরের দিন সকালে বড় বড় পারস্য যোদ্ধাদের ডেকে একজন একজন করে সে একা সকলের সঙ্গে যুদ্ধ করবে এবং তা'হলে নিশ্চয় তার বাবার সঙ্গে দেখা হবে।

ভোরের বেলা সোরাবের দূত পার্সি শিবিরে গিয়ে বল্ল—"আমাদের সেনাপতি সোরাব্‌ বলে পাঠিয়েছেন যে আপনাদের মধ্যে বড় বড় যোদ্ধা যাঁরা আছেন তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে তিনি একা যুদ্ধ কর্‌বেন; অতএব আপনারা প্রস্তুত হোন্‌।" এই নিমন্ত্রণের সংবাদ পেয়ে পার্সি যোদ্ধাদের মনে ভয় হলো। তাঁরা জান্‌তেন যে এক রোস্তম্‌ ছাড়া অন্য কোন পার্সি যোদ্ধা সোরাবের সঙ্গে পেরে উঠ্‌বে না। আবার রোস্তমও একজন ছোকরার সঙ্গে যুদ্ধ করাটা তাঁর পক্ষে অপমানজনক বলে মনে করবেন—এখন উপায়? ক্রমশঃ

বাঙ্গলার জলচর খাদ্য।

বাঙ্গলা দেশের নদী নালায় পুকুরে ও বিলে
জলচর উভচর খাদ্য যত মিলে,
ধরিয়া এনেছি তাহা কবিতার জালে,
খাও যথা অভিরুচি ঝোলে কিংবা ঝালে।

আমিষের আহারেতে আগে আছে আড়,
অতীব অরুচিকর অঙ্গভরা হাড়।
নিরামিষ হয় বিষ, ইলিশ-এর ঘ্রাণে,
রন্ধনের গন্ধ শুঁকি আনন্দিত প্রাণে।
কই-কই ক'রে খুঁজে কই খাই ক'ষে,
কাতলা উতলা করে, কাঁটা কালবোস-এ।
কুঁচে যেন আস্ত সাপ দেখে হয় ভয়,
কাঁকড়া নাড়িছে দাঁড়া সে যে মাছ নয়।
কচ্ছপ হিন্দুর গ্রাহ্য হয়েছে ঢাকায়,
সস্তা মেলে মস্ত জীব আট্‌টি টাকায়।
খলিসা খর্‌সোলা আনি খালুই ভরিয়া;
খুঁজিয়া খয়রা খাই যতন করিয়া।
গুগলির ঝোলে হয় শৈত্য উপচার;
গেঁটে ঝিনুকেরা খাদ্য নামে অয়েষ্টার।
চিতলের পেটি খাই ফেলে দেই গাদা।
চচ্চড়ি অম্বলে খাই চেলা আর চাঁদা।
ঘি-চাঁদাকে ইংজারিতে পম্‌ফ্রেড্ বলে,
শুনিয়াছি মেলেনাক বাঙ্গলার জলে।
চিংড়ির মত স্বাদু আর কিছু নাই,
গল্‌দা, বাগ্‌দা, কুচো, মোচা, সবই মোরা খাই।
টেপরা আড়ের মত শুধু হাড় সার;
টাঁই অতি বড় মাছ খেতে চমৎকার।
তপসে তপস্বী-প্রিয় যদি হয় তাজা,
ঝোলে তার নাহি তার ভাল লাগে ভাজা।
নাদোস্ নামেতে খ্যাতি হয়েছে যাহার,
সংস্কৃত 'ভদ্রা' হতে ভেদা নাম তার।
পোলো চুপে পাঁক ঘেঁটে পাঁকাল না চাই;
পার্শে, পাবতা, পুঁটি পেলে পরে খাই।

চিতল সদৃশ মাছ নামেতে ফলুই,
মুড়াটি দেখিতে যেন ডোঙ্গার গলুই।
বাঁশের চোঙ্গায় বান্ ধরে এনে খাই,
বোয়াল ও বেলে মাছ বিষম বালাই।
বাজারেতে বেচে বাচা, বাটা, বাঁশপাতা,
ভেট্‌কি, ভাঙ্গন ভেদা মাছ গাদা গাদা।
মৃগেল, মাগুর আর মৌরলা মিঠে;
রোহিত মাছের রাজা; মিঠে অতি রিঠে।
কেহ বলে চ্যাং তাকে কেহ বলে ল্যাটা,
পুকুরের পাঁকে থাকে খাওয়া বড় ল্যাটা।
শোল মাছ খেতে ভাল ছাড়াইয়া ছাল,
হিন্দুর অখাদ্য মাছ গজাল বা শাল।
শৃঙ্গী বা শিঙ্গির কাঁটা ফোটে যদি গায়,
মাছ কেবা খাবে বল বিষে প্রাণ যায়।
সরপুঁটি পুঁটি নয় নহে সে শফরী,
সোণাখড়িকার হয় সরস চচ্চড়ি।
ইহা ছাড়া অন্য মাছ থাকে যদি দেশে,
নাম করে পাঠকেরা পাঠায়ো "সন্দেশে"।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

পিশাচ পাখী।

শিকারী পাখী যত রকমের আছে, তার মধ্যে যে সকলের চাইতে বড় আর সকলের চাইতে ভয়ঙ্কর, তাকেই আমরা পিশাচ পাখী বল্‌ছি। এ পাখীর আসল নাম হার্পি ঈগ্‌ল্। আমেরিকায় যেখানে এ পাখীর বাসা, সেখানকার লোকেরাও একে "ভূত পাখী," "পিশাচ পাখী" এই সব নাম দিয়ে থাকে।

এমন ভয়ানক নখ আর কোন পাখীর নাই। যদিও তার ঠোঁটটিও বড় কম সাঙ্ঘাতিক নয়, কিন্তু আসলে কাজের সময় সে শিকারকে ঠোক্‌রাতে যায় না—নখ

দিয়ে ছোবল্ মারে। বড় বড় বেড়াল পর্য্যন্ত ঐ নখের এক ঝাপ্টায় মারা পড়্তে দেখা যায়। ইঁদুর, বেড়াল, কাঠবেড়াল এ সবত ছোট শিকার—হার্পি ঈগ্‌ল্ অনেক সময়েই বাঁদর মেরে খায়, সুবিধা পেলে ছোট ছেলে পিলেদেরও মার্তে ছাড়ে না।

হার্পি ঈগ্‌ল্।

বাস্তবিক, পাখীর মুখখানা দেখ্‌লেই বোঝা যায় যে তার মেজাজটা বড় ভাল নয়। ভ্রূকুটি পাকান চোখ, বাঁকা নাক, তার উপর সেয়ানা হাসি—মনে হয় সব সময়ে কি যেন একটা মৎলব আঁট্‌ছে।

একবার একটা হার্পি ঈগ্‌ল্ কি করে জখম হ'য়ে এক মাঠের মধ্যে এসে প'ড়েছিল—তাই দেখে কতগুলো লোক তার উপর কুকুর লেলিয়ে দিল। পাখিটা তখন বেগতিক দেখে চিৎ হ'য়ে শুয়ে এম্‌নি পা ছুঁড়্‌তে লাগ্‌ল—যে কুকুরগুলো আর এগুতে ভরসা পায় না। শেষটায় একটা কুকুর অনেক সাহস ক'রে তার কাছে যাওয়ামাত্র সে নখের এক আঁচড়ে তার একটা কাণ আর মাংসশুদ্ধ গলার খানিকটা চামড়া ছিঁড়ে নিল! তারপর অনেক লোক মিলে পাখীটাকে মেরে ফেল্ল।

কিন্তু এমন যে ভয়ানক পাখী তাকেও বেশ সহজেই পোষমানান যায়। একবার পোষ মান্‌লে সে নিরীহ ভাল মানুষের মত থাকে—অন্তত তার মনিবকে ঠোক্‌রাতে যায় না।

'লিখিয়ে' আর 'পড়িয়ে'।

এক গ্রামে একজন ভারী 'লেখিয়ে' ছিল, গ্রামের যত নিরক্ষর লোক সকলে তাকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে নিত। একদিন এমনি একটি লোক তাকে দিয়ে চিঠি লেখাতে এলে, সে সেই লোকটিকে বল্ল, "ভাই আমার পায় বড্ড ব্যথা হয়েছে, আজ চিঠি লিখতে পারব না।" সেই লোকটি তাতে আশ্চর্য্য হয়ে বল্ল, "চিঠি লিখবে ত হাতে, পায়ের ব্যথায় সে কাজ কি করে আটকাবে?" লিখিয়ে বল্ল, "আটকাবে না? সে চিঠি পড়ে দিতেও ত আমাকেই যেতে হবে; আর কারু কি সে লেখা পড়বার সাধ্য আছে?"

একেই বলে 'লিখিয়ে'। লেখা যদি চট্ করে যে-সে পড়ে ফেল্ল, তবে আর বাহাদুরী কি? কি বল ভাই? তোমাদের কার লেখা পড়তে কেমন? তোমরা বাংলা লিখলে কি তা ইংরাজীর মত দেখায়, না ফারসীর মত দেখায়? আমাদের একজন 'দাদামশায়' ছিলেন তাঁর লেখাও এমনিতর ছিল,—বাংলা কি ইংরাজী চট করে বোঝা যেত না। বিশেষতঃ তাঁর নামটি। আমাদের কাণ ছিঁড়ে ফেল্লেও সে নাম আমরা বানান করে পড়তে পারতাম না, কিন্তু তাঁর লেখার চেহারা দেখে দশ হাত দূরে থেকে বলে দিতে পারতাম যে ওটি দাদামশায়ের দস্তখত।

একবার দাদামশায়ের একখানা চিঠি কোন মতেই তার ঠিকানায় পৌঁছাতে না পেরে শেষ গিয়ে ডেড্ লেটার্ আপিসে—সেই যেখানে সব পথহারা চিঠির বিচার হয়, সেইখানে—উপস্থিত হয়। সে আপিসে তেমন তেমন উৎকট লেখারও 'পড়িয়ে' সব থাকে, কিন্তু তারা আমাদের দাদামশায়ের দস্তখতটি কিছুতেই পড়ে উঠতে পারল না। অনেক কষ্টে তারা চিঠির মাথায় লেখা ঠিকানাটুকু পড়তে পেরেছিল, কেন না, চিঠি আরম্ভ করবার সময় অনেকেই একটু ধরে লেখে। সেই ঠিকানাটুকু খামের উপর লিখে তার উপরে দাদামশায়ের দস্তখতটি চিঠির ভিতর থেকে কেটে বসিয়ে দিয়ে তারা কাজ সারল। সে চিঠি ঘুরে আবার আমাদের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলে আমাদের খুবই হাসি পেল। সেই "মরা চিঠি" ওয়ালাবাবুরা বোধ হয় আর এমন শক্ত লোকের হাতে পড়েন নি।

সে কালে হাতের লেখা পড়ার একটা পরীক্ষা ছিল। চাকরীর উমেদার বাবুদের হাতে আমাদের দাদামশায়ের লেখার মত লেখা তুলে দিয়ে বল ত, 'পড় দেখি'। একবার এক সাহেবের কাছে একটি বাবু কেরাণীগিরির জন্য পরীক্ষা দিতে এসেছে,

তাকে দিয়েছে তেমনি একটা বিশ্রী লেখা পড়তে। সে বেচারা তার মাথামুণ্ডু কিচ্ছু বুঝতে না পেরে, যা মুখে এল, তাই গড় গড় করে বলে যেতে লাগল। সাহেব বাংলার 'ব'ও জানেন না, তিনি তাতে ভারী খুসী হয়ে তখনি তাকে চাকরী দিয়ে দিলেন, বল্লেন, "বহুৎ আচ্ছা কেরাণী; আর কেউ পড়তে পারেনি, ও পড়েছে!" তারপর যখন পরীক্ষা শেষ করে সাহেব চলে গেলেন; তখন আর আর উমেদারেরা তাকে ঠাট্টা করে বল্ল "কি বোকা! চিঠিখানা যে উল্টো করে ধরেছিলি, তাও বুঝতে পারিস্ নি?" তাতে সে বল্ল, "তা যাই হোক, আমি ত চাকরী পেয়েছি, তোরা বুঝতে পেরে কি কর্‌লি?"

লেখিয়ের কথা আর দাদামশায়ের কথা বলতে গিয়ে আরেক দাদামশায়ের কথা মনে পড়ে গেল। সে বেচারার একটি এতটুকু নাতনী আছে, সে তাঁকে চিঠি লেখে। সে যে কোন্ দেশী অক্ষর, তা তোমরা না দেখে যেমন বুঝ্‌ছ, দেখলে তার চেয়ে বেশী বুঝতে পারবে না। এর আগে একখানি চিঠি এসেছিল, তার সঙ্গে তার মার হাতের লেখা বাংলা তরজমা ছিল :—"দাদা মশাই, তুমি এস, আমার জন্যে দাঁত মাজবার এনো।" 'দাঁত মাজবার' মানে হচ্ছে 'টুথ্ ব্রাস্'। ওর মার টুথ্ ব্রাস্‌টি দেখে ওর ভারী পছন্দ হয়েছে, তাই ওর নিজেরও একটা চাই। এ সব কথা ঐ তরজমাটুকুর গুণে দাদামশাই সহজেই পড়ে নিলেন। তারপর আবার সে দিন তার কাছ থেকে এই চিঠিখানা এসে উপস্থিত হয়েছে :—

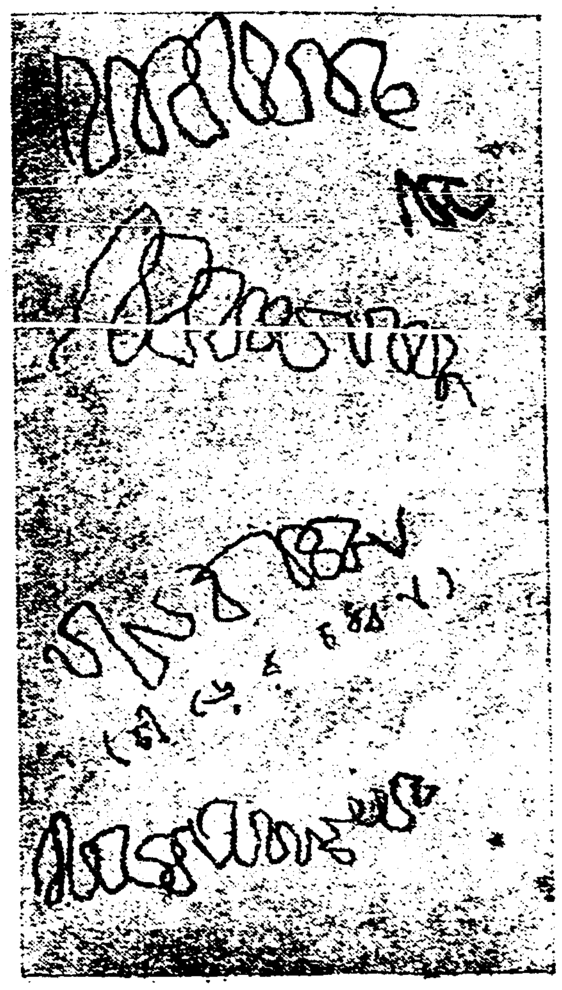

অনেক দিন ভেবে দাদামশাই এর একটি কথা পড়তে পেরেছেন। এ কথাটি যে 'চীড়ের চর্ব্বণ' তাতে আর কোন সন্দেহ করবার কারণ দেখা যায় না। নাতনী কি না, তাই দাদামশাইকে চিঁড়ে খেতে বলে রসিকতা করেছে। দাদা-মশাইয়ের দাঁত আলগা, তিনি চিঁড়ে খেতে পারেন না। কিন্তু আর কথাগুলো যে কি, তা পড়তে না পারায় বড়ই চিন্তার কারণ হয়েছে, কেন না, তাতে হয় ত আরো ঢের ভাল ভাল খাবারের সংবাদ থাকতে পারে। সন্দেশের পাঠক পাঠিকারা যদি এই চিঠিখানির আগাগোড়া পড়ে দিতে পারেন, তবে বুড়োর বড় উপকার হয়।

রাগের ওষুধ।

কেদারবাবু বড় বদ্‌রাগী লোক। যখন রেগে বসেন, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না।

একদিন তিনি মুখখানা বিষণ্ণ ক'রে বসে আছেন, এমন সময় আমাদের মাষ্টারবাবু এসে বল্লেন "কি হে কেদারকেষ্ট, মুখখানা হাঁড়ি কেন?"

কেদারবাবু বল্লেন "আর মশাই বল্‌বেন না। আমার সেই রূপোবাঁধান হুঁকোটা ভেঙ্গে সাত টুক্‌রো হ'য়ে গেল—মুখ হাঁড়ির মত হবে না ত কি বদ্‌নার মত হবে?"

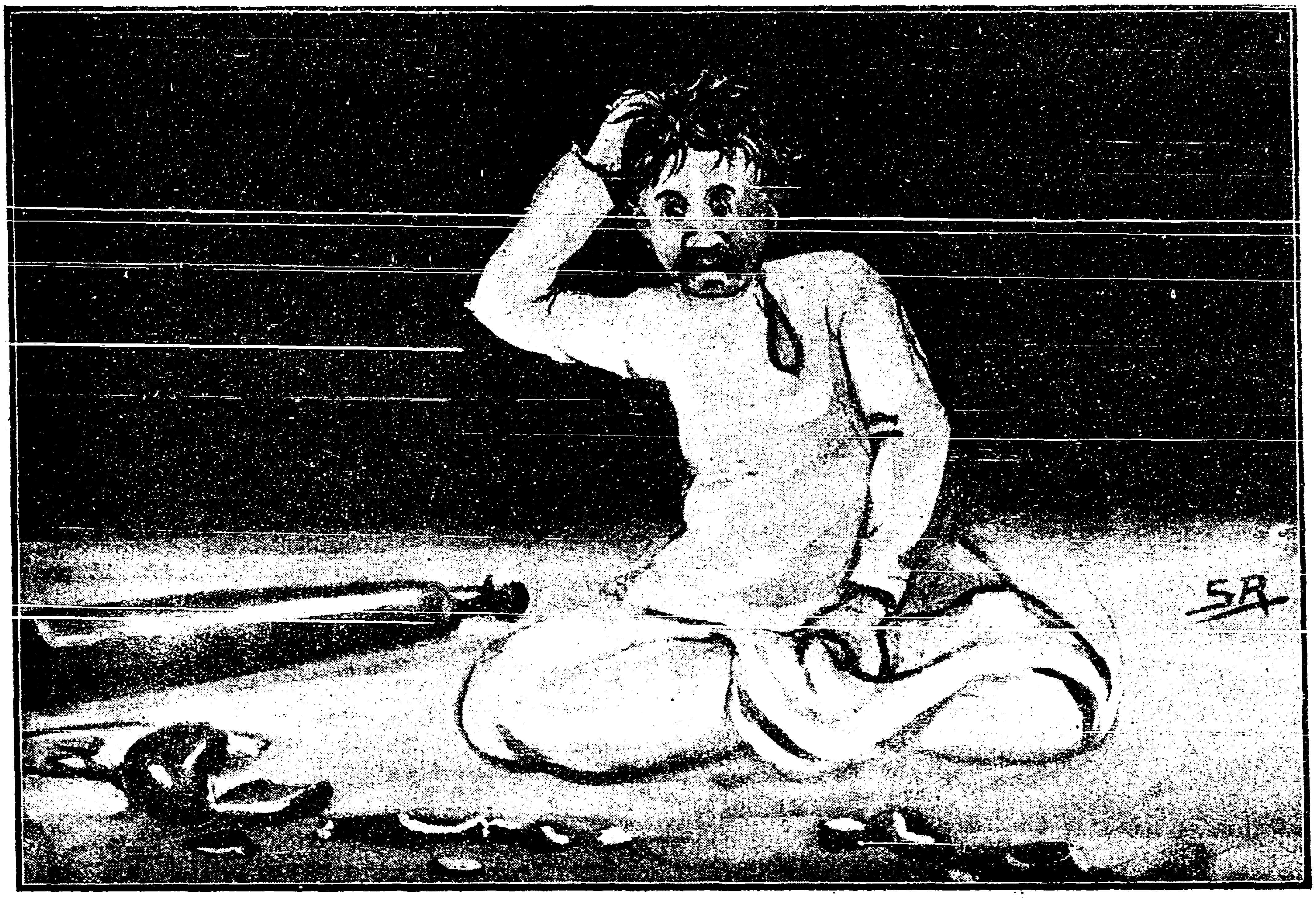

মাষ্টার মশায় বল্লেন "বল কি হে? এতো কাচের বাসন নয় কি মাটির পুতুল নয়, —অম্‌নি খামখা ভেঙ্গে গেল, এর মানে কি!"

কেদারবাবু বল্লেন, "খামখা ভাঙ্‌তে যাবে কেন—কথাটা শুনুন না। হ'লো কি—কাল রাত্রে আমার ভাল ঘুম হয় নি। সকাল বেলা উঠেছি, মুখ হাত ধুয়ে তামাক খেতে বস্‌ব, এমন সময় কল্‌কেটা কাৎ হ'য়ে আমার ফরাসের উপর টিকের আগুন

প'ড়ে গেল। আমি তাড়াতাড়ি যেই আগুনটা সরাতে গেছি অম্নি কিনা আঙুলে ছ্যাঁক্ ক'রে ফোস্কা প'ড়ে গেল! আচ্ছা, আপনিই বলুন—এতে কার না রাগ হয়? আরে, আমার হুঁকো, আমার কল্কে, আমার আগুন আমার ফরাস, আবার আমার উপরেই জুলুম। তাই আমি রাগ করে—বেশী কিছু নয়—ঐ মুগুরখানা দিয়ে পাঁচ দশ ঘা মার্‌তেই কিনা হতভাগা হুঁকোটা ভেঙে খান্ খান্”!

মাষ্টার মশাই বল্লেন, “তা যাই বল বাপু, এ রাগ বড় চণ্ডাল—রাগের মাথায় এমন কাণ্ড ক'রে বস, রাগটা একটু কমাও”।

“কমাও ত বল্লেন—রাগ যে মুখের কথায় বাগ্ মান্‌বে—এ রাগ আমার তেমন নয়।”

“দেখ, আমি এক উপায় বলি। শুনেছি, খুব ধীরে ধীরে এক, দুই, তিন ক'রে দশ গুণ্‌লে—রাগটা নাকি শান্ত হ'য়ে আসে। কিন্তু তোমার যেমন রাগ, তাতে দশ বারোতে কুলোবে না—তুমি একেবারে একশ' পর্য্যন্ত গুণে দেখ।”

তারপর একদিন কেদারবাবু ইস্কুলের সাম্‌নে দিয়ে যাচ্ছেন। তখন ছুটির সময়, ছেলেরা খেলা কর্‌ছে। হঠাৎ একটা মার্বেল ছুটে এসে কেদারবাবুর পায়ের হাড়ে ঠাঁই ক'রে লাগ্‌ল। আর যায় কোথা! কেদারবাবু ছাতের সমান এক লাফ দিয়ে লাঠি উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছেন। ছেলের দল যে যেখানে পারে একেবারে সটান্ চম্পট্। তখন কেদারবাবুর মনে হ'ল মাষ্টারবাবুর কথাটা একবার পরীক্ষা ক'রে দেখি। তিনি আরম্ভ কর্‌লেন, এক—দুই—তিন—চার—পাঁচ—

স্কুলের মাঝখানে একজন লোক দাঁড়িয়ে বিড়্ বিড়্ ক'রে অঙ্ক বল্‌ছে, তাই দেখে স্কুলের দারোয়ান ব্যস্ত হ'য়ে কয়েকজন লোক ডেকে আন্‌ল। একজন বল্ল “কি হ'য়েছে মশায়?” কেদারবাবু বল্লেন, “ষোল—সতের—আঠার—উনিশ—কুড়ি—”

সকলে বল্ল “একি? লোকটা পাগল হ'ল নাকি?—আরে, ও মশাই, বলি, অমন ধারা ক'চ্ছেন কেন”? কেদারবাবু মনে মনে ভয়ানক চট্‌লেও—তিনি গুণেই চলেছেন, “ত্রিশ—একত্রিশ—বত্রিশ—তেত্রিশ—”

আবার খানিক বাদে আর একজন জিজ্ঞাসা কর্‌ল “মশাই, আপনার কি অসুখ ক'রেছে? কব্‌রেজ মশাইকে ডাক্‌তে হবে”? কেদারবাবু রেগে আগুন হ'য়ে বল্লেন “উনষাট্—ষাট—একশট্টি—বাষট্টি—তেষট্টি—”

দেখ্‌তে দেখ্‌তে লোকের ভীড় জমে গেল—চারিদিকে গোলমাল, হৈ চৈ। তাই শুনে মাষ্টারবাবু দেখ্‌তে এলেন, ব্যাপারখানা কি! ততক্ষণে কেদারবাবুর গোণা প্রায়

শেষ হ'য়ে এসেছে। তিনি দুই চোখ লাল ক'রে লাঠি ঘোরাচ্ছেন আর বল্‌ছেন "ছিয়ানব্বুই—সাতানব্বুই—আটানব্বুই—নিরেনব্বুই—একশো—কোন্ হ ত ভা গা লক্ষ্মীছাড়া মিথ্যাবাদী বলেছিল এক্‌শো গুণ্‌লে রাগ থামে" ? ব'লেই ডাইনে বাঁয়ে দুম্‌দাম্ লাঠির ঘা !

লোকজন সব ছুটে পালাল। আর মাষ্টার মশাই এক দৌড়ে সেই যে-ঘরের মধ্যে ঢুক্‌লেন, আর সারাদিন বেরোলেন না।

অদ্ভুত ইতিহাস।

অনেক শত বৎসর আগে ইজিপ্ট্ দেশের লোকেরা ছবির ভাষায় বই লিখ্‌ত। আমরা যেমন অক্ষরের পর অক্ষর লিখে সব কথা বুঝিয়ে দিতে পারি, তারা তেম্‌নি ছবির পর ছবি এঁকে তাদের লেখার কাজ সেরে নিত। ছবি আঁকবার নানারকম সঙ্কেত থেকেই নাকি ক্রমে অক্ষরের সৃষ্টি হ'য়েছিল। চীনেদের অক্ষরগুলোও অনেকটা ছবি আঁকার মত ; যেমন 'ঝগড়া' বোঝাতে হ'লে তারা আঁকে একটি ঘর, আর তার মধ্যে দুটি মেয়ে !

আমেরিকার সেই লাল্‌চে রঙের মানুষেরা—যাদের লোকে মিছামিছি 'ইণ্ডিয়ান' বলে—তাদের মধ্যেও এই রকম ছবি দিয়ে লেখার দস্তুর ছিল—এবং এখনও আছে। সেই দেশের একজন লোক কেমন অদ্ভুত ক'রে নিজের কথা সব লিখে রেখে-ছেন দেখ—

এটা থেকে তোমরা তার জীবনের অনেকটা ইতিহাস প'ড়ে ফেল্‌তে পার। কি ক'রে পড়্‌বে ? সে আর মুস্কিল কি ? আমি পড়ে দিচ্ছি, শোন।

প্রথমেই লেখক তাঁর পরিচয় দিচ্ছেন। প্রথম ছবি দুটো হ'চ্ছে তাঁর বাবার আর মায়ের। তাঁর বাবার হাতে বল্লম—তার মানে তিনি খুব বীর। তাঁর মাথায় ঐ মাছটি হ'চ্ছে তাঁদের বংশ-চিহ্ন। আমরা যেমন ঘোষ বোস মুখুর্জ্জে ব'লে পরিচয় দিই—এরা তেমনি কুকুর বেড়াল মাছ পাখী এই সব চিহ্ন দিয়ে পরিচয় বলে। মাথার উপর কাল ঢাক্‌নি দেওয়ার অর্থ ইনি খুব মন্ত্র তন্ত্র জানেন। কোমরে কাল পুঁটুলি—অর্থাৎ খুব টাকা আছে। লেখকের জন্ম সূর্য্যের কাছে—অর্থাৎ পূবের দেশে। আটটা দাঁড়ির

প্রথম দাঁড়ির মাথায় তীর—অর্থাৎ লেখক আট ভাইয়ের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়—তীরটি হ'ল তাঁর নাম। আমরা তাঁকে "বাণবীর" বল্‌ব। তার নীচে মাথার মত

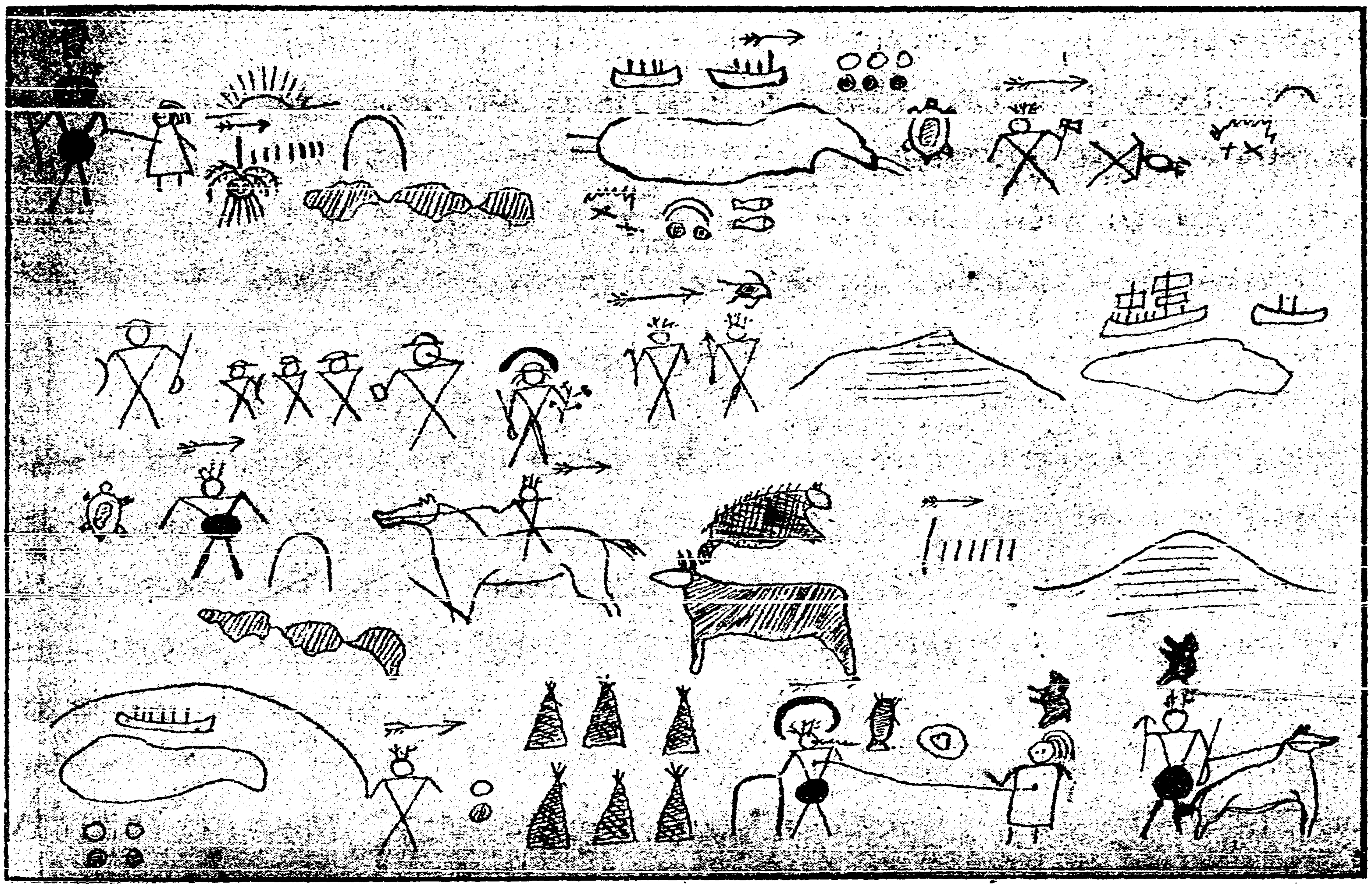

ওটা কি? উনি ভাল দেবতা—বাণবীরের সহায় আছেন। তার পর তার বাড়ীর ছবি—বাড়ীর পাশে তিনটি ক্ষেত।

দুই নৌকায় সাতজন লোক সঙ্গে বাণবীর বেরুচ্ছেন—ঐ লম্বা জিনিষটা হ্রদের ছবি। তিন সূর্য্য তিন চাঁদের, অর্থাৎ তিন দিন তিন রাত্রের, পর কচ্ছপ। "কচ্ছপ" মানে ডাঙায় ওঠা। ডাঙায় নেমে কি কর্‌লেন তাও হ্রদটার নীচেই লেখা হ'য়েছে। প্রথমেই ঐ তিড়িবিড়িগুলার অর্থ আগুন; ওখানে তাঁরা বিশ্রাম কর্‌লেন। তাঁরা দুদিন ছিলেন আর মাছ খেয়েছিলেন, তাও দেখান হ'য়েছে। তার পর আবার দেখ বাণবীর কুড়ুল হাতে যুদ্ধ ক'রে কাকে মেরে ফেলেছেন। তার পর আবার আগুনের ধারে বিশ্রাম। এই ত গেল প্রথম লাইন।

এর পর আর এক মস্ত ঘটনা। ছয়জন লোক, তাদের বংশচিহ্ন নাই সুতরাং বিদেশী—মাথায় পালকের বদলে টুপি—সুতরাং তারা সাহেব। একজন খুব বড় সাহেব—তার বন্দুকও আছে, তলোয়ারও আছে। তার পর ছোট খাট তিনজনের মধ্যে একজনের হাতে তলোয়ার। তার পর আর একজন, তার এক হাতে বই; আর এক হাত মুখে দেবার অর্থ ইতি খুব লেখাপড়া জানেন। তারপর বন্দুক হাতে আর একজন; তাঁর এক হাতে গাছ—অর্থাৎ ওষুধপত্র। বাণবীরের বিশ্বাস ডাক্তার নিশ্চয়ই যাদু বিদ্যা জানে, তাই তার মাথায় একটা ঢাক্‌নি দেওয়া হ'য়েছে। বাণবীর আর অন্য একজন (তারও বংশচিহ্ন মাছের মত—হয়ত বাণবীরেরই কেউ হবে)—এরা পাহাড়ের উপর দিয়ে সাহেবদের একটা হ্রদে নিয়ে গেলেন। সেইখানে সাহেবদের পালতোলা নৌকা আর বাণবীরদের নৌকা, দুই দেখান হ'য়েছে।

ডাঙ্গায় উঠে (কচ্ছপ) তারা বাণবীরকে অনেক বখ্‌শিস্ দিল (কোমরে পুঁটুলি)। বাণবীর সেই তিন ক্ষেতের ধারে তাঁর বাড়ীতে ফিরে এলেন। তারপর দেখ টাকা পেয়ে বাণবীর ঘোড়া কিনেছেন। এখন তিনি খুব শিকার করেন (ভাল্লুক আর হরিণ)। আবার তিনি ছয়জন লোক নিয়ে পাহাড়ে চলেছেন।

তারপর আবার হ্রদ। ছয়জন নৌকায় ক'রে পার হ'ল—তাদের দুদিন দুরাত্রি লাগ্‌ল। বাণবীরের ঘোড়া আছে তিনি ডাঙ্গার পথে চলে গেলেন—একদিন একরাত্রে। এখানে কতগুলা অদ্ভুত রকমের বাড়ী বা তাম্বু—অর্থাৎ এখানে একদল "ইণ্ডিয়ানের" আড্ডা! তাদের একটি মেয়েকে বাণবীরের ভারি পছন্দ হ'ল—তাদের বংশের চিহ্ন কুকুরছানা! বাণবীরের মুখ থেকে দেখ কত কথাই বেরুচ্ছে—তাঁর সুন্দর বাড়ীর কথা, তাঁর টাকার কথা, তাঁর যাদুবিদ্যার কথা, তাঁর বংশের কথা, তাঁর ভালবাসার কথা। এম্নি ক'রে দুজনের খুব ভালবাসা হ'ল। এখন মেয়ের বাবার মত হ'লেই হয়। তার বাবা হ'চ্ছেন দলের সর্দ্দার। তিনি যে মস্তলোক, হাতের বন্দুকেই তার প্রমাণ। ঐ দেখ, বাণবীর তাঁর ঘোড়াটি তাঁকে দিয়ে ফেলেছেন। এখন আর তিনি রাজি না হ'য়ে করেন কি?

কামড়াবে নাকি !

প্রাচীন কচ্ছপ।

যখন প্রলয় হয়, মার্কণ্ডেয় মুনি তখন উপস্থিত ছিলেন; তিনি অনেক দিনের মানুষ। আবার তাঁহারও আগের মানুষ ছিলেন মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন যে কত দান, কত ধর্ম্ম, কত যজ্ঞ করিয়াছিলেন, আর তাহাতে তাঁহার যে কত পুণ্য হইয়াছিল, তাহা বলিবার আমার সাধ্য নাই।

সেই পুণ্যের ফলে মহারাজ স্বর্গে গিয়া হাজার হাজার বৎসর বাস করিয়াছিলেন। হাজার হাজার বৎসর পরে তাঁহার পুণ্য ফুরাইয়া গেল, কাজেই তখন আবার তাঁহাকে এই পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে হইল।

ততদিনে পৃথিবীর লোকে তাঁহার কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল। এত দান, এত ধর্ম্ম, এত যজ্ঞ যে তিনি করিয়াছিলেন, সে সকলের কথা জানা দূরে থাকুক, তাঁহার নামটি পর্য্যন্ত কাহারও মনে ছিল না।

রাজা ভাবিলেন, "মার্কণ্ডেয় মুনি খুব পুরাণো মানুষ, তাঁহার নিকট যাই,—তাঁহার হয় ত আমার কথা মনে থাকিতে পারে।"

তাই তিনি মার্কণ্ডেয় মুনির নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মুনি ঠাকুর, আমার কথা ত সকলেই ভুলিয়া গিয়াছে। আপনি কি আমাকে চিনিতে পারেন?"

মার্কণ্ডেয় মুনি বলিলেন, "আমরা তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইতে ব্যস্ত থাকি, তাহাতে নিজের কথাই কতবার ভুলিয়া যাই। আপনাকে আবার কি করিয়া চিনিতে পারিব?"

তাহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "আচ্ছা মুনি ঠাকুর, আপনার চেয়েও পুরাণো লোক কি কেহ আছে?"

মার্কণ্ডেয় মুনি বলিলেন, "হিমালয় পর্ব্বতে প্রাবারকর্ণ বলিয়া এক প্যাঁচা আছে, সে আমার চেয়ে ঢের বুড়া হইয়াছে। হয় ত সে আপনাকে চিনিতে পারিবে। আপনার সেখানে যাইতে ইচ্ছা হইলে আমি আপনার সঙ্গে যাইতে পারি। কিন্তু সে যে ঢের দূরের পথ!"

রাজা বলিলেন, "তাহাতে কি? আমি আপনাকে বহিয়া লইয়া যাইব।"

এই বলিয়া তিনি মার্কণ্ডেয় মুনিকে বহিয়া, সেই প্যাঁচার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে বাপু, তুমি ত শুনিয়াছি যার পর নাই পুরাণো লোক; তুমি কি আমাকে চিনিতে পার?"

এ কথায় প্যাঁচা তাহার গোল গোল চোখ দুটি বড় করিয়া, খুব ব্যস্ত ভাবে, আগে বসিয়া, তার পর দাঁড়াইয়া, তার পর উঁকি দিয়া, তার পর গুঁড়ি মারিয়া, রাজাকে মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখিল, তার পর অতিশয় গম্ভীর ভাবে বলিল, "না মহাশয়! আমার ত বোধ হয়, যেন বা আপনাকে চিনি বলিয়া মনে হইতেছে না।"

তাহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "আচ্ছা, তোমার চেয়েও বুড়া কি কেহ আছে!"

প্যাঁচা খানিক চিন্তা করিয়া বলিল, "ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক সরোবর আছে, তাহার ধারে নাড়ীজঙ্ঘ বলিয়া এক বক থাকে। সে আমার চেয়েও বুড়া; তাহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করুন।"

প্যাঁচা তাঁহাদিগকে পথ দেখাইয়া সেই সরোবরের ধারে সেই বকের নিকট লইয়া আসিলে, মার্কণ্ডেয় মুনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে নাড়ীজঙ্ঘ, তুমি কি রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে জান?"

বক এক পায় দাঁড়াইয়া খানিক চিন্তা করিয়া বলিল, "না মহাশয়! আমি ত তাঁহার কথা কিছুই জানি না!"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার চেয়েও প্রাচীন কেহ আছে কি?"

বক বলিল, "এই সরোবরে এক কচ্ছপ থাকে, তাহার নাম অকূপার; সে আমার চেয়েও অনেক প্রাচীন।"

এ কথায় তাঁহারা সেই বককে লইয়া অকূপারকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন। বকের ডাক শুনিয়া সে তাড়াতাড়ি জল হইতে উঠিয়া আসিলে, মার্কণ্ডেয় মুনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অকূপার, তুমি কি এই ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজাকে জান?"

এ কথা শুনিয়াই অকূপার কাঁদিতে লাগিল। তারপর একটু শান্ত হইয়া সে বলিল, "আহা! ইঁহাকে জানিব না ত জানিব কাহাকে? এত যাগ যজ্ঞ আর কে করিয়াছে? ইনি যজ্ঞের সময় যে সকল গরু দান করিয়াছিলেন, তাহাদের খুরের ঘায় এই সরোবর হইয়াছে, তাহাতে সেই অবধি আমি পরম সুখে বাস করিতেছি।"

তখন স্বর্গ হইতে দেবতারা ইন্দ্রদ্যুম্নকে ডাকিয়া বলিলেন, "মহারাজ! এখনও তোমার পুণ্যের কথা লোকে ভুলিয়া যায় নাই, সুতরাং তুমি আবার স্বর্গে চলিয়া আইস!"

সেই কচ্ছপটি না জানি কতই বুড়া ছিল। আমরা তাহার কথা সহজে ভুলিব না। সে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নকে মনে রাখিয়াছিল, তাই তিনি আবার স্বর্গে যাইতে পাইলেন।

(এই গল্পটি "মহাভারতের গল্প" হইতে লওয়া হইয়াছে)

আশ্চর্য্য ফুল।

আশ্বিনের সন্দেশে কতগুলি ছোট ছোট ফুলের কথা আর তাদের ছবি ছিল। এবারেও একটা ফুলের রঙিন্ ছবি দেওয়া হইয়াছে—কিন্তু এটি যে নেহাৎ ছোট নয় তাহা ছবি দেখিলেই বুঝিতে পার। ঐ যে লোকটি ফুলের কাছে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার মত চার পাঁচজন ফুলের উপর বেশ বসিয়া থাকিতে পারে! একশ বছর আগে এরূপ ফুলের কথা কেহ বলিলে লোকে হয় ত বিশ্বাসই করিত না—কারণ এমন অদ্ভুত ফুলের কথা কেউ তখনও শোনে নাই।

রাফ্‌ল্‌স্ নামে একজন সাহেব সুমাত্রার জঙ্গলে ঘুরিতে ঘুরিতে ডুমুরজাতীয় একটা গাছের নীচে একটা চমৎকার "বেদী" দেখিতে পান। সেই বেদীর কাছে গিয়ে তাঁহারা দেখেন সেটা বেদী নয় একটা ফুলমাত্র! ফুলের এক একটি পাপ্‌ড়ি এক হাত চওড়া, আর যেমন তাহার পাতার বহর তেম্‌নি তার রঙের বাহার। তাহার মধ্যে যে ঐ হাঁড়ির মত জিনিষটি দেখিতেছ, উহার মধ্যে ৭ সেরের বেশী জল ধরে অর্থাৎ ওটি যদি সত্যই হাঁড়ি হইত তবে উহার মধ্যে পোলাও রাঁধিলে ২৫ জন লোককে পেট ভরিয়া খাওয়ান যাইত। ফুলের পিছনে ঐ যে মস্ত বাঁধাকপির মত জিনিষটি দেখিতেছ, ওটি ফুলের কুঁড়ি! ফুলের পাপ্‌ড়িগুলি প্রায় এক আঙ্গুল পুরু।

ফুলটি "পরগাছা"—তার নিজের গাছ পাতা ডালপালা কিছুই নাই; কিন্তু সে অন্য গাছের শিকড় আশ্রয় করিয়া বেশ স্বচ্ছন্দে গজাইয়া উঠে। ফুলের গন্ধটি ঠিক মড়া পচার মত। সেই গন্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি উড়িয়া আসে। রাফ্‌ল্‌স্ সাহেবের নাম অনুসারে ফুলের নাম হইয়াছে "রাফ্‌লেসিয়া"।

রাফ্‌লেসিয়ার কাছে ভিক্টোরিয়া পদ্ম নেহাৎ ছোট ঠেকিবে—কারণ খুব বড় একটি ভিক্টোরিয়া পদ্ম চওড়ায় এক হাতের বেশী হইবে না! কিন্তু ফুলটিকে যদি খুব বড় বলিতে রাজি না হও, অন্তত পাতাগুলি যে খুবই বড় সে কথা মানিতেই হইবে। খুব বড় এক একটা পাতার মধ্যে অনায়াসেই এক একখানা খাট বসান যায়, চেয়ার

টেবিলশুদ্ধ ৫।৭টি লোক তাহার উপর সহজেই জায়গা করিয়া লইতে পারে। কিন্তু শুধু বড় বলিয়াই ইহার খাতির নয়—পাতার গড়ন যেমন সুন্দর, তেমনি তার চমৎকার রং। পাতার উপরটুকু সবুজ, আর তলার দিক টক্‌টকে লাল—পাতার চারিদিকে ঘেরা সেই

লাল রং ঠিক থালার কাণার মত উঠিয়া থাকে। ফুলের রং প্রায়ই সাদা অথবা হাল্কা গোলাপী হয়—আর তাহার গন্ধ নাকি এমন সুন্দর যে তেমন সুগন্ধ অতি অল্প ফুলেরই আছে।

যুদ্ধের ফিকির।

ফাঁকি দিয়ে রামচন্দ্রকে মারবার জন্য মকরাক্ষ কি রকম ফিকির ক'রেছিল কৃত্তিবাসের রামায়ণে তার গল্প আছে। সে তার রথের আশে পাশে অনেক গরু বেঁধে নিয়ে লড়াই কর্‌তে গেল; আর মনে করল যে রামচন্দ্র গরু মার্‌বেন কি ক'রে? পাছে

গোহত্যা হয় এই ভয়ে তিনি ভাল ক'রে যুদ্ধই করতে পারবেন না। কিন্তু বেচারার সে ফিকির খাট্‌ল না—

"মকরাক্ষ এসেছিল বুদ্ধি বড় সরু।
যুদ্ধ জিন্‌তে এসেছিল পালে বেঁধে গরু॥
বৃষভেতে টানে রথ গোচর্ম্মেতে ঢাকা।
বায়ুবাণে ধেনু উড়ে বেটা হৈল ভেকা॥
গোবৎস গোচর্ম্ম ধেনু বাণে গেল উড়ে।
চেয়ে দেখ রাক্ষসার মুণ্ড আছে পড়ে॥"

ইজিপ্ট্‌ দেশে এক সময় বেড়ালের ভারি সম্মান ছিল। সেখানকার লোকে বেড়ালের সেবা করত, আর প্রাণ গেলেও কেউ বেড়াল মারতে সাহস পেত না। শোনা যায় পারস্যের এক সেনাপতি একবার এই বেড়াল-ভক্তির সুযোগ বুঝে তাদের নাকাল ক'রেছিলেন। পারস্যের সৈন্যেরা হাজার হাজার বেড়াল সঙ্গে এনে যুদ্ধের সময় সেইগুলোকে সাম্‌নে ছুঁড়ে দিতে লাগ্‌ল। তাই দেখে ইজিপ্টের সৈন্যেরা এমনি ভয় পেয়ে গেল যে তারা তীর টীর ফেলে কেউ ছুটে পালাল, কেউ বা মাটিতে লম্বা হ'য়ে পড়্‌ল; আর বিপক্ষ দল সহজেই ফাঁকি দিয়ে যুদ্ধ জিতে কেল্লা দখল ক'রে নিল।

আজ কালকার যুদ্ধে অবশ্য এ রকম ফাঁকি চলে না। কিন্তু এখানেও ফাঁকি-চালাকির জায়গা আছে। যুদ্ধের কৌশল কেবল মারামারি কাটাকাটির মধ্যেই নয়, শত্রুর চোখে ধাঁধা দেওয়া, লুকোচুরির নানারকম কায়দা দেখান, যুদ্ধের মধ্যে এ সবেরই

দরকার হয়। শত্রুকে ডান দিক হ'তে আক্রমণ কর্‌ব, এই যদি আমার মৎলব হয়; আর তাকে যদি আমি বুঝ্‌তে দিই যে আক্রমণটা বাঁ দিকেই হবে; সেটা আমার পক্ষে একটা মস্ত লাভ। সেই জন্য যুদ্ধের দস্তুর এই যে, শত্রুর বাইরের ভড়ং দেখে ভুল্‌লে হবে না—সে ভিতরে ভিতরে কি কর্‌ছে—কোথায় কত সৈন্য রাখ্‌ছে বা সরাচ্ছে—এ সব খবর রাখ্‌তে হবে। আজকাল এরোপ্লেন হওয়ায় এসব খবর নেওয়ার ভারি সুবিধা হ'য়েছে। শত্রুর মাথার উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে তার পেটের কথা জেনে ফেলা যায়—শুধু যুদ্ধের জায়গাটিতে নয়, কিন্তু তার বিশ মাইল পিছনে সে কি কর্‌ছে, কোথায় কি কি রকম সৈন্য মজুৎ রেখেছে এই সব দেখে শুনে তার চাল চলনের হিসাব রাখা যায়। পাহাড়ের আড়ালে থেকে গোলা আস্‌ছে, অম্নি এরোপ্লেন উড়ে গিয়ে জেনে আস্‌ল, কামানটা কোথায়!

আজকালকার যুদ্ধের একটা অদ্ভুত মজা এই যে, যারা কামান ছোঁড়ে তারা প্রায়ই শুধু অঙ্কের হিসাব ক'রেই মারে—শত্রুকে বড় একটা চোখে দেখ্‌তে পায় না। এরোপ্লেন এসে খবর দিল, অমুক জঙ্গলের পিছনে শত্রু সৈন্যের আড্ডা, কিম্বা অমুক জায়গায় তার কামানের সার। তা' থেকে গোলন্দাজেরা তাদের ম্যাপ্ দেখে হিসাব ক'রে, তাদের কামান সেই-মুখো ক'রে বসায়, আর সেই রকম হিসাবমত তাদের গুলি ছোঁড়ে।

এরোপ্লেনেও কিন্তু সব লুকোচুরি ধরা পড়ে না। লোকে এরোপ্লেনকেও ফাঁকি দেবার নানারকম ফিকির শিখেছে। সব চেয়ে সহজ ফিকির হ'চ্ছে লুকিয়ে থাকা। রাস্তা দিয়ে কামানের সার চলেছে; যাই এরোপ্লেনের শব্দ পাওয়া গেল, অমনি হুড়মুড় ক'রে সব রাস্তা ছেড়ে গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়াল। আর এরোপ্লেনের সাধ্য কি তাকে খুঁজে বা'র করে।

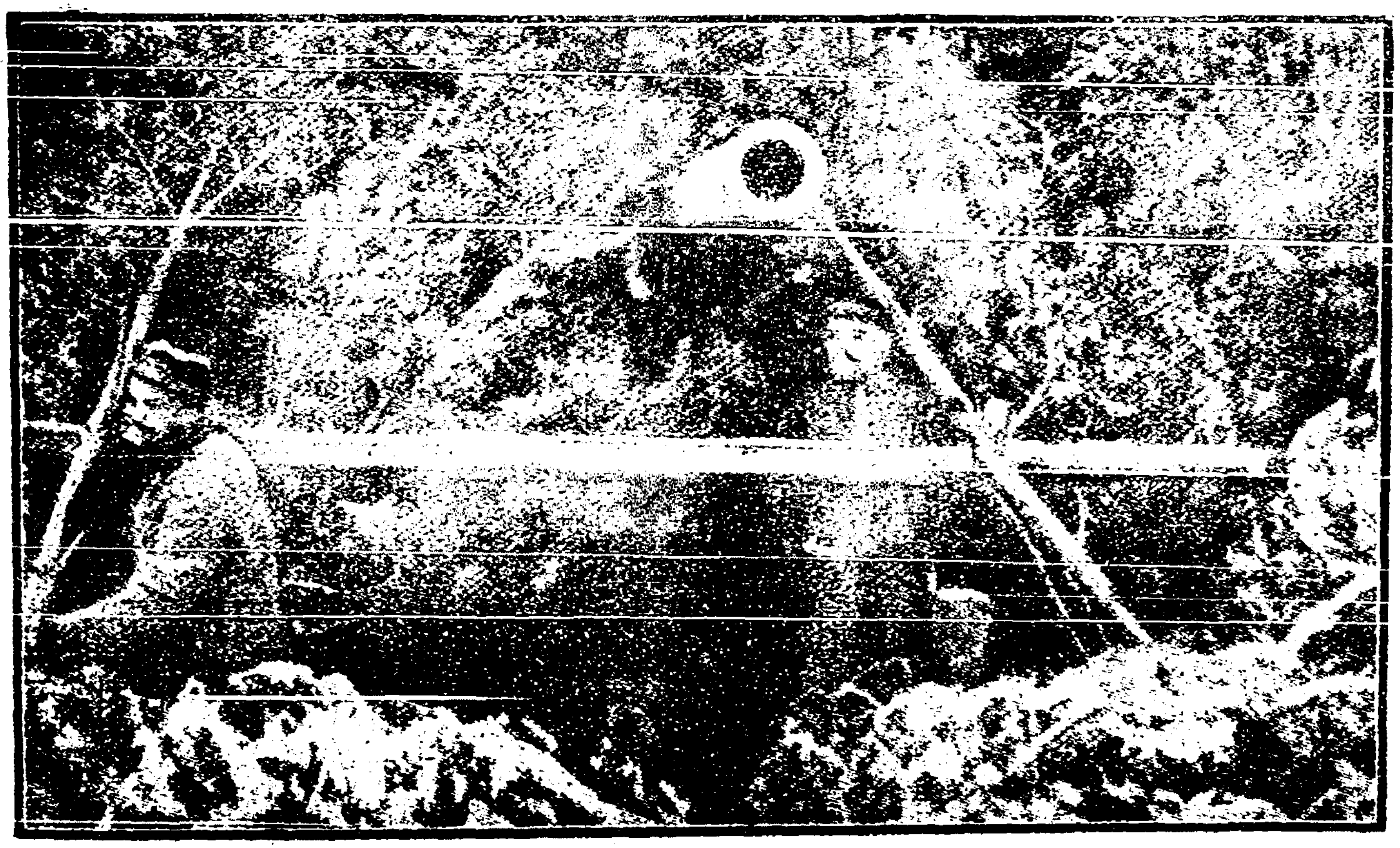

যেখানে সুবিধা আছে গাছের তলায় ঝোপের আড়ালে পাহাড়ের গর্ত্তে কামান

লুকিয়ে রাখলেই হয়, কিন্তু যেখানে সুবিধা নেই সেখানেই ফিকিরের দরকার। ছবিতে দেখ কতগুলো লতা পাতা দিয়ে একটা ফরাসী কামানকে কেমন সুন্দর ক'রে লুকিয়ে রেখেছে। এই কামানের উপর দিয়ে কত এরোপ্লেন উড়ে গেছে কিন্তু কেউ তার সন্ধান পায়নি। খোলা ময়দানের মধ্যে গর্ত্ত খুঁড়ে তার উপর ঘাসের চালা দিয়ে কামান লুকিয়ে দেখা গেছে, এরোপ্লেন থেকে সেটা ধরা যায় না। আবার তার চেয়েও চমৎকার একটা উপায় আছে—কামানে রং দিয়ে তাকে আশে-পাশের জমীর সামিল ক'রে দেওয়া। এ বিষয়ে ফরাসীরা খুব ওস্তাদী দেখিয়েছে—একটা ফরাসী কামানকে এই ভাবে রং করিয়ে খোলা ময়দানে মাসের পর মাস রাখা হ'য়েছে অথচ জর্ম্মান এরোপ্লেন তাকে দেখেও কামান ব'লে টের পায়নি।

শত্রুকে বুঝ্‌তে না দেওয়া যেমন একটা ফিকির—ইচ্ছা ক'রে ভুল বুঝানও তেম্‌নি। রাত দুপুরে অনেকগুলা মশাল জ্বালিয়ে দেও, এরোপ্লেনওয়ালা ঠিক ভাব্‌বে ওখানে সৈন্যেরা তাঁবু ফেল্‌ছে! সেই খবর পেয়ে শত্রুপক্ষ ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌বে আর খামখা সেই দিকে কামান ছুঁড়ে গোলা নষ্ট কর্‌বে। কাঠ বা কাগজ দিয়ে কামান বানিয়ে তাকে আধ ঢাকা ক'রে রেখে দেও, আর তার কাছে একটু ধোঁয়া দেও—একটা এরোপ্লেন গেলেই দেখ্‌বে কেমন মজা! সেই "কামান" ভাঙ্‌বার জন্য শত্রুদের হাজার হাজার টাকার গোলা নষ্ট হবে।

এরোপ্লেনওয়ালা যদি খুব সেয়ানা আর হুঁসিয়ার হয়, তবে সে অনেক ফিকির ধ'রে ফেল্‌তে পারে। একবার জর্ম্মানরা একটা মস্ত ঝোপ বানিয়ে তার মধ্যে কতগুলো কামান লুকিয়ে রেখেছিল। সেটাকে দেখে এক ফরাসী এরোপ্লেনওয়ালার সন্দেহ হ'ল—চষা ক্ষেতের মধ্যে হঠাৎ এত বড় ঝোপ কেন? সে সেই ঝোপের উপর কয়েকটা বোমা ফেল্‌তেই সব ফাঁস্ হ'য়ে গেল।

ঝোড়ো কাক।

তাহাকে আমরা সবাই "ঝোড়োকাক" বলিতাম। মাথাভরা রুক্ষ চুল—সে কোন দিন তাহা বুরুষ করিত না। বড় বড় ড্যাব্ ড্যাব্ চোখ আর বোকার মত হাসি, তার মুখের মধ্যে এই ছিল দেখিবার জিনিষ। বাস্তবিক সে এমন কুৎসিত ছিল, যে সকলেই বলিত যে পাখীগুলা পর্য্যন্ত তাহাকে দেখিলে ভয় পায়। তার উপর তার চলাফিরার ছিরি এমনই অদ্ভুত ছিল যে, দেখিলে হাসি থামান দায় হইত। তাতাড়া লোকটার কাজ-কর্ম্ম ছিল ভারি আনাড়ি রকমের।

আমরা একই বোর্ডিংএ থাকিতাম—কিন্তু আমাদের খেলা ও আমোদের মধ্যে তাহাকে বড় একটা ডাকিতাম না। সেও গায়ে পড়িয়া আমাদের হাসি তামাসার মধ্যে যোগ দিতে সাহস পাইত না; যদিও ভাবে গতিকে বোঝা যাইত যে আমাদের সঙ্গে মিশিবার ইচ্ছাটা তাহার মধ্যে ষোল আনা রহিয়াছে। আমরা তাহার উপর খুব মুরুব্বিয়ানা করিতাম এবং তাহার চেহারার দোষ বা বুদ্ধির অভাব বা কাজকর্ম্মের আনাড়িপনা লইয়া খুব কাটাকাটা রকমের ঠাট্টা তামাসা করিতাম। সে মনে মনে দুঃখিত হইলেও কোন দিন প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইত না। আমরা ফুটবল খেলিতাম, সে রোজ উৎসাহ করিয়া তাহা দেখিত। একদিন সে নিজেই সখ করিয়া খেলায় নামিল, কিন্তু সেদিন সে খেলার সময় এমন হাস্যজনক রকমের আনাড়িপনা দেখাইয়াছিল যে, আমরা তাহাকে ধমক দিয়া তাড়াইয়া দিলাম—সেই হইতে তাহাকে আর খেলার কাছে যাইতে দেখি নাই। রাগে দুঃখে ও অপমানে সে কয়দিন আমাদের সঙ্গে কথা বলিল না।

ইহার মধ্যে আমরা একদিন ঠিক করিলাম নৌকা বাহিয়া মুকুন্দপুর পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসিব। সে দিন সে, কি যেন কি মনে করিয়া, আপনা হইতেই জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে সঙ্গে নেবেন?" আমাদের পরেশবাবু এক ধমক দিয়া বলিলেন, "কেন বাপু? তুমি ত বেশ আছ। আবার নৌকায় চড়বার সখ কেন?" আর একজন বলিয়া উঠিলেন "না হে, ওসব অলক্ষণ জুটিও না"। কিন্তু আমাদের আর দুইজনের কি সুমতি হইল, আমরা হঠাৎ তাহাকে লইতে রাজি হইলাম। বৈকাল বেলা আমরা পাঁচজনে নৌকায় উঠিলাম—অর্থাৎ আমরা চারজন ও "ঝোড়োকাক"। আমরা দুইজন দাঁড় টানিয়া চলিয়াছি—দেখিতে দেখিতে নৌকা অনেকদূর আসিয়া পড়িল। এমন

সময় পরেশ জিজ্ঞাসা করিল "কেমন হে, ঝোড়োবাবু, দাঁড়টান্‌তে জান ত ?" ঝোড়ো খানিকক্ষণ ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করিয়া তাকাইয়া বলিল, "আজ্ঞে কখন ত টানিনি" ! পরেশ বলিল "তবে ত, চিত্তির করেছ ? বলি, কেবল তোমার রূপ দেখ্‌লে ত আমাদের নৌকা চল্‌বে না—জান আর না জান দাঁড় টান্‌তে হবে"। তখন আমরা সকলে মিলিয়া হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলাম—এত বড় বেয়াদবী ! আমরা দাঁড় টানিয়া মরিব আর উনি কোন্‌ নবাবপুত্র যে ভুঁড়ি দোলাইয়া আরাম করিবেন ?

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। আমরা তখন বাড়ী ফিরিতেছি—হঠাৎ এক জায়গায় নৌকা ঘুরাইতে গিয়া একটা আধ-ডুবান বাঁশের মাথায় নৌকা লাগিয়া গেল। দোষ আমাদেরই ছিল কিন্তু আমরা ঐ বোকারামকে বকিয়া গায়ের ঝাল ঝাড়াইলাম। তারপর খানিকদূর যাইতেই বোঝা গেল যে, নৌকার পাশে ফুটা হইয়াছে—জল উঠিতেছে। ভয়ে আমাদের মুখ শুকাইয়া গেল। নৌকাটা একটু হাল্কা হইলে, জল কম উঠিবে—এই মনে করিয়া পরেশ বলিল, "তোমরা কেউ সাঁতার জান" ? আমরা সকলেই বলিলাম "ভাল জানি না"—ঝোড়োকাক বলিল "আমি একটু একটু জানি"। পরেশ আবার বলিল, "একজন যদি একটু জলে নামিয়া সাঁতার কাটিতে থাকি, বাকী কয়জন ততক্ষণে ধাঁ করিয়া ঐ দিকে গিয়া লোক ডাকিয়া আনিতে পারি"। কথাটা বিশেষ ভাবে ঐ "ঝোড়ো"কে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইল—সেও তাহা বুঝিয়াও চুপ করিয়া রহিল। তখন আমাদের মধ্যে একজন হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "ওঁর নতুন কাপড়টি ভিজে যাবে তাই ওঁর মায়া হ'চ্ছে"। কথাটা বড় কর্কশ শুনাইল—শুনিতে সকলেরই খারাপ লাগিল। ঝোড়ো আর কথাটি না বলিয়া জলে নামিয়া অদ্ভুত ভাবে হাত পা ছুঁড়িয়া চারিদিকে জল ছিটাইয়া সাঁতার কাটিতে লাগিল। সে বলিল, "ভাই তোমরা বেশী দেরী করিও না—আমার সাঁতার কাটা ভাল অভ্যাস নাই।"

আমাদের সকলেরই মনে খুব কষ্ট হইলেও, তাহার সাঁতারের ভঙ্গী দেখিয়া আমাদের হাসি পাইল। কিন্তু তখন আর ভাবিবার সময় নাই ! আমরা প্রাণ পণে দাঁড় টানিতে টানিতে জল সেঁচিতেছি—আর চীৎকার করিয়া ডাক দিতেছি "কে আছ ? নৌকা লইয়া শীঘ্র আইস"। ডাকিতে ডাকিতে ক্রমে সাড়া পাইলাম। দেখিলাম দু তিনটি নৌকা এদিকে আসিতেছে। মনে হইল, যেন নৌকা আসিতেই চায় না।

মনে হইল, সেই বেচারা না জানি কি করিতেছে ? মনে হইল আর কোন দিন তাহার মনে কষ্ট দিব না।

নৌকা আসিল ; সকলে মিলিয়া সেই জায়গার চারিদিকে কত খুঁজিলাম—কিন্তু আমাদের "ঝোড়োকাক"কে আর খুঁজিয়া পাইলাম না !

বজ্র।

আকাশে যখন বিদ্যুৎ চমকায় আর তার পরেই গুরু গুরু করে ভয়ানক শব্দ হয় আমরা তাকে বাজ পড়া বলি। অনেক লোকের বিশ্বাস সেই সময়ে বাজ বলে সত্য

সত্যই একটা কিছু পড়ে। আমাদের এক বামুন ঠাকরুণ ছিল সে একদিন আমাদের কাছে গল্প করল যে তার বাড়ীর কাছেই বাজ পড়েছে আর সে বাজটা নাকি সে নিজের চোখে দেখে এসেছে। বাজটার সে কি রকম বর্ণনা দিয়েছিল তা আমার মনে নাই। সেই থেকে বাজ পড়বার গল্প শুনলেই আমরা জিজ্ঞাসা করতাম বাজটা দেখা গেছে কিনা, সেটা দেখ্‌তে কি রকম আর কত বড়।

আসলে কিন্তু বাজ পড়বার সময় সত্য সত্যই কিছু পড়ে না। বিদ্যুতের ঝিলিক লেগে বাতাসটা হঠাৎ গরম হয়ে ছট্‌কিয়ে পড়ে আর পরের মূহুর্ত্তেই সেই বাতাস ফিরে আসতে গিয়ে ভয়ানক ঠোকা ঠুকি লাগিয়ে দেয়, এই ঠোকা ঠুকির শব্দকেই আমরা বাজ পড়া বলি। কিন্তু তবু দেখা যায় বাজ বলতে সত্যই যে কিছু একটা পড়ে এ বিশ্বাস পৃথিবীর নানা জায়গায় নানা জাতীর মধ্যে দেখা যায়। অনেক পুরাতন পুঁথির মধ্যে এই রকম বাজ পড়ার গল্প আছে।

এ বিশ্বাস যে একেবারে মিথ্যা তা নয়। উল্কা পড়তে দেখে লোকে তাকে বাজ মনে করে এ সব গল্প লিখেছে। তোমরা বোধ হয় অনেকেই দেখেছ যে মাঝে মাঝে এক একটা তারা যেন হঠাৎ আকাশের মাঝ দিয়ে ছুট্ দেয়। এগুলি আসলে কিন্তু তারা নয়, এদের উল্কা বলে। উল্কাগুলি পৃথিবীর মত সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে এক একটা পথ চল্‌তে চল্‌তে পৃথিবীতে ঢুঁ মারতে আসে, কিন্তু উল্কাগুলি চলে এমন ভয়ানক জোরে যে পৃথিবীর বাতাসের ঘসায় সেগুলি গরম হয়ে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ক্বচিৎ এক আধটার পুড়তে পুড়তেও কিছু বাকি থেকে যায়, সেগুলি তখন ভয়ানক শব্দ করে পৃথিবীর যেখানে এসে পড়ে সেখানে প্রকাণ্ড পাতকুয়ার মত গর্ত্ত হয়ে যায়। আশে পাশে গাছ পালায় আগুন জ্বলে উঠে। চারিদিকের মাটি এত গরম হয়ে উঠে যে হয় ত চব্বিশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত লোকে তার কাছে যেতে পারে না; এ রকমের উল্কা এ পর্য্যন্ত অনেক পাওয়া গেছে। কলকাতার জাদুঘরে গেলে সেখানেও এরূপ উল্কা দেখতে পাবে। এখানে একটা উল্কার ছবি দেওয়া গেল। উল্কাটি একটা ছোট খাটো হাতির সমান বড়, ওজন দুই শ' মণেরও উপরে। উল্কাটি পুড়ে এইটুকু অবশিষ্ট আছে; পুড়বার আগে অন্ততঃ এর দশ গুণ ছিল। পুড়বার সময় তার ভয়ানক শব্দে অনেক দূর পর্য্যন্ত লোকের ভয় লেগে গিয়েছিল, আর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মাঠ গ্রাম সব ধোঁয়ায় ছেয়ে ছিল।

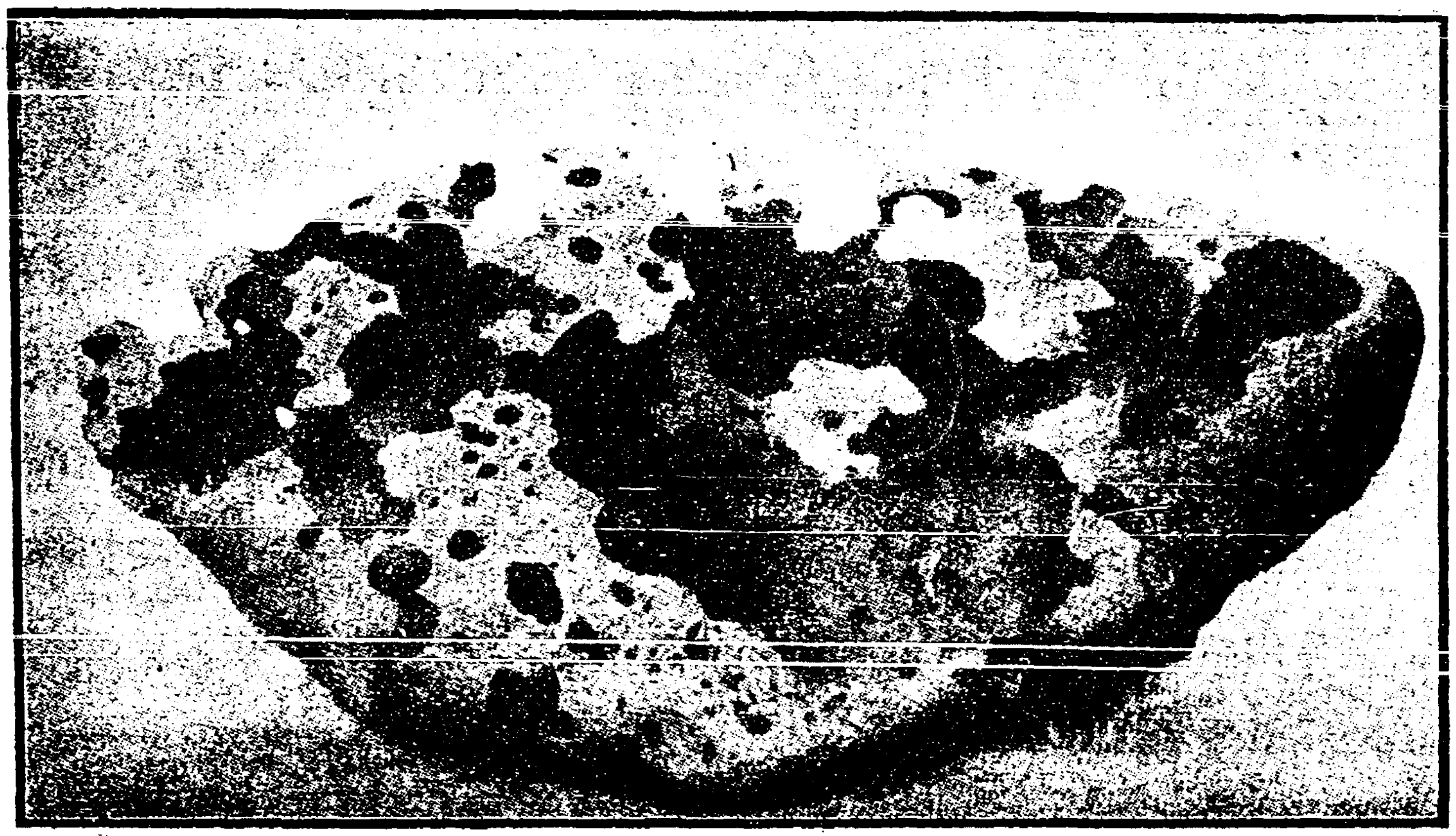

আমেরিকার এক পাহাড়ে উল্কা পড়ে তার চুড়া ভেঙ্গে প্রকাণ্ড গর্ত্ত হয়ে গিয়েছিল এখনও সেখানে খুঁজলে উল্কার টুক্‌রা পাওয়া যায়।

জানোয়ারের ভালবাসা।

তোমরা অনেকেই বোধ হয় দেখেছ, কুকুরের যখন ছানা হয়, তখন সে অচেনা লোক কাছে এলেই 'ঘোঁ' ক'রে শব্দ করে, আর বেশী কাছে এলে কাম্‌ড়াতে যায়। চেনা লোক কাছে গেলে, অনেক সময়ই সে আনন্দে ল্যাজ নাড়ে, আর তার বাচ্চার গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করলে সেও খুব খুসী হয়। হয় ত সে আহ্লাদে এসে তোমার হাতও চেটে দিতে পারে। প্রায় সব জন্তুরই তার ছোট ছানাদের প্রতি ভালবাসা অত্যন্ত বেশী ;—এমন কি অনেক সময় তাদের, ছানাকে রক্ষা কর্‌বার জন্য প্রাণ দিতেও দেখা গেছে।

পরের পৃষ্ঠায় যে ছবি দেখ্‌ছ, এটা একটা সত্যি ঘটনার ছবি। কয়েকজন শিকারী, বরফের দেশে, বল্লম নিয়ে শিকার কর্‌তে গিয়ে ছিলেন। সেখানে একটি সিন্ধু ঘোটক আর তার ছোট্ট ছানাটিকে দেখ্‌তে পেয়ে তাদের মার্‌তে গেলেন। মায়ের প্রাণ ছানার জন্য অস্থির হয়ে উঠ্‌ল ; সে ছানাকে তার সাম্‌নের পা দিয়ে ঢেকে নিজে বল্লমের খোঁচা গা পেতে নিতে লাগ্‌ল, কিছুতেই সরে গেল না। ছোট্ট ছানাটির ভয়ের চেহারা, আর তার মায়ের মুখে ছানার জন্য ব্যস্ত ভাব দেখে শিকারীদের বড় দুঃখ হ'ল। কিন্তু সে দুঃখের দরুণ তাদের কাজ আট্‌কাল না। সিন্ধু ঘোটকের দামী চামড়ার লোভ তারা কিছুতে সাম্‌লাতে পার্‌ল না,—ছানা আর তার মা দু জনেই বল্লমের খোঁচায় মারা গেল।

আরেকটি যে ছবি দেওয়া হ'লো, এতেও দেখ একটি শাদা ভাল্লুক তার ছানাকে রক্ষা কর্‌বার জন্য কতগুলো কুকুরের সঙ্গে লড়াই কর্‌ছে। 'সন্দেশে' হিমের দেশের কথা লেখার সময় যে কেন্‌ সাহেবের কথা বলা হয়েছিল, এই ঘটনা সেই কেন্‌ সাহেবের দলের লোকেরা দেখেছিলেন। ভাল্লুকটা তার ছানাকে নিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় ৪।৫ টা কুকুরে তাদের তাড়া কর্‌ল। সে প্রথমে উঠে দৌড় দিল, কিন্তু ছানাটা তার সঙ্গে আস্‌তে পার্‌ছে না দেখে তাড়াতাড়ি ফিরে এল, আর ছানার পেটের নীচে পা গলিয়ে দিয়ে তাকে ছুঁড়ে আগে ফেলে দিল। এই রকমে ছানাটাকে একটু নিরাপদ জায়গায় পাঠিয়েই সে কুকুরগুলোর সঙ্গে লড়াই কর্‌তে ফিরে দাঁড়াল। ছানাটা কিন্তু আর এগিয়ে যেতে সাহস পেল না। সে ফিরে ফিরে দেখ্‌তে লাগ্‌ল,—যেন সে তার মায়ের সাহায্য চায়। আবার ভাল্লুকটা

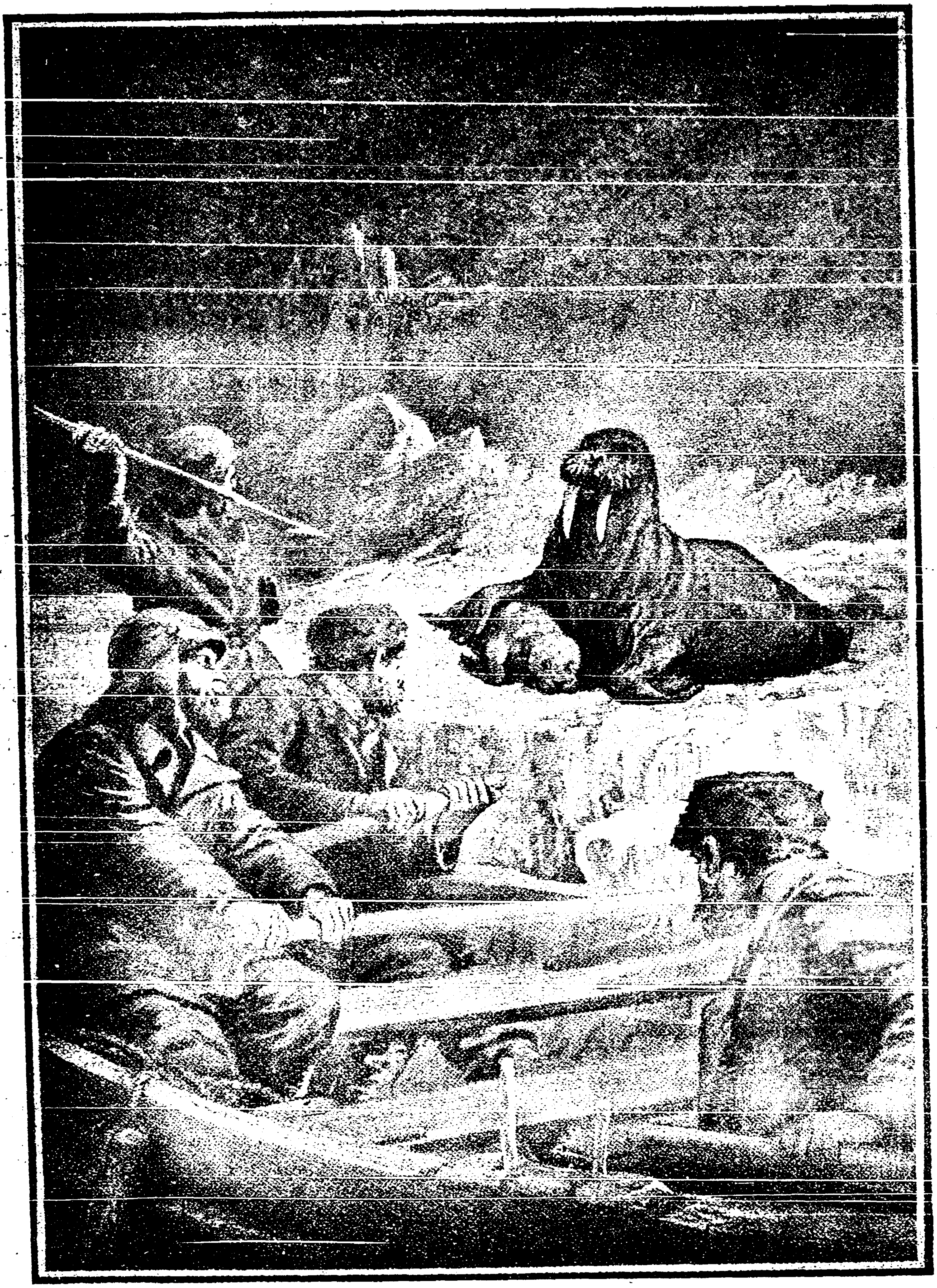

সিন্ধুঘোটকের মাতৃস্নেহ।

তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কুকুরের সঙ্গে লড়াই কর্‌তে লাগ্‌ল। কখনও পা দিয়ে, কখনও টুঁটিতে কাম্‌ড়িয়ে ধরে সে ছানাটাকে দূরে ফেলে দিচ্ছে, আর নিজে কুকুরগুলোর সঙ্গে লড়াই কর্‌ছে। কিন্তু এ রকমে আর কতক্ষণ চলে; শেষে ভাল্লুকটা ক্লান্ত হয়ে পড়্‌ল। তখন আর বেচারা কি করে?—তার বুকের নীচে ছানাকে আগ্‌লিয়ে নিয়ে

পাগলের মত হয়ে কুকুরগুলোকে থাবা মার্‌তে আর কামড় দিতে চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌ল। যতক্ষণ সে বেঁচে ছিল, তার ছানাকে রক্ষা করেছিল; শেষে এক বন্দুকের গুলি খেয়ে তার মৃত্যু হ'লো। ছোট ছানাটি এতক্ষণ চুপ ক'রেছিল; কিন্তু তার মাকে পড়ে যেতে দেখে সে লাফিয়ে উঠে কুকুরগুলোকে আক্রমণ কর্‌ল। কুকুরেরা তো ভয়ে তার দিকে এগুতেই পারে না;—সে এমন ভয়ানক লড়াই কর্‌তে আর চ্যাঁচাতে লাগ্‌ল। শেষে তাকেও গুলি ক'রে মার্‌তে হ'লো। প্রথমে একটা গুলি খেয়েও সে কোন রকমে গড়িয়ে তার মায়ের

মৃত দেহের কাছে গিয়ে সেটাকে রক্ষা কর্‌ছিল। তখন তাকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলা হ'লো।

জানোয়ারদের সম্বন্ধে দেখা যায় যে তাদের ছানা যখন ছোট থাকে তখনই তারা ছানাদের বেশী ভালবাসে। ছানারা বড় হ'লে সে ভালবাসা প্রায়ই চ'লে যায়। যে কুকুরটা আজ তার ছোট্ট ছানার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারে, সেই কুকুরটাই দু দিন পরে তার ছানা বড় হ'লে, তার সঙ্গে সামান্য খাবার জিনিষ নিয়ে মারামারি কাম্‌ড়া কাম্‌ড়ি কর্‌তে পারে। ছানা বড় হয়ে গেলে জানোয়ারেরা তাদের বড় একটা খোঁজও নেয় না। যতদিন তারা অসহায় অবস্থায় থাকে,, ততদিনই তাদের প্রতি মায়া, তাদের প্রতি ভালবাসা।

গল্পসল্প।

বাংলা অক্ষরে যেমন অন্য সব ভাষার সকল কথা লেখা যায়—যেমন "আই গো আপ্‌", কিম্বা কোন নাম, যেমন "লর্ড কারমাইকেল", "জেম্‌স্‌ ওয়াট্‌"। সে রকম কিন্তু সব ভাষায় চলে না। চীনা ভাষায় এক একটি অক্ষর এক একটা কথা। একজন বাঙ্গালী বাবু একজন চীনা ভদ্রলোককে বল্লেন, "আপনি আপনাদের ভাষার অক্ষরে আমার নাম লিখুন তো। আমার নাম—ধ্রুব।" চীনা ভদ্রলোকটি অনেকক্ষণ ভেবে চিন্তে কতকগুলি হিজিবিজি কি যেন লিখ্‌লেন। সেই লেখা অন্য একজন চীনাকে পড়্‌তে দেওয়া হ'লে সে বল্ল, "এতে লেখা রয়েছে—ডু-লু-ফা।" একজন জাপানী ভদ্রলোক ট্রাফালগারের সম্বন্ধে জাপানী ভাষায় কি যেন লিখ্‌ছিলেন। তাঁর লেখার মধ্যে যেখানে ট্রাফালগার কথাটা আছে, সেটা তিনি ইংরাজীতেই লিখ্‌ছিলেন। একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "আপনি ও কথাটা ইংরাজীতে লিখলেন যে?" জাপানী ভদ্রলোক বল্লেন, "আমাদের ভাষার অক্ষর দিয়ে ট্রাফালগার লেখা যায় না; সব চেয়ে কাছাকাছি যা লেখা যায় তার উচ্চারণ হচ্ছে—ত্রা-ফারু-গারু!"

একটি ভদ্রলোকের চীনা ভাষা শেখ্‌বার ইচ্ছা হ'লো। তিনি একটি চীনা পণ্ডিতকে মাইনে ক'রে রাখ্‌লেন। সে তো প্রথম দিন এসেই বল্ল, "আমি আজ 'চঁ'

কথাটার মানে আপনাকে শেখাব।” সেই ‘চঁ’ কথাটাকেই সে কত রকম মুখ ভেংচি ক’রে বল্ল। কোনটা শুনতে চ্চ-এর মত, কোনটা চঃ-এর মত, কোনট চং-এর মত। এই রকমে প্রায় ২০।২৫টা ‘চ’ ব’লে সে বিকট মুখ ভেংচি দিয়ে—‘চ’ বলে বল্ল “বল তো এর মানে কি ?”—বাবুর তো চক্ষু স্থির! তিনি সেই দিনই তাঁর পণ্ডিতের মাইনে চুকিয়ে দিয়ে তাকে বিদায় ক’রে দিলেন। বল্লেন, “আমার চীনে ভাষা শিখে দরকার নেই।”

এক সাহেবের বড় বাংলা শিখ্‌বার সখ হ’লো। তিনি এক পণ্ডিত রেখে খুব উৎসাহের সঙ্গে পড়্‌তে আরম্ভ করলেন। গোড়ায় কয়েকদিন বেশ উৎসাহের সঙ্গে পড়া চল্লো; কিন্তু যখন যুক্ত অক্ষর পড়া আরম্ভ হ’লো, তখনই তো সাহেবের যত গোল বাধ্‌ল। তিনি যুক্ত অক্ষর দেখে তো চটেই অস্থির,—“কি! একটা অক্ষরের ঘাড়ে আর আরেকটা অক্ষর! এমন আজগুবী ভাষাও তো দেখি নি। এমন ভাষাও আবার ভদ্রলোকে পড়ে!” মানুষের ঘাড়ে মানুষ, আর অক্ষরের ঘাড়ে অক্ষর, এ কেবল তোমাদের দেশেই সম্ভব।

এক সাহেব একবার একটি মুসলমান ভদ্রলোককে তাঁর নিজের সম্বন্ধে কি যেন একটা গল্প বল্‌ছিলেন। মুসলমান ভদ্রলোকটি সাহেবের গল্প শুনেই যাচ্ছেন আর মাঝে মাঝে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ছেন। সাহেব বেচারা অনেকক্ষণ ধরে উৎসাহের সঙ্গে ব’লে গল্পটা শেষ কর্‌লেন; কিন্তু গল্পটা যখন শেষ হ’লো তখন সেই মুসলমান ভদ্রলোক গম্ভীর ভাবে বল্‌লেন, “হাম আঙ্গ্‌রেজী নেহি সমঝ্‌তা।” সাহেব বেচারা তখন বেজায় দ’মে গেলেন।

ধাঁধা।

এক ভদ্রলোককে একটি ছেলে তাঁর বয়স জিজ্ঞাসা করেছিল। তিনি তার উত্তর দিলেন এই রকম ঃ—

তোর যে দিনে জন্ম তখন আমার বয়স খানি,
এখনকার তোর বয়সের সমান ছিল জানি।
আরো বলি হোক না ক্রমে চৌদ্দ বছর গত,
তোর বয়সটি হবে আমার এই বয়সের মত॥

বল তো ভদ্রলোকটির বয়স কত ?

তিনটি অক্ষরে তার কপালে আগুন,
লেজ কেটে গান গায় গুন গুন গুন।
পেট বাদে পায়ে বেড়ি ঠন ঠন বাজে,
মাথা কেটে গাছ হয়ে থাকে বন মাঝে॥

এক বাড়ীর দেয়ালে বারো হাত লম্বা আর দু'হাত চওড়া একটা ফুটো ছিল। সে বাড়ীতে এক টুকরা তক্তা ছিল, সেটা আট হাত লম্বা আর তিন হাত চওড়া। তক্তাটা কোন কাজে আস্‌বে না ব'লে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু একজন মিস্ত্রী সেটাকে দেখে বল্ল, "আমি এটাকে দু' টুক্‌রো ক'রে কেটে এই কাঠ দিয়েই সমস্তটা ফুটো বুজিয়ে দেবো।" বল তো, সে কেমন ভাবে কাঠটা কাট্‌তে আর লাগাতে চেয়েছিল ?

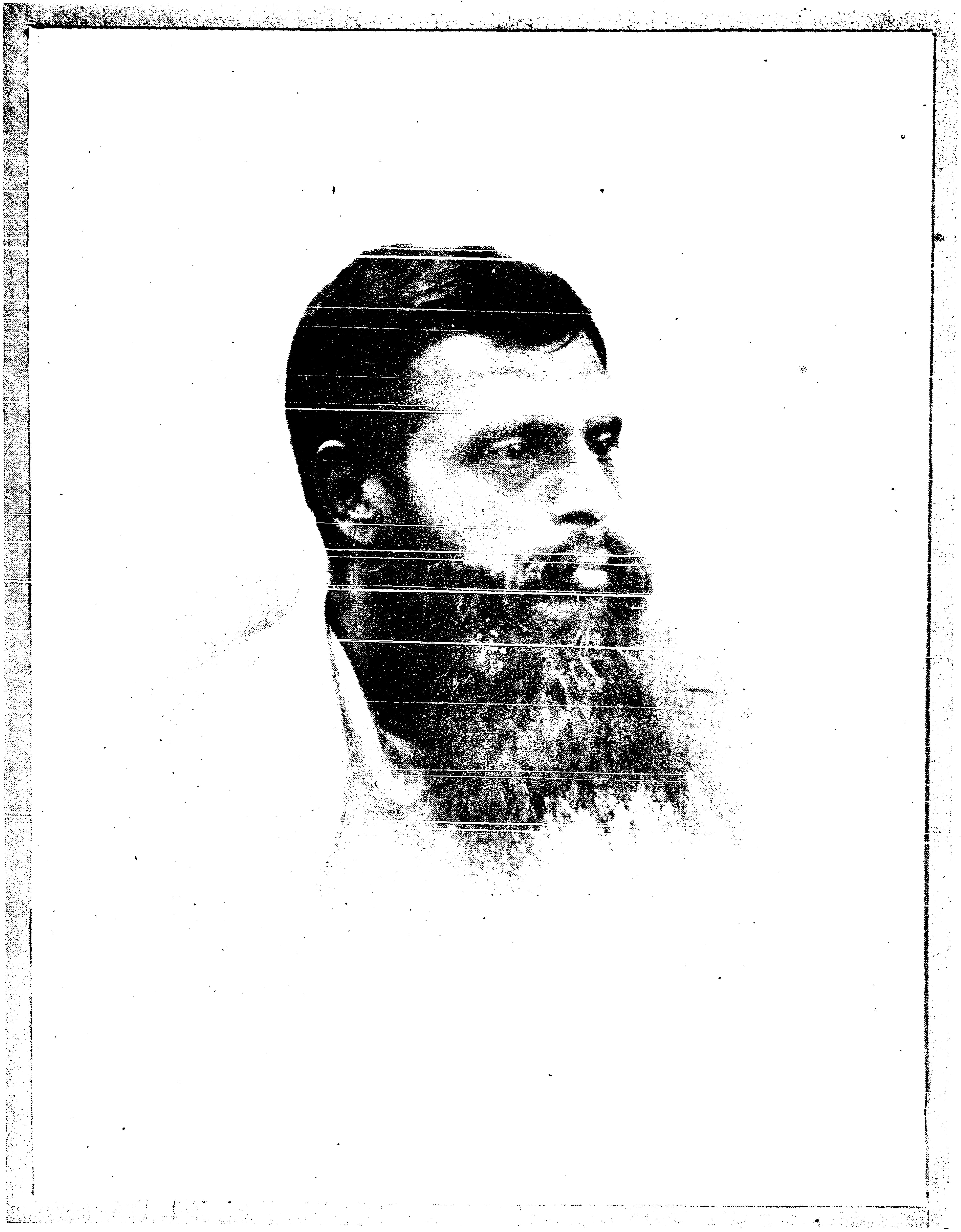

তৃতীয় বর্ষ　　　মাঘ, ১৩২২　　　দশম সংখ্যা

উপেন্দ্রকিশোর।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

১

দিব্য কান্তি সুঠাম-দেহ,
প্রাণভরা প্রেম, প্রীতি ও স্নেহ,
　　'সঙ্গীত কলা' রসে ভোর,
বিদ্যা-বিনয় ভূষিত চিত্ত
গলাগলি করি শিল্প সাহিত্য
　　মূর্ত্তিমান্ উপেন্দ্র-কিশোর।

২

সৌম্যমূর্ত্তি মধুর হাসি
প্রাজ্ঞ আলাপী সুমিষ্টভাষী,
　　ফুল্ল কুসুম ভব-কাননে,
ভক্তি-অশ্রু শিশির বিন্দু
শোভিত সে ফুল, হে কৃপাসিন্ধু
　　ঝরিয়া পড়িল তব চরণে।

৩

অনিত্য জগতে স্থায়ী কিছু নয়,
তোমার চরণে স্থিতি যাঁর হয়,
অমর সে মর জীবনে ;
দূর কর মোহ স্ব-জন সবার,
ঘুচাও সন্তাপ শোক-হাহাকার,
"তোমার মধুর সান্ত্বনে"।

পাহাড়িয়া পাখী।

স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর।

"সন্দেশের" পাঠকপাঠিকাগণ, যে দারুণ শোকসংবাদ বহন করিয়া এই সংখ্যার 'সন্দেশ' তোমাদিগের নিকট যাইতেছে, তোমাদের কোমল হৃদয়ে তাহা নিশ্চয়ই আঘাত দিবে। "সন্দেশের" সম্পাদক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী আর ইহজগতে নাই। যিনি বহু বৎসর ধরিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম, অজস্র অর্থব্যয়, অশেষ আদর ও যত্ন করিয়া তোমাদিগের মনোরঞ্জন করিয়াছেন, কত মজার কথা, কত সুন্দর উপদেশ, কেমন রঙ্গিন ছবি পূর্ণ করিয়া মাসে মাসে তোমাদের হাতে "সন্দেশ" দিয়া তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করিতেন এবং তাহাতে নিজে কত না আনন্দ লাভ করিতেন, তোমাদিগের সেই বন্ধু তোমাদিগকে ছাড়িয়া বিগত ৪ঠা পৌষ প্রভাতে পরলোকবাসী হইয়াছেন। তোমরা অনেকেই হয়ত তাঁহাকে দেখ নাই, কেহ কেহ হয় ত তাঁর নামও জান না ; কিন্তু সকলেই "সন্দেশ" বা অন্যান্য মাসিক পত্রে তাঁর মজার গল্প ও কবিতা পড়িয়াছ, তাঁর হাতের আঁকা ছবি দেখিয়াছ, যেমন ভাবে বলিলে বেশ সহজে তোমরা বুঝিতে পার তেমন ভাবে লিখিত উপদেশ পাইয়াছ। তোমরা তাঁহাকে না চিনিলেও, তিনি তোমাদিগকে,—বাঙ্গলার সকল বালকবালিকাকে,—শিশুদের মনটিকে, বেশ চিনিতেন। তাই যেটি বলিলে এবং যেমন ভাবে বলিলে, তোমরা বুঝিবে, তোমাদিগের মনের মত হইবে, তোমাদিগের প্রতি গভীর স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া বহু পরিশ্রম ও যত্ন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি

ও নিপুণতা প্রয়োগে তোমাদিগকে শিক্ষা ও আমোদ দিতে, তোমাদিগকে "ফূর্ত্তি" দিয়া ভাল করিতে তিনি সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন। বয়সে তিনি প্রবীণ হইলেও, নানা গুণে তিনি অলঙ্কৃত হইলেও, তাঁর প্রাণ তোমাদেরি মত সহজ, সরল ছিল; যেন তোমাদেরি তিনি সমবয়সী—তাই যাহারা তাঁহাকে দেখিয়াছ, তাহাদের মধ্যে অনেকে নিঃসঙ্কোচে তাঁর সহিত কথা বলিয়া কত আনন্দ পাইয়াছ! এই শিশুর মত সরল বিশ্বাসী, শিশুবৎসল ও মধুর হৃদয় বন্ধুকে তোমরা হারাইয়াছ! যাঁহার প্রাণের মাধুর্য্য, চরিত্রের সুবাস ও শুভ্রতা বহন করিয়া "সন্দেশ" তোমাদের কাছে এত মিষ্টি লাগিত, যাঁহার প্রাণের আনন্দ, চিত্রে ও গল্পে, গান ও কবিতার মধ্য দিয়া তিনি তোমাদিগকে বিলাইয়া দিতেন, আজীবন তোমাদিগের সেবা করিয়া যিনি এখন বিশ্রাম লাভ করিতে লোকান্তরে চলিয়া গিয়াছেন, আর তোমরা তাঁহাকে দেহে দেখিতে পাইবে না, এবারের

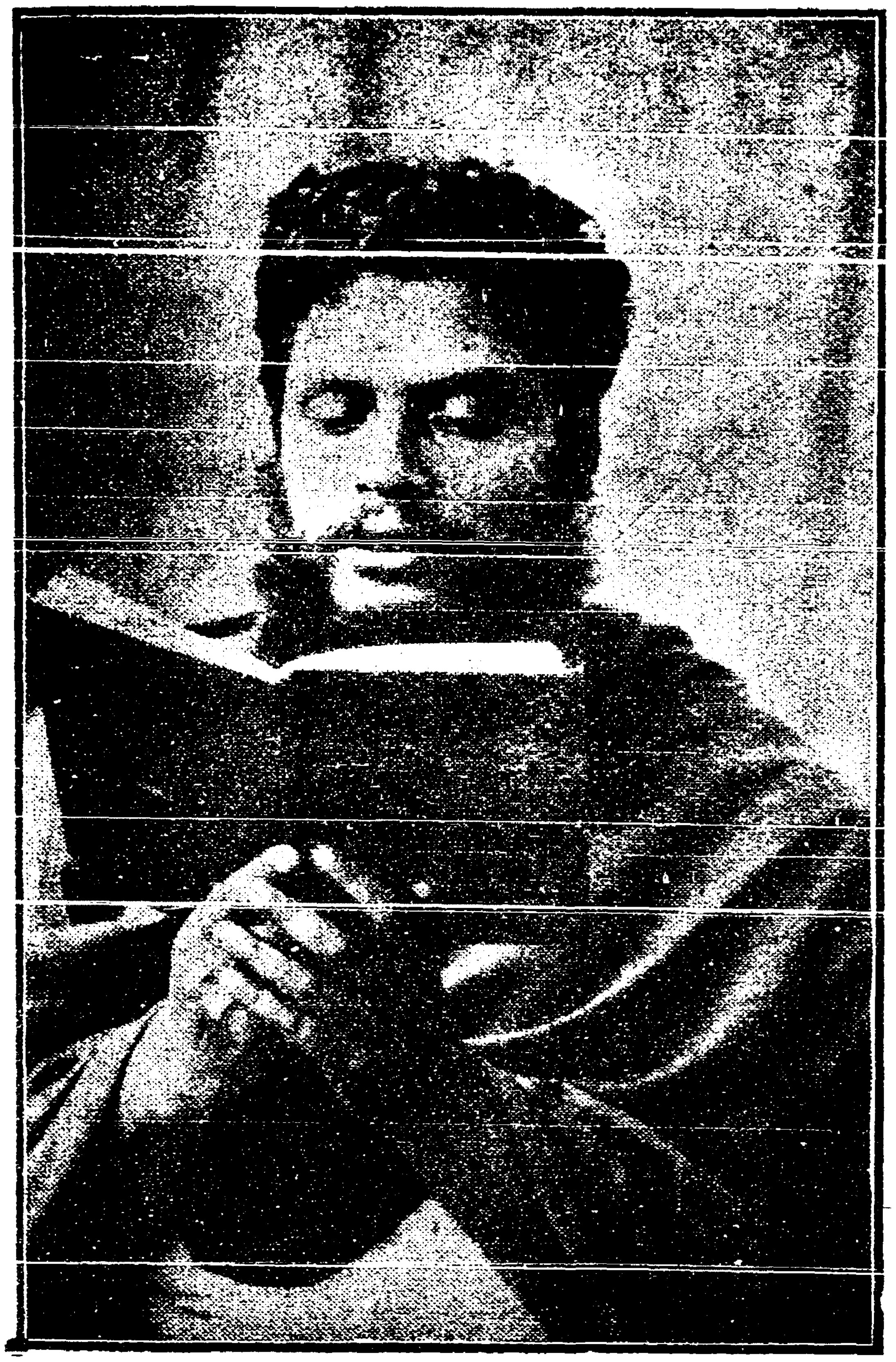

চিত্রে এই শেষ দেখা দেখিয়া লও! কত উৎসবে আমোদে কত বালকবালিকা তোমরা তাঁহার রচিত গান, তাঁহারই প্রদত্ত সুর তাঁহারই কাছে শিখিয়া, তাঁহার বেহালার ও কণ্ঠের সহিত তোমাদের কণ্ঠ মিলাইয়া গাহিয়াছ। সে কণ্ঠ আজ নীরব!

ময়মনসিংহ জেলার মসূয়া গ্রামে ১২৭০ সালে (১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে) ২৮শে বৈশাখ উপেন্দ্রকিশোর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ তেজস্বী ধার্ম্মিক ও বিদ্বান বলিয়া দেশে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ৺লোকনাথ রায়কে লোকে 'মুন্সী' শ্যামসুন্দর বলিয়া জানিত। পার্শি এবং সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কথা সে অঞ্চলে এখনও শোনা যায়।

শ্যামসুন্দরের প্রথম পুত্র সারদারঞ্জন রায় এখন মেট্রপলিটান কলেজের প্রিন্সিপাল। গণিত ও সংস্কৃতে ইনি সুপণ্ডিত।

শ্যামসুন্দরের দ্বিতীয় পুত্র কামদারঞ্জন; পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁহার খুড়া ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ উকীল ও জমীদার হরিকিশোর রায়চৌধুরী তাঁহাকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন এবং সেই অবধি তাঁহার নাম হইল উপেন্দ্রকিশোর।

বালক উপেন্দ্রকিশোর ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে ভর্ত্তি হন; অতি শৈশবেই তিনি আপনা হইতেই শিল্প সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। কথিত আছে শিশু উপেন্দ্রকিশোর পিতার সম্মুখে নাচিতে নাচিতে "যদু বলে কানু ভাই, ছাড় দুনিয়ার বাদসাই!' বলিয়া গান করিতেন। বিনা শিক্ষা ও সাহায্যে অতি অল্প বয়সে শুধু স্বাভাবিক প্রতিভা ও নিজের আগ্রহে তিনি বাঁশী ও বেহালা বাজাইতে ও ছবি আঁকিতে শিখিয়াছিলেন। একবার তখনকার লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর সার আসলি ইডেন (Sir Ashley Eden) ময়মনসিংহ জেলা স্কুল পরিদর্শন করিতে গিয়া হটাৎ বালক উপেন্দ্রকিশোরের খাতায় তাঁহার নিজের ছবি অঙ্কিত দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন, এবং বালককে বলেন "তুমি ইহারই চর্চ্চায় আপনাকে নিযুক্ত রাখিও!" সঙ্গীত বিষয়ে তাঁহার এমন স্বাভাবিক প্রতিভা ও আগ্রহ ছিল, যে স্কুলে পড়িবার কালে একদিন তিনি বাসায় আসিয়া এক পুরাতন চাকরকে বলিলেন, "এখনই আমার জন্য একটা বেহালা কিনিয়া আন্; একটা গৎ শুনিয়া

আসিয়াছি, দেরী করিলে ভুলিয়া যাইব!" সেই দিনই তাঁর বেহালা বাজনার সূত্রপাত—পরবর্ত্তী জীবনে তিনি এ বিষয়ে বিশেষ দক্ষতালাভ করিয়াছিলেন; এবং জীবনের শেষভাগে বেহালা তাঁহার প্রধান আরাম ও আনন্দের কারণ হইয়াছিল; শ্রান্তি, নৈরাশ্য, দুঃখ, এমন কি রোগ-যাতনা তিনি বেহালা বাজাইতে বাজাইতে ভুলিয়া যাইতেন; এমন তন্ময় একনিষ্ঠ হইয়া তিনি বাজাইতেন যে শুধু তাঁর সুমিষ্ট বাজনা শুনিয়া, সুখ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সঙ্গীতের উপর ভক্তির উদ্রেক হইত!

ক্রমে বালক উপেন্দ্রকিশোর চিত্র ও সঙ্গীতের প্রতি এত আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন, যে ক্লাশের পড়ার প্রতি তাঁহার আর তেমন মনোযোগ রহিল না; তাঁহার স্কুলের শিক্ষকগণও বলিতেন "উপেন্দ্রকিশোর ক্লাশে অতি উচ্চ স্থান লাভ করেন, বুদ্ধি ও প্রতিভা তাঁহার অসাধারণ; কিন্তু স্কুলের পড়ায় তাঁর একেবারে মনোযোগ নাই!" ইহার উত্তরে বালক বলিত "শরৎদাদা পাশের ঘরে পড়া মুখস্থ করেন, তাতেই আমার পড়া হয়। দুই জনে পড়িতে গেলে অনর্থক গণ্ডগোল বাড়ে!"

তখন ময়মনসিংহে শরচ্চন্দ্র রায় নামে একজন উৎসাহী, ছাত্রবৎসল সহৃদয় ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনি উপেন্দ্রকিশোরের প্রতিভা, চরিত্র, কলা বিদ্যানুরাগ দেখিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন।

শরৎবাবু বুঝিতে পারিয়াছিলেন উত্তরকালে উপেন্দ্রকিশোর একজন মানুষের মত মানুষ হইতে পারিবে।

যখন প্রবেশিকা পরীক্ষা নিকবর্ত্তী হইল, শরৎবাবু ব্যাকুল হইয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুপ্রসিদ্ধ রতনমণি গুপ্তের শরণাপন্ন হইলেন—কই তাঁর প্রিয় ছাত্র এখনও বেহালা ও তুলি লইয়াই মত্ত, এখনও ত তার মন বইএর দিকে ফিরিল না! শিক্ষক মহাশয় ছাত্রকে ডাকাইয়া বলিলেন "তোমার উপর আমাদের অনেক আশা-ভরসা; দেখিও যেন আমাদের নিরাশ করিও না"—সেই দিনই বালক ঘরে আসিয়া আপনার সাধের বেহালাটি ভাঙ্গিয়া ফেলিল—অনাদৃত পুস্তকগুলি গোছাইয়া পাঠে মনোনিবেশ করিল। যথাকালে ১৫৲ টাকা বৃত্তি লইয়া ময়মনসিংহ জেলাস্কুল হইতে উপেন্দ্রকিশোর প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে এবং পরে কিছু দিন মেট্রপলিটান কলেজে অধ্যয়ন করেন। এই শেষোক্ত কলেজ হইতে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি বি-এ পাশ করেন।

কলিকাতায় আসিবার কয়েক বৎসর পরেই তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করায় তাঁহার দেশের লোকে তাঁহার উপর অনেক শাসন ও অত্যাচার করিয়াছিল। কিন্তু তিনি এমন প্রশান্তচিত্ত লোক ছিলেন যে তাহাতে বিচলিত না হইয়া, তিনি কেবল আপনার সুমিষ্ট ব্যবহারে সকলকে শান্ত করেন, মিষ্টতা দ্বারা ক্রোধকে পরাজয় করেন।

তিনি কেবল চিত্র ও সঙ্গীতের চর্চ্চাতেই ব্যস্ত থাকিতেন এরূপ মনে করিলে ভুল হইবে। বাস্তবিক নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য তিনি সারাজীবন যেরূপ আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহের পরিচয় দিয়াছেন, এরূপ সচরাচর দেখা যায় না। হাল্কাভাবে কোন বিষয়ের চর্চ্চা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল, যখনই যাহাতে হাত দিতেন তাহারই সাধনায় একেবারে নিমগ্ন থাকিতেন। তাঁহার নানামুখী প্রতিভায়ও তিনি নানা বিদ্যার অধিকারী হইতে পারিয়াছিলেন।

তিনি যে একজন অতি উচ্চ শ্রেণীর চিত্রকর ছিলেন, তাহা বোধ হয় তোমরা জান। কোন কোন বিষয়ে এক্ষেত্রে তাঁহার সমকক্ষ এদেশে কেহ ছিল না বলিলেও অন্যায় হয় না।

শিশুদের জন্য তাহাদের উপযোগী ছবি দিয়া বই লিখিবার আগ্রহ তাঁহার ১৬।১৭ বৎসর বয়সেই দেখা গিয়াছিল। আজকাল তোমাদের জন্য কত রকমের বই আর কাগজ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সে সময়ে তাহার কিছুই ছিল না। শিশুরা কটমট উপদেশ পূর্ণ গুরুগম্ভীর বিষয় পড়িয়া তখন হয়রান হইত। কিছু পরেই ৺প্রমদাচরণ সেন "সখা" নাম দিয়া শিশুদের উপযোগী একখানি কাগজ বাহির করিলেন এবং উপেন্দ্রকিশোরের লিখিবার শক্তি দেখিয়া তাঁহাকে 'সখায়' লিখিতে আহ্বান করিলেন। সেই অবধি তিনি শিশুদের সেবায় এমন উৎসাহে, এমন অকাতরে আপনাকে ঢালিয়া দিয়াছিলেন যে শেষ জীবনে রুগ্ন শরীরেও এই ব্রত পালনে তিনি পরম আনন্দ লাভ করিয়া গিয়াছেন। তিনি শিশুদের জন্য যে কাজ করিয়াছেন, জীবনে যদি আর কোন কাজ না করিতেন, তবুও শুধু এই কাজই তাঁহাকে আমাদের কৃতজ্ঞতা ও সম্মানের অধিকারী করিত।

তোমরা সেকালের 'সখা' আর আজকালকার যে কোন সচিত্র কাগজ মিলাইয়া দেখ। দেখিবে, সেকালের মোটা আঁচড়ের মত ছবি ও একালের সুন্দর ছবিতে আকাশ পাতাল তফাৎ। তোমরা হয়ত জান না যে এরূপ ধরনের ছাপান ছবি করাইবার প্রথা উপেন্দ্রবাবুই সর্ব্বপ্রথমে এদেশে প্রচলিত করেন। শুধু তাহাই নহে তিনি এ বিষয়ে

নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক নিয়ম ও পন্থা আবিষ্কার করিয়া নানা দেশে যেরূপ সুখ্যাতি ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, এক্ষেত্রে আর কোন-ভারতবাসী সেরূপ কৃতীত্ব দেখাইতে পারেন নাই।

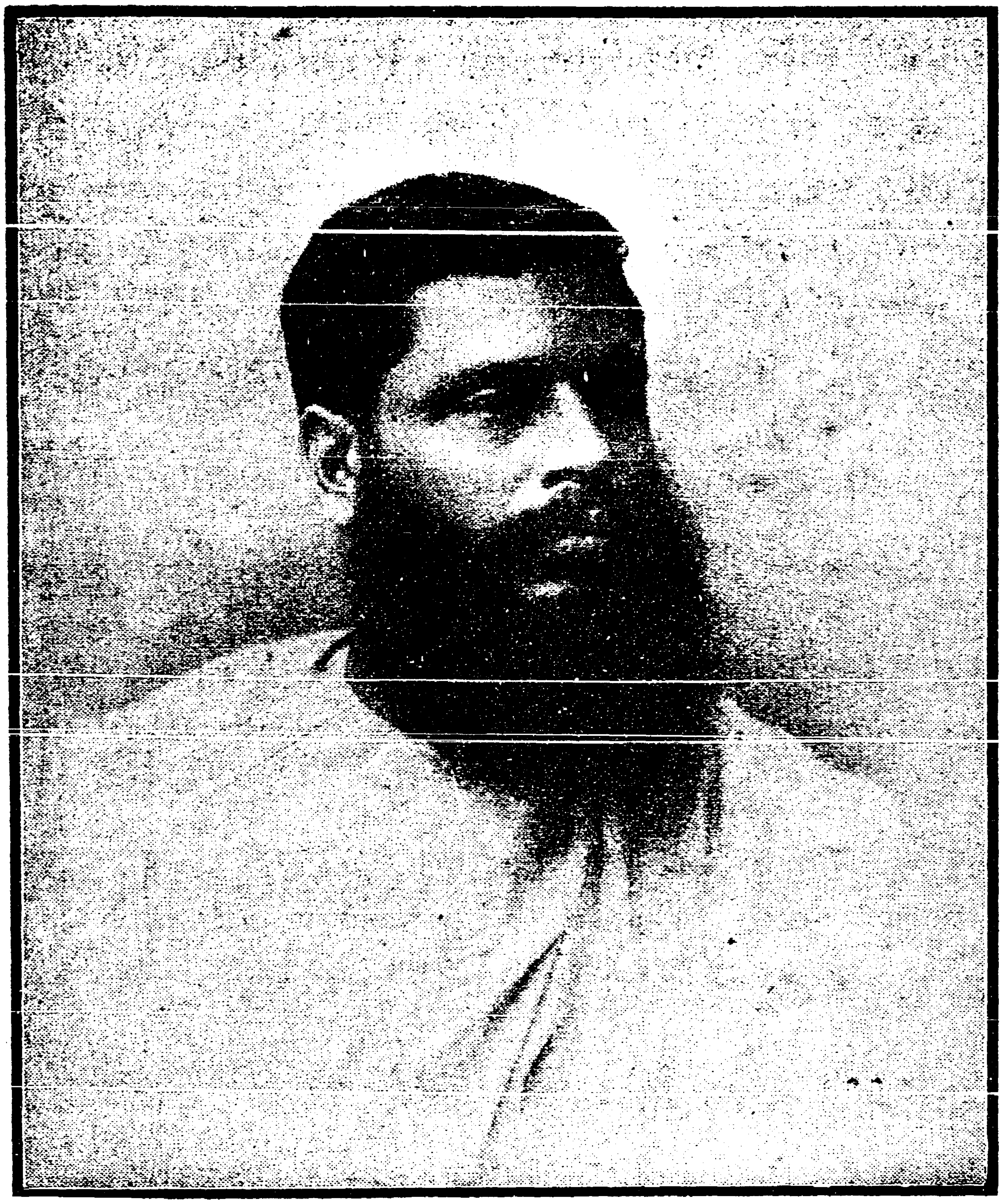

এ সব ত বাহিরের কথা। আসল মানুষটির সহিত যাহাদের ভাল করিয়া পরিচয় হয় নাই, তাহারা জানে না, তিনি কি রকম খাঁটি লোক ছিলেন। চিন্তায় বাক্যে আচরণে সত্যকে সর্ব্বতো-ভাবে রক্ষা করিতে তিনি কোন দিন ইতস্তত করেন নাই। কর্ত্তব্য বলিয়া যাহা বুঝিতেন তাহা পালনের জন্য সুখ দুঃখ, সাংসারিক লাভ ক্ষতি, সমস্ত তাঁহার কাছে তুচ্ছ বোধ হইত। এত বিষয়ে তিনি কৃতীত্বলাভ করিয়াছিলেন, অথচ অহঙ্কার তাঁহার লেশমাত্র ছিল না। নিরভিমান, নিরহঙ্কার, সরলপ্রাণ, সর্ব্বজনপ্রিয়, সকলের বন্ধু ছিলেন তিনি। এই "সন্দেশ" যে তাঁহার কি প্রিয় ছিল, ইহার জন্য লিখিয়া, ইহার জন্য ছবি আঁকিয়া রুগ্নদেহে ইহার সেবা করিয়া তিনি যে কি আনন্দ পাইতেন—যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই জানেন।

এই সন্দেশ তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন হইয়া থাকুক। এখন হইতে যাঁহারা এই কাগজ চালাইবেন তাঁহারা যেন তাঁহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া, ইহাকে উপযুক্তরূপে পরিচালিত করিতে পারেন, ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করি।

অন্ধের সূর্য্য দেখা।

এক ছিল অন্ধ। সে লোকের কাছে আকাশের কথা শুনত আর ভাবত, না জানি আকাশটা কি রকম জিনিষ। একদিন কে যেন তাকে বল্ল যে আকাশ নীল রঙের!

তারপর, একদিন কাপড় ছোপাবার জন্য তার বাড়ীতে নীল রঙের গুঁড়ো আনান হ'য়েছে—সে তার মধ্যে আঙুল দিয়ে জিজ্ঞাসা করছে, "এটা কি?" সকলে বল্‌ল, "ধ'রো না, ধ'রো না ওটা নীল রং।" অন্ধ ভাবল, "ও, এতক্ষণে বুঝেছি—আকাশটা ময়দার মত।"

তারপর কিছুদিন যায়। একদিন সে শুনল সকলে সূর্য্যের কথা বল্‌ছে। সে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "ভাই তোমরা সূর্য্য সূর্য্য কর সূর্য্যটা কি রকম বল্‌তে পার?"

একজন বল্ল, "সূর্য্য ঝক্‌ঝকে থালার মত। আকশে থাকে।"

অন্ধ তাড়াতাড়ি বাড়ী এসে বল্ল, "আমায় একখানা ঝক্‌ঝকে থালা দাও ত!" থালটা নিয়ে সে বেশ ক'রে নেড়ে চেড়ে পরীক্ষা ক'রে বল্ল, "সূর্য্যটা শক্ত, গোল, আর ঠং ঠং শব্দ করে।"

তারপর একদিন সে বেচারা চল্‌তে চল্‌তে দেখ্‌তে না পেয়ে একটা মস্ত ময়দার থলির উপর হোঁচট্ খেয়ে প'ড়ে গেল। পড়্‌বার সময় নিজেকে সাম্‌লাতে গিয়ে, হাতের কাছে টেবিল চেয়ার যা কিছু ছিল সব উল্টে ফেল্‌ল। বাসনপত্র ঝন্‌ঝন্ ক'রে বেজে উঠ্‌ল, বস্তা ফেটে চারিদিকে ময়দা ছড়িয়ে পড়্‌ল। অন্ধ বেচারা ব্যাপারটা কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ল না। খালি টের পেল যে তার মাথাটা যেন ঠন্ ক'রে কিসের মধ্যে লাগ্‌ল।

সে তখন চারদিক হাত্‌ড়িয়ে দেখে কি, তার মাথার কাছে একটা প্রকাণ্ড থালা আর চার দিকে ময়দার মত গুঁড়ো। এই দেখেই সে এম্‌নি বিকট চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল—যে তিন পাড়ার লোক এক দৌড়ে হাজির হ'ল। তখন সে বল্ল, "ভাই সকল! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে—আমি আকাশ ভেঙে সূর্য্যের মধ্যে প'ড়ে গেছি।"

রোস্তম্ ও সোরাব্।

অনেক ভেবে চিন্তে তাঁরা রোস্তমের তাঁবুতে গিয়ে তাঁকে সব কথা বল্লেন।

রোস্তম জিজ্ঞাসা করলেন,—"তাতারদের কোন্ সেনাপতি আমাদের সঙ্গে একা যুদ্ধ করতে চায়?" তাঁরা বল্লেন,—

"তাতার সেনাপতি সোরাব নিজে যুদ্ধ করতে চান; সোরাব কে, কার ছেলে এসব অবশ্যি আমরা কিছু জানি না কিন্তু তাঁর নাম খুব, তাঁর ক্ষমতা ঠিক আপনারি মত। এখন আপনি যদি তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ না করেন তা হলে আমাদের আজ হার নিশ্চয়।"

রোস্তম বল্লেন—"হাঁ, এই যুবক যোদ্ধাটীর কথা আমিও শুনেছি, সে সত্যি সত্যি বীর বটে—তার মতন ছেলের পিতা হতে পারলে আমি সৌভাগ্য মনে করতাম। কিন্তু আমি যুদ্ধ করে করে পাকা হয়ে গিয়েছি একজন বালকের সঙ্গে যুদ্ধ করাটা আমার পক্ষে উচিত হবে না।"

"সোরাব আমাদের বড় বড় যোদ্ধাকে নিমন্ত্রণ করেছে এখন আপনি যদি তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে রাজি না হন তা হলে লোকে বলবে যে পাছে আপনি তার সঙ্গে হেরে যান সেই ভয়ে যুদ্ধ করতে চাচ্ছেন না।"

রোস্তম। "বটে! এমন কথা কি করে বল্‌ছেন। যুবা হোক্, বৃদ্ধ হোক্, সে যতই বড় যোদ্ধা হোক না কেন আমি রোস্তম তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে ভয় পাব!! যান, আপনি সকলকে বলুন গিয়ে আমি সোরাবের সঙ্গে যুদ্ধ করব। কিন্তু একটী কথা বলে রাখ্‌ছি, আমি আমার নাম ডুবাতে পারব না আমি ছদ্মবেশে যুদ্ধ করব—আমার বর্ম্মেতে কিম্বা ঢালের মধ্যে এমন কোন চিহ্ন থাকবে না যা দেখে সকলে আমাকে রোস্তম বলে চিন্‌তে পারে।"

রোস্তম সামান্য সৈনিকের মত বর্ম্ম পরে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধে চল্লেন, প্রভুভক্ত রুকেশা তার পিছনে চল্ল, তখন পার্সি শিবিরে আনন্দ দেখে কে! যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে রোস্তম দেখ্‌লেন তাতার সেনাপতি যুবক যোদ্ধা সোরাব প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছেন। তার চেহারা খানি দেখেই যেন রোস্তমের মনে দয়া হলো।

তিনি বল্লেন—"ও হে যুবক! সকলেই বেঁচে থাকতে চায়, ইচ্ছা করে কি কারও মরবার সাধ হয়। আমি যুদ্ধ করে করে বুড়ো হয়ে গিয়েছি, আমার এই ডান হাতের

সামনে কেউ কখনো দাঁড়াতে পারেনি। তোমার অল্প বয়স, কেন মিছামিছি মরতে চাও? চল আমার সঙ্গে তোমাকে আমার বাড়ী নিয়ে গিয়ে ছেলের মতন যত্ন করে রাখব, আমার এই বুড়ো বয়সে তুমি আমার মনে সুখ দিবে।”

রোস্তমের বিশাল দেহখানি দেখে এবং তাঁর মিষ্টি কথাগুলি শুনে সোরাবের মনে আশা হলো। খানিক এগিয়ে গিয়ে বল্ল,—“আপনি রোস্তম নন? বলুন, শীগ্‌গির উত্তর দিন—আপনি কি রোস্তম?”

সোরাবের কথা শুনে রোস্তম ভুল বুঝ্‌লেন। তিনি মনে করলেন যে, “রোস্তমের সঙ্গে একা যুদ্ধ করেছে এটা লোকের কাছে খুব জাঁক করে বল্‌তে পারবে তাই বোধ হয় সোরাব জান্‌তে চাচ্ছে যে আমি বাস্তবিক রোস্তম কি না।” এই ভেবে তিনি বল্লেন,—“বটে, রোস্তমের চেয়ে ছোট যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ করে বুঝি তুমি খুসি হবে না? কিন্তু রোস্তম তোমার সাম্‌নে এসে হাজির হলে আর যুদ্ধের কথা মুখে আন্‌তে না, তখনি হয় হার মানতে আর না হয় তোমার হাড় কখানি বালির উপর পড়ে থাকত।”

রোস্তমের উত্তর শুনে সোরাব নিরাশ হয়ে গেল, মনে একটু আঘাতও পেল আবার সঙ্গে সঙ্গে রাগও হলো। তখন একটু গরম হয়ে উত্তর দিল,—“বটে, এ রকম করে আমাকে ভয় দেখাবেন ভেবেছেন? আমি কচি খোকা নই যে সহজে ভয় পাব। আমি বুঝতে পারছি আপনি একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা, আমার চেয়ে আপনি অনেক খানি উঁচু, কিন্তু যুদ্ধ করলে কে হারবে কে জিত্‌বে সেটা কেউ বলতে পারে না। আসুন তা হলে প্রস্তুত হোন, দেখা যাবে কে ভাল কে মন্দ।”

সোরাবের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রোস্তম তাকে বল্লম ছুঁড়ে মারলেন, সোরাব চট্ করে লাফিয়ে সরে গিয়ে নিজের বল্লম ছুঁড়ল—রোস্তম সেটাকে তাঁর ঢাল দিয়ে আটকালেন। রোস্তম তখন প্রকাণ্ড গদা নিয়ে সোরাবকে ভীষণ আঘাত করলেন কিন্তু এবারেও সোরাব লাফিয়ে একপাশে সরে গেল। এদিকে গদা বিফল হওয়ায় রোস্তম তার ওজনের টান সামলাতে পারলেন না, হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়লেন। সোরাব ইচ্ছা করলেই তখন তাঁকে মেরে ফেলতে পারত।

সোরাব কিন্তু সে কাজ করল না, ভদ্রতা করে পেছনের দিকে সরে গিয়ে বল্ল,—“এতটা জোরে গদা চালান উচিত হয় নি, এখন আপনি উঠে দাঁড়ান—রাগ করবেন না, জানিনা কেন, কিন্তু আপনার দিকে চাইলে পর আমার ত একটুও রাগ হয় না। আমার

মনের মধ্যে যেন কে বল্‌ছে, 'তোমাদের দুজনের মধ্যে ঝগড়া হওয়াটা উচিত নয়!' অতএব চলুন আমরা ক্ষান্ত হই।"

ততক্ষণে রোস্তম উঠে দাঁড়িয়েছেন, রাগে তাঁর শরীর থর থর করে কাঁপতে লাগ্‌ল, তিনি বল্লেন,—"আমাদের মধ্যে শান্তি হতে পারে না, এতগুলো লোকের সাম্‌নে তুমি আমাকে লজ্জা দিয়েছ এখন আর আমার মনে দয়া টয়া নাই, মরণ পর্য্যন্ত এ যুদ্ধ করব—প্রস্তুত হও।"

আবার ভীষণ বেগে যুদ্ধ আরম্ভ হলো ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল, দুজনেরই বর্ম্ম চুরমার হয়ে গেল, দুজনেই কাহিল হয়ে পড়্‌লেন কিন্তু কাহারও হার জিত হলো

না। অনেক চেষ্টার পর সোরাব তলোয়ার দিয়ে রোস্তমের টুপির পালক কেটে ফেল্ল, ইস্পাতের টুপিতে তলোয়ার লেগে টুপি খানিটা কেটে গেল বটে কিন্তু আঘাতের চোটে তলোয়ার চুরমার হয়ে গেল সোরাবের হাতে রইল স্থধু বাঁট খানা।

সোরাবের তলোয়ার ভেঙ্গে গিয়েছে দেখে জয়ের আশায় রোস্তমের চোখ্ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল। নিজের বল্লম তুলে চীৎকার করে বল্লেন, "রোস্তম!" এই চীৎকার শুনে সোরাব একেবারে অবাক্, তার হাত থেকে ঢালটী মাটিতে পড়ে গেল আর সেই মুহূর্ত্তে রোস্তমের বল্লম তার বুকে বিঁধে সে টল্‌তে টল্‌তে পড়ে গেল।

রোস্তম তার নিকটে এসে বল্লেন,—"মহাবীর! শেষটায় সামান্য একজন যোদ্ধার হাতেই তোমার মরণ হলো!"

সোরাব বলিল,—"ঐ রোস্তম নামেই আমি মারা গেলাম। ঐ নাম শুনেই আমার হাত অবশ হয়ে গেল। কিন্তু মনে রাখ্‌বেন, আমার পিতা মহাবীর রোস্তম নিশ্চয়ই এর শোধ নিবেন।"

রোস্তম বল্‌লেন,—"কে তোমার পিতা বল্‌ছ? রোস্তমের ত সুধু একটি মেয়ে ছিল।"

সোরাব বল্ল,—"না তা নয়, রোস্তমের ছেলেই ছিল। তার প্রমাণ, আমার বর্ম্মের বাঁধন খুলে দেখুন্ রোস্তমের আংটী আমার গলায় বাঁধা রয়েছে।"

রোস্তম তাড়াতাড়ি বর্ম্মের বাঁধন খুলতে লাগলেন, তাঁর হাত থরথর করে কাঁপতে

লাগল। বাঁধন খুলে দেখেন, সত্যি সত্যি তাঁর আংটী সোরাবের গলায় বাঁধা রয়েছে।

রোস্তমের চোখ অন্ধকার হ'য়ে এল। তিনি "হা পুত্র, হা পুত্র" বলে কেঁদে উঠ্‌লেন, এবং অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

সোরাব অতি কষ্টে হামাগুড়ি দিয়ে তাঁর নিকটে এসে মুখে হাত বুলিয়ে তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করতে লাগল।

খানিক পরে রোস্তমের জ্ঞান হ'তেই তিনি তলোয়ার নিয়ে আত্মহত্যা কর্‌তে গেলেন। কিন্তু সোরাব তখনি তাঁর হাতখানি ধরে তাঁকে বারণ কর্‌ল।

আহা! বৃদ্ধের তখন কি কষ্ট! তাঁর চোখ্ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগল। তিনি দুই হাতে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। সে দৃশ্য দেখে উভয় সৈন্যদল যুদ্ধের কথা ভুলে কেঁদে আকুল। রোস্তমের ঘোড়া প্রভু ভক্ত রুকেশ ধীরে ধীরে তাঁদের কাছে এসে দেখ্‌তে লাগল—তারও চোখ ভরা জল।

সোরাব জিজ্ঞাসা করল—"বাবা! এই বুঝি সেই রুকেশ? হায় রুকেশ! মা বলেছিলেন যে একদিন তোমাকে আর তোমার প্রভুকে দেখ্‌তে পাব, কিন্তু কি রকম অবস্থায় দেখ্‌ব সেটা মা বুঝ্‌তে পারেন নি।"

মৃত্যুর পূর্ব্বে সোরাব পিতাকে বল্ল,—"বাবা! আমার সৈন্যদলকে আপনি যুদ্ধ করে বধ করবেন না, এরা ফিরে চলে যাক্। আর আমার কবরের উপর একটি মন্দির বানিয়ে তাতে লিখে দেবেন—"মহাবীর রোস্তমের পুত্র সোরাব,—যাকে চিন্‌তে না পেরে রোস্তম নিজ হাতে বধ করেছিলেন—এটা তাহারই সমাধি।"

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

বাঙ্গলার জলচর খাদ্য।

(গত মাসের "সন্দেশ" দেখ)।

বিজয় বাবু বাঙলা দেশের নদী, বিলে, খালে;
যত্ন ক'রে মাছ ধ'রেছেন, কবিতার জালে।
ঝোলে ঝালে খেতে দিলেন, কিন্তু একি গোল;
ঢেকে রেখে দিলেন কেন ভাজা ও অম্বোল!
কড়াই ডা'ল আর টকের মাছের মর্ম্ম জানে রাঢ়;
যা'ক সে কথা! গোটাকয়েক নাম পড়েছে ছাড়।

কচ্ছপের নাম হ'ল, "কেটো" গেল বাদ ;
কেঁদে বলে "সুঁদি," "সিম" একি পরমাদ !
"কয়লা" বলে ময়লা নই, মুখে গোঁফ দাড়ী ;
তবু আমার নাম না হ'ল বাবুদের বাড়ী।
"কেঁকলে" কেঁদে বলে আমার এ কি অপরাধ ;
ঠোঁট লম্বা এমন আমি, আমার নামই বাদ !
"গরচা" বলে টের্চা ভাষে, খরচা কড়ি নাই ;
বাজার ঘুরে বাবু আমায় ত্যাগ ক'রেছেন তাই।
"গুঁতে" বলে পাঁকে থাকি পাঁকাল দাদার ভাই ;
শরীর এমন চিত্রি করা, দেখ্‌লেনাক ছাই।
"ট্যাপা" বলে খাও কি না খাও, তা'র ধারিনা ধার ;
পারে বা কে পেট ফুলা'তে আমার মত আর ?
"ডাঁড়্‌কে" বলে দাঁড়াও বাবু, একবার দেখ ফিরে ;
ছোট ব'লে ভুলো না'কো দিচ্চি মাথার কিরে।
"তেচোকো" সে আরো ছোট, কপালে তা'র চোখ ;
ঝাঁকে ঝাঁকে বেড়ায় কিন্তু খায়না অনেক লোক।
"পাঙাশ" তখন হেসে বলে, আসল নামই বাকী ;
এমন মজার উৎসবেতে আমিই গেলাম ফাঁকি।
"ফেঁসা" বলে ঘেঁসা দায় বাবুদের পাতে ;
সরু সরু কাঁটা যায় জড়াইয়া ভাতে।
"বাট্‌কে" কেন আট্‌কে গেল, এত বড় দায় ;
"ভোলা"কে ভুলেছে সবে হায় হায় হায় !
ক্ষুদ্র "রামকরাতি"রা হল বড় খাপা ;
তাহাদের নাম কেন হয় নাই ছাপা।
"শামুক" বলে মুখটি খুলে পাওনি বুঝি স্বাদ ;
গুগ্‌লি, ঝিনুক, কাঁকড়া নিলে, আমায় দিলে বাদ !

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

জলের গুণ।

'জলের গুণ' বলছি বটে, কিন্তু আমি যে পরীক্ষার কথা তোমাদের শোনাতে যাচ্ছি, তার কোনটাতে হাওয়া আর আলোর গুণও আছে। পরীক্ষাটি হয় জল দিয়ে, তাই আমি বলছি 'জলের গুণ'।

১। গেলাস ভরে জল রয়েছে, এক চুল জায়গা খালি নেই। সেই গেলাসে কি আর কিছু জিনিস ধরতে পারে? পারে বই কি। ঐ জলে ধীরে ধীরে চিনি ফেলতে থাক। চিনি গলে জলে মিশে যাবে, কিন্তু জল তাতে উঁচু হবে না, কাজেই গেলাস থেকে পড়বেও না। এমনি করে যে কতখানি চিনি সেই জলে গলান যেতে পারে, তা দেখলে তুমি আশ্চর্য্য হয়ে যাবে।

২। আচ্ছা, জল ত শুনেছি সব সময়ই নীচের দিকে গড়িয়ে যায়; তাকে কি কখনো উপর বাগে উঠান যেতে পারে? পারে বই কি। একটি নেকড়ার পল্‌তে পাকিয়ে, তার নীচের দিকটা জলে ডুবিয়ে ধর দেখি। দেখবে, ক্রমে সেই পল্‌তেটিকে ভিজিয়ে জল উপর বাগে উঠতে থাকবে। খুব সরু চোঙ্গার ভিতর দিয়েও জল খানিকটা উপরে উঠতে পারে। চোঙ্গাটি যত সরু হয়, তার ভিতর দিয়ে জল ততই উপরে ওঠে। চোঙ্গার ছিদ্রটি কিন্তু খুবই সরু হওয়া চাই। এক ইঞ্চির ষোল ভাগের এক ভাগ কিম্বা তার চেয়েও কম চওড়া হলে বেশ হয়।

৩। গেলাসটিকে উল্টিয়ে ধরলে, কিম্বা তাতে ছিপি এঁটে দিলে কিম্বা আর কোন মতে মুখ বন্ধ করে দিলে জল পড়তে পাবে না। কিন্তু কোন রকম চাপ বা মুখে কিছু এঁটে না দিয়েও জল পড়া বন্ধ করা যায়। গেলাসটি একটা গামলায় ডুবিয়ে, তাতে জল ভরে, তারপর জলের নীচে থাকতে থাকতেই তার মুখে একখানি কার্ড্‌ বসিয়ে দাও। তারপর গেলাসটিকে উল্টিয়ে তাকে ঠিক খাড়া রেখে জল থেকে তুলে আন। এই সময়ে কার্ড্‌খানিকে হাত দিয়ে একটু চেপে ধরতে হবে, যাতে সেখানি গেলাসের মুখ থেকে সরে বা আলগা হয়ে না যায়। যদি গেলাসটিকে একটুও কাৎ না করে তাকে এই ভাবে জল থেকে তুলে আনতে পার, তবে দেখবে যে এখন তোমার হাত কার্ড্‌ থেকে সরিয়ে নিলেও জল পড়তে পায় না। এটাকে কিন্তু জলের চেয়ে হাওয়ার গুণই বেশী বলতে হবে। হাওয়ায় নীচে থেকে ঠেলে রাখে বলেই

জল পড়তে পায় না। জলের গুণ শুধু এইটুকু হচ্ছে যে, সে হাওয়াকে গেলাসের ভিতরে ঢুকতে দেয় না।

৪। লোহা কি জলে ভাসান যায়? যায় বই কি। লোহার নৌকা, কিম্বা বাসন, কিম্বা বাক্স ভাসাবার কথা আমি বলছি না। কিন্তু সময় বিশেষে নীরেট লোহাও যে জলে ভাসতে পারে, একটি সরু ছুঁচ খুব আলগোছে সেই জলের উপর শুইয়ে দিলেই সে কথা বুঝতে পারবে। ছুঁচটি খাড়া কিম্বা কাৎ করলে কিন্তু তখনি ডুবে যাবে।

৫। তুমি হাত পেতে রেখেছ, খানিকটা উঁচু থেকে তাতে টপ্ টপ্ করে জল পড়ছে, এমন ভাবে তুমি কতক্ষণ হাত পেতে রাখতে পার? তুমি হয় ত বলবে যে 'যত ক্ষণ খুসী!' জল কি না ভারী মোলায়েম জিনিস, কাজেই একথা সহজেই মনে হতে পারে। কিন্তু আসলে কাজটি এর চেয়ে অনেক কঠিন। এমন ভাবে আধ সের জল কেউ টপ্ টপ্ করে হাতে পড়তে দিতে পারে না। তার আগেই হাত ফুলে তাতে ভয়ানক যন্ত্রণা হবে।

৬। জল উঁচু বাগে উঠবার আর একটা উপায়ের কথা বলা হয় নি। খুব উঁচু থেকে নলের ভিতর দিয়ে জল আনলে সে জল যে নীচে এসে নলের মুখ দিয়ে ফোয়ারার মত ছুটে বেরয়, তা তোমরা সকলেই দেখেছ। (অবশ্য নলের মুখ উপর বাগে বাঁকান থাকা চাই।) ফোয়ারার জল যে লাফিয়ে ওঠে, তারও এই কারণ। দেড় হাজার দু হাজার ফুট উঁচু থেকে নল দিয়ে জল আনতে পারলে, নলের নীচের মুখ দিয়ে সে জল এমনি ভয়ানক তোড়ে বেরুতে থাকে যে, তার ধাক্কায় লোহার তলোয়ার অবধি ভাঙ্গতে দেখা গিয়াছে।

৭। জল কাঁচের মত স্বচ্ছ। তার ভিতর দিয়ে দেখতে পাওয়া যায়, আবার তাতে জিনিসের ছবিও পড়ে। একটি কাঁচের গেলাসে জল ঢেলে তাতে একটি চামচ আধা আধি ডুবিয়ে রেখে দাও। এখন, উপর থেকে তাকালে দেখবে যে চামচের উপরের আধখানার ছবি জলে পড়েছে। আবার নীচে থেকে জলের ভিতর দিয়ে উপর বাগে তাকালে দেখবে যে, চামচের নীচের আধখানারও একটা ছবি উপর বাগে উঠে গিয়েছে। এ স্থলে জলের চেয়ে আলোরই গুণ বেশী।

৮। একটি কাঁসার গেলাসের তলায় একটি টাকা রেখে দাও। উপর থেকে সোজা সুজি গেলাসের ভিতরে তাকালে টাকাটি বেশ দেখতে পাবে। এখন গেলাসটিকে

বন-মোরগ।

U. RAY & SONS, CALCUTTA.

একটু একটু দূরে সরিয়ে তার পাশ থেকে ট্যারচা ভাবে টাকাটিকে দেখতে চেষ্টা কর। তখন হয় ত টাকার সবটা দেখতে পাবে না। আরেকটু দূরে নিলে হয় ত তার বেশীর ভাগই গেলাসের কানায় আড়াল পড়ে যাবে। আরো সরালে হয় ত আর টাকাটির কিছুই দেখা যাবে না। এখন যদি কেউ গেলাসে জল ঢেলে দেয়, তা হলে আবার টাকাটি দেখতে পাওয়া যাবে। এতেও জলের চেয়ে আলোর কাজ বেশী।

৯। ওঠানে দড়ি টানা আছে, তাতে আমাদের কাপড় শুকাতে দেয়। দিনের বেলায় দড়িগুলো ঝুলে থাকে, রাত্রে হিম পড়ে টান হয়ে যায়।

১০। বেহালার তাঁতের তার আবার তার উল্টো। বাদলায় তাকে ঢিলে করে ফেলে, শুকনোয় তাকে টান করে দেয়।

এখন একটা গল্প বলে শেষ করি। একটা উঁচু স্তম্ভ কাৎ হয়ে গিয়েছে, তাতে দড়ি বেঁধে তাকে টেনে খাড়া করবার চেষ্টা হচ্ছে। দড়ির এক মাথা স্তম্ভে বাঁধা, আরেক মাথা খোঁটায় জড়ান। বিশাল স্তম্ভ, লোকগুলো প্রাণপণ করেও তাকে নাড়তে পার্‌ছে না। তামেসগিরেরা খালি 'এমনি কর' 'তেমনি কর' ব'লে তাদের ধমকাচ্ছে, তাতে বেচারারা আরো থতমত খেয়ে যাচ্ছে। তখন রাজপুরুষেরা বল্লেন, "কেউ কথা বলতে পারবে না; যে বলবে তার কঠিন সাজা হবে।" আবার টানাটানি চল্ল, কিন্তু তাতেও কোন ফল হল না। এমন সময় ভিড়ের ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠল, "দড়ি ভিজিয়ে দাও!" সে জানত যে জলের গুণ হচ্ছে, দড়িকে খাটো করা, আর দড়ি খাটো হলেই স্তম্ভটাকে টেনে সোজা করবে। তাই সে সাজার ভয় না মেনেই ঐ কথা বলেছিল। আর কজেও হল তাই। দড়িতে জল দিতেই স্তম্ভ সোজা হয়ে দাঁড়াল। তখন অবশ্য আর তাকে সাজা দিবার কথা কেউ বলতে এল না।

বোকারাম।

আমাদের ক্লাসে ছয় জন ছাত্র ছিল, তার মধ্যে নরেন ভারি সেয়ানা। সে ক্লাসে বরাবর প্রথম থাক্‌ত, খেলায়ও খুব ওস্তাদ সুতরাং তার কথা সকলেই মান্‌ত। আমাদের দলটি বেশ ছিল—দলের সকলেরই এক একটা বিশেষত্ব ছিল। গোপেন্‌কে আমরা "রামমুর্ত্তি" বল্‌তাম; তার গায়ে বেজায় জোর। রমাপ্রসাদ ভারি মজার লোক—থেকে থেকে এম্‌নি অদ্ভুত রকমের এক একটা কথা বল্‌ত, কিম্বা মুখভঙ্গী

কর্‌ত যে হাস্‌তে হাস্‌তে আমাদের পেটের নাড়ি ছিঁড়ে যেত। বৈকণ্ঠ এমন সব আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গল্প জান্‌ত যে আমাদের বিশ্বাস ছিল, সে বড় হ'লে নিশ্চয়ই খুব মস্ত একজন লেখক হবে। সুবোধ পরীক্ষার সময় নম্বর পেত খুবই কম, কিন্তু সে তাসের ম্যাজিক দেখাত এমন চমৎকার, আর বেড়ালের ঝগ্‌ড়ার এমন সুন্দর নকল কর্‌ত যে কি বল্‌ব! আমিও পরীক্ষার সময় খুব নীচে থাক্‌তাম—কিন্তু সে কেবল কম পড়্‌তাম বলে। কি কর্‌লে খুব সহজে অনেক টাকা করা যায়, আর কি রকম আশ্চর্য্য কাজ কর্‌লে রাতারাতি খুব নাম হয় এই সব কথা ভাব্‌তে গিয়ে আমি পড়ার সময়ই পেতাম না। তা ছাড়া, আসলে কিন্তু আমার বুদ্ধি খুব চোখা ছিল। আমার ঠাকুরমা বলেছেন, আমি যখন খুব ছোট ছিলাম, আমাদের বাড়ীতে একবার চোর এসেছিল। আমি যদি ঠিক সেই সময়ে জেগে গিয়ে কান্নাকাটি ক'রে সকলের ঘুম না ভাঙাতাম—তাহ'লে চোরের হাতে সেদিন বাড়ীর কোন জিনিষ আর রক্ষা পেত না।

যাক্ সে কথা। আমরা ছয়জন ছিলাম—এর মধ্যে কোথা হ'তে একটা কালো রোগা লিক্‌লিকে পাড়াগেঁয়ে ছোক্‌রা এসে আমাদের ক্লাসে ভর্ত্তি হ'ল। হেড্ মাষ্টার মশাই যখন তাকে এনে আমাদের ক্লাসে বসিয়ে দিয়ে গেলেন—তার চেহারা দেখেই আমাদের পিত্তি জ্বলে গেল। রামপ্রসাদ বল্ল, "পড়্‌তে এয়েছে নাকি—আমি ভাব্‌লুম পাখা টান্‌বে বুঝি।" শুনে আমরা হেসে গড়াগড়ি। ছোক্‌রাটা আবার খাতা পেন্সিল সঙ্গে এনেছে। কেনরে বাপু! প্রথম দিন স্কুলে এসেই তোর এ সব ভাল মান্‌ষী দেখাবার দরকার কি?

সেদিন পড়া শেষ হ'তেই নরেন্ চেঁচিয়ে বল্ল, "ছোকরার নামটা কি হে খোঁজ কর ত?" ছেলেটা নিজে থেকেই উত্তর দিল, "ছোক্‌রার নাম বিশ্বম্ভর।" হোঃ হোঃ হোঃ—বিশ্বম্ভর! এমন নামও রাখে! নরেন বল্ল, "ভদ্রলোকের নাম বিশ্বম্ভর—এত কখনও শুনি নি!" আমরা সকলেই নাম নিয়ে খুব রসিকতা কর্‌লাম—তাতে সে কিছু বল্‌ল না, কিন্তু যা'বার সময় এম্‌মি ক'রে মুচ্‌কে হেসে গেল, যেন আমাদের হাসি ঠাট্টা সে গ্রাহ্যই করে না। দেখে রাগে আমাদের গা জ্বলে গেল।

পরদিন পণ্ডিতমশাই জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "তোমার নাম কি হে?" আমরা এক সঙ্গে বিকট চীৎকার ক'রে বল্লাম, "বিশ্বম্ভর"। ছোক্‌রাটা অম্‌নি ব'লে উঠ্‌ল, "আজ্ঞে না, আমি শ্রীরামলাল ঘোষ।" পণ্ডিত মশাই তাঁর হাতের ছড়ি খানা দিয়ে আমাকে আর সুবোধকে সপাসপ্ কয়েক ঘা মেরে দিলেন; বল্লেন আমরাই নাকি সব চাইতে বেশী চেঁচিয়েছিলাম! সেদিন ছুটির পরেই সবাই মিলে রামলালকে পাক্‌ড়াও কর্‌লাম।

"নরেন বল্ল" নাম ভাঁড়িয়ে ভারি তামাসা করা হ'চ্ছিল ? রামলাল একগাল হেসে বল্ল, "নাম ভাঁড়াব কেন ? তোমরা জান্‌তে চাইলে ছোকরার নাম কি—আমার মামার আফিসে বিশ্বম্ভর ব'লে এক ছোক্‌রা আছে—আমি তার নাম বলেছি।" রমাপ্রসাদ এক মুখ ভেংচি দিয়ে বল্ল, "বাপু হে, রামলাল, জানত 'যত হাসি তত কান্না, বলে গেছে রামশর্ম্মা !'"

তারপর কিছু দিন গেল—আমরা তার নাম রাখলাম 'বোকারাম'। নতুন ছাত্র ব'লে মাষ্টারেরা তাকে কিছু বলেন টলেন না ; যত আক্রোশ আর যত প্রশ্ন কেবল আমার আর সুবোধের বেলা ! ঐ পাড়াগেঁয়ে ছোঁড়াটার সাম্‌নে আমাদের যে রোজ অপদস্থ হ'তে হয় এ আমাদের আর সহ্যই হয় না। এর মধ্যে একদিন মাষ্টার মশাই ক্লাসে এমনি একটা শক্ত আঁক দিলেন যে কেউ সে আঁক কষ্‌তে পারে না। এমন কি, নরেন পর্য্যন্ত হার মেনে গেল। মাষ্টার মশাই খানিকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে বল্‌লেন, "কি হে, কেউ পার্‌লে না।" রামলালটা অম্‌নি ব'লে উঠেছে, "আজ্ঞে আমার হ'য়েছে।" মাষ্টার মশাই তার খাতা দেখে ভারি খুসী হ'য়ে—তাকে বল্লেন, "যাও, তুমি ফার্ষ্ট ব'সো গিয়ে।" লজ্জায় অপমানে নরেনের কাণ পর্য্যন্ত লাল হ'য়ে গেল।

সেদিন স্কুল থেকে বেরিয়েই আমাদের সঙ্গে রামলালের ঝগড়া বেধে গেল। নরেন বল্‌ল, "ভারিত এতটা অঙ্ক কষেছেন তার আবার দেমাক দেখনা—বুক ফুলিয়ে বাড়ী চ'লেছেন।" রমাপ্রসাদ বল্ল, "ওহে রামলাল, ওরফে বিশ্বম্ভর, ওরফে বোকারাম—দুএকটি চড় খেলে তবে ঠিক্ মত লাল হবে।" রামলাল বল্ল, "তোমার ভাই রং ফরসা তার উপর গাল দুটিও ফোলা—ভাল ক'রে একবার চড়িয়ে দিলে পাকা আঁবের মত লাল হ'য়ে উঠ্‌বে।" তাই শুনে গোপেনের আর সহ্য হল না ; সে একেবারে রামলালের ঘাড় টিপে ধ'রে বল্‌ল, "খবরদার ! জোর দেখাচ্ছিস্ কাকে ?" দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি—তারপর ঘুঁষাঘুঁষি। আমরা ভেবেছিলাম গোপেনের হাতে প'ড়ে এইবারে বাছাধন কিছু টের পাবেন। কিন্তু গোপেন্ যখন তার তিন ঘুঁষিতে তিন পাক খেয়ে শেষটায় মাটিতে প'ড়ে হাঁপাতে লাগ্‌ল, তখন আমাদের মুখে আর কথাটি নেই। বাড়ী এসে তখন আমরা তাকে মনের সাধ মিটিয়ে গাল দিলাম।

তারপর ক্রমে দেখা গেল বোকারাম সংস্কৃত খুব কম জানে—ইংরাজিতে একেবারেই কাঁচা। আমরা এই সুবিধা ছাড়্‌ব কেন ? তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বল্‌তাম, "মেজে ঘ'ষে গাধার মত খেটে দুটো অঙ্ক সবাই কষ্‌তে পারে। কিন্তু মগজে যার গোবর ভরা, ইংরিজি শেখা কি তার কর্ম্ম ?" বৈকণ্ঠ খুব গম্ভীর হ'য়ে বল্‌ত,—ইংরিজি ভাল

না জান্‌লে আজকাল কিছু করবার যো নেই। তার এক মামাত ভাই মস্ত পণ্ডিত লোক—তিনি কোন গবর্ণমেণ্টের আফিসে খুব বড় একটা চাকরী পাচ্ছিলেন—খালি ইংরিজিটা তেমন দুরস্ত নয় ব'লে তাঁর চাকরী হ'ল না।" রামলাল একদিন হেসে বল্‌ল, "তোমাদের যেরকম ইংরিজি দুরস্ত দেখ্‌ছি এক এক জন লাট বেলাট হবেন, তাতে আর সন্দেহ কি? দেখো ভাই, তোমাদের আফিসে পেয়াদার কাজ টাজ খালি থাক্‌লে আমায় তখন ভুলো না।" চটবার কথা বল্‌লেও সে চটে না—দেখে আমাদের রাগ দশগুণ বেড়ে যেত।

তারপর পরীক্ষার সময় এল—পরীক্ষা হ'য়ে গেল; ইংরাজির দিন রমাপ্রসাদ তাকে বল্ল, "দেখো হে, could লিখ্‌তে cood লিখো না—আর threw মানে 'মধ্য দিয়ে' নয়—একথা যেন ভুলো না।" রামলাল লম্বা সেলাম ক'রে বল্ল, "যে আজ্ঞে।"

পরীক্ষার ফল যখন বেরুল তখন দেখি, ও হরি! এ কি কাণ্ড! সব বিষয়েই রামলাল প্রথম! ইংরেজিতে সে এত নম্বর পেয়েছে যে তাই নিয়ে মাষ্টার মহলে মহা হুলস্থূল প'ড়ে গেছে। তার উপর যখন হেড্‌ মাষ্টার মশাই তার কাগজ খানা এনে তার রচনাটার ভারি সুখ্যাতি ক'রে আমাদের পড়িয়ে শোনালেন, সেদিন ভাগ্যিস্‌ 'বোকারাম' স্কুলে আসেনি; তা না হ'লে তার দেমাকে হয় ত আমাদের টেকাই দায় হ'ত। আমরা পরামর্শ কর্‌ছি সে আস্‌লে কি ক'রে তাকে জব্দ করা যায়, এমন সময় শোনা গেল সে নাকি আর আস্‌বে না—তাদের বাড়ী শুদ্ধ সব অন্য কোথায় চ'লে গেছে। শুনে আমরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌লাম!

সেই দিন আমরা বাড়ী গিয়ে প্রত্যেকে এক এক খানা চিঠি পেলাম। প্রত্যেকটিতেই লেখা—

বিদ্যাদিগ্‌গজ বুদ্ধিমান মহাশয়,

কথায় বলে, "গাধা পিটাইলে ঘোড়া হয়।" ইহা সত্য কি না জানি না; কিন্তু আপনাদের মত মর্কটদের ভাল মতে না পিটিলে আপনাদের আর মানুষ হইবার সম্ভাবনা দেখি না। কিন্তু আমার অবর্ত্তমানে পিটিবে কে, এই কথা ভাবিয়া বড়ই কষ্ট পাইতেছি। ইতি

আপনাদের "বোকারাম"।

হতভাগাটা ঠিকানা পর্য্যন্ত দেয় নাই যে চিঠির উত্তরে গায়ের ঝাল মিটা'ব। মনের দুঃখ মনেই হজম করতে হ'ল!

পাখীর পালক।

তোমরা সকলেই নানা রকম রং ভালবাস ? রামধনুর মধ্যে দেখ কত রং, ফুলের মধ্যে দেখ কত রং, তা'ছাড়া মানুষের তৈয়ারী জিনিষের মধ্যে তো রংএর অভাবই নাই। কিন্তু পাখীর পালকের মধ্যে যে কত রকম রং তা' কি তোমরা দেখেছ ? পৃথিবীর যত রং, সবই এদের পালকের মধ্যে পাবে। আর, কি যে সুন্দর এ সব পালক তা' না দেখ্‌লে কল্পনাই কর্‌তে পার্‌বে না। এই জন্যই এক একটা পাখীর পালক খুব দামী হয়!

শুকপাখীদের ছবি তোমরা তো সন্দেশে দেখেছই ;—টিয়া, চন্দনা, কাকাতুয়া, হীরামন, এদের গায়ে কত রকমেরই রং আছে ;—কেউ সবুজ, কেউ নীল, কেউ লাল ; কারো গায়ে দুই দু'তিন রকমের রং। তা'ছাড়া বিদেশী নানা জাতি শুকের গায়েও সুন্দর রং দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

এই যে পাখীটির ছবি দেখ্‌ছ, এর নাম কোয়েজাল—আমেরিকায় পাওয়া যায়। এরা শালিখের চেয়ে ছোট থাকে ;—কিন্তু এদের ল্যাজ এক হাত লম্বা। গায়ের পালকই বা কি চমৎকার! সুন্দর সবুজ রংএর উপর সাদায় কালোয় কাজ করা। বুকটা টকটকে লাল রংএর।

ময়ূরের পালক বোধ হয় তোমাদের অনেকের কাছেই আছে। একবার দেখে নেও তার মধ্যে কত রকমের রং। এ ছাড়া এক জাতের ময়ূর আছে তাদের পালক ধবধবে শাদা।

বন-মোরগ তোমরা দেখেছ কি ? যদি না দেখে থাক তো এবারের রঙ্গিন ছবিটা দেখ। কি সুন্দর এদের পালক! কত রকমের রং! এদের অনেকের পালকে যে কি সুন্দর কারিকুরি কাজ তা' দেখ্‌লে অবাক হ'য়ে যেতে হয়। বর্ম্মা দেশের জঙ্গলে

'পাগড়িওয়ালা পাখী'

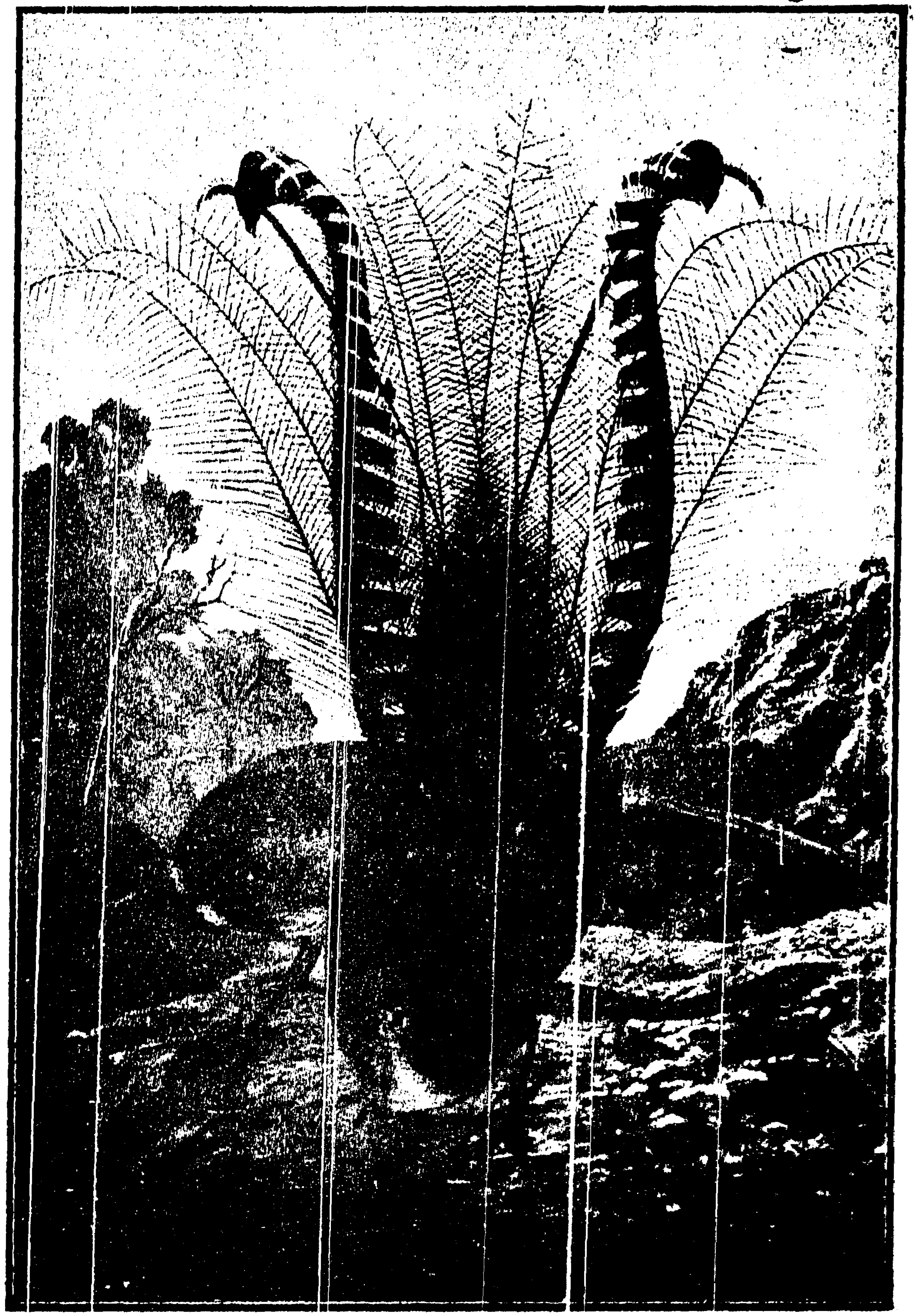

'বীণা পাখী'

এই সব বন-মোরগ অনেক দেখ্‌তে পাওয়া যায়। সন্দেশে যিনি 'বনের খবর' লিখ্‌তেন, তিনি একবার একটা ছোট বনমোরগ ধরেছিলেন, কিন্তু সেটাকে ধরে বেশীদিন রাখ্‌তে পারলেন না ;—সেটা মরে গেল।

আগের পৃষ্ঠায় 'পাগ্‌ড়িওয়ালা পাখী'র ছবি দেওয়া হ'য়েছে। এদের মাথায় পাগ্‌ড়ির মত পালক আর গলায় সুন্দর পালকের হাঁসুলি। গায়ের রং তেমন জমকালো না হ'লেও এদের পালক দেখ্‌তে বড় সুন্দর। এরা যখন গান গায়, তখন এদের গলার হাঁসুলির পালক নাচ্‌তে থাকে, আর সুন্দর হ'য়ে ছড়িয়ে পড়ে।

'স্বর্গের পাখী' শিকার

অরেকটি পাখীর ছবি দেখ্‌ছ, এর নাম বলা যেতে পারে 'বীণা-পাখী' (Lyre Bird)। এর লেজটা দেখ কেমন মজার ; অনেকটা বীণার মত। তাই এদের ঐ নাম হয়েছে।

উটপাখীর পালক যদিও খুব রং চঙে নয়, কিন্তু দেখ্‌তে বড়ই সুন্দর। মেমসাহেবরা তাঁদের পোষাকে ঐ পালক অনেক সময় ব্যবহার ক'রে থাকেন, তাই উটপাখীর পালক অনেক দামে বিক্রী হয়, আর অনেক ব্যবসাদার এই পালকের ব্যবসা ক'রে ঢের টাকা রোজগার করেন।

'স্বর্গের পাখী'র (Bird of Paradise) নাম তোমরা বোধ হয় শুনেছ। যারা আলিপুরের চিড়িয়াখানা দেখেছ, তারা হয় তো এ পাখীকে দেখছও। এর পালকও খুব সুন্দর দেখ্‌তে—যেমন তার রং তেমন তার সুন্দর চেহারা! যে দেশে এর জন্ম, সে দেশের লোকেরা এই পাখী শিকার ক'রে পালকগুলি ছাড়িয়ে নিয়ে, ধোঁয়া দিয়ে শুকিয়ে নিয়ে বিক্রী করে। এ পালকের অনেক দাম।

এ ছাড়া আরও কত হাজার হাজার রকমের সুন্দর পাখী আছে, তা' আর লিখে শেষ করা যায় না। ছোট পাখীদের মধ্যে মনিয়া পাখীর রং বড় সুন্দর! এরা যে কত রকম রঙের হয় তা' আমি বল্‌তেই পারি না। লাল, নীল, হল্‌দে, সবুজ, বেগুনি, সাদা, কালো, কোন রঙ্‌ই তো বাদ দেখি না।

বিলাতে বাবুগিরির এক সরঞ্জাম হ'লো পাখীর পালক। এই জন্য প্রতি বৎসর লাখ লাখ পাখী মারা হয়। এক এক জাতের পাখী এত বেশী ক'রে মারা হ'য়েছে যে তারা প্রায় লোপ পেয়ে গেছে। শেষ কালে আইন ক'রে সে সব পাখী মারা বন্ধ কর্‌তে হয়েছে। এখন অনেকেই পোষাকে পাখীর পালক ব্যবহার করা ছেড়ে দিচ্ছেন।

কাঁচের পাহাড়।

এক রাজা ছিলেন, তাঁর এক সুন্দরী আদুরে মেয়ে ছিল। রাজামশাই কর্‌লেন কি, একটা প্রকাণ্ড কাঁচের পাহাড় বানিয়ে ব'লে দিলেন, "এর উপরে যে চড়্‌তে পার্‌বে, সে আমার অর্দ্ধেক রাজ্য পাবে, আর আমার মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দেবো।"

কত রাজপুত্র তো পাহাড়ে চড়্‌তে গিয়ে পা পিছ্‌লে পড়ে হাত পা ভাঙ্গলেন। শেষে এক রাজপুত্র এলেন, তাঁকে দেখে মেয়েটির বড় পছন্দ হ'লো। তাই সে তার বাবাকে বল্ল, "বাবা, আমি এঁকে পাহাড়ে উঠ্‌তে সাহায্য কর্‌ব।" আদুরে মেয়ের কথায় রাজামশাই আর কি ক'রে 'না' বলেন ?

তখন মেয়েটি রাজপুত্রের সঙ্গে পাহাড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু অর্দ্ধেক পথ উঠে মেয়েটি পা পিছ্‌লে প'ড়ে গিয়ে কোথায় যে মিলিয়ে গেল কেউ দেখ্‌তে পেল না। খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ—কোথাও পাওয়া গেল না। রাজামশাই বল্লেন, "ভাঙো কাঁচের পাহাড়!" অমনি দেখ্‌তে দেখ্‌তে লাখ লাখ লোক কুড়ুল নিয়ে পাহাড় ভেঙে ভূমিসাৎ কর্‌ল। কিন্তু কই, মেয়েকে তো পাওয়া গেল না!

এদিকে হয়েছে কি, মেয়েটি মাটিতে পড়্‌বার আগেই পাহাড় ফেটে ফাঁক হয়ে তাকে গিলে ফেলেছে, আর সে বেচারি এক গভীর গর্ত্ত দিয়ে পড়্‌তে পড়্‌তে একেবারে মাটির নীচে এক অন্ধকার বাড়ীতে গিয়ে হাজির। সেখানে এক বুড়ো থাকে, সে লম্বায় তোমার চেয়ে বেঁটে হলেও তা'র দাড়ি যা লম্বা, তা' আর কি বল্‌ব! চেহারাটাও বড়ই অদ্ভুত।"

মেয়েটিকে দেখে সে বল্ল, "এই যে, তুমি এসেছ! বেশ, বেশ! এবারে আমার ঘর ঝাঁট দেবার, বাসন মাজবার আর রাঁধবার লোক পাওয়া গেছে। কাল থেকে এ সব কাজ কর্‌তে হবে কিন্তু!" সে বেচারা আর কি করে; ভয়ে ভয়ে তা'তেই রাজি হ'ল।

তখন থেকে মেয়েটি সেখানেই থাকে, বুড়োর কাজ করে, আর ব'সে ব'সে কেবলই কাঁদে। বুড়ো রোজ বেড়াতে যায় আর সন্ধ্যার সময় অনেক সোনা রূপো নিয়ে ফিরে আসে।

একদিন বুড়ো বেড়াতে বেরিয়েছে, আর মেয়েটি ক'রেছে কি বাড়ীর সব দরজা জানালা বন্ধ ক'রে একটি ছোট্ট কপাট খোলা রেখেছে। বুড়ো এসে তো কত ডাকাডাকি দরজা খুলে দেবার জন্য; মেয়েটি কিন্তু কিছুতেই আর দরজা খোলে না। এদিকে কিন্তু ক্ষিদেয় বুড়োর পেট চোঁ চোঁ কর্‌ছে, ঘুমও পেয়েছে বড্ড।

তখন সে রেগে বাড়ীর পেছন দিকের সেই ছোট্ট কপাটের কাছে গিয়ে তার ভিতর দিয়ে গ'লে ঢুক্‌তে চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু বেচারা দাড়িই সাম্‌লাতে পারে না, ঢুক্‌বে কি

ক'রে? তাই সে দাড়িটাই আগে জানালা দিয়ে গলিয়ে দিল। মেয়েটিও সুবিধা বুঝে তার দাড়ি শুদ্ধ কপাট চেপে বন্ধ ক'রে দিল। তখন যে বুড়োর টানাটানি আর দোহাই দস্তুর!

মেয়ে বল্ল, "বল শীগ্গির, কি ক'রে বাবার কাছে ফিরে যাব, না হ'লে কিছুতেই ছাড়্ছি না।" বুড়ো আর কি করে? উপরে উঠ্‌বার উপায় বল্‌তেই হ'বে, না হ'লে তার আর যাবার জো নাই।

তাই সে বল্ল, "ঐ যে ঘর দেখ্‌ছ, ওর এক কোণায় একটা মই আছে, সেটাকে যত লম্বা ইচ্ছা করা যায়, তাই দিয়ে উঠে যাও।"

মেয়েটি তখনই মই দিয়ে উঠে তার বাবার কাছে চ'লে এল। তখন যে কি আনন্দ হ'লো সকলের, তা' আর কি বল্‌ব! রাজা মশাই তখনই সেই রাজপুত্রকে ডেকে খুব ঘটা ক'রে তাঁ'র সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলেন, আর অর্দ্ধেক রাজ্যও দিলেন।

তারপর সেই মই দিয়ে গর্ত্তের ভিতরে নেমে বুড়োর সমস্ত সোনা রূপো নিয়ে এসে, বুড়োকে এক ঘরে বন্ধ ক'রে রেখে দিলেন। এখনও কেউ তার খোঁজ নেয় নি।

চীনদেশের কথা।

তোমরা "উল্টা মুলুকের" কথা শুনেছ? যেখানকার সব কাজ কর্ম্ম আজগুবি রকমের উল্টাপাল্টা? সে কোন্ দেশ আমি তা জানি না; কিন্তু চীন দেশকে যদি এই নাম দেওয়া যায় তাহ'লে বোধ হয় নেহাৎ অন্যায় হয় না।

আমরা বই লিখি সাম্‌নে থেকে, চীনেরা লেখে উর্দ্দুর মত পিছন থেকে। আমাদের লাইনগুলি যায় বাঁয়ে থেকে ডাইনে, তারা লেখে ডান দিক থেকে, উপর হতে নীচে। আমরা যদি তেমন ক'রে বাংলা লিখি তবে সেটা দাঁড়াবে এই রকম—

সে	ছে	ক	কি	থাঁ	চী
দে	ড়ে	থা	বা	দা	ন
শে	ছে	ক	রং	না	দে
র		য়		ক	শে
ক	আ	চং	কি	ট্যা	য
থা	ফিং		বা	রা	ত
লি	টি	ফং	ঢং	চো	লো
খি	কি			খ	ক

আমরা নাম বল্‌তে হ'লে নামটা আগে পদবীটা পরে বলি—যেমন পশুপতি ঘোষ। চীনেম্যান হ'লে বল্‌বে ঘোষ পশুপতি। আমরা তারিখ বলি—১লা মাঘ, ১৩২২, চীনে কায়দায় বল্লে বল্‌তে হয় ১৩২২ মাঘ ১লা। আমরা লোককে নমস্কার করি, সাহেবেরা "হ্যাণ্ড্‌ শেক্‌" করে, চীনেরা নিজের হাত ধ'রে ঝাঁকায়। আমরা ক্লাশে পড়া বলি মাষ্টারের দিকে মুখ ক'রে—তারা বলে তাঁর দিকে পিছন ফিরে! আমাদের রোগ হ'লে ডাক্তারকে টাকা দিই—চীনেরা যত দিন ভাল থাকে ডাক্তারকে পয়সা দেয় যাতে অসুখ না হয়; অসুখ করলেই পয়সা বন্ধ ক'রে দেয়। আমরা আরাম ক'রে শুতে হ'লে নরম বালিশ মাথায় দেই, চীনেরা উঁচু ঘাড়ের উপর উঁচু কাঠের তক্তা গুঁজে আরাম ক'রে ঘুমায়। আমাদের দেশের লোক দুষ্টু লোকে শত্রুকে খুন ক'রে—চীনেরা তার বাড়ীতে আত্মহত্যা ক'রে তাকে সাজা দেয়।

"চোর দিয়ে চোর ধরা" আমাদের দেশেও আছে। কিন্তু চীনেদেশে রীতিমত "চোর সমিতি" থাকে। গৃহস্থেরা সেই সতিতিতে চাঁদা দেয়, যাতে চোরেরা তাদের বাড়ীতে চুরি না করে।

চীনেদের একটা মন্দিরে হাজার হাজার লোক প্রার্থনা করতে যেত। একদিন সে সময়কার রাজা তাই শুনে হুকুম দিলেন, "সব বন্ধ কর—এত লোকে মিলে চেঁচামেচি কর্‌লে ঈশ্বর আমার কথা শুন্‌বেন কি ক'রে?"

গাধার চীৎকারে যদি ঘুমের ব্যাঘাত হয়, চীনেরা তাকে ঠ্যাঙায় না; তার ল্যাজে দড়ি দিয়ে পাথর বেঁধে রাখে। তাতে নাকি গাধার এত অপমান বোধ হয় যে সে বেচারা আর শব্দ টব্দ করে না।

চীনেদের কথার কায়দাও বড় অদ্ভুত। লোকের সঙ্গে দেখা হ'লে আমরা বলি, "কেমন আছেন?" চীনেরা জিজ্ঞাসা করে, "ভাত খাওয়া হয়েছে?" যদি খাওয়া হ'য়ে থাকে, তা হ'লে এর উত্তর বল্‌তে হবে, "আজ্ঞে হাঁ বেয়াদবি মাপ কর্‌বেন।"

মনে কর, দুজন অপরিচিত লোকের আলাপ হচ্ছে। তাদের কথাবার্ত্তা হবে এই রকম ধরণের—

"মহাশয়ের মহাসম্মানিত সুন্দর নামটি কি?"

"এ অধমের ঘৃণিত অকিঞ্চিৎকর নাম ওয়াং।"

"বয়সের কোন্‌ আশ্চর্য্য উচ্চতা আপনি লাভ করেছেন?"

"কিছু নয়, কিছু নয়। এই ত অনেক কষ্টে সবে ষাট পার হ'য়েছি।"

"আপনার সেই অতি সুন্দর প্রাসাদ ভবনটি কোথায়?"

"নদীর ধারে ভাঙা কুঁড়ের মধ্যে এই অপদার্থ দেহটা থাকে।"

"আপনার গৃহে মহা সম্ভ্রান্ত নমস্য কয়জন? (অর্থাৎ ক'টি ছেলে)?"

"এই, তিন ব্যাটা বাঁদর আছে।"

অনেক সময় কাজের কথার মধ্যেও এই রকম গুরু গম্ভীর বুলি আওড়াতে হয়। ডাক্তার এসে পিঠে মলম দিবে—সেখানেও তাকে বল্‌তে হবে—"এই সামান্য মলম আপনার মহামান্য পৃষ্ঠে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতে দিয়া ইহাকে কৃতার্থ করুন।"

যদি চীনাম্যানকে তাহার স্ত্রীর কথা জিজ্ঞাসা কর, সে হয় ত নাক সিঁট্‌কাইয়া উত্তর দিবে, "নোংরা দুর্গন্ধ বাঁদীটা ঘরেই পড়ে আছে—তার কথা ব'লে আপনার মুখের অপমান কর্‌বেন না।"

যে সব লোকে বক্তৃতায় লম্ফঝম্ফ করে কিন্তু কাজের বেলায় কিছু নয়, চীনেরা তাকে বলে "কাগজের বাঘ"। একজন ইংরাজ একটা কোমর বন্ধ কিনেছিলেন, তাতে চীনা অক্ষরে কি যেন লেখা ছিল; দোকানদার বল্ল তার অর্থ "মহা সুখ"। ইংরেজটি সেইটা কোমরে বেঁধে সকলকে দেখাতেন। শেষটায় একজন চীনা তাঁকে বুঝিভে দিল যে, কথাটার অর্থ ওরকম দাঁড়ায় বটে, কিন্তু আসলে ঠিক মত তরজমা ক'রে বল্লে বল্‌তে হয় "খেয়ে খেয়ে ভুঁড়ো পেট"!

চীনদেশে ছেলেদের ভারি আদর। এক একটা ছেলের তিনবার ক'রে নামকরণ হয়। জন্মাবার কিছু পরেই একবার নাম হয়—ভূত ভোলাবার জন্য। ভূত প্রেতেরা যদি টের পায় যে ছেলেটি বাপমায়ের ভারি আদরের, তারা হিংসা ক'রে তাদের অনিষ্ট কর্‌তে পারে। সেই জন্য প্রথমটা খুব অনাদরের ভান ক'রে একটা বিশ্রী নাম রাখা হয়, যেমন—"ছারপোকা, আহাম্মক, পাজি, ছিঁচ্‌কাঁদুনে" ইত্যাদি। তারপর ছেলের যখন লেখাপড়া আরম্ভ হয় তখন আবার নাম হয়, যেমন "পড়ায়-মন" "কলমওয়ালা" "বুদ্ধি-খুল্‌ছে"—ইত্যাদি। তারপর, শেষ নামকরণ হয় বিয়ে কর্‌বার সময়।

মেয়েদের বেলা কিন্তু এত কিছুই হয় না। অনেক সয়ম তাদের নামই থাকে না—১নং মেয়ে, ২নং মেয়ে ব'লে পরিচয় দেওয়া হয়। তা ব'লে মনে ক'রো না যে চীনেম্যান্‌রা ভারি গম্ভীর গোছের মানুষ—হাসি তামাসা বেশী জানে না। আসলে তারা খুব আমুদে লোক। তবে কিসে যে তাদের আমোদ হয় আর কিসে যে হয় না এ অনেক সময় বোঝা যায় না! ঝিঁঝি পোকার লড়াই তাদের একটা ভারি আমোদ। দুটো পোষা

ঝিঁঝি পোকাকে এক জায়গায় ছেড়ে দিয়ে সরু সুতো দিয়ে তাদের সুড়সুড়ি দেওয়া হয়। তাতেই ক্রমে তারা ক্ষেপে উঠে সাংঘাতিক রকম লড়াই বাধিয়ে দেয়। তখন

চীনেদের ফূর্ত্তি দেখে কে! রাস্তায় যদি কেউ পা মচ্‌কিয়ে প'ড়ে যায়, কিম্বা যদি ধাক্কাধাক্কি হ'য়ে কোন গাড়ীটাড়ী উল্টে যায়—অম্নি দেখ্‌বে আশে-পাশের যত লোক কাজ কর্ম্ম ফেলে হো হো ক'রে হাস্‌তে হাস্‌তে ছুটে আস্‌বে। এটা তাদের পক্ষে একটা ভারি মজার ব্যাপার!

চীনেদের দেশে এক দল লোক আছে তাদের পেশা হ'চ্ছে লোককে গল্প শোনান। নানা রকম গল্প তাদের মজুৎ থাকে। একটা নমুনা দিলাম—

'এক ছিল বোকা গৃহস্থ। তার স্ত্রী ছিল খুব চালাক। বোকা যে দিনই বাজারে যেত, সেদিনই ঠকে আস্‌ত। জিনিষ পত্র সব ডবল দামে কিনে আন্‌ত। একদিন তার স্ত্রী বল্ল, "যে যা দাম চায় অম্‌নি সেই দামেই জিনিষ কিন্‌তে যেয়ো না—যত চাবে

তার অর্দ্ধেক ব'লো।" গৃহস্থ মশাই বাজারে গিয়ে দোকানদারকে বল্লেন, "এইটার দাম কত হে?" দোকানদার বল্ল, "কুড়ি সেণ্ট্।" গৃহস্থ বল্লেন, "বটে? দশ সেণ্ট্ দেব।" "দশ সেণ্ঠে কি হয়? ষোল সেণ্ঠে দিব।" গৃহস্থ ভাব্লেন যত বল্বে তার অর্দ্ধেক বল্তে হবে—"আট সেণ্ট্।" দোকানদার বল্ল, "মশাই, আপনার কথার ঠিক নেই—পোনের সেণ্ঠের কমে পাবেন না।" গৃহস্থ বলে, "তাই ত! পোনেরর অর্দ্ধেক কত হয়? সাড়ে সাত, না? আচ্ছা সাড়ে সাত দিব।" দোকানদার তখন তাকে মেরে তাড়িয়ে দিল।'

চীনেরা খুব ভাল কারিকর হয়—তাদের বুদ্ধিও খুব ধারাল। তারাই সর্ব্ব প্রথম বই ছাপাতে শেখে, কাগজ বানায়, দিগদর্শন যন্ত্র আবিষ্কার করে, বারুদ তৈয়ারি করে। পৃথিবীর সব চেয়ে বড় খাল চীনাদের তৈরী। সব চেয়ে লম্বা, সব চেয়ে বড় দেয়ালও

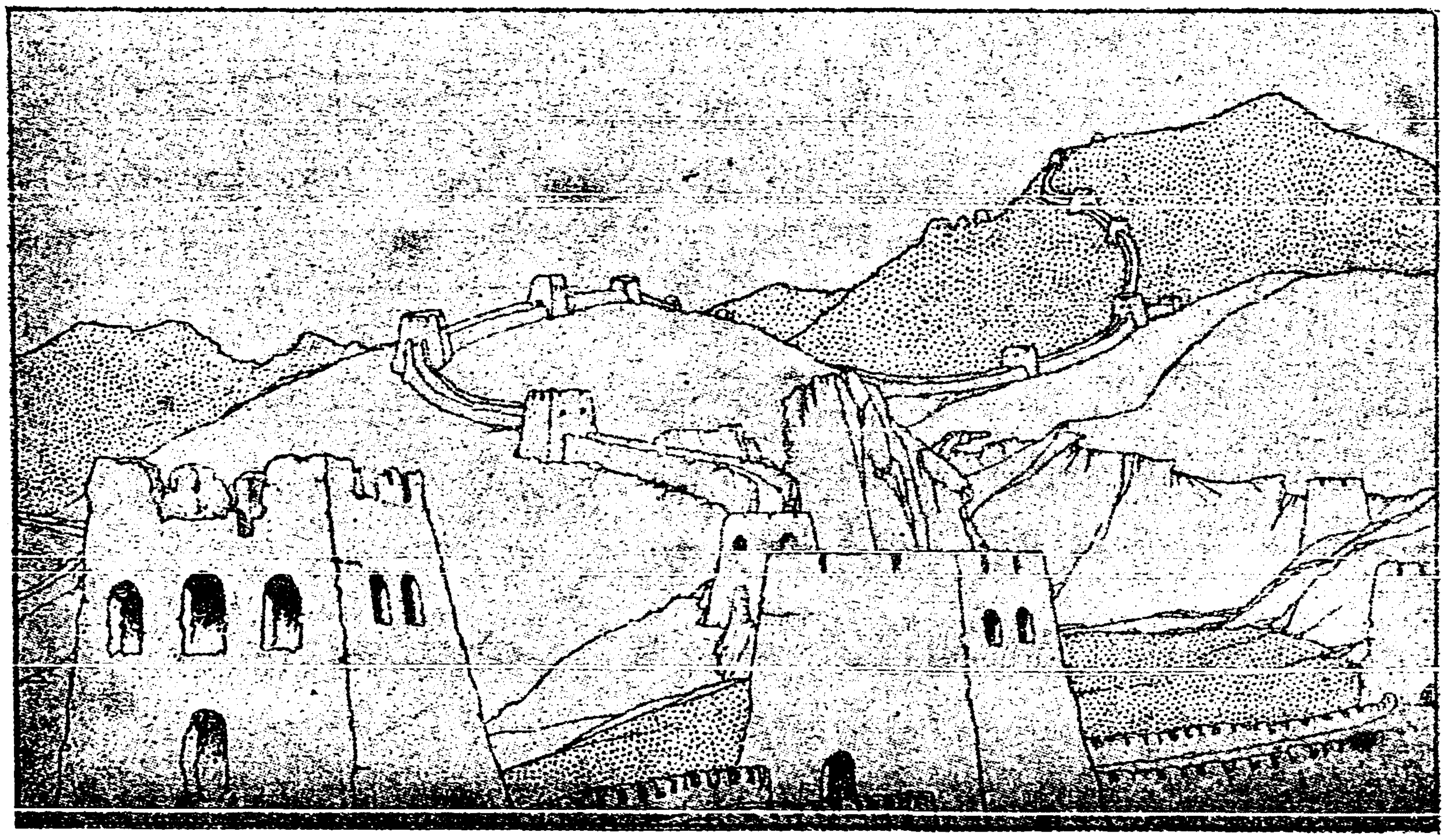

তাদেরই তৈরী। এই দেয়াল অধিকাংশ জায়গায়ই এত চওড়া যে চারজন লোক অনায়াসে পাশাপাশি ঘোড়া দৌড়িয়ে তার উপর দিয়ে যেতে পারে। দেয়ালটি পাহাড় পর্ব্বতের উপর দিয়ে গেছে। ঘোড়ায় চড়ে তার এক মাথা থেকে আর এক মাথা পর্য্যন্ত ঘুরে আস্তে প্রায় ত্রিশ দিন সময় লাগে।

গুজবের জন্ম।

রাম বাবুর চাদর খানা পোকায় কেটেছে—তিনি সকালে শ্যাম বাবুকে বল্লেন, "এই সেদিন চাদর খানা কিন্‌লুম এর মধ্যেই তার দুর্দ্দশা দেখ।"

শ্যাম বাবু তাঁর বৈঠকখানায় ব'সে বল্লেন, "রাম বল্‌ছিল, পোকার অত্যাচারে কাপড় চোপড় ত আর থাকে না, তার ভাল চাদর খানার আর কিছু বাকী রাখেনি।" সেই শুনে হরিচরণ তার বামা পিসীকে বল্ল, "কাপড় চোপড়গুলো কর্পূর টপূর দিয়ে একটু সাবধানে ভাল ক'রে রেখো—এই শুনে এলুম, রাম বাবুর সেই দেড়শ টাকার শাল খানা এর মধ্যেই গেছে।"

বামা পিসী তাঁর অনুকুল দাদাকে বল্লেন, "শুনেছ দাদা, রাম বাবুদের সর্ব্বনাশ হয়েছে। বাড়ীতে চোর না কি এসেছিল—দামী কাপড় চোপড়গুলো সব সরিয়েছে।"

অনুকুল বাবু পথে যেতে দেখ্‌লেন দারোগা মশাই এক পেয়াদা নিয়ে কোথায় চলেছেন। তিনি তাঁর কেরাণী মহলে গল্প কর্‌লেন, "ওহে রাম চাটুর্য্যের বাড়ী পুলিশ গিয়েছে চুরির তদন্ত কর্‌তে—ব্যাপারটা কি একবার খোঁজ কর্‌তে হবে।"

কেরাণীরা বলাবলি কর্‌তে লাগ্‌ল, "শেষটায় রাম চাটুর্য্যের হাতে হাত কড়া পড়্‌বে নাকি?" কেউ বল্লে, "রাম বাবু নয়—হয় ত বাড়ীর আর কেউ।" কেউ বল্লে, "যাই হোক্—বাড়ী থেকে চোরাই মাল বেরিয়েছে ত।"

রাম বাবু তখন আফিসে। তিনি বিকালে বাড়ী ফিরে এসে শোনেন কি, সহরময় রাষ্ট্র হ'য়েছে যে পুলিশে নাকি তাঁকে চালান দিয়েছে- ছয় মাস জেল হবার সম্ভাবনা!

নূতন ধাঁধা।

মাষ্টার মশাইকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম তাঁর ছাত্র ক'জন। তিনি বল্লেন, "অর্দ্ধেক ছেলে পড়ে, সিকি ভাগ ছেলে চুপ ক'রে ব'সে থাকে, সাত ভাগের এক ভাগ গল্প করে, বাকি তিনটি ছেলে ঘুমায়।"

বল তো তাঁর ক্লাসে কয়টি ছেলে?

গত মাসের ধাঁধার উত্তর।

১। ভদ্রলোকটির বয়স এখন ২৮ বৎসর।

২। "মশাল"।

৩। এই রকমে কোনাকুনি কাঠখানাকে কেটে

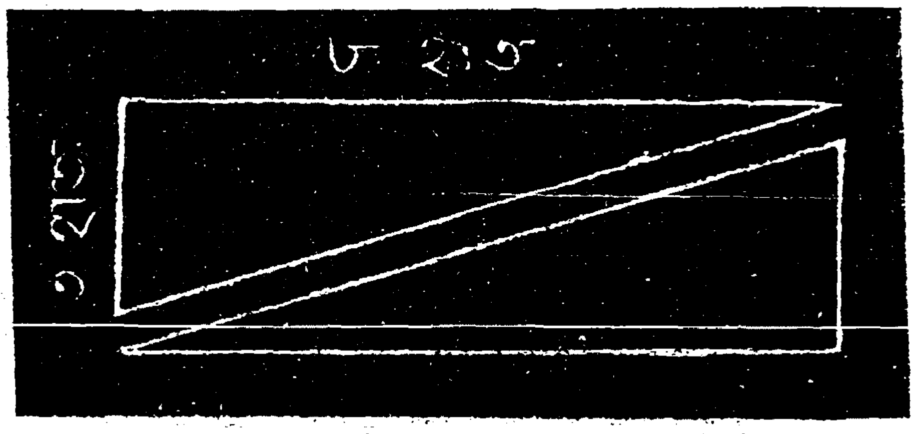

এই রকমে দুটি টুকরা জোড়া দিয়ে ফুটো বুজিয়েছিল।

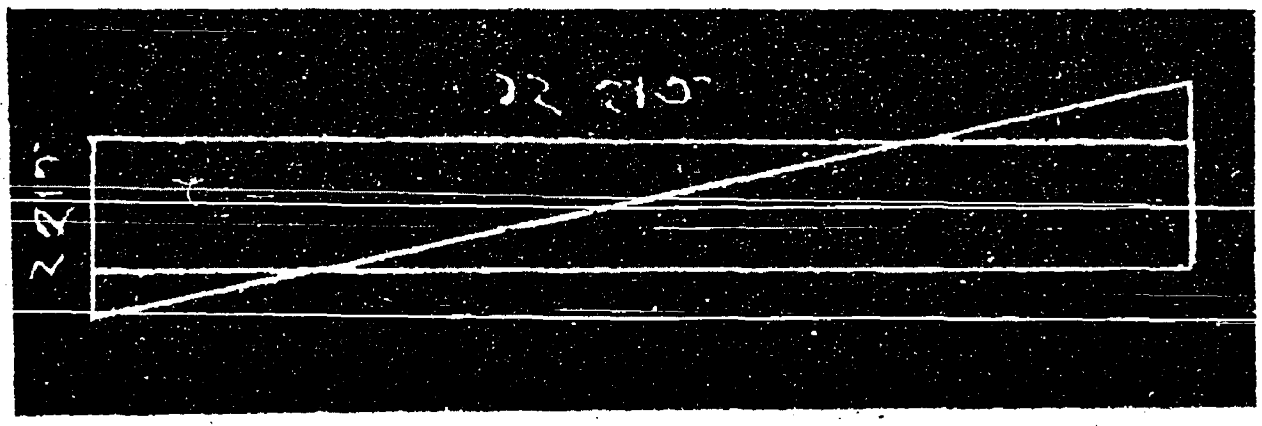

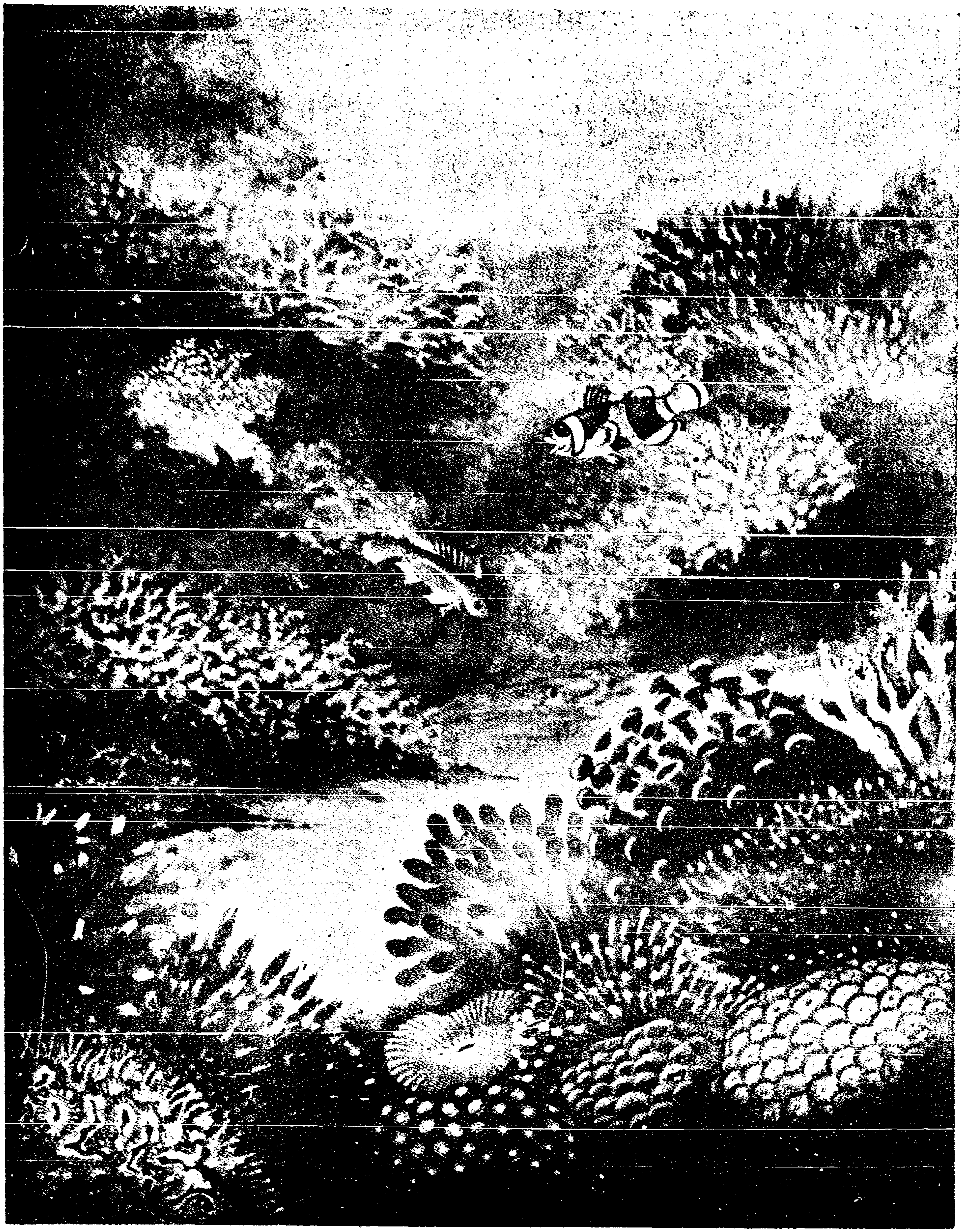

প্রবাল

তৃতীয় বর্ষ ফাল্গুন, ১৩২২ একাদশ সংখ্যা

ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

রঙের খেলা।

সকলে— একটি সুতায় সাতটি মণি,
সাতটি আলোর মেয়ে,
নেমে এলাম এই ধরাতে
অরুণ আলো বেয়ে।

জাগ্‌ল বরণ, চরণ পাতে,
লীলায় অপরূপ ;
তাইত এমন মনমোহন
ভুবনভরা রূপ।

তাইত এত রঙের শোভা
সন্ধ্যা মেঘের গায়,
শ্যাম ধরণী লুটিয়ে পড়ে
নীল আকাশের গায়।

তাই রঙ্গীন পাখীর পাখা
রঙ্গীন ফুল ফল,
রঙের মেলা তাই ছেয়েছে
সকল জল স্থল।

বেগুনী রং— আমরা দুটি বেগুনী রঙ
রয়েছি ফুলে ফলে,
প্রজাপতির ডানার মাঝে,
সুদূর অস্তাচলে।

নীল রং— নীল বরণ আকাশ তলে,
নীল সাগর জল,
নীল নলিনী, সুনীল মণি
নয়ন নীলোৎপল।

সবুজ রং— ঢাকিয়াছি বন উপবন
স্নিগ্ধ হরিত বাসে;
চোখ জুড়ান সবুজ রঙে
সবাই ভাল বাসে।

হল্‌দে রং— পীত বরণ স্বর্ণ বরণ,
আমারে হেরিবে
অগ্রাণেতে ধানের ক্ষেতে
বসন্ত উৎসবে।

কমলা রং— নারাঙ্গী রং, জাফ্‌রাণী রং,
রঙের রাণী সেই,
সকাল সাঁঝে আকাশ মাঝে,
তুলনা যার নেই।

লাল রং— আনন্দেরি স্বরূপ আমি
আরক্ত বরণ,
সবার সেরা, সবার প্রিয়,
শোভায় অতুলন।

সকলে— কিরণ ডোরে মণির মালা,
মোরা কিরণ বালা,
শিশির দলে মাণিক জ্বলে,
মোদেরি সে খেলা।

দাঁড়াই যবে গগন ঘেরি
ইন্দ্রধনু শিরে,
সাতটি বোনের হাসির ছটা
ভুবন আলো করে।

শ্রীসুখলতা রাও।

গরুড়ের অহঙ্কার।

নাগমাত্রেই গরুড় পক্ষীর খাদ্য, সেই জন্য গরুড়ের নামে নাগদের বড় ভয় হয়। অনন্ত নাগের পুত্র মণিনাগ ছিল খুব ক্ষমতাশালী নাগ; সে গরুড়ের ভয়ে মহাদেবের পূজা আরম্ভ করিল। মহাদেব তাহার পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"তুমি কি বর চাও বল।" মণিনাগ বলিল "প্রভু! গরুড় যেন আমার কোনও অনিষ্ট করিতে না পারে, আপনি আমাকে এই বর দিন!" মহাদেব সন্তুষ্ট চিত্তে মণিনাগকে সেই বর দিলেন।

মহাদেবের বরে নির্ভয় হইয়া মণিনাগ যেখানে গরুড় বাস করিত সেখানে গিয়া বুক ফুলাইয়া বেড়াইতে লাগিল। গরুড়ের ত রাগ হইবার কথাই—সে মণিনাগকে ধরিয়া

তাহার ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিল। এদিকে নন্দী তাহার প্রভু মহাদেবকে বলিল—"প্রভু! মণিনাগ আর ফিরিয়া আসিল না কেন? নিশ্চয়ই গরুড় তাহাকে খাইয়া ফেলিয়াছে কিম্বা ঘরে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।" নন্দীর কথায় মহাদেব সমস্ত ঘটনা জানিতে পারিয়া বলিলেন—"গরুড় মণিনাগকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। তুমি শীঘ্র বিষ্ণুর নিকট গিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট কর এবং মণিনাগকে লইয়া আইস।"

নন্দী বিষ্ণুর নিকট গিয়া মহাদেবের কথা জানাইল। নারায়ণ সন্তুষ্ট হইয়া গরুড়কে বলিলেন—"হে বিনতানন্দন! তুমি আমার কথা শুন, মণিনাগকে নন্দীর নিকট ফিরাইয়া দাও।" গরুড় বলিল—"না, আমি কিছুতেই দিব না। নাগ আমার খাদ্য, আমি তাই মণিনাগকে ধরিয়া আনিয়াছি আপনি এখন উহাকে ছাড়িয়া দিতে বলিতেছেন—এটা আপনার অত্যন্ত অন্যায় হইতেছে। প্রভুমাত্রই ভৃত্যদের ভাল ভাল জিনিষ দেয় আপনি আমাকে কিছুই দেন না, এখন আমি নিজে যাহা সংগ্রহ করিয়াছি তাহাও আবার ছাড়িয়া দিতে বলিতেছেন। আমার পিঠে চড়িয়া আমার বলেই ত আপনি যুদ্ধের সময় দৈত্যদের জয় করেন—সে কথাটা কি একবার মনে ভাবেন্ না?"

গরুড়ের অহঙ্কার দেখিয়া বিষ্ণু হাসিয়া উত্তর করিলেন—"ওহে গরুড়! তুমি আমাকে বহন করিয়া থাক এবং তোমার বলেই আমি দৈত্যদিগকে জয় করিয়া থাকি—এ অতি উত্তম কথা বলিয়াছ। তোমার যথেষ্ট শক্তি সেটা আমি স্বীকার করি, কিন্তু আমার এই কনিষ্ঠ অঙ্গুলিটা একবার বহন কর দেখি?" এই বলিয়া বিষ্ণু নন্দীর সাক্ষাতেই নিজের আঙ্গুল গরুড়ের মাথায় রাখিলেন। বিষ্ণুর আঙ্গুলের চাপে গরুড়ের মাথা তাহার কাঁধের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল—তাহার কাঁধ চ্যাপ্টা হইয়া গেল। বেচারি গরুড় তখন প্রাণের দায়ে জোড় হস্তে ভগবান বিষ্ণুর স্তুতি বন্দনা করিয়া বলিল "হে প্রভু! হে নারায়ণ! আমি আপনার ভৃত্য, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আপনি সকলের শ্রেষ্ঠ, আমার প্রভু। ভৃত্য শত অপরাধ করিলেও প্রভু তাহার দোষ ক্ষমা করিয়া থাকেন।"

গরুড়ের দুর্দ্দশা দেখিয়া লক্ষ্মীর দয়া হইল, তিনিও তখন তাহার মুক্তির জন্য বিষ্ণুকে অনুরোধ করিলেন। তখন নারায়ণ নন্দীকে বলিলেন—"তুমি গরুড়ের সহিত এই মণিনাগকে শিবের নিকট লইয়া যাও। শিবের অনুগ্রহে গরুড় আবার তাহার নিজের শরীর ফিরিয়া পাইবে।"

নন্দী মণিনাগের সহিত গরুড়কে শিবের নিকট লইয়া গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। মহাদেব তখন গরুড়কে বলিলেন—"হে বিনতানন্দন! তুমি গৌতমী গঙ্গায় গিয়া স্নান কর তাহা হইলে তোমার নিজের শরীর ফিরিয়া পাইবে।"

মহাদেবের উপদেশমত গৌতমী গঙ্গায় স্নান করিয়া গরুড় পুনরায় বজ্রের মতন কঠিন সোনার শরীর পাইয়া বিষ্ণুর নিকট ফিরিয়া গেল।

মানুষ খেকো নেক্ড়ে।

যেমন মানুষ খেকো বাঘ থাকে (man eater) তেমনি মানুষ খেকো নেকড়ের কথাও অনেক শুনতে পাওয়া যায়। এই রকম একটা মানুষ খেকো ভীষণ নেক্ড়ের গল্পই আজ সন্দেশের পাঠক পাঠিকাদের বলব ঃ—সে বহু দিনের কথা; ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে একবার ফরাসি দেশে হঠাৎ কোথা থেকে একটা ভয়ঙ্কর নেক্ড়ে বাঘ এসে উপস্থিত হয়েছিল। এই নেকড়েটা ছিল নাকের ডগা থেকে লেজের ডগা পর্য্যন্ত ছয় ফুট লম্বা! এত বড় নেক্ড়ে বাঘ প্রায় দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। একেই ত ভীষণ বড় নেক্ড়ে তার উপর আবার সেটা ছিল মানুষ খেকো। কজন লোক তার পেটে গিয়েছিল জান? তিরাশি জন। তা ছাড়া জখমও করেছিল ৩০।৪০ জনের কম নয়। নেক্ড়েটাকে মারবার চেষ্টায় কত জন শিকারী ঘুরে ফিরেছিল তা শুন্‌লে তোমরা বোধ করি বিশ্বাসই কর্‌বে না। সমস্ত ফরাসি দেশ এই একটা নেক্ড়ের উপদ্রবে একেবারে অস্থির হয়ে পড়েছিল। অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে দস্তুর মত দল বেঁধে না গেলে চাষীরা চাষ কর্‌তে যেতে ভরসা পেত না। এই মানুষ খেকো নেক্ড়েটির গতি ছিল আরও অদ্ভুত—সকালে হয় ত শুন্‌তে পাওয়া গেল একটা গ্রামে উপদ্রব কর্‌ছে আবার রাত্রে শোনা গেল ষাট মাইল দূরে এক গরীব কৃষকের ছেলেটিকে খেয়ে ফেলেছে।

কখনও বা পঁচিশ ত্রিশটি গ্রামের লোক দলবদ্ধ হয়ে এই নেক্ড়েকে আক্রমণ কর্‌তো। একবার হাজার হাজার শিকারী মিলে একটা প্রকাণ্ড বন ঘেরাও করেছিল সেই বনের মধ্যেই নেক্ড়েটা থাকত। তন্ন তন্ন করে বন জঙ্গল উলট পালট করে সকলে খুঁজে বেড়াল কিন্তু নেকড়ের উদ্দেশও পাওয়া গেল না—সেটা যেন ধোঁয়া

হয়ে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে পড়ল। একজন শিকারী একবার বল্‌ল—"আরে মশাই, গুলি ত ঢের বার সেটাকে মেরেছি কিন্তু কি আশ্চর্য্য বন্দুকের গুলিও কি তার গায়ে লেগে ভোঁতা হয়ে পড়ে যায়!" ক্রমে অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়াল যে কুকুরগুলি পর্য্যন্ত আর নেকড়েটাকে তাড়া করতে চাইত না, নেহাৎ জোর জবরদস্তি করে লেলিয়ে দিলেও তারা অন্য দিকে ঘেউ ঘেউ করতে করতে চম্পট দিত। লোকের তখন বিশ্বাস জন্মে গেল যে এটা নেকড়েই নয়—নেকড়ের ছদ্মবেশধারী কোনও ভূত হবে। গ্রামে গ্রামে ঢের লোক এই নেক্‌ড়ের ভয়ে পূজো দিতে লাগ্‌ল।

ফরাসি গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করে দিলেন—"যে এই নেক্‌ড়ে মারতে পারবে তাকে অনেক টাকা বক্‌সিস্‌ দেওয়া হবে।" খুব সুন্দরী পিতৃমাতৃহীন একটি সম্ভ্রান্ত ধনীর কন্যা বল্লেন—"যে এই নেক্‌ড়েটাকে মারতে পারবে তাকেই আমি বিয়ে করব!" কাউণ্ট লিওঁসী নামে এক সম্ভ্রান্ত যুবক এই মেয়েটিকে ভালবাসত। সে প্রতিজ্ঞা ক'রে বস্‌ল—"হয় নেক্‌ড়ে মেরে এই কন্যাকে বিয়ে করবে আর না হয় সে চেষ্টায় নিজের প্রাণ দিবে।" এই পণ ক'রে জন কয়েক ভাল শিকারী এবং দুটা ভীষণ ডালকুত্তা সঙ্গে নিয়ে লিওঁসী চল্ল নেক্‌ড়ের উদ্দেশে।

এদিক সেদিক ঘুরে ফিরে অনেক চেষ্টার পর শিকারীর দল একদিন নেক্‌ড়েটাকে একটা পাহাড়-ঘেরা প্রকাণ্ড গর্ত্তের মধ্যে তাড়িয়ে নিয়ে গেল। গর্ত্তটার চারিধার খুব উঁচু, একেবারে খাড়া হয়ে উঠেছে, সরু একটা পথ দিয়ে সেখানে যেতে হয়—জায়গাটি বড়ই বিপদজনক। যুবক লিওঁসী স্থির করল যা কর্‌তে হয় সে একাই কর্‌বে এমন ভয়ানক জায়গায় কিছুতেই সে অপর লোকদের নিয়ে যাবে না। গহ্বরে ঢুকবার পথে সঙ্গীদের বল্ল—"তোমরা হুঁসিয়ার থেকো, নেক্‌ড়েটা যদি পালিয়ে যেতে চায় তখনি তাকে গুলি করো।" এই বলে সেই কুকুর দুটো সঙ্গে নিয়ে সে এগিয়ে চল্ল। এ বড় ভয়ানক জায়গা, পালাবার পথ নাই—হয় জিত না হয় মৃত্যু।

কয়েক পা এগিয়ে গিয়েই লিওঁসী দেখ্‌ল বরফের উপর এখানে সেখানে সেই নেক্‌ড়ের পায়ের দাগ। নেক্‌ড়েটাকে দেখতে পাওয়া গেল না; পাহাড়ের ঝোপে ঝাপে অনেক সন্ধান করেও তার কোন উদ্দেশ নাই, এমন সময় হঠাৎ কুকুর দুটো গোঁ গোঁ করে উঠল। লিওঁসী যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল তার কিছু দূরেই একটা জায়গায় জল জমে ছিল; সেই জলের ধারে লম্বা লম্বা নল খাগড়ার মত পাতা-ওয়ালা গাছ। সেই পাতার ভিতর দিয়ে লিওঁসী দেখল আগুনের মত জ্বল জ্বল

করে দুটো চোখ্‌ জ্বল্‌ছে। বন্দুক একেবারে নিশান করে তখন সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলো, কুকুর দুটি তার পিছনে, তারাও শিকার দেখতে পেয়েছে—যুদ্ধের জন্য উৎসুক হ'য়ে তারাও গর্জ্জন কর্‌তে লাগল।

নেক্‌ড়ে তবু স্থির হয়ে বসেই রয়েছে। তখন লিওঁসী তার চোখ দুটোর মাঝখানে তাক্‌ করল! যাই বন্দুক তাক্‌ করা অমনি নেক্‌ড়ে বিদ্যুদ্বেগে সেখান থেকে তাড়া করে এল। লিওঁসী ভয় পাবার লোক নয় সে তখন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ধ্বড়াম্‌ করে ছেড়ে দিল বন্দুক। সঙ্গে সঙ্গে গভীর আর্ত্তনাদ করে নেক্‌ড়েটাও ধরাশায়ী হলো। কিন্তু তবু কি সেটার মরণ আছে! রক্তে তার শরীর মাখামাখি হয়ে গিয়েছে কিন্তু তবু চক্ষের নিমেষে আবার লাফিয়ে উঠে সে একেবারে লিওঁসীর উপরে এসে পড়ল। হাতে সঙ্গীন ছিল সেটা দিয়ে লিওঁসী আত্মরক্ষার চেষ্টা করল বটে কিন্তু সঙ্গীনটা গেল ভেঙ্গে। বন্দুকটাও গেল বেঁকে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেও মাটিতে একেবারে চিৎপাৎ। প্রভুভক্ত বিশ্বাসী কুকুর দুটি তার সঙ্গে না থাকলে বোধ করি সেখানেই তার শেষ হয়ে যেত।

সৌভাগ্যক্রমে সেই সময়ে কুকুর দুটি এক সঙ্গে নেক্‌ড়ের ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়্‌ল। নেক্‌ড়েও ছাড়্‌বার পাত্র নয়, তার ক্ষুরের মত ধারাল দাঁত দিয়ে একটা কুকুরের পিঠে এমন কামড়িয়ে দিল যে মেরুদণ্ডটা মড়মড় করে ভেঙ্গে গিয়ে কুকুর তখনি মরে গেল। অপর কুকুরটা

এই অবসরে নেক্ড়ের টুঁটি কামড়িয়ে ধরায় লিওঁসী শরীরের উপরেই দুটোতে ভীষণ যুদ্ধ বেধে গেল। বেচারা পড়ে গিয়েই ত প্রায় অজ্ঞানের মত হয়েছে তার পরে আবার মস্ত বড় দুটো জন্তু তার উপরে যুদ্ধ কর্‌ছে, তার দম বন্ধ হবার জোগাড়! কিন্তু তবু নিজের প্রাণটা বাঁচাবার জন্য শেষ চেষ্টা না করে সে ছাড়ল না। প্রকাণ্ড একটা ছুরি তার কোমরে ঝুলান ছিল সেই ছুরিটা নিয়ে সে নেক্ড়ের বুকের মধ্যে একেবারে বাঁট পর্য্যন্ত বসিয়ে দিল। এই সময়ে হঠাৎ তার মনে হলো যেন কারা চেঁচিয়ে বল্‌ছে—"ভয় নাই মশায়, কিছু ভয় নেই, আমরা এসে পড়েছি।" মুহূর্ত্ত পরেই লিওঁসীর চেতনা লোপ পেল।

খানিক পরে জ্ঞান লাভ করে লিওঁসী দেখল যে তার দলের লোকেরা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। তখনি লাফিয়ে উঠে সে জিজ্ঞাসা কর্‌ল—"নেক্ড়ে? নেক্ড়েটার কি হলো?" দলের সর্দ্দারটি আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল বরফের উপর সেই মরা কুকুরের পাশেই নেক্ড়েও মরে পড়ে আছে। তার শরীরটা টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গিয়েছে, চারিদিকে রক্তে মাখামাখি আর সেই ছুরিটা তখনও তাঁর বুকের মধ্যে বিঁধে রয়েছে। অন্য কুকুরটা যুদ্ধের পর ক্লান্ত হয়ে বরফের উপর শুয়ে শুয়ে হাঁপাচ্ছে আর তার শরীরের আঘাত গুলি জিব দিয়ে চাট্‌ছে।

সকলে মিলে তখন দল বেঁধে নেক্ড়েটাকে নিয়ে সেই মেয়ের বাড়ীতে চল্ল। এই সুসংবাদ ইতি পূর্ব্বেই তিনি শুন্‌তে পেয়েছিলেন! তিনি তাঁর প্রাসাদের দরজায় নেমে এসে বিজয়ী বীরের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এরপর লিওঁসীর সঙ্গে যে তাঁর বিয়ে হয়ে গেল সেটা ত তোমরা বুঝ্‌তেই পার্‌ছ। সেই দিন থেকে ফরাসি দেশও সেই মানুষ খেকো নেক্ড়ের হাত থেকে রক্ষা পেল।

সামান্য জিনিষ।

যে সকল ছোট খাট জিনিষ আমরা সর্ব্বদা ব্যবহার করি, এবং সাধারণত যাকে আমরা "সামান্য জিনিষ" ব'লে থাকি—তার কথা আমরা বড় একটা ভেবে দেখি না। এই যে ছুঁচ সুতা কাগজ কলম প্রভৃতি যা আমরা সর্ব্বদা কাজে লাগাই, এগুলি কোথায় কেমন ক'রে তৈরী হয়, কোথা হ'তে কেমন ক'রে আসে, এসব কথা আমরা যদি ভেবে দেখ্‌তাম তাহ'লে অবাক্ হ'য়ে যেতাম। এক একটা অতি-সামান্য জিনিষের জন্যও মানুষের কতখানি শক্তি সময় ও বুদ্ধি খরচ কর্‌তে হয়েছে, সেকথা ভাবতে গেলে আর কোন জিনিষকেই সামান্য ব'লে মনে হয় না।

এই যে কলমের আগায় "নিব" পরান রয়েছে, ঐ নিবটার কথা ভাব দেখি। কোথায় কোন্ খনি থেকে ধাতু পাথর জোগাড় ক'রে, বড় বড় চুল্লীতে সেই পাথর গলিয়ে মানুষে তা থেকে লোহা বের করে। সেই লোহাকে পুড়িয়ে পিটিয়ে ইস্পাত তৈরী হয়। ইস্পাতকে কলে ফেলে, ঠেঙিয়ে, চাপ দিয়ে যখন সেটা পাৎলা পাতের মত হয়, তখন সেই ইস্পাতের "চাদর" থেকে চ্যাপ্টা নিবের মত ছোট ছোট টুক্‌রো কাটে। নিবের কারখানায় গেলে দেখ্‌বে—সারি সারি কল, তার একটির কাজ নিবের ছুঁচাল মুখটি চিরে দেওয়া; আর একটিতে নিবের গায়ে ফুঁটো কাটা হয়। কোন কলে হয়ত নিবগুলি ঘসে মেজে পরিষ্কার পালিশ হ'য়ে আসে, কোনটিতে নিবের উপরকার লেখাগুলির ছাপ মেরে দেয়। তারপর সেই চ্যাপ্টা পাতের মত নিবটিকে বাঁকিয়ে তার পিঠ গোল ক'রে দিলেই খাসা নিব তৈরী হ'ল। সেই নিব বিলাত থেকে চালান হ'য়ে জাহাজে চ'ড়ে এদেশে আসে; তারপর কত দোকান ঘুরে শেষে তোমাদের কলমের আগায় এসে বসে।

ঐ যে প্রতিদিন লোকে খবরের কাগজ পড়্‌ছে সেই কাগজের আদিজন্ম হয়ত নরওয়ে দেশের গাছে। সেই গাছ কেটে সিদ্ধ ক'রে তার মণ্ড পাকিয়ে তা থেকে কেমন ক'রে কাগজ বানাতে হয়—সেকথা গত বৎসরের সন্দেশে বলা হ'য়েছে। এই যে সন্দেশের লেখা তোমরা পড়্‌ছ এর কালী কোথা থেকে এসেছে কে জানে? কোথায় আমেরিকাতে কেরোসিন জ্বালিয়ে তা থেকে লোকে কাল রং তৈরী কর্‌ছে। সেই রংকে ঘন তেলে গুলে ইংরেজ কালীওয়ালা কালী বানিয়েছে। সেই কালী কিনে এনে আমরা সন্দেশ ছাপি আর তোমরা পড়।

সকাল বেলা উঠে হাজার হাজার লোকে চা বানিয়ে খায়। সেই চা আসে কোথা থেকে? আসামের পাহাড়ে জঙ্গলে যে এত সব চাবাগান আছে, ভেবে দেখ সেখানে কত পরিশ্রম ক'রে কুলি খাটিয়ে রাত দিন চা-গাছের যত্ন নেওয়া হ'চ্ছে। সেই গাছের পাতা বাছাই ক'রে শুকিয়ে কলে পিষে বাক্সবন্দী ক'রে এখানে চালান দেয়। ব্যবসাদারেরা সেই চা কিনে তাতে নানারকম মিশাল দিয়ে আবার তাকে টিনে বন্ধ ক'রে তোমার আমার কাছে বিক্রী করে। চায়ের মধ্যে যে চিনিটুকু দিচ্ছ সেও এসেছে হয় ত যবদ্বীপ থেকে। আক নিংড়িয়ে, রস বের ক'রে, সেই রসকে জ্বাল দিয়ে দানা বাঁধিয়ে, সেই দানাকে বার বার পরিষ্কার ক'রে তবে তা থেকে ঝক্‌ঝকে সাদা পরিষ্কার চিনি বেরিয়েছে।

এই রকমে যে জিনিষের কথাই ভাব তার মধ্যেই দেখ্‌বে কত পরিশ্রম, কত অদ্ভুত কাণ্ড, মানুষের সঙ্গে মানুষের কত রকম কেনা বেচার সম্বন্ধ। ডাল ভাত তরকারী লবণ প্রতিদিন যা খাও তার জন্য কত লোক সারাদিন ধ'রে হাড় ভাঙা খাটুনি খাটছে, রোদে ঘেমে বৃষ্টিতে ভিজে কত চাষা দিনের পর দিন তার ক্ষেতের যত্ন নিচ্ছে। তুমি আমি মাছ খাব, তার জন্য কত জেলে কত নদীতে জাল ফেল্‌ছে; সেই মাছ রেলে উঠে, নৌকায় চ'ড়ে লোকের ঘাড়ে চেপে বাজারে বাজারে বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মিষ্ট-মুণ্ড জীবের দেশ।

দেশের মানুষ মিষ্ট-মুণ্ড; সাম্‌লে তুণ্ড এবং জিভ্,
শোন তাদের বর্ণনাটা; বুঝ্‌বে কেমন মজার জীব।

(রাজার বর্ণনা)

নারিকেলে মাথা গড়া, জাম্‌রুলেতে কাণ,
চোখ্ দুটি নারকেলি কুল কাটা দুইখান।
গাল দুটি নারকেলের ফোঁপল, পাকা কলা নাক,
তাল-শাঁসটি চিবুক তাহার এমনি রূপের জাঁক।
অধরোষ্ঠ লম্বা আঙ্গুর, কিস্‌মিস্ তার দাঁত,
জিহ্বাটি কাঁটালের কোয়া কেউ দিও না হাত।
কাঁচা খেকো রাজার মাথা অতি চমৎকার,
ভাট বামুণে স্তুতির মন্ত্রে করেন ফলাহার।

(মন্ত্রীর বর্ণনা)

চুলগুলি তার ঝুরি ভাজা, মাথার খুলি আস্‌কে,
কাণ দুটি সিঙ্গারা তার; বল্‌না তোরা চাস্ কে ?
গাল দুটি তার ফুল্‌কো লুচি, কপাল সরু চাক্‌লি ;
চক্ষু দুটি ছানাবড়া ; না ব'লেই কে চাক্‌লি ?
ঠোঁটখানি তার ভাজা পুলি পানতুয়া তার নাক্‌রে ;
চিবুকটি তার বরফি-কাটা ; খাস্‌নে, একটু রাখ্‌রে।
জিভ্‌টি ঠিক জিবে-গজা, দন্ত ছানার মুড়্‌কি ;
মুখ দিয়ে যে লালা গড়ায় সেটা নলেন্ গুড়্ কি ?
মন্ত্রী ব'লেই পাকা মাথা,—মিষ্ট কিন্তু গুরুপাক ;
অজীর্ণ ভয় থাকে যদি, বুদ্ধি এঁটে দূরে থাক্।

(প্রজার বর্ণনা)

মুণ্ড তাদের কুষ্মাণ্ড, কর্ণ দুটি শীম,
নাসা তাদের কচি শশা, দেখ্‌তে যেন ভীম।
চক্ষু পটোল, গণ্ড বেগুন, ওষ্ঠ—লঙ্কা কাঁচা,
গুম্ফ দাড়ি হচ্ছে তাদের শাক ভাজা ভাজা।
চালের দানা তাদের দাঁত, পটল পাতা জিভ্,
হলেও তিক্ত পিত্তনাশী, জানে সকল জীব।
সিদ্ধ করে' কর্‌তে হয় প্রজার মুণ্ডপাত ;
জানেন উকীল, জমিদার—ধরার জগন্নাথ।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

প্রবাল।

এবারের রঙীন্ ছবিটা দেখ—রং বেরঙের গাছের মত, থোকা থোকা ফুলের মত কি সব অদ্ভুত জিনিষ! এই জিনিষের নাম প্রবাল। তোমরা অনেকে হয়ত প্রবাল বা "পলা" দেখেছ। লাল ঝামার মত একরকম প্রবাল অনেক সময়েই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। তাকে ঘষে মেজে পালিশ ক'র্‌লে তখন তার রং খোলে। কিন্তু প্রবাল যে কত রকম হয়, আর তার যে কি আশ্চর্য্য সুন্দর রং হ'তে পারে, তা যদি দেখতে চাও, তবে একটি বার সেই সব সমুদ্রে গিয়ে দেখ, যেখানে হাজার হাজার লাখ লাখ প্রবাল একসঙ্গে বাড়্‌ছে। সেখানে জলের নীচে তাকিয়ে দেখ্‌লে মনে হয়, কে যেন সমুদ্রের নীচে রঙের গালিচা বিছিয়ে রেখেছে। যারা কল্‌কাতায় থাক, তারা যাদুঘরে (Museum) গিয়ে দেখে আস্‌তে পার প্রবালের কি বাহার!

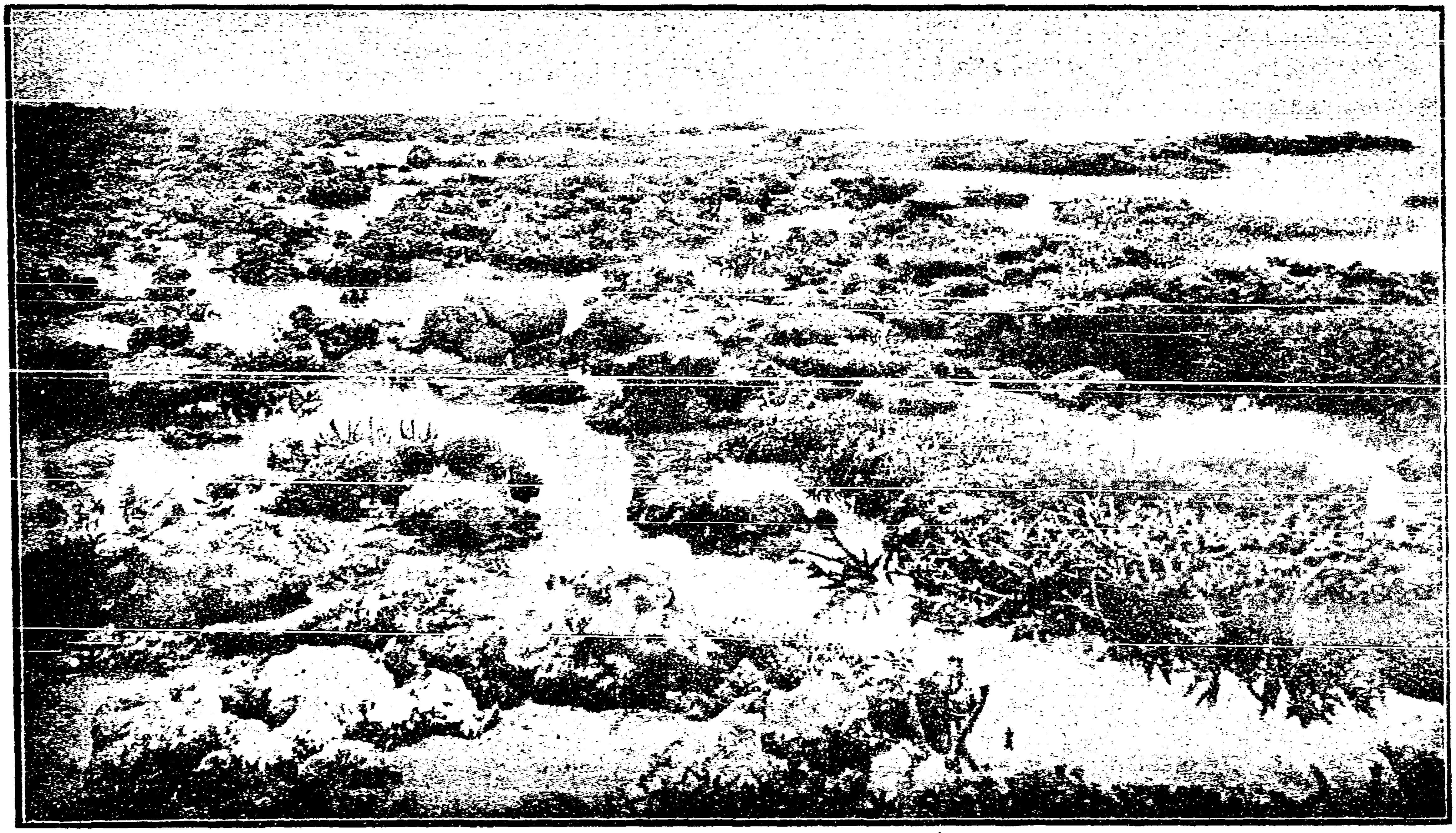

প্রবাল-দ্বীপ।

প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরের যে সব জায়গায় জল খুব পরিষ্কার এবং গভীর নয়, যেখানে শীতের উৎপাত নেই এবং গ্রীষ্মও খুব বেশী হয় না—এমন সব জায়গায় খুঁজ্‌লে

প্রবাল পাওয়া যায়। "খুঁজ্‌লে"ই বা বলি কেন? অনেক জায়গায় খুঁজবারও দরকার হয় না; প্রবালের চড়া, প্রবালের দ্বীপ, প্রবালের পাহাড়—সমুদ্র জুড়ে পড়ে থাকে। অষ্ট্রেলিয়ার আশে পাশে যে সব অসংখ্য ছোট ছোট দ্বীপ দেখা যায়, তার অনেকগুলি প্রবালের রাজ্য বল্লেও হয়। তোমরা মানচিত্রে দেখ অষ্ট্রেলিয়ার উত্তরপূর্ব্ব কূলের কাছে সমুদ্রের মধ্যে Great Barrier Reef ব'লে লম্বা রেখা আঁকা আছে। এই জিনিষটা একটা প্রবালের চড়া—১২০০ মাইল লম্বা—চওড়ায় ১০।২০ মাইলেরও বেশী—কোন কোন জায়গায় প্রায় একশ মাইল।

কিন্তু, "প্রবাল" জিনিষটা কি জান? প্রবাল এক রকম কীটের বাসা বা কঙ্কাল। এই প্রবাল কীটের ইতিহাস ভারি অদ্ভুত। কীট যখন শিশু থাকে তখন তার চেহারা থাকে ছোট্ট একটি বিন্দুর মত। তার পিছনে একটা সরু লেজ, সেইটিকে নাড়িয়ে সে জলের মধ্যে কিলবিল কর্‌তে থাকে। চল্‌তে চল্‌তে যখন সে শক্ত পাথরে এসে ঠেকে অম্‌নি তার ঘোরাফেরা বন্ধ হ'য়ে যায়। তার শরীরটা চোঙার মত লম্বা হ'য়ে আসে তা থেকে ক্রমে মুখ আর শুঁড় বেরোয়। সেই শুঁড় দিয়ে সে খাবার সংগ্রহ করে। যত খায় তত তার শরীর বাড়ে, তার গায়ে ফোস্কার মত উঠে তা থেকে ডালপালা বেরিয়ে চারিদিক ছড়িয়ে পড়ে। আর সেই সঙ্গে আর একটা অদ্ভুত কাণ্ড হয়—প্রবালকীটের চারিদিকে খোলসের মত তার বাসা তৈরী হ'তে থাকে। সেই বাসাকেই আমরা 'প্রবাল' বলি। কীট যতক্ষণ বাসার মধ্যে থাকে বাসাকে ততক্ষণ জীবন্ত বলা চলে—বাসার চারিদিকে অসংখ্য শুঁড় বেরিয়ে থাকে—কোন পোকা বা মড়া গাছপালা বা অন্য কোন "খাবার" কাছে এলে সব শুঁড়গুলি মিলে তাকে চেপে ধ'রে মুখের কাছে ঠেলে দেয়। কীটের খিদেও যেন কিছুতে আর মিট্‌তে চায় না। যতই খায় ততই তার বাসা বড় হ'য়ে উঠ্‌তে থাকে—সেও ক্রমেই পুরানো বাসা ছেড়ে উপরে উঠ্‌তে থাকে আর নতুন বাসা বানাতে থাকে।

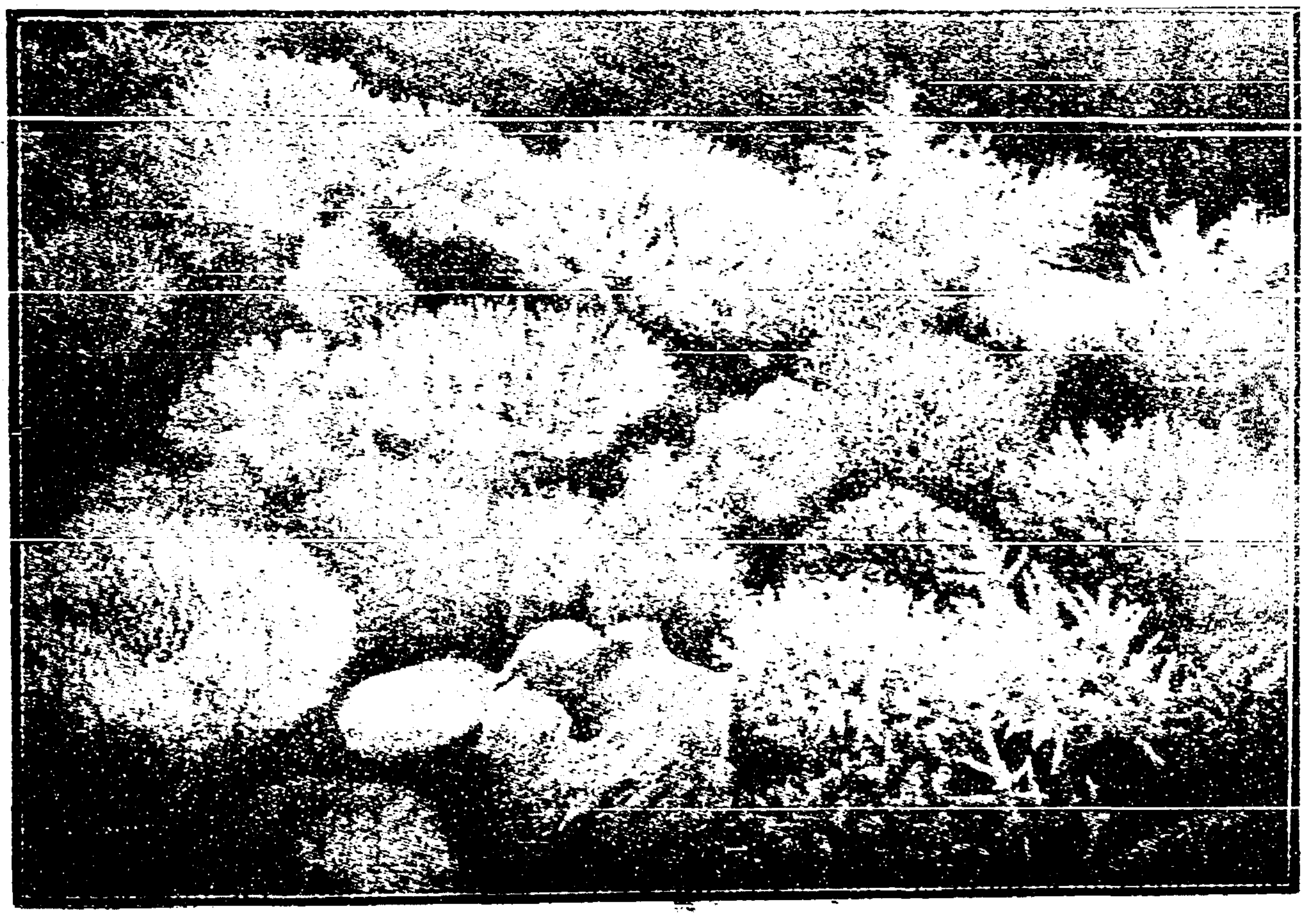

প্রবাল কীটের বাসা।

এই রকমে লক্ষ লক্ষ কীট একসঙ্গে বাসা বানাতে বানাতে সমুদ্রকে সমুদ্র ভরিয়ে ফেলে। যতক্ষণ সে জলের উপর পর্য্যন্ত না ওঠে ততক্ষণ তার বাসা ক্রমাগতই উঁচুতে চড়্‌তে থাকে। জলের উপরে প্রবালকীট বাঁচতে পারে না—কাজেই প্রবাল দ্বীপগুলি প্রায়ই সমুদ্রের সমান উঁচু থাকে। ক্রমে কাদা মাটি এসে এই সকল দ্বীপের উপর প'ড়ে সুন্দর জমী ত'য়ের হয়। শামুম ঝিনুক ও নানারকম জলজন্তু তার উপর বাস কর্‌তে আসে। সমুদ্রের উপর দিয়ে যত পাখী যাওয়া আসা করে তাদের মুখ থেকে দৈবাৎ ফলের বীজ সেই দ্বীপের উপর পড়্‌লে তা থেকে কত সময় গাছও বেরোয়। তারপর মানুষে হয়ত তার সন্ধান পেয়ে খোঁজ নিতে আসে সেটা থাকবার মত জায়গা কিনা।

এদিকে প্রবালকীটেরও বিশ্রাম নেই। সমুদ্রের ঢেউয়ের ঘায়ে শক্ত পাথর পর্য্যন্ত ক্ষয়ে যায়—প্রবালের বাসার ত কথাই নেই। সমুদ্র ক্রমাগতই তাদের বাসা ভেঙে ভেঙে ধুয়ে নিচ্ছে, আর ক্রমাগতই সেই ভাঙার উপরে তারা নতুন করে বাসা গড়্‌ছে। তিল তিল ক'রে দিনের পর দিন লক্ষ লক্ষ প্রবালকীট তাদের বাসাকে সমুদ্রের ঢেউয়ের মুখে ঠেলে তুল্‌ছে। তাদের এই প্রাণপণ চেষ্টা ও পরিশ্রমের কাছে সমুদ্রও হার মেনে যায়।

আমাদের শরীরে মেরুদণ্ডশুদ্ধ একটা হাড়ের কাঠাম আছে। তার উপরে ভর ক'রেই সমস্তটা শরীর মজবুৎ হ'য়ে বসে। কিন্তু যে সব জন্তুর তা নাই, তাদের মধ্যে অনেকে একটা শক্ত খোলসের মধ্যে নিজের নরম শরীরটাকে লুকিয়ে রাখে যেমন, শামুক ঝিনুক। প্রবালকীটের ও সেই দশা। সে নিজের একটা আশ্রয় বানাবার চেষ্টাতেই তার বাসা বাঁধে। তার ফলে যে কত বড় কাণ্ড ঘটে উঠ্‌ছে আর তার মধ্যে যে কত রকমের রঙের খেলা তোমার আমার মনে তাক্ লাগিয়ে দিচ্ছে—সে বেচারা তার কোন খোঁজই রাখে না।

রঙীন ছবিতে যা দেখ্‌ছ সেটা জলের নীচে জীবন্ত প্রবালের ছবি। তার মধ্যে দুটি রঙিন মাছও আছে ; প্রবাল দেশের মাছ কিনা রং চংও প্রবালেরই মত।

এই যে আমি !

গল্প।

"বড় মামা, একটা গল্প বল না।"

"গল্প ? এক ছিল গ, এক ছিল ল আর এক ছিল প—"

"না—ও গল্পটা না। ওটা বিচ্ছিরি গল্প—একটা বাঘের গল্প বল।"

"আচ্ছা। যেখানে মস্ত নদী থাকে আর তার ধারে প্রকাণ্ড জঙ্গল থাকে—সেইখানে একটা মস্ত বাঘ ছিল আর ছিল একটা শেয়াল।"

"না শেয়াল ত বল্‌তে বলি নি—বাঘের গল্প।"

"আচ্ছা, বাঘ ছিল আর শেয়াল টেয়াল কিছু ছিল না। একদিন সেই বাঘ ক'রেছে কি একটা ছোট্ট সুন্দর হরিণের ছানার ঘাড়ে হাল্লুম ক'রে কাম্‌ড়ে ধ'রেছে—"

"না—সে রকম গল্প আমার শুন্‌তে ভাল লাগে না। একটা ভাল গল্প বল।"

"ভাল গল্প কোথায় পাব? আচ্ছা শোন—এক ছিল মোটা বাবু আর এক ছিল রোগা বাবু। মোটা বাবু কিনা মোটা, তাই তার নাম বিশ্বম্ভর, আর রোগা বাবু কিনা রোগা, তাই তার নাম কানাই।"

"বিস্‌-কম্বল মানে কি মোটা, আর কানাই মানে কি রোগা ?"

"না ; মোটা কিনা, তাই তার মস্ত মোটা নাম—বিশ্‌-শম্‌-ভ-র্‌। আর রোগা লোকের ছোট্ট নাম—কানাই।

"রোগা কানাই বল্‌ল, 'মোটা বিশ্বম্ভর' তোমার এমন বিচ্ছিরি ঢাকাই জালার মতন চেহারা কেন?' মোটা বিশ্বম্ভর বল্‌ল, 'রোগা কানাই' তোর হাত পা কেন কাঠির মতন, হাড়গিল্লার ঠ্যাঙের মতন, রোদে-শুক্‌নো দড়ির মতন?' তখন তারা ভয়ানক চ'টে গেল। রোগা বল্‌ল, 'মোট্‌কা লোকের বুদ্ধি মোটা।'

"মোটা বল্‌ল, 'রোগা লোকের কিপ্‌টে মন।"

"মোটা বুদ্ধি মানে কি বোকা বুদ্ধি ?"

"হ্যাঁ। তারপর শোন—মোটা আর রোগা তখন খুব ঝগ্‌ড়া কর্‌তে লাগ্‌ল। এ বল্‌ল, 'রোগা মানুষ ভাল নয়'—ও বল্‌ল, 'মোটা হলেই দুষ্টু হয়।' তখন তারা বল্‌ল, 'আচ্ছা চল ত পণ্ডিতের কাছে—বইয়েতে কি লেখা আছে—জিজ্ঞেসা কর ত।'"

"বইয়েতে কি সব কথা লেখা থাকে ?"

"হ্যাঁ থাকে। তারা তখন দুজনেই পণ্ডিতের কাছে গিয়ে নালিশ করল। পণ্ডিত মশাই নাকের আগায় চশমা এঁটে, কাণের ফাঁকে কলম গুঁজে মুণ্ডু নেড়ে টিকি ঝেড়ে, তেড়ে বল্লেন, 'রোসো! দাঁড়াও, একটু বোসো—রোগা এবং মোটা এদের কে কি রকম পাজি, বিচার কর্‌ব আজই।' এই বলে পণ্ডিতমশাই তাকিয়ার উপর পাশ ফিরে নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে লাগ্‌লেন। রোগা কানাই আর মোটা বিশ্বম্ভর ব'সেই আছে ব'সেই আছে—এক ঘণ্টা যায়, দু ঘণ্টা যায়! তখন পণ্ডিত মশাই চোখ রগ্‌ড়িয়ে বল্লেন, 'ব্যাপার খানা কি'? বাবুরা বল্ল, 'আজ্ঞে, সেই রোগা আর মোটার কথা।' পণ্ডিত বল্লেন, 'ঠিক ঠিক'—এই ব'লে প্রকাণ্ড বড় একখানা বই নিয়ে মুখ বাঁকিয়ে হেলে দুলে, ষাঁড়ের মতন সুরটি করে তিনি বল্‌তে লাগ্‌লেন—'বইয়ে আছে—

মোট্‌কা মানুষ হোঁৎকা মুখ
বুদ্ধি ভোঁতা আহাম্মুক—'

অম্‌নি রোগা কানাই হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌ল। তখন পণ্ডিত বল্লেন—

'শুক্‌নো লোকের সয়তানি
দেমাক দেখে হার মানি।'

তাই শুনে মোটা বাবু হেসে লুটোপুটি। তখন পণ্ডিত বল্লেন, 'বইয়ে লিখেছে—

মস্ত মোটা মানুষ যত
আস্ত কোলা ব্যাঙের মত।
নিষ্কর্ম্মা সব হদ্দ কুঁড়ে
কুম্‌ড়ো গড়ায় রাস্তা জুড়ে!
আর—চিম্‌সে রোগা যত ব্যাটা
বিষম ফাজিল বেদম জ্যাঠা।
শুঁট্‌কো লোকের কারসাজি
হিংসুটে আর হাড় পাজি॥'

তাই শুনে রোগা মোটা দুয়ে মিলে ভয়ানক রকম চটে গেল।

পণ্ডিত বল্লেন—'দুটোই বাঁদর দুটোই গাধা
রোগা মোটা সমান হাঁদা।
ভণ্ড বেড়াল পালের ধাড়ি
লাগাও মুখে ঝাঁটার বাড়ি।

মাথায় মাথায় ঠুকে ঠুকে
চূণ কালি দাও ভুটোর মুখে ॥'

এই ব'লে পণ্ডিত মশাই এক টিপ্ নস্যি নিয়ে, নাকের মধ্যে গুঁজে, আবার নাক ডাকিয়ে ঘুমাতে লাগ্‌লেন।"—

"তারপর সেই বাবুরা কি বল্‌ল ?"

"বাবুরা হাঁ ক'রে বোকার মত মাথা চুল্‌কাতে চুল্‌কাতে বাড়ী চলে গেল, আর ভাবল পণ্ডিতটা কি বোকা!"

বন-মানুষ।

বন-মানুষের কথা তোমরা অনেকেই শুনে থাকবে। আফ্রিকার জঙ্গলে আর এসিয়ার দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে ওরাং-ওটাং, শিম্পাঞ্জি, গরিলা প্রভৃতি বাঁদর দেখতে পাওয়া যায়, তাদেরই বন-মানুষ বলে। "বাঁদর" বল্লাম বটে, কিন্তু আসলে এদের বাঁদর বলা অন্যায় হবে—বরং বাঁদরের চেয়ে মানুষের সঙ্গেই এদের সাদৃশ্য বেশী। সেই জন্যই এদের বন-মানুষ বলা হয়েছে।

বুড়ো ওরাং-ওটাং।

পণ্ডিতেরা বলেন যে এরা নাকি আমাদের কুটুম, কারণ কত লক্ষ বছর আগে জানি না—এদের আর আমাদের পূর্ব্বপুরুষ নাকি এক ছিল। একই বংশের একটি শাখা ক্রমে উন্নত আর সভ্য হতে হতে 'মানুষ' হয়েছে, আর অন্যান্য শাখাগুলি বনে জঙ্গলে নানা অবস্থায় পড়ে 'বন-মানুষ' হয়েছে।

কাজেই মানুষ আর বন-মানুষের চেহারায় অনেক তফাৎ—মানুষ পোষাক পরতে শিখেছে, তাই তার শরীরের চামড়াটি মোলায়েম। বনমানুষকে শীত বাদলের হাত হ'তে রক্ষা করবার জন্য তার শরীরটি লোমের পোষাকে ঢাকা। মানুষ সোজা হয়ে দুপায়ে হাঁটে, সে জন্য তার পা দুটি সোজা, ও শরীরের অন্যান্য অঙ্গের চেয়ে পায়ের জোর বেশী। বনমানুষ গাছে থাকে, এডাল থেকে ওডালে ঝুলে ঝুলে বেড়ায়, কাজেই তার হাত দুটিতে জোর বেশী, পায়ের পাতার গড়নও মানুষের পায়ের মত না হয়ে অনেকটা হাতের মতন হয়েছে—তাতে গাছে চড়বার সুবিধা হয়। বনমানুষের নাক চেপ্টা, দাঁতগুলি বড় বড় ও ছুঁচাল, চোয়াল খুব চওড়া ও মজবুৎ; মানুষের মুখের গড়ন সে রকম নয়। মানুষ কথা বলতে পারে, তার জিভ ও মুখের মাংসপেশী প্রভৃতিও সেই রকম ভাবে তৈরী হয়েছে। তাছাড়া মানুষের মস্তিষ্ক অনেক বড় ও ভারি আর তার মধ্যে কারিকুরিও অনেক বেশী—কারণ তার বুদ্ধিও যে অনেক বেশী।

কিন্তু এসব তফাৎ থাকলেও, মোটামুটি মাথা ও শরীরের গড়নে, শরীরের ভিতরের যন্ত্রগুলিতে মানুষ আর বনমানুষে খুব বেশী সাদৃশ্য আছে। বনমানুষের রক্তও ঠিক মানুষের রক্তেরই মত। শিম্পাঞ্জির মাথার গড়ন ও দাঁত অনেকটা মানুষের মত। গরিলার হাত, পা, নাক ও শরীরের ভিতরের যন্ত্রগুলি খুব মানুষের মত। ওরাং ওটাংএর চাল চলনে, মুখের ভাবে, এবং ছেলেবেলায় মাথার খুলির গড়নে মানুষের সঙ্গে খুব সাদৃশ্য থাকে।

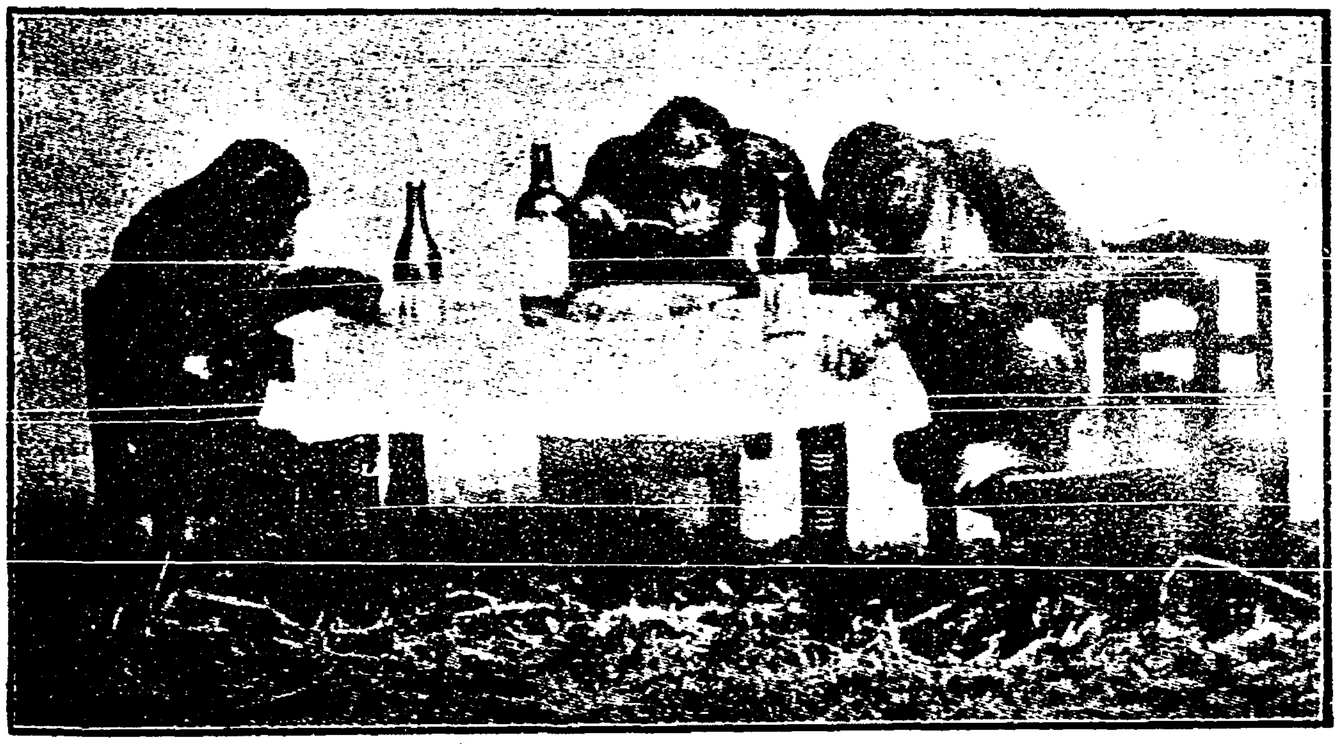

শিম্পাঞ্জি বেশ সহজে পোষ মানে। এরা বড় চটপটে সেয়ানা জন্তু—যা দেখে, সহজেই শিখে নেয়। পোষা সিম্পাঞ্জি হ্যাট কোট পরে বেড়ায়, টেবিলে বসে কাঁটা চামচে খায়, সার্কাসে তামাসা দেখায় এ রকম অনেক দেখা গিয়েছে। কথা বলতে না পারলেও তারা নানা রকম সুর ও ভঙ্গী করে রাগ, দুঃখ, অভিমান, আব্দার প্রভৃতি নানা ভাব প্রকাশ করতে পারে। একজন মেম একটি শিম্পাঞ্জির বাচ্চা পুষেছিলেন সে নাকি তাঁকে দেখলেই আহ্লাদ করে "উম্মা" বলে ডাকত। শিম্পাঞ্জির আবার

সুর বোধও আছে! অবিশ্যি তারা ওস্তাদের মতন গাইতে হয়তো পারে না, কিন্তু তবু তাদের শেখালে নাকি তারা দু তিনটা সুর গলা দিয়ে বের করতে পারে। শিম্পাঞ্জি যে হাসে, তা এই ছবিখানা দেখলেই পরিষ্কার বুঝতে পারবে। শিম্পাঞ্জিরা জঙ্গলে দল বেঁধে থাকে। জ্যোৎস্না রাত্রে মাঝে মাঝে তারা আড্ডা বসিয়ে বন তোলপাড় করে তোলে—চেঁচামেচি, লাফালাফি দাপাদাপির তো অন্তই নাই, তার উপর আবার পোকায় খাওয়া ফাঁপা গাছের গুঁড়ি গুলোকে নিয়ে দুহাতে ঢোল বাজান হয়।

ওরাং ওটাংও বেশ পোষ মানে, কিন্তু তারা শিম্পাঞ্জির মত অত চালাক নয়, অমন স্ফূর্ত্তি আর সয়তানী বুদ্ধিও তাদের নাই। তারা ভাল মানুষটির মত গম্ভীর হয়ে চুপচাপ বসে থাকে। মানুষের সঙ্গে মিশবার জন্য তাদের তেমন আগ্রহ দেখা যায় না। তবে ভাল ব্যবহার পেলে তারাও খুব বশ হয়।

গরিলাকে পোষ মানান বড় কঠিন কাজ। একে তো সহজেই তার অসুখ করে, তার উপর আবার মেজাজটি বেজায় রাগী আর একগুঁয়ে; তাকে ধরে এনে খাঁচায় পুরে রাখবে এ অপমান সে কিছুতেই সইতে রাজি হয় না। গত বৎসরের সন্দেশে গরিলার কথা বলা হ'য়েছে।

বনের ফল মূলই হচ্ছে বনমানুষের প্রধান খাদ্য, তবে মাঝে মাঝে পোকা, মাকড়, পাখীর ডিম প্রভৃতিও বাদ যায় না। গাছের উপর ডালপালা দিয়ে তারা একটা মাচার মত তৈরী করে, সেইটা হয় তাদের বাসা।

এক সাহেবের একটা পোষা শিম্পাঞ্জি ছিল। একদিন সে বসে বসে কি খাচ্ছে আর একটা ছোট্ট বাঁদর বসে বসে তাই দেখছে। দেখে দেখে বাঁদরটার খাবার ইচ্ছা হল না কি জানি না, সে করল কি আস্তে আস্তে শিম্পাঞ্জির কাছে গিয়ে তাকে কুট্

করে কামড়িয়ে দিল। শিম্পাঞ্জিটা তখন কিচ্ছু বল্ল না, গম্ভীর ভাবে খাওয়া শেষ করল। তারপর আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে কোত্থেকে একটা ছড়ি নিয়ে এল আর বাঁদরছানাকে লেজে ধরে এমন ঠেঙ্গান ঠেঙ্গাল, সে আর কি বলব !

বাঁদরকে শাসন করা হয়ে গেলে শিম্পাঞ্জি একটা গাছে উঠে বসে রইল। এক বেচারা বেবুনের ভারি ইচ্ছা হ'ল তার সঙ্গে ভাব করে। সেও গাছে উঠে পাশের ডালে বসল আর শিম্পাঞ্জির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মুচকিয়ে হাসতে লাগল। শিম্পাঞ্জির কিন্তু এমন বেয়াদবী পছন্দ হ'ল না—সে দু একবার তাকিয়ে দেখল, তারপর আস্তে আস্তে ঠ্যাং উঠিয়ে বেবুনটাকে এক লাথি মেরে গাছ থেকে ফেলে দিল।

সাধারণ বাঁদরে ঝগড়া কর্‌বার সময় যেমন খালি আঁচড়াআঁচড়ি কামড়াকামড়ি করে বনমানুষেরা তা করে না। তারা অনেক সময়েই ঠিক মানুষের মত গম্ভীর হ'য়ে কীল ঘুঁষি মার্‌তে থাকে।

একবার কল্‌কাতার চিড়িয়াখানায় দুটা ওরাং ওটাং ছিল। তাদের একটা কোত্থেকে একটা জবাফুলের মালা পেয়েছিল। আর একটা কর্‌ল কি সেই মালার দুটো ফুল খেয়ে ফেল্‌ল ! আর যায় কোথা ? যার মালা সে এসে গুম্ গুম্ ক'রে তার পিঠে কীল বসিয়ে দিল। আর সেটাও ঠিক মানুষের খোকার মত 'ওঁয়া' 'ওঁয়া' ক'রে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। এই কলকাতার চিড়িয়াখানাতেই একবার এক ওরাং ওটাং একটা বেড়ালছানা পুষেছিল। তাকে যখন বিলাত পাঠান হ'ল, সে তার বেড়ালছানাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল।

অতি লোভের সাজা।

ইঁদুর যাচ্ছিল হাওয়া খেতে। খানিক দূর যেতেই এমন বৃষ্টি আরম্ভ হ'লো যে তাকে ছুটে গিয়ে এক গর্ত্তে ঢুক্‌তে হ'লো। গর্ত্তের মধ্যে সে এক টুকরো শুক্‌নো শিকড় পেয়েছিল বৃষ্টি থামলে পর সেটি সে সঙ্গে করে নিল। জল ডিঙিয়ে রাস্তায় উঠে সে দেখে কি, এক বেচারা মানুষ পিঠে রাঁধবার জন্য বার বার আগুন জ্বাল্‌তে চেষ্টা কর্‌ছে কিন্তু কিছুতেই আর পার্‌ছে না ;—কাঠ সব ভেজা।

ইঁদুর বল্ল "এই নাও একটা শুক্‌নো কাঠ ; এ দিয়ে আগুন জ্বালাও।"

লোকটি ভারি খুসী হয়ে শিকড়টা নিল ; আর পিঠে রান্না হ'লে ইঁদুরকে কয়েকখানা পিঠে বক্‌শিস্ দিল।

ইঁদুর তা' নিয়ে গোঁফে চাড়া দিয়ে বল্‌তে লাগ্‌ল, "এক টুকরো কাঠের বদলে এতগুলো পিঠে! বুদ্ধি থাক্‌লে সবই হয়।"

খানিক দূর গিয়ে সে আবার দেখ্‌ল যে এক বেচারা কুমোর তার কাজ কর্ম্ম ফেলে তা'র ছোট ছেলেগুলোর কান্না থামাতে চেষ্টা কর্‌ছে ;—ছেলেরাও কিছুতেই থাম্‌ছে না।

ইঁদুর বল্লে "এই নাও ; এই পিঠে খেলে ওরা চুপ কর্‌বে।" ছেলেরা পিঠে পেয়ে মহাখুসী—কান্নাকাটি সব থেমে গেল। তখন ইঁদুর বল্ল "আমার বক্‌শিস্ কৈ?" কুমোর তাকে একটা ছোট্ট ভাঁড় বক্‌শিস্ দিল।

ইঁদুরের ফূর্ত্তি তখন দেখে কে? নিজের বুদ্ধির অহঙ্কারে তার বুক ফুলে এক হাত উঁচু হয়ে উঠল। আরো কিছু দূর গিয়ে সে দেখল যে একজন গোয়ালা একটা মহিষের দুধ দোয়াচ্ছে। তার কাছে ঘটি নাই ; তাই একটা নোংরা পাতার ঠোঙ্গায় করেই দুধ নিচ্ছে।

ইঁদুর বল্ল, "আরে ছি ছি—ওতে কেন দোয়াচ্ছ? এই নাও ভাঁড়টা, এতে ক'রে দুধ দোয়াও।" গোয়ালাও ভাঁড় পেয়ে খুব খুসী হ'য়ে ইঁদুরকে খানিকটা দুধ খেতে দিল।

ইঁদুর তাতে ভয়ানক চটে বল্লে—"তুমি কি রকম ছোট লোক হে? একটা আস্ত ভাঁড় দিলাম, তার বদলে না হয় তোমার মহিষটাই দিতে!"

গোয়ালা মজা দেখ্‌বার জন্য ইঁদুরটাকে মহিষের সঙ্গে একটা দড়ি দিয়ে বেঁধে দিয়ে বল্ল, "নাও তোমার মহিষ ; ওকে এখন বাড়ী নিয়ে যাও।"

ইঁদুর বেচারাত বড়ই মুস্কিলে পড়ল। সে চায় তার বাড়ী যেতে, মহিষ যায় মাঠের দিকে। তখন সে গম্ভীর হয়ে বল্ল, "মহিষটাকে একটু চরিয়ে নিয়ে, আমি ঐ পথেই বাড়ী যাব"।

চর্‌তে চর্‌তে মহিষটা বনের ধারে এসে থাম্‌ল; সেখানে কতগুলি পাল্কিবেহারা তাদের পাল্কি নামিয়ে বিশ্রাম করতে ব'সেছে। ইঁদুর শুনতে পেল যে তারা বলাবলি করছে, "এ কেমন ধারা ছোট লোক এরা! এত বড় বিয়ে, এত ধূমধাম, আর আমাদের কিনা শুধু খিচুড়ি খেতে দিলে!—এক টুকরো মাংসও দিলে না। এখন যদি বৌ শুদ্ধ পাল্কিটা খানার মধ্যে উল্‌টে দিই তবেই বাবুরা আচ্ছা জব্দ হয়!"

ইঁদুর বল্ল, "এই নাও, আমার মহিষটাকে তোমরা মেরে রেঁধে খাও।"

বেহারাদের একজন বল্ল, "তোমার মহিষ? ইঁদুরের আবার মহিষ থাকে না কি?" ইঁদুর বল্ল, "দেখছ না, আমি ওকে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছি।"

তখন তারা মহিষটাকে মেরে, হৈ চৈ করে রান্না করে, পেট ভরে মাংস খেল।

ইঁদুর বল্ল, "আমার বক্‌শিস্?" একটা লোক একটুকরো মাংস দিয়ে বল্ল "এই নে"। ইঁদুর বল্ল, "বটে! আমায় বোকা ঠাউরেছ? সে হচ্ছে না—ঐ পাল্কিশুদ্ধ নতুন বৌকে আমায় দিতে হবে"। তখন লোকগুলোর খেয়াল হল—সর্ব্বনাশ! বেলা যে অনেক হ'য়ে গেছে, এখন যদি পাল্কী নিয়ে যাই বাবুরাত ঠেঙিয়ে হাড় ভেঙে দেবে। তারা পাল্কিটাল্কি ফেলে সেখান থেকে চম্পট দিল। তখন ইঁদুর পাল্কির কাছে গিয়ে পর্দ্দা ফাঁক করে সেই বৌটিকে পাল্কি থেকে নাম্‌তে বল্ল। এতক্ষণ দেরী হ'চ্ছে দেখে ভয়ে মেয়েটির মুখ শুকিয়ে গেছে। সে ভাবল বনের মধ্যে একা প'ড়ে থাকার চেয়ে ইঁদুরের সঙ্গে যাওয়াও ভাল। তাই সে তার পিছন পিছন রওয়ানা হ'লো। ইঁদুর ভাব্‌ছে, "আমার কি পাকা ব্যবসা বুদ্ধি! একটা শুক্‌নো কাঠ দিয়ে আরম্ভ ক'রে নতুন বৌ লাভ কর্‌লাম।"

তার গর্ত্তের কাছে এসে ইঁদুরের বড় ভাবনা হ'ল, তার গর্ত্ত যে এতটুকু! বৌকে বাড়ী নেবে কি ক'রে? সে মাথা চুলকিয়ে নিয়ে বল্ল, "তাইত, কাল আমি আপনার জন্য একটা চালা বানিয়ে দেব। আজকের রাত্রিটা আপনি ঐ কুল গাছটার নীচেই থাকুন!"

মেয়েটি বল্ল, "আমার যে বড় খিদে পেয়েছে!"

ইঁদুর বল্ল, "আজ দেখছি সকলেরই খিদে পাচ্ছে। আচ্ছা, একটু সবুর করুন, খাবার আন্‌ছি।" এই ব'লে সে একটা মটর আর একটা ধানের শিস নিয়ে এল। মেয়েটি তো দেখেই রেগে অস্থির! "আমি কি ঐ শুক্‌নো মটর আর ধানের শিস খেয়ে থাক্‌ব নাকি?" ইঁদুর তখন রেগে বল্ল, "বৌরা যে এত জ্বালায় তা কে জান্‌ত! আরে, কুল খেয়েও তো থাক্‌তে পার!"

মেয়েটি কেঁদে বলে উঠ্‌ল, "তোমার ঐ বিচ্ছিরি কাঁচা কুল আমি খাবও না, পাড়্‌তেও পার্‌ব না!"

ইঁদুর রেগে তার গর্ত্তে চ'লে গেল। মেয়েটি আর কি করে? সে রাত্রে উপোস ক'রেই রইল। সকালে ইঁদুর তার কোঁচড় ভ'রে কুল পেড়ে দিল, আর সে কুলগুলো নিয়ে সহরের রাস্তায় বিক্রী কর্‌তে লাগ্‌ল। ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে মেয়েটি তার নিজের বাড়ীতে এসে হাজির। তখন সকলের যে কি আনন্দ হ'লো, তা' আর কি বল্‌ব! সবাই ভেবেছিল যে তাদের মেয়েকে জঙ্গলে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। মেয়ে তাদের কাছে সেই দুষ্টু বেয়ারাদের কথা, তাদের মাংস খাওয়ার কথা, ইঁদুরের কথা, সব বল্‌ল।

এদিকে তো ইঁদুর মশাই যখন দেখ্‌ল যে মেয়েটি আর আসেই না, তখন সে তাদের বাড়ীর দরজায় একটা কাঠি দিয়ে ঘা দিতে লাগ্‌ল। মেয়ের মা তাড়াতাড়ি দরজা খুলে ইঁদুরকে বল্‌লেন, "এই যে, জামাই বাবু! আপনি বাইরে দাঁড়িয়ে কেন! আসুন, আসুন!"

ইঁদুর তো অহঙ্কারে একেবারে ফুলে উঠ্‌ল, আর গম্ভীরভাবে চল্‌তে চল্‌তে গোঁফে চাড়া দিতে লাগ্‌ল।

এদিকে কিন্তু ইঁদুরের বস্‌বার জন্য একটা চৌকির উপর একটা সুন্দর আসন বিছান হয়েছে। সে চৌকির মাঝখানটা ফাঁকা; আর তার নীচেই একখানা লোহা তাতিয়ে লাল ক'রে রাখা হয়েছে। ইঁদুর মশাই যাই গিয়েছেন তার উপরে চ'ড়ে বস্‌তে অম্‌নি তাঁর ল্যাজের মধ্যে গরম লোহা ছ্যাঁক্‌ ক'রে লেগেছে। তখন যে তার এক লাফ! ওরে বাবা!—সেই যে সেখান থেকে ছুট দিল, একেবারে পোড়া লেজ শুদ্ধ গর্ত্তের ভিতরে এসে থাম্‌ল। সেদিন থেকে বেচারা আর ব্যবসা কর্‌তে চেষ্টা করে নি।

ছায়ার কাণ্ড।

সমুদ্রের ভিজা বালির উপর দিয়ে যখন লোক হেঁটে যায়—তখন তাতে কেমন পরিষ্কার ছায়া পড়ে দেখেছ ? হঠাৎ দেখ্‌লে মনে হয় যেন জলের উপরেই হেঁটে যাচ্ছে। অবশ্য বালিটা ভিজা থাকার দরুণই ঐ রকম দেখায়। কিন্তু একেবারে খট্‌খটে শুক্‌না ডাঙার উপরেও অনেক সময় এমন সুন্দর ছায়া দেখা যায় যে চোখের ধাঁধা লেগে যায়—সেটা ডাঙা না জল !

তোমরা অবশ্য মরীচিকার কথা শুনেছ। মরুভূমিতে চল্‌তে চল্‌তে পথিক ঠিক যেন দেখ্‌তে পায় যে বিলের জল থৈ থৈ কর্‌ছে আর তার মধ্যে গাছ পালার সুন্দর ছায়া প'ড়েছে। কিন্তু তারা যতই তার কাছে যেতে থাকে ছায়াও যেন ক্রমে মিলিয়ে যায়! শেষটায় কোথায় বা জল কোথায় বা ছায়া, তারা গিয়ে দেখে ধু ধূ কর্‌ছে শুক্‌নো বালি ! এই রকমে মিথ্যা ছায়ার ধাঁধায় প'ড়ে, ঐ জল ঐ জল ক'রে, কত বেচারা মরুভূমির মধ্যে তৃষ্ণায় মারা গেছে তার আর সংখ্যা হয় না। মরুভূমির তপ্ত বালির উপর যে গরম বাতাসের স্তর জমে তার মধ্যেই ছায়াটা দেখা যায়—আর সেই বাতাসের আয়নাকেই জল ব'লে মনে হয়।

মরীচিকা আবার উল্টা সোজা নানা রকমের হয়। এই একটা ছবি দেখ। আকাশের গায়ে গাছপালার উল্টো ছায়া দেখা যাচ্ছে।

এই রকম উল্টা ছায়া অনেক সময়ে মেরু সমুদ্রের মধ্যে দেখা যায়। আকাশের

ঠাণ্ডা বাতাসের স্তর সেখানে আয়নার মত কাজ করে। কখনও আবার এমনও হয় যে জাহাজ বা বরফের ঢিপি কোথাও কিছুর দেখা নাই, অথচ আকাশে তার ছায়া পড়েছে! এরকম হয় কেন জান? পৃথিবী গোল ব'লে। সমুদ্রের পিঠটা আড়াল পড়ে, তাই নীচে থেকে দূরের জিনিষ দেখা যায় না; কিন্তু উপরে, যেদিকে জাহাজের ছায়া পড়েছে, সেখান থেকে হয় ত সেই জিনিষটা বেশ দেখা যাচ্ছে। যেমন মনে কর, একটা ঢিপির এধারে ব'সে তুমি তার ওদিকের কিছু দেখ্‌তে পাও না—কিন্তু সেই ঢিপির আগায় যদি একটা আয়না থাকে, তার মধ্যে সহজেই ওদিকের ছায়া দেখ্‌তে পার্‌বে।

সমুদ্রের মধ্যে এই রকম ছায়ার গোলমালে একবার একটা ভারি মজার কাণ্ড হ'য়েছিল। একটা জাহাজ ইটালী যেতে যেতে দূরে সমুদ্রের মধ্যে একটা দ্বীপ দেখ্‌তে পেল। সেখানে তার আগে কোন দ্বীপ কেউ দেখেনি! এই খবর পেয়েই মাণ্টা থেকে চার পাঁচ খানা জাহাজ তখনি ছুটে গেল সেই নতুন দ্বীপ দখল কর্‌তে। কিন্তু সেখানে গিয়ে তারা অপ্রস্তুত—দ্বীপ টীপ কোথাও কিছু নেই! তখন খোঁজ খবর নিয়ে বোঝা গেল, যে জিনিষটাকে দ্বীপ মনে করা হ'য়েছিল সেটা 'এট্‌না' পাহাড়ের ছায়া মাত্র, অথচ এট্‌না পাহাড় সেখান হ'তে অনেক দূরে—চোখে দেখ্‌বার কোন সম্ভাবনা নাই।

দেয়াল বা পর্দ্দার সাম্‌নে যদি আলো থাকে, আর সেই আলোকে যদি তুমি আড়াল ক'রে দাঁড়াও—তাহ'লে দেয়ালে তোমার ছায়া পড়্‌বেই। কিন্তু

দেয়াল বা কিছু যদি না থাকে তাহ'লে কি শূন্যে ছায়া পড়্বে? হ্যাঁ, তাও পড়্তে পারে বৈকি! যাকে আমরা 'শূন্য' বলি সেটা সত্যি সত্যিই ফাঁকা শূন্য নয়, তাতে বাতাস, কুয়াশা, ধূলো, বালি কত কিছু থাক্তে পারে।

পাহাড়ের সাম্নে দিয়ে যখন খাড়াভাবে কুয়াশা নাম্তে থাকে তখন তার উল্টো দিকে সূর্য্য থাক্লে সেই কুয়াশার পর্দ্দার উপর পরিষ্কার ছায়া পড়্তে পারে। এরকম ছায়া দেখ্তে ভারি অদ্ভুত। আগের পৃষ্ঠায় ছবিতে দেখ দুটো লোক ব'সে আছে আর "শূন্যে" তাদের ছায়া প'ড়েছে! একবার এক সাহেব পাহাড়ে ঘুর্তে ঘুর্তে হঠাৎ এক জায়গায় এসেই দেখেন, কোত্থেকে একটা ছায়ার মতন ভূত এসে তাঁর সাম্নে দাঁড়াল, তিনি প্রথমটা ভারি চম্কে উঠেছিলেন, কিন্তু তার পরেই বুঝ্তে পার্লেন, ভূতটা তাঁর নিজেরই ছায়া!

বসন্ত।

শীত ফুরাল এলো আবার বসন্ত এদেশে;
মলয় বায়ু ছুটলো আবার, উঠ্লো কুসুম হেসে।
আমের মুকুল ফুটে গেছে, দু'এক গাছে "গুটি";
শ্রীপঞ্চমী গেছে, আছে দোল যাত্রার ছুটি।
এম্নি ক'রে বার মাসে ছয়টি ঋতু চলে;
তা'দের, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, শিশির, শীত, বসন্ত বলে।
এম্নি ভাবে বর্ষচক্র ঘুরছে অবিরাম;
আমরা কেবল যাচ্চি গুণে দিয়ে একটা নাম।
এই চক্রের চক্রী যিনি বিশ্ব মূলাধার;
এসো সবে প্রণাম করি চরণ তলে তাঁ'র।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মফিজ উদ্দিন।

(সত্য গল্প)।

মফিজ উদ্দিনের বাড়ী হাজি গাঁ; সে প্রত্যহ নিমু রায়ের বাজারে দুধ, আনাজ, পাটালীগুড় বেচতে আসত। বাজারের রাস্তার ধারেই রায়েদের বাড়ীতে বাঙ্গলা স্কুল। মফিজ বাজার থেকে ফিরবার সময় দেখত, অনেক ছেলে স্কুলে লেখাপড়া করছে। তাই দেখে তার লেখাপড়া শিখ্‌তে ইচ্ছা হল। তখন তার বয়স ২১ কি ২২ বৎসর। অল্প বয়সে মফিজের বাপের মৃত্যু হয়েছিল। মফিজের বাপের এক জোড়া বলদ, একটা গাই, দুইটা বাছুর, কতকগুলি খেজুর গাছ এবং কয়েক বিঘা ধানের জমি ছিল। মফিজের বাপ মারা যাওয়ার পরে, মফিজের মা ধানের জমি ও খেজুর গাছগুলি ভাগে জমা দিয়ে এবং গাইয়ের দুধ ও আনাজ প্রভৃতি ভদ্র পল্লীতে বিক্রী করে, মফিজ ও তার বুড়ী নানীকে প্রতিপালন করতে লাগল।

ক্রমে মফিজ বড় হয়ে, নিজেই চাষের কাজ ও খেজুর গাছ কাটা, গুড় জ্বাল দেওয়া প্রভৃতি আরম্ভ করল। মফিজের বাপ মা ভাল পাটালী গুড় তৈরী করতে পারতেন। মফিজদের বাড়ীর পাটালী বাজারে বিখ্যাত ছিল। মফিজও মায়ের কাছে ভাল পাটালী তৈরী শিখেছিল। মফিজ বড় হয়ে আর মাকে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে দুধ গুড় বেচতে দিত না। মফিজ নিজেই বাজারে গিয়ে বেচে আসত।

একদিন মফিজ বাজার থেকে ফিরবার সময় স্কুলে গিয়ে গুরু মশায়কে বল্ল, 'আমি আপনার কাছে লেখাপড়া শিখব।' গুরু মশায় বল্লেন 'তোমার সময় নাই, কোন্ সময়ে তুমি লিখবে পড়বে?' মফিজ বল্ল 'আমি ঠিক করেছি, ভোরে উঠে বাড়ীর কাজ সারব, তারপরে বাজারে দুধ বেচে স্কুলে এসে পড়ব। স্কুল ছুটি হলে বাড়ী গিয়ে, বাড়ীর কাজ করব। চাষের সময় একজন ঠিকে চাকর রেখে দেব।' এই বলে মফিজ স্কুলে ভর্ত্তি হল।

ছেলেরা দাড়িয়ালা মিঞাকে ক, খ পড়তে দেখে হাসত, কেউ কেউ ঠাট্টাও করত। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই ছেলেরা মফিজের বাধ্য হল। মফিজ ছেলেদের ছোট ভাইয়ের মত ভাল বাসত। মধ্যে মধ্যে নিজের তৈরী পাটালী গুড় খেতে দিত এবং গান শুনাত।

ছেলেরা এক মনে গান শুনত এবং তার গলার মিষ্ট সুরের তারিফ করত। মফিজ এক বছরেই শটকে, কড়াকে, ফলা, বানান প্রভৃতি শিখে ফেল্ল। দ্বিতীয়

বৎসরেই গুরু মশায়ের শ্রেণীগুলি শেষ করে, পণ্ডিত মশায়ের শ্রেণীতে অর্থাৎ ছাত্রবৃত্তি স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে উঠল। বাঙ্গলা স্কুলে একজন পণ্ডিত ও একজন গুরু ছিলেন। পণ্ডিত মশায় প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী পড়াতেন। গুরু মশায় বাকী সমস্ত পড়াতেন। তখন মফিজের পড়া বেশী হল। সকালে সন্ধ্যায়ও বাড়ীতে পড়তে হতো। কাজেই সে একজন বার মাসের চাকর রাখল। চাকরের দ্বারাই অনেক কাজ করাত।

মফিজ যখন প্রথম শ্রেণীতে উঠেছে সেই সময়ে শীত কালে একদিন মফিজ খেজুর রস পাড়তে গিয়ে দেখল কোন ভাঁড়ে অর্দ্ধেক, কোন ভাঁড়ে তারও কম এমন কি কোন ভাঁড়ে সিকি রস আছে। এই ভাবে দুই তিন দিন রস চুরীর পরে একদিন মফিজ দেখ্‌ল একটা ভাঁড়ের গুড় কে ময়লা ফেলে নষ্ট ক'রে দিয়েছে। মফিজ ভয়ানক চটে গেল ও ভাঁড়টা তখনই ভেঙ্গে ফেল্ল। বাড়ীতে এসে মার কাছে নালিশ কর্‌ল 'কাল আমি বাঁখের বাড়ীতে ব্যাটার ঠ্যাং ভেঙ্গে দেব'।

মফিজ ভাঁড়ের রসের পরিমাণ দেখিয়া বুঝিয়াছিল রস শেষ রাত্রে চুরি যায়, মফিজ সেই দিনই শেষ রাত্রে একখানা রস বইবার বাঁখ হাতে করে, খেজুর তলায় গেল। খেজুর তলায় ঘুরতে ঘুরতে দেখতে পেল, এক জায়গায় রস পেড়ে জড় করে রেখেছে। তখন সে আরও সাবধানে গাছ তলায় ঘুরতে ঘুরতে একটা গাছে দেখতে পেল, এক জন লোক রসের ভাঁড় নিয়ে নামছে, সে বাঁখ উঁচু করে দাঁড়াল, লোকটা যেমন মাটীতে পা দিয়েছে, মফিজ অমনি বাঁখ দিয়ে এক ঘা বসিয়ে দিল, লোকটা একটা বিকট শব্দ করে, মাটিতে পড়ে গেল, আর সাড়া পাওয়া গেল না।

মফিজ ভীত হয়ে তখনই বাড়ী গিয়ে একটা আলো জ্বালিয়ে নিয়ে এসে দেখে লোকটা মরে গিয়েছে, সে তাদেরই পাড়ার একজন পুরাণ চোর।

মফিজ আর বাড়ী গেল না, একেবারে থানায় গিয়ে সমস্ত কথাই সত্য বল্ল, থানার দারোগা তাহাকে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট চালান দিলেন, মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব খুনের অপরাধে মফিজকে জজ সাহেবের নিকট চালান দিলেন, মফিজ জজ সাহেব ও জুরীগণের নিকটও পূর্ব্বের মত সমস্ত কথা সত্য বল্ল, জজ সাহেব ও জুরীগণ মফিজকে খুনের অপরাধ হইতে অব্যাহতি দিলেন, কিন্তু জজ সাহেব মফিজকে ছয় মাসের জন্য জেলে পাঠাইলেন। রায়ে লিখিলেন, আসামীর খুন করার ইচ্ছা ছিল না। দুষ্ট লোকটাকে শাসন করাই তাহার উদ্দেশ্য, কিন্তু রাগের বশীভূত হয়ে, হিতাহিত

জ্ঞান শূন্য হওয়া উচিত না, এই অপরাধে তাহাকে ছয় মাসের জন্য জেলে পাঠান গেল।

মফিজ জেলে গিয়াও কষ্ট পায় নাই, সে খুব পরিশ্রমী ও কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিল, নিজের কাজগুলি ঠিক মত কর্‌ত এবং কাহারও সহিত কোন প্রকার খারাপ ব্যবহার কর্‌ত না, তাতে জেলের কর্ম্মচারীরা তাহার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন। ছয় মাস পরে সে জেল হতে ফির্‌ল, ইহার পর সে অনেক বৎসর বেঁচে ছিল এবং পুত্র পৌত্রেরও মুখ দেখেছিল, কিন্তু এই দীর্ঘ কালের মধ্যে মফিজ আর কখনও হাটে, বাজারে বা লোক সমাজে বাহির হয় নাই। নিজের বাড়ী, খেজুরতলা ও ধানের জমি ইহার বাহিরে সে যেত না। মফিজ কোরাণ পড়িতে শিখেছিল প্রত্যহই কোরাণ পড়িত, মধ্যে মধ্যে দুই একখানা ভাল বাঙ্গলা বই কিন্‌ত এবং অবসর মত ঘরে বসে তাহাও পড়িত।

আবোল তাবোল।

কল ক'রেছেন আজব রকম চণ্ডীদাসের খুড়ো—
সবাই শুনে 'সাবাস্' বলে পাড়ার ছেলে বুড়ো।
চণ্ডীদাসের নাম শোননি? যাওনি তাদের বাড়ী?
দেখনি তার মেশোর মুখে বিকট রকম দাড়ি?
নাই বা দেখ, তবু যদি খুড়োর কথা শোন
অবাক্ হ'য়ে থম্‌কে যাবে, সন্দেহ নাই কোন।
খুড়োর যখন অল্প বয়স—বছর খানেক হ'বে—
উঠ্‌ল কেঁদে 'গুংগা' ব'লে ভীষণ অট্ট রবে।
আর ত সবাই 'মামা' 'গাগা' আবল তাবল বকে
খুড়োর মুখে 'গুংগা' শুনে চম্‌কে গেল লোকে।
পাড়ার যত প্রাচীন বুড়ো অবাক্ হ'য়ে চায়
এমন বুদ্ধি আর কোথাও দেখাই নাহি যায়।
সেই খুড়ো আজ কল করেছেন আপন বুদ্ধি বলে
পাঁচ ঘণ্টার রাস্তা যাতে সওয়া ঘণ্টায় চলে।

দেখে এলাম কলটি অতি সহজ এবং সোজা,
ঘণ্টা দশেক ঘাঁট্‌লে পরে আপনি যাবে বোঝা।
বল্‌ব কি আর কলের ফিকির, বল্‌তে না পাই ভাষা,
ঘাড়ের সঙ্গে যন্ত্র জুড়ে এক্কেবারে খাসা।
সাম্‌নে তাহার খাদ্য দোলে যার যে রকম রুচি,
(মণ্ডা মিঠাই চপ্ কাট্‌লেট খাজা কিম্বা লুচি)।

মন বলে তায় 'খাব খাব' মুখ চলে তায় খেতে,
মুখের সঙ্গে খাবার ছোটে রঙ্গরসে মেতে।
এম্‌নি ক'রে লোভের টানে খাবার পানে চেয়ে,
উৎসাহেতে হুঁশ্‌ রবে না চল্‌বে খালি ধেয়ে।
হেসে খেলে দু দশ যোজন চল্‌বে বিনা ক্লেশে,
খাবার গন্ধে পাগল হ'য়ে জিভের জলে ভেসে।
সবাই বলে সমস্বরে ছেলে জোয়ান বুড়ো,
অতুল কীর্ত্তি রাখ্‌ল ভবে চণ্ডীদাসের খুড়ো।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর।

ক্লাসে ২৮টি ছেলে ছিল।

গত মাসের ৩ নং ধাঁধার উত্তরটী ভুল ছিল। উহা এই প্রকারের হইবে ঃ—

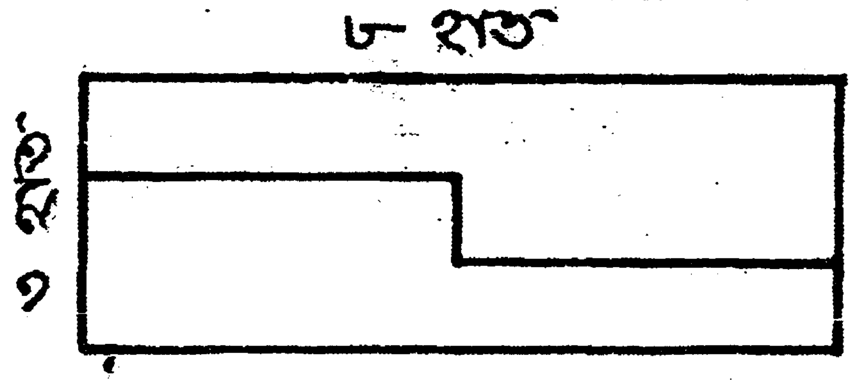

কাঠটিকে এইভাবে দুই ভাগে কাটতে হবে

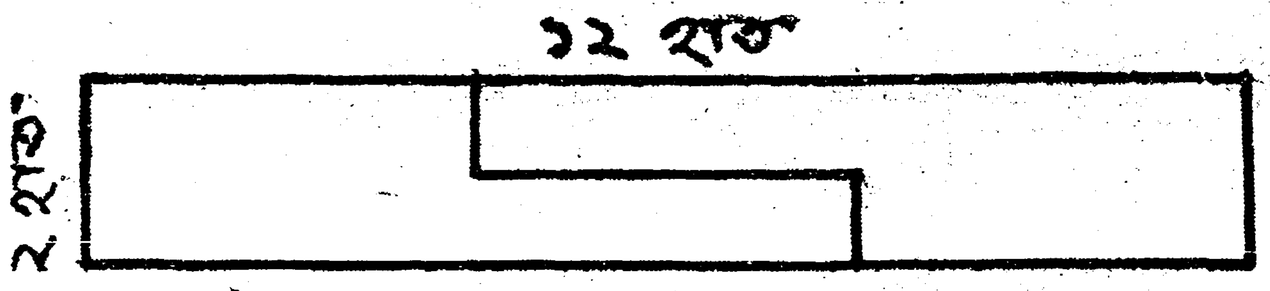

পরে টুকরা দুটিকে পাশাপাশি এইভাবে জুড়লে ছিদ্র বন্ধ হবে।

প্রবাল মাছ।

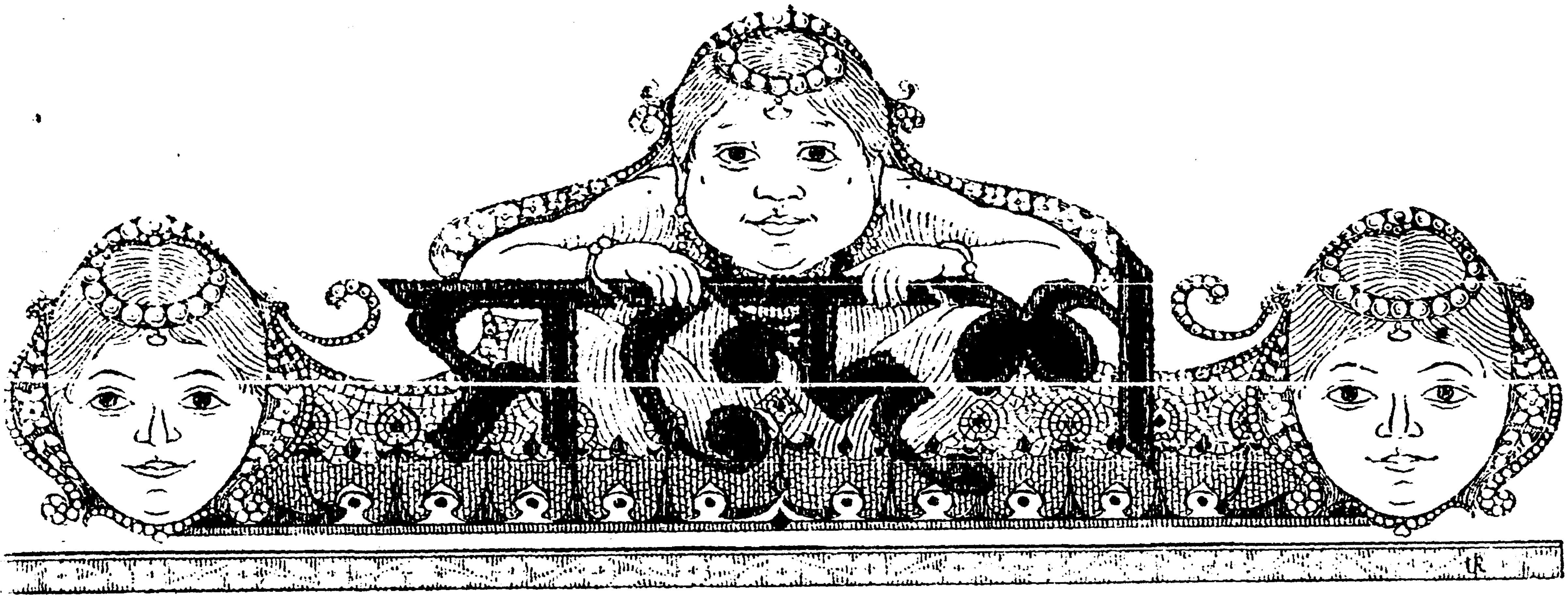

তৃতীয় বর্ষ চৈত্র, ১৩২২ দ্বাদশ সংখ্যা

প্রথম গালি।

বয়সে— আড়াই কি দুই
মনটি নিরমল জুঁই,
হাল্‌কা যেন হাওয়া
মেয়ে সে মুখ-চাওয়া
মায়ের কাছে কাছে
ছায়ার মত আছে
জানেনা মা বিনা কিছুই।

আর সে দিদি চেনে তার
দিদি সে সাথী খেলিবার
দুটিতে পিঠোপিঠি
তবুও খিটিমিটি
হয় না বেশী বেশী
নাইক রেষারিষি
কলহ নাইক নিতুই।

জগৎ মানে যেন,—তার—
মা, দিদি আপনি সে আর,
এ ছাড়া কিছু নেই
চেনে না কারুকেই
অকথা কুকথার
ধারে না কোনো ধার
শেখেনি আজো 'তুই' 'মুই'।

একদা হ'ল তুটি বোনে
পুতুল নিয়ে কি কারণে
ঝগড়া কাড়াকাড়ি,
তখন দিয়ে আড়ি
হারিয়া কাঁদো-কাঁদো
হ'য়ে সে আধো-আধো
কহিল "ডিডি! টু'মি—টুই।"

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

ইল ও ইলা।

সেকালে সূর্য্যবংশে ইল নামে খুব ক্ষমতাশালী একজন রাজা ছিলেন। তিনি একদিন অনেক সৈন্যসামন্ত এবং লোকজন সঙ্গে লইয়া শিকারের জন্য বনে গেলেন। প্রতিদিন বনে বনে ঘুরিয়া শিকার করিতে করিতে তাঁহার এতই ভাল লাগিল যে রাজধানীতে ফিরিয়া যাইবার জন্য তাঁহার আর ইচ্ছা হইল না। তখন তিনি তাঁহার সঙ্গের লোকজনকে বলিলেন—"তোমরা সকলে রাজধানীতে ফিরিয়া গিয়া আমার পুত্রকে লইয়া রাজত্ব কর, আমি জনকতক লোক সঙ্গে এখানে থাকিয়া কিছুকাল শিকার করিব।" রাজার হুকুম মত সকলেই রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন। তখন রাজাও বনে বনে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে হিমালয় পর্ব্বতে গিয়া, সেখানেই বাস করিতে লাগিলেন।

একদিন রাজা দেখিলেন তাঁহার বাড়ীর নিকটেই অতি সুন্দর, ঠিক অট্টালিকার মত সুসজ্জিত একটি গহ্বর। এই গহ্বরে যক্ষরাজ সমন্যু ও তাঁহার স্ত্রী সমা থাকিতেন। যক্ষেরা নানারূপ মায়া জানে, সমা ও সমন্যু অনেক সময় হরিণের রূপ ধরিয়া বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেন; রাজা ইল জানেন না যে সেটা যক্ষের বাড়ী; কাজেই এমন সুন্দর সাজান গোজান গহ্বরটী দেখিয়া তাঁহার লোভ হইল তিনি লোকজন লইয়া সেটাকে দখল করিয়া বসিলেন।

যক্ষরাজ বন হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাজার এই অন্যায় ব্যবহার দেখিয়া ভারি চটিলেন। কিন্তু এখন উপায়? ইল রাজাকে ত যুদ্ধ করিয়া জয় করা বড় সহজ নয়। গহ্বরটী ছাড়িয়া দিতে বলিলে তাহা কি তিনি শুনিবেন? যক্ষরাজ তখন তাঁহার আত্মীয় বড় বড় যোদ্ধা যক্ষদের স্মরণ করিয়া বলিলেন—"তোমরা ইল রাজার নিকট হইতে যেরূপে পার আমার গহ্বর উদ্ধার করিয়া দাও।" যক্ষরাজের কথায় সকল যক্ষযোদ্ধা মিলিয়া ইল রাজাকে গিয়া বলিল—"শীঘ্র আমাদের গহ্বর ছাড়িয়া দাও নচেৎ যুদ্ধ করিয়া এখনি তোমাকে তাড়াইয়া দিব।" ইল রাজার অত্যন্ত রাগ হইল, তিনি তখনি যক্ষদিগের সহিত ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া তাহাদের হারাইয়া দিলেন। বেচারি যক্ষরাজ কি আর করেন, স্ত্রীকে লইয়া মনের দুঃখে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন যায়, একদিন যক্ষরাজ তাহার স্ত্রীকে বলিলেন—"এই অত্যাচারী দুষ্ট রাজাটাকে ফাঁকি দিয়া না তাড়াইলে ত চলিবে না। তুমি এক কাজ কর—খুব সুন্দরী হরিণী সাজিয়া রাজাকে ভুলাইয়া যেরূপে পার একবার যদি তাঁহাকে উমা বনে লইয়া যাও তবেই রাজা মহাশয় জব্দ হইবেন। আমি ত আর সেখানে যাইতে পারিব না কাজেই তোমাকেই এ কাজটা করিতে হইবে।"

যক্ষের কথা শুনিয়া যক্ষিণী বলিল—"তুমি কেন উমাবনে যাইবে না? সেখানে গেলে দোষ কি?"

যক্ষরাজ বলিল—"পার্ব্বতীর অনুরোধে মহাদেব তাঁহার জন্য এক নির্জ্জন বন প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন—তাহারই নাম 'উমাবন'। সেখানে মহাদেব, গণেশ, কার্ত্তিক আর নন্দী এই কয়জন ছাড়া অন্য পুরুষ কেউ গেলে তখনি সে স্ত্রীলোক হইয়া যাইবে। এখন বুঝিতেই পার সেখানে আমার যাইবার সাধ্য নাই।"

তারপর যক্ষের উপদেশ মত সমা হরিণী সাজিয়া ইল রাজার সম্মুখে গিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহাকে দেখিয়াই রাজার মনে শিকারের লোভ চাপিল, তিনি একাকী

ঘোড়ায় চড়িয়া তাহার পিছনে তাড়া করিলেন। হরিণীও রাজাকে ক্রমে সেই উমাবনের দিকে লইয়া চলিল। এইরূপে যখন সে বুঝিতে পারিল যে রাজা উমাবনে প্রবেশ করিয়াছেন তখন হঠাৎ সে হরিণীরূপ ছাড়িয়া পুনরায় যক্ষিণী হইয়া একটা অশোক গাছের তলায় দাঁড়াইয়া রহিল। এদিকে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া রাজাও এই অশোক গাছের নিকটেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া যক্ষিণী হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল—"কি গো সুন্দরী ইলা। তুমি স্ত্রীলোক হইয়া পুরুষের বেশে একা ঘোড়ায় চড়িয়া কাহাকে খুঁজিতেছ?" যক্ষিণী তাঁহাকে "ইলা" বলিয়া সম্ভাষণ করায় রাজার অত্যন্ত রাগ হইল এবং তিনি তাহাকে ধমক দিয়া সেই হরিণীটার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। যক্ষিণী বলিল—"ইলা! তুমি রাগ করিতেছ কেন? আমি ত কোন অন্যায় কথা বলি নাই।"

ততক্ষণে রাজার হুঁশ্ হইল যে তিনি সত্যি সত্যিই স্ত্রীলোক হইয়া গিয়াছেন? এখন উপায়? ইলা তখন বিষম ভয় পাইয়া যক্ষিণীকে এ অদ্ভুত ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন—"দোহাই তোমার, সত্যি করে আমাকে বল কেন আমি স্ত্রীলোক হইলাম, তুমি নিশ্চয় ইহার কারণ জান। তুমিই বা কে তাহাও আমাকে বল।" যক্ষিণী বলিল—"আমার পতি যক্ষরাজ সুমন্যু হিমালয়ের গহ্বরে থাকেন, আমি তাঁহার পত্নী সমা। আপনি এতদিন যে গহ্বরে আছেন সেটাই আমাদের গহ্বর। আমিই হরিণী সাজিয়া আপনাকে ভুলাইয়া এই উমাবনে আনিয়াছি। মহাদেবের আদেশ অনুসারে কোন পুরুষমানুষ এখানে আসিতে পারে না। আসিলেই সে স্ত্রীলোক হইয়া যায়। এই জন্যই আপনি স্ত্রীলোক হইয়াছেন। এখন দুঃখ করিয়া আপনার কোনও লাভ নাই, আপনি ক্ষত্রিয় যোদ্ধা ও সূর্য্যবংশের উপযুক্ত বীর ছিলেন—কিন্তু আপনার লড়াই করা আর শিকার করা এখন জন্মের মত শেষ হইল। আর তাহার জন্য দুঃখ করিয়া লাভ কি? দুদিন বাদে আপনিই সে সব কথা ভুলিয়া যাইবেন।"

যক্ষিণীর কথায় ইলা আরও ভয় পাইয়া বলিলেন—"যক্ষিণী! তুমি অনুগ্রহ করিয়া বল কি করিয়া আমার সময় কাটিবে, আমি কাহার আশ্রয়ে থাকিব।"

যক্ষিণী বলিল—"পূর্ব্বদিকে খানিক দূরেই চন্দ্রের পুত্র মহাত্মা বুধের আশ্রম আছে। বুধ তাঁহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য এই পথ দিয়া যান। তিনি যখন যাইবেন তখন তুমি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইও তিনিই তোমায় আশ্রয় দিবেন।"

ইহার পর একদিন বুধগ্রহ পিতার নিকট যাইবার পথে সুন্দরী ইলাকে দেখিয়া বলিলেন—"হে সুন্দরী! তোমার যদি কোনও আপত্তি না থাকে তাহা হইলে আমার সঙ্গে চল আমি তোমাকে আমার রাণী করিয়া রাখিব।" ইলা সন্তুষ্ট চিত্তে রাজি হইয়া বুধের সঙ্গে গেলেন, বুধও তাঁহাকে বাড়ীতে লইয়া গিয়া বিবাহ করিলেন। কিছুকাল পরে ইলার পরম সুন্দর একটি পুত্র হইল। অনেক মুনি ঋষি এবং দেবতারা সেই পুত্রকে দেখিবার জন্য সেখানে আসিলেন। জন্মিবা মাত্রই সে শিশু উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল, তাহার এইরূপ পুরু অর্থাৎ উচ্চ রব শুনিয়া দেব-ঋষিরা তাহার নাম রাখিলেন "পুরুরবা"। পুরুরবা দিন দিন বড় হইতে লাগিল, বুধ নিজে তাহাকে নানা রকমের বিদ্যা শিখাইলেন।

ইলা যদি তাঁহার পূর্ব্বকার সমস্ত কথা ভুলিতে পারিতেন, তবে তাঁহার দুঃখের কোনই কারণ থাকিত না। কিন্তু সে সকল কথা তাঁহার মনে থাকিয়া গেল। বড় হইয়া পুরুরবা দেখিলেন তাঁহার মা অনেক সময় মলিন মুখে বসিয়া বসিয়া কি জানি ভাবেন। একদিন মাকে ঐরূপ চিন্তা করিতে দেখিয়া পুরুরবা জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা! তুমি সময় সময় মুখখানি মলিন করিয়া কি চিন্তা কর? কিসের জন্য তোমার এত দুঃখ? তুমি আমায় বল কিসে তোমার দুঃখ দূর হইবে। তুমি যেরূপ বলিবে আমি সেইরূপ করিতেই প্রস্তুত আছি।"

ইলা বলিলেন—"বাবা! তোমার পিতা বুধ সকলই জানেন তাঁহাকে গিয়া তুমি জিজ্ঞাসা কর—তিনিই তোমাকে উপদেশ দিবেন।" পুরুরবা তখন পিতার নিকটে গিয়া তাঁহার উপদেশ চাহিলেন। বুধ বলিলেন—"পুরুরবা! ইলার পূর্ব্বকথা সবই আমার জানা আছে। বিপুল রাজ্যের অধীশ্বর মহারাজা ইল উমাবনে প্রবেশ করিয়া মহাদেবের শাপে সকল হারাইয়া এখন অসহায় স্ত্রীলোকরূপে সংসারে বাস করিতেছেন। তুমি গৌতমী গঙ্গায় গিয়া স্নান করিয়া মহাদেব এবং পার্ব্বতীর বিধিমতে পূজা কর, তাঁহাদের অনুগ্রহ হইলেই এ শাপ দূর হইতে পারে—নতুবা আর কোন উপায় নাই।"

পিতার উপদেশে পুরুরবা গৌতমী গঙ্গায় চলিলেন, ইলা এবং বুধও তাঁহার সঙ্গে গেলেন। গৌতমী গঙ্গায় স্নান করিয়া তিনজনে মহাদেব ও ভগবতীর আরাধনা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব ও ভগবতী তাঁহাদিগকে দেখা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমাদের পূজায় আমরা অত্যন্ত তুষ্ট হইয়াছি তোমরা এখন কি বর চাও বল—তাহাই তোমাদিগকে দিব।" পুরুরবা বলিলেন—"ইল রাজা

না জানিয়া আপনার বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাঁহাকে আপনি ক্ষমা করিয়া শাপ হইতে মুক্ত করুন।” মহাদেবের মত লইয়া দেবী ভগবতী বলিলেন—“তথাস্তু, ইলরাজ। এখন গৌতমীতে স্নান করিলেই তাঁহার ইচ্ছামত রূপ লাভ করিবেন।”

পার্ব্বতীর কথায় ইলা গৌতমী গঙ্গায় ডুব দিয়া মাথা তুলিবা মাত্র সকলে চাহিয়া দেখিল ইলা আর নাই। তাহার স্থানে সশস্ত্র মহারাজ ইল যোদ্ধ্‌বেশে জল হইতে উঠিয়া আসিলেন। সেই অবধি সে স্থানের নাম ইলাতীর্থ।

কুকুরের প্রতিশোধ।

যুবক অ’ব্রে মণ্টার্জিস্ প্রাসাদের জমিদারের ছেলে। তিন দিন থেকে তার বন্ধুরা কেউ তাকে দেখ্‌তে পায় না। রবিবার দিন সকালেও সে গির্জায় গিয়েছিল কিন্তু বিকালে থেকে তার কোনও উদ্দেশ নাই। সে দিন বিকালে সহরে একটা টুর্ণামেণ্ট্ হলো, দুজন নামজাদা যোদ্ধা সেখানে যুদ্ধের কত রকম খেলা দেখালেন। কথা ছিল অ’ব্রে তার বন্ধু নার্সাকের সঙ্গে একত্রে এই টুর্ণামেণ্ট্ খেলা দেখ্‌বে কিন্তু নার্সাক দেখ্‌লো সে সেখানে নাই। অ’ব্রের স্বভাব ত এরূপ নয়? কোন খেলাই ত তার বাদ পড়ে না! বাস্তবিক অ’ব্রের অনুপস্থিতিতে তার বন্ধু বান্ধবেরা বড়ই চিন্তিত হলো, তারা ঠিক বুঝ্‌তে পারল যে তার কোনও দুর্ঘটনা হয়েছে।

চতুর্থ দিন শেষ রাত্রে নার্সাকের হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল, তার মনে হলো যেন ঘরের দরজায় কিসে আঁচড়াচ্ছে। বিছানায় বসে কান পেতে নার্সাক্ শুন্‌লে আঁচ্‌ড়ানর সঙ্গে সঙ্গে গোঁ গোঁ শব্দ—যেন একটা কুকুর খুব কষ্টে পড়ে এরূপ শব্দ করছে। তখনি উঠে গিয়ে নার্সাক দরজা খুলে দিল। দরজা খুলে দেখ্‌ল কি? প্রকাণ্ড বড় একটা গ্রে হাউণ্ড্ কুকুর ঠিক দরজার সাম্‌নে লম্বা হয়ে পড়ে আছে, পরিশ্রমে এবং ক্ষিধেয় বেচারির প্রায় শেষ অবস্থা, তার উঠে দাঁড়াবার শক্তি নাই। পাঁজরের হাড়-গুলো বেরিয়ে পড়েছে, চোখ্ দুটো রক্তের মত লাল টক্‌টকে, জিবটা পড়েছে ঝুলে আর তার সমস্তটা শরীর ঠক্ ঠক্ করে কাঁপ্‌তে লেগেছে।

নার্সাক্‌কে দেখে কুকুরটা অতি কষ্টে উঠে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে নেজ নাড়তে লাগ্‌ল আর তার নাকটা নিয়ে নার্সাকের হাতে ঘস্‌তে আরম্ভ করল। তখন যুবক নার্সাক্ কুকুরটাকে চিন্‌তে পারল এটা তার বন্ধু অ’ব্রের খুব আদরের কুকুর, সর্ব্বদা

তার সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌ত। তখনি নার্সাকের হুকুমে তার চাকর খাবার নিয়ে উপস্থিত, চক্ষের নিমেষে কুকুরটা খাবারগুলি শেষ করে ফেল্‌ল। তার খাওয়ার রকম দেখে নার্সাক্‌ বেশ বুঝ্‌তে পারল যে কয়েকদিন থেকে সে একেবারে অনাহারে রয়েছে। খাওয়ার পরই কুকুরটা কেমন জানি করতে লাগ্‌ল—একবার দরজার কাছে যায় আবার ফিরে এসে নার্সাকের মুখের দিকে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে তাকায় আবার যায়। কখনও বা তার কাপড় কাম্‌ড়ে ধরে টান্‌ছে—যেন নার্সাক্‌কে কিছু বলতে চায়। কুকুরটার এরূপ আশ্চর্য্য ব্যবহার দেখে নার্সাকের মনে সন্দেহ হলো যে এই ঘটনার সঙ্গে তার বন্ধু অ'ব্রের নিরুদ্দেশের কোনও সম্বন্ধ আছে। অ'ব্রে যেখানে লুকিয়ে আছে কুকুরটা হয় ত সে জায়গার সন্ধান বলে দিতে পারে। ক্রমে নার্সাক্‌ স্পষ্ট বুঝতে পারল যে কুকুর তাকে নিয়ে কোথাও যেতে চায়। তখন কালবিলম্ব না করে সে কুকুরের পিছনে পিছনে চল্‌ল।

রাস্তায় বেরিয়ে কুকুরটা এ গলি সে গলি দিয়ে যেতে যেতে মাঝে মাঝে পিছনের দিকে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল নার্সাক্‌ও তার পিছনে আসছে কি না। ক্রমে সহরের দরজা পার হয়ে মাঠে গিয়ে দুজনে উপস্থিত, কুকুরও মাঠ পার হয়ে গেল। তার পরেই ভীষণ বন, সেকালে এই বনের পথে খুবই চোর ডাকাতের উপদ্রব ছিল। সেই ভয়ানক বনের ভিতর খানিক দূর গিয়ে কুকুরটা প্রকাণ্ড একটা ওক্‌ গাছের তলায় দাঁড়াল। গাছের তলায় একটা জায়গা দেখে মনে হলো যেন দিন কয়েকের মধ্যেই সে জায়গাটা কেউ খুঁড়েছে। তখন হঠাৎ গভীর যন্ত্রণার একটা আর্ত্তনাদ করে কুকুরটা সেই খোঁড়া জায়গাটার উপর যে শুলো নার্সাক্‌ শত চেষ্টা করেও তাকে সেখান থেকে আর তুল্‌তে পারল না। এই ব্যাপার দেখে নার্সাকের মনে হলো গুরুতর সন্দেহ, তখনি সে সহরে

ফিরে গিয়ে কতকগুলি লোক সঙ্গে করে আবার সেই জঙ্গলে গিয়ে উপস্থিত। লোকেরা তখনি খোঁড়া জায়গাটার মাটি এবং শুক্‌না পাতা লতা সব তুলে ফেল্‌ল। তখন তারা দেখ্‌ল কি? অ'ব্রের মৃতদেহ কে জানি তাকে খুন করে সেখানে পুঁতে রেখেছে। তখন্ সকলে মিলে মৃতদেহ বয়ে নিয়ে সহরে এসে মণ্টার্জিস্ পরিবারের সমাধিক্ষেত্রে তারও সমাধি দিল।

এই ঘটনার পর থেকে সেই গ্রেহাউণ্ড কুকুরটা নার্সাকের বড়ই ভক্ত হয়ে পড়ল—তার ঘরেই শোয়, তার সঙ্গে খায়, নার্সাক্ যেখানে যায় কুকুরটাও সঙ্গে সঙ্গে যায়। একদিন সকাল বেলা দুজনে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল এমন সময় কুকুরটা হঠাৎ ভীষণ গর্জ্জন করে উঠল। নার্সাক্ দেখল কুকুরটা রাগে থরথর করে কাঁপছে, তার ঘাড়ের লোম গুলো দাঁড়িয়ে উঠেছে—দেখ্‌তে দেখ্‌তে সে তীরের মত ছুটে গিয়ে অন্য একজন যুবকের উপর লাফিয়ে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে লোকটি মাটিতে সটান চিৎপাৎ। তখন তার পোষাক দেখে নার্সাক্ বুঝতে পারল যে যুবকটি রাজার শরীর রক্ষক দলের একজন লোক, তার নাম ম্যাকেয়ার। ম্যাকেয়ারের সঙ্গে তার কয়জন বন্ধুও ছিল তারা তখন লাঠি দিয়ে মেরে অতি কষ্টে কুকুরটাকে ছাড়ায়। ততক্ষণে নার্সাক্ এসে তাকে ধরে নিয়ে গেল। সে কি সহজে যেতে চায়? রাগে তখনও তার গা কাঁপছে।

কিছু দিন পরে আবার একদিন ঠিক এইরূপ ঘটনা হলো। নার্সাক্ সরকারী বাগানে বেড়াচ্ছিল, সেখানে ম্যাকেয়ারের সঙ্গে তার দেখা হয়। যাই ম্যাকেয়ারকে দেখা অমনি কুকুরটা ভীষণ গর্জ্জন করে দিদ্যুদ্বেগে গিয়ে তার উপর লাফিয়ে পড়ল। নার্সাক্ এবং রাজার শরীর রক্ষকদলের জনকয়েক কর্ম্মচারি মিলে কুকুরটাকে ছাড়াতে তাঁদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। এই ঘটনা ক্রমে রাজার কানে গেল। অ'ব্রের সঙ্গে নাকি অনেক দিন থেকে ম্যাকেয়ারের ঝগড়া ছিল সে খবরও রাজা শুন্‌তে পেলেন। তখন রাজার মনে একটা প্রশ্ন উঠ্‌ল—"আমার এই যুবক বডি গার্ডের উপর দেখ্‌ছি কুকুরটার বেজায় রাগ—এর কারণ কি? তাহলে কি তার প্রভুর খুনের সঙ্গে এর কোনও সংশ্রব আছে?" রাজা মহাশয় মনে মনে ঠিক করলেন এর একটা কিনারা না করে ছাড়বেন না। তিনি তখন নার্সাক্‌কে বলে পাঠালেন—"কুকুর নিয়ে আমার সঙ্গে এসে দেখা কর।" নার্সাক্ কুকুর নিয়ে রাজসভায় গিয়া উপস্থিত। সিংহাসনে রাজা বসেছেন, এক পাশে তাঁর কর্ম্মচারিগণ অপর পাশে শরীর রক্ষকের দল, তার মধ্যে যুবক ম্যাকেয়ারও আছে। মাথা নীচু করে নার্সাক্ রাজাকে নমস্কার

করল। এদিকে যাই ম্যাকেয়ারকে দেখা অমনি কুকুর ভীষণ গর্জ্জন করে ছুটে গিয়ে

একলাফে একেবারে তার উপর পড়ল। রাজসভায় হুলস্থূল ব্যাপার! রাজকর্ম্মচারিগণ চমকে গেলেন—রাজার সন্দেহ তখন নিশ্চয়তায় পরিণত হলো।

রাজা তখন স্থির করলেন যে ভগবানের বিচার দিয়ে এ বিষয়ের মীমাংসা করবেন—অভিযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে অভিযোগকারী কুকুরের লড়াই হবে।

সেইদিনই বিকালে রাজা এবং তাঁর সমস্ত পারিষদবর্গের সাম্‌নে এই লড়াই হলো। ম্যাকেয়ারকে কোন অস্ত্র নিতে দেওয়া হলো না সে শুধু লাঠি নিয়ে যুদ্ধ করবে। সময়ের সঙ্কেত হওয়া মাত্র উভয় যোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্রে এসে উপস্থিত। কুকুরটাকে দেখে স্পষ্টই বুঝ্‌তে পারা গেল যে তার প্রভুর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য সে যে যুদ্ধ করতে এসেছে সেটা সে বিলক্ষণ জানে। শত্রুকে সে এক মুহূর্ত্তেরও অবকাশ দিল না, তার ডাইনে বামে সাম্‌নে পিছনে ক্রমাগত আক্রমণ করতে লাগল। মাঝে মাঝে লাফিয়ে শূন্যে উঠে পড়ে—যেন ইচ্ছাটা লাফ দিয়ে শত্রুর টুঁটি কামড়িয়ে ধরবে। ম্যাকেয়ারও লাঠি দিয়ে ক্রমাগত তাকে মারবার চেষ্টা করতে লাগল বটে কিন্তু কুকুর বেজায় চট্‌পটে—এদিক ওদিক সরে গিয়ে তার আঘাতগুলি ফস্‌কিয়ে দিতে লাগল। কুকুরটার এই অসাধারণ শক্তি দেখে ম্যাকেয়ার কেমন জানি দমে গেল—তার লাঠি যেন আর চলে না, হাত যেন তার অবশ। তখন সকলেই দেখ্‌ল ভয়ে তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে কুকুরের দিকে যেন ভরসা করে তাকাতেই পারছে না—তার মাথা নীচু হয়ে গেল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে কুকুরটা এক লাফে তার টুঁটি কামড়িয়ে ধরে

তাকে মাটিতে চিৎপাৎ করে ফেল্‌ল। ম্যাকেয়ার ভয়ে চিৎকার করে উঠ্‌ল—"মহারাজ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমি দোষী—আমিই অ'ব্রেকে খুন করেছি।" আর কার ক্ষমা কে করে? ভগবান স্বয়ং দোষী ব্যক্তির বিচার করেছেন। কুকুরটাকে তখন অতি কষ্টে ছাড়িয়ে নিয়ে রাজার হুকুমে ম্যাকেয়ারকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে ফাঁসি-কাঠে প্রাণবিসর্জ্জন দিয়ে ম্যাকেয়ার সেই বিশ্বাসী কুকুরের প্রভুর হত্যার প্রায়শ্চিত্ত করল।

সেই দিন থেকে কুকুরটার নাম হয়ে গেল "ডগ্ অব্ মণ্টার্জিস্"। মণ্টার্জিস্ প্রাসাদে গেলে দেখ্‌তে পাওয়া যেত অভিযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে অভিযোগকারী কুকুরের যুদ্ধের দৃশ্যটা একটা পাথরে খোদাই করা রয়েছে।

আশ্চর্য্য পুতুল।

চাবি-দেওয়া বিলাতী টিনের খেলনা তোমরা সকলেই হয় ত দেখিয়াছ। খেলনার ভিতরে স্প্রিঙের কল থাকে; চাবি ঘুরাইয়া কল ছাড়িয়া দিলে সেই খেলনা ছুটাছুটি করিয়া, হাত পা নাড়িয়া, বা আর কোন উপায়ে তামাসা দেখায়। আমরা একবার এই রকম একটা খেলনা দেখিয়াছিলাম, তাহাতে চাবি দিলে সেটা এমন অদ্ভুত ভঙ্গীতে ঠিক মাতালের মত টলিতে থাকে, যে দেখিলে হাসি সাম্‌লান যায় না। এই রকমের অনেক আশ্চর্য্য খেলনা ও পুতুলের কথা আমরা শুনিয়াছি। কিন্তু এখানে আমরা যে পুতুলের ছবি দিলাম এমন আশ্চর্য্য পুতুল বোধ হয় আর কোথাও নাই।

বিলাতে এই পুতুলের তামাসা দেখাইয়া পুতুলওয়ালা ঢের টাকা রোজগার করিয়াছে। ছবিতেই দেখিতেছ পুতুলটা একটা সাধারণ মানুষের সমান লম্বা—তাহার কাপড় চোপড় জুতা মোজা কিছুরই

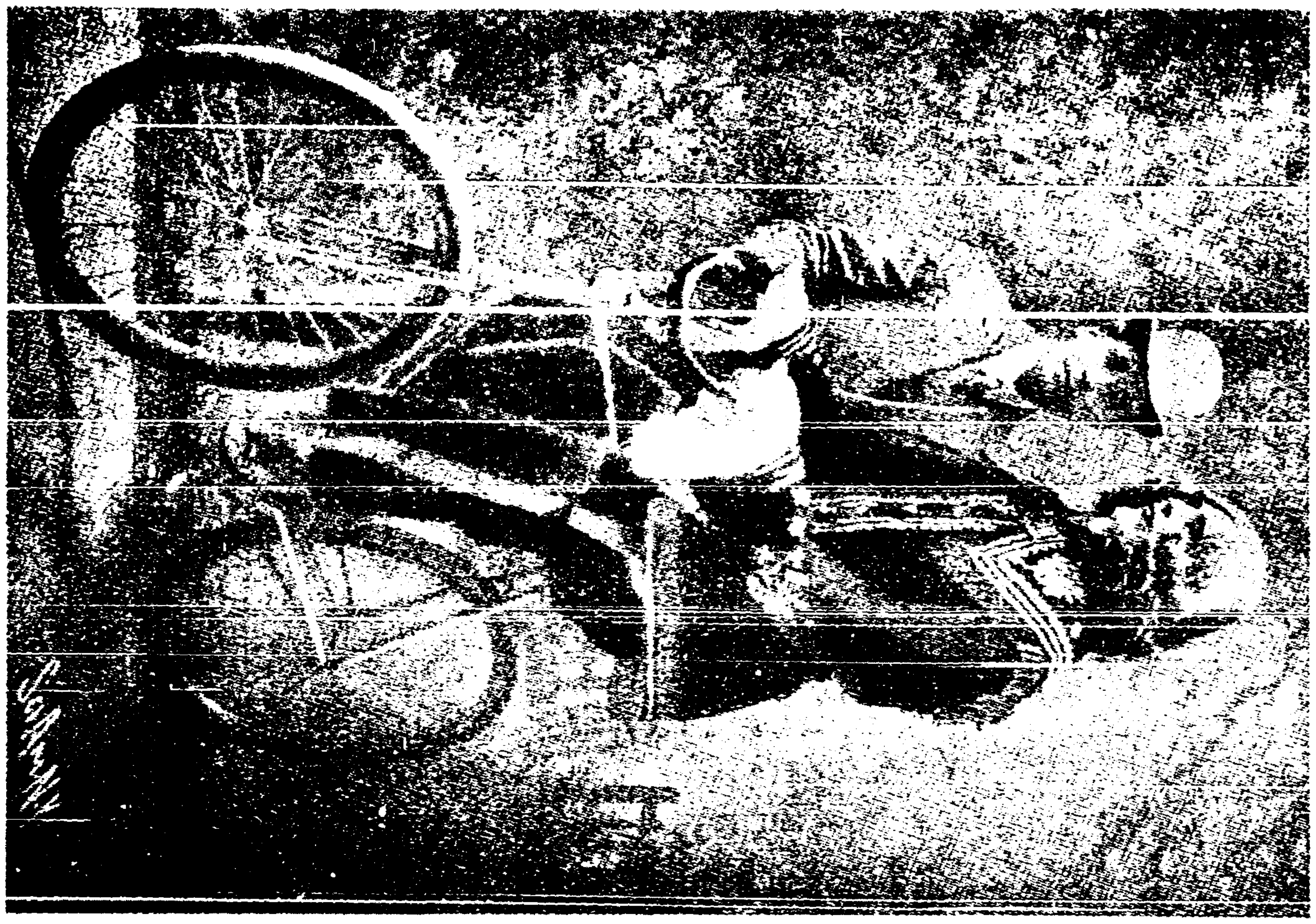

পুতুলের সাইকেল চালান।

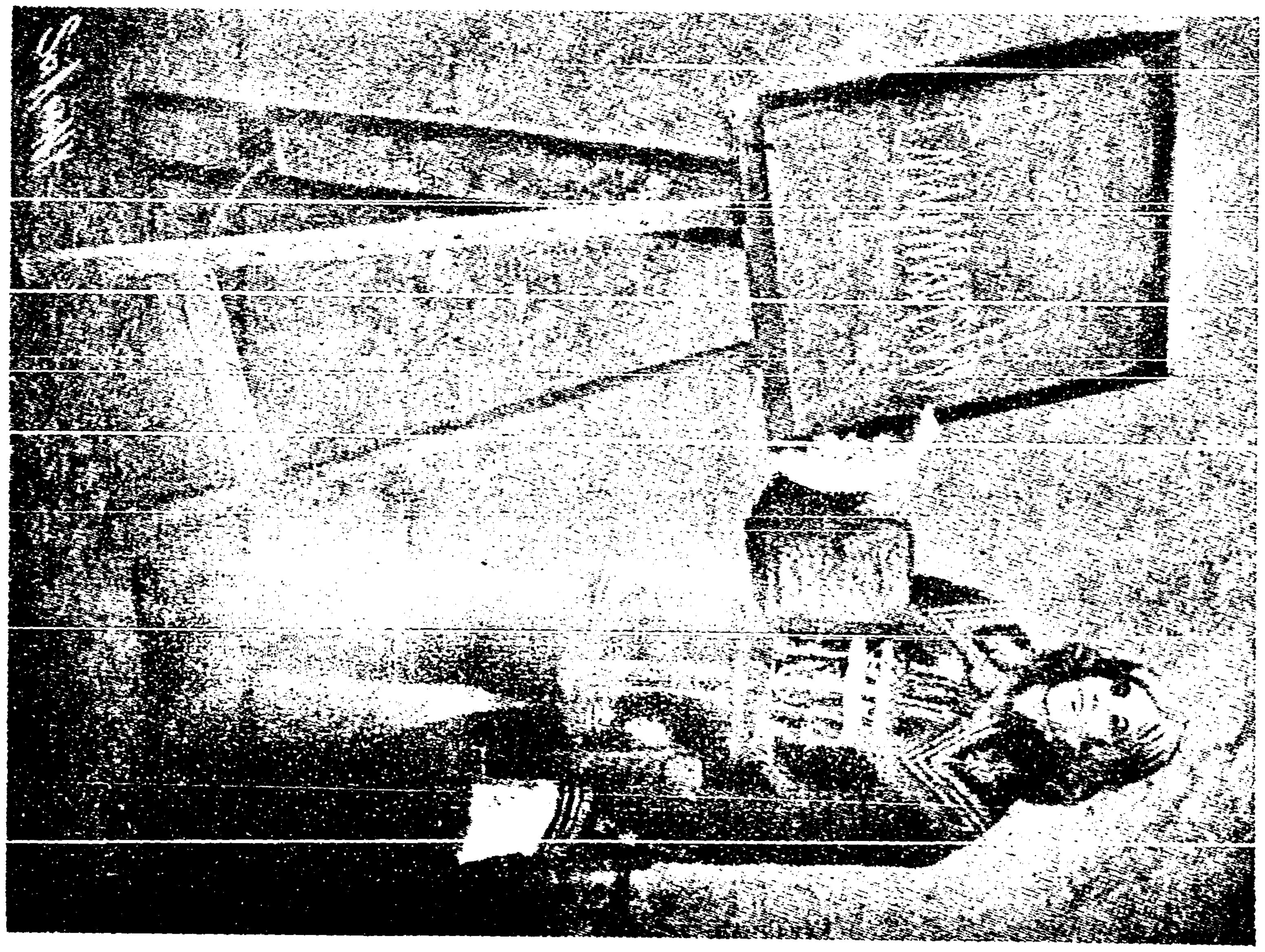

পুতুলের নাম-লেখা।

অভাব নাই। মুখে হাসি লাগিয়াই আছে—কিন্তু সে হাসির কোন অর্থ নাই—কারণ তাহার চোখ মুখের ভঙ্গীর কোন পরিবর্ত্তন হয় না। পুতুলের ভিতরটা ফাঁপা, তাহার মধ্যে কলকব্জার আর অন্ত নাই—তাহারই সাহায্যে সে ঠিক মানুষের মত পা ফেলিয়া হাঁটিয়া বেড়ায়। অবশ্য, সে পথঘাট দেখিয়া চলিতে পারে না—কল টিপিয়া সমান জমীতে ছাড়িয়া দিলে সোজা হাঁটিয়া যায়।

একটা প্রকাণ্ড তক্তার মঞ্চের উপর পুতুলের তামাসা দেখান হয়। সেই মঞ্চে ঢুকিবার আগে পুতুলের পিঠে চাবি দিয়া ছাড়িয়া দেয়—পুতুল খট্ খট্ করিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে দর্শকদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন তামাসাওয়ালা আসিয়া পুতুলের পরিচয় দেয়। তারপর পুতুলকে "বোর্ডের" কাছে যাইতে বলা হয়—পুতুল ঠিক বোর্ড পর্য্যন্ত গিয়া থামে। তখন পুতুলের হাতে খড়ি দিয়া বোর্ডে হাত ঠেকাইয়া তাহাকে নাম লিখিতে বলা হয়—সে আপনার নাম লেখে enigmarelle (enigma অর্থ হেঁয়ালি)। পুতুলের লেখাপড়ার বিদ্যা কিন্তু ওই পর্য্যন্তই। হাত চালাইবার জন্য তাহার কাঁধের মধ্যে যেরূপ কলের ব্যবস্থা আছে, তাহাতে কেবল ঐ লেখাই বাহির হয়।

কিন্তু পুতুলের সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য তামাসা বিনাসাহায্যে সাইকেল্ চালান। সাইকেলের উপর তাহাকে ভালমতে বসাইয়া কল টিপিয়া দাও—তারপর সে আপনা হইতেই নিজেকে সাম্‌লাইয়া গোল চক্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সাইকেল চালাইতে থাকিবে। সেই সময়ে তাহার পায়ের ওঠানামার দিকে তাকাইয়া দেখিলে সেটাকে পুতুলের পা বলিয়া কিছুতেই বিশ্বাস হয় না।

কিছুদিন আগে এক সাহেব এক পুতুল বানাইয়াছিলেন সে বোর্ডে অঙ্ক কষিত! সাহেব বোর্ডের পিছনে লুকাইয়া বৈদ্যুতিক চুম্বকের সাহায্যে পুতুলের হাত চালাইতেন আর লোকে অবাক হইয়া ভাবিত—পুতুল লেখে কি করিয়া?

রাজার সভা।

রাজা ছিলেন সিংহাসনে, প্রহরীরা দ্বারস্থ.
সভার যত সদস্যেরা বসেছিলেন আড়ষ্ট।
যা-তা বলে যাচ্ছেন রাজা ভারি উল্টা পাল্টা,
সায় দিয়ে সব ঘাড় নাড়ছে রেখে কথার তালটা।
সভায় ছিল একটি ছেলে—বয়স বছর্ সতের,
দেখ্লে যখন ঠিক নেইক কাহার কোন মতের-ও,
হেসে ফেল্লে একেবারে নানা সুরে রঙ্গে।
হায়রে কপাল! কাহার সাধ্য সভার নিয়ম লঙ্ঘে।
রাজা বল্লেন,—"বটে বটে! কেরে ছেলে আহ্লাদে?
যেতেই হবে ফাঁসি ওকে, জল্দি ডাকাও জল্লাদে।"
ছেলে বল্লে,—"মহারাজা, দিন্ না যা হয় দণ্ড,
বুঝে নিলাম, এই সভাতে সকল বেটাই ভণ্ড।"
"ছোট মুখে বড় কথা?" রাজা বল্লেন, "আচ্ছা,—
প্রমাণ যদি কত্তে পার তোমার কথাই সাঁচ্চা;
ফাঁসিত দিব না তোমায়, বরং কর্লাম ধার্য্য—
বিয়ে দেব রাজকন্যা, দিব অর্দ্ধ-রাজ্য।"
ছেলে বল্লে,—"প্রমাণ দেওয়া হচ্ছে অতি সহজ-ই—"
(জল্লাদ এসে ধর্ল হাত, বালক কহে,—"রহোজী!")
"কিন্তু যদি ঘাড়ে চাপেন আস্ত রাজার কন্যা,
এই গরীবকে হতেই হবে একেবারে হন্যা;
তার চাইতে আগে থেকে ফাঁসি যাওয়াই ইষ্ট।"
(কথা শুনে হাঁফ্ ছাড়লেন, সভার যত শিষ্ট।)
রাজা কহেন, চুল্কে মাথা,—"পারকি কেউ বল্তে,
আসেন্ নিত দেবতা কেউ আজ্কে আমায় ছল্তে?"
সবাই বল্লে,—"মহাপ্রভু, যা বলেছেন, ঠিক্ ঠিক্!"
মন্ত্রী বল্লেন,—"টিক্টিকিটাও করেছিল টিক্ টিক্।"

রাজা বল্লেন,—"কিংবা বকাট্ কচ্ছে খানিক বকামি,
কিংবা পাগল, কিংবা ধূর্ত্ত কচ্ছে বহুত ঠকামি।"
"ঠিক বলেছেন, অতিসত্য," কহেন যত পণ্ডিত।
বালক কহে,—"মহারাজা, করুন আমায় দণ্ডিত,
কিন্তু দেখুন প্রমাণ হ'ল, সবাই এরা ভণ্ড।"
রাজা বল্লেন,—"আচ্ছা তোমার মাপ্ কর্‌লাম দণ্ড;
কিন্তু এখন প্রমাণ কর, পেলে রাজার কন্যা,
কেমন করে হতে পার পাগল অর্থাৎ হন্যা?"
বালক কহে,—"ভবিষ্যতে প্রমাণ না হয় কর্‌ব
একেবারে পাগল হ'লে,—কিন্তু কিবা লভ্য?"
রাজা বল্লেন,—"খালাস দিলাম।" জ্বর ছুট্‌ল ঘর্ম্মে!
বালক কহে,—"রাজার সভায় আস্‌ব না এ জন্মে।"

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

ভাল্লুকের খিচুড়ি খাওয়া।

জমিদারের আমগাছে এবার খুব আম ফ'লেছে। তার একটি ডাল গরিব কাঠুরের কুঁড়ে ঘরের উপর ঝুলে পড়েছে। জমিদার মশাই কাঠুরেকে বলেছেন, "তোমার বাড়ীতে আমার গাছের আম পড়ে গেলে, সে আম তোমারই হবে।" কাঠুরে বেচারা খালি ভাব্‌ছে, "কবে ঝড় হবে, আর আমার ঘরের কাছে সব পাকা আম ঝ'রে পড়্‌বে! তখন মনের সাধে আম খাব।"—কিন্তু ঝড়ও আসে না, আর আমও পড়ে না। অনেক দিন এ রকম ভাবে যায়; কাঠুরে বনে কাঠ কাট্‌তেও যায় না, কাজেই পয়সা কড়িও ঘরে আসে না।

কাঠুরেণী একদিন ভয়ানক রেগে কাঠুরেকে বল্ল, "আজ যদি তুমি এক আঁটি কাঠ কেটে না আন, তবে তোমায় উপোস থাক্‌তে হবে; আর আমি মজা করে খিচুড়ি রেঁধে খাব।" খিচুড়ির লোভে কাঠুরে তখনই কুড়োল নিয়ে বেরুল।

যেতে যেতে পথে এক ভাল্লুকের সঙ্গে দেখা। ভাল্লুক তো কাঠুরেকে দেখেই লম্বা এক নমস্কার দিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "ভাল আছ তো? সকাল বেলা কুড়ুল নিয়ে

যাওয়া হ'চ্ছে কোথায় ?" কাঠুরে বল্ল, "কাঠুরেণী খুব চমৎকার খিচুড়ি রাঁধ্‌ছে। এক আঁটি কাঠ কেটে নিয়ে গেলে তবে আমায় খেতে দেবে। সেই কাঠের চেষ্টায় বেরিয়েছি।"

ভাল্লুকের তো খিচুড়ির নাম শুনেই জিভে জল এসেছে। সে বল্ল, "আচ্ছা ভাই, আমি এক আঁটি কাঠ জোগাড় করে দিচ্ছি; আমায় খিচুড়ির ভাগ দেবে তো ?"

কাঠুরে বল্লো, "তা' কি হয় ? খিচুড়ি রাঁধ্‌তে খরচ কত ! তা'তে ঘি আছে, জাফরান আছে, আরও কত মসলা আছে ! এক মন কাঠের কমে কিছুতেই হ'তে পারে না।"

ভাল্লুক তা'তেই রাজি হ'লো, আর কাঠুরেকে বল্লো, "তুমি বাড়ী যাও, আমি এখনই কাঠ নিয়ে আস্‌ছি।"

কাঠুরে বাড়ী গিয়ে কাঠুরেণীকে ভাল্লুকের কথা বল্‌তেই কাঠুরেণী মাথায় হাত দিয়ে বল্লো, "সর্ব্বনাশ! ওকে কতখানি ভাগ দেবো তা' তো কিছু ঠিক করনি! খিচুড়ির হাঁড়ি একবার ওর হাতে পড়লে কি আর রক্ষা আছে?"

এই ব'লেই ড়ু'জনে খিচুড়ির হাঁড়ি নাবিয়ে নিয়ে সাপুৎ সুপুৎ ক'রে খেতে আরম্ভ কর্‌লো। খানিকটা খেয়েই কাঠুরে বল্লো, "ভাল্লুকের জন্য ভাগ রেখো কিন্তু!" কাঠুরেণীও বল্লো, "ভাল্লুকের ভাগটা খেয়ে ফেলো না যেন!" কেউই কিন্তু খাওয়া থামায় না;—কেবল খাচ্ছেই, খাচ্ছেই। শেষকালটায় ড়ুজনেই চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "এই য্যাঃ! ফুরিয়ে গেল!"

এখন কি করা যায়? ড়ুজনে মিলে পরামর্শ ক'রে, বাড়ীতে যা' কিছু খাবার জিনিষ আছে সব তালা চাবি দিয়ে বন্ধ ক'রে রেখে, খিচুড়ির খালি হাঁড়িটা উনুনে চড়িয়ে দিয়ে নিজেরা লুকিয়ে রইল।

ভাল্লুক এসে যখন দেখ্‌ল যে খিচুড়ির হাঁড়িটা একেবারে খালি, তখন যে তার রাগটা হল! প্রথমে তো সে ঘরের চারিদিকে খুঁজল, আর কিছু খাবার জিনিষ আছে কি না। তা' যখন পেল না, তখন সে মনে কর্‌ল যে সেই এক মন কাঠ নিয়ে সে ঘরে চ'লে যাবে। কিন্তু বাইরে এসেই আম গাছে পাকা আম দেখে তার মাথায় একটা বুদ্ধি জোগা'ল। সে বল্ল, "এই পাকা আম যদি কিছু পেড়ে নিতে পারি, তবে সেগুলো বিক্রী ক'রে খিচুড়ি খাবার পয়সা পাবো।"

যাই না এ কথা মনে করা, অমনি সে খিচুড়ির হাঁড়ি নিয়ে গাছে চড়ে আম পাড়্‌তে আরম্ভ কর্‌লো। ভাল ভাল পাকা আম সে হাঁড়ির মধ্যে রাখে, আর কাঁচা আমগুলো টপাটপ্ গিলে খায় আর মুখ সিঁট্‌কিয়ে বলে, "হলোই বা টক; বিনা পয়সায় পাওয়া জিনিষ ফেল্‌তে নেই।"

কাঠুরে আর কাঠুরেণী এতক্ষণ আড়ালে লুকিয়ে সব দেখ্‌ছিল। শেষটায় কাঠুরেণীর আর সহ্য হ'লো না। তা'র ছিল বড্ড শর্দ্দি, কাশী। ঠাণ্ডায় তার কাশী আর ভয়ানক হাঁচি এল। কাঠুরে তো ব্যস্ত হয়ে বল্ল, "আরে, আরে, চুপ!" কিন্তু কিছুতেই আর রাখা গেল না। হঠাৎ ভয়ানক জোরে—"হ্যাঁ—চ্চো ঃ——" শব্দ হ'লো। সে এমনই জোরে শব্দ যে মনে হ'লো চারদিক যেন কেঁপে উঠ্‌ল।

ভাল্লুক তো সে আওয়াজ শুনে মনে কর্‌ল তাকে বুঝি কেউ গুলি কর্‌ল। আর অমনি সে খিচুড়ির হাঁড়ি টাড়ি, কাঠ টাঠ সব ফেলে রেখে, গাছ থেকে তড়াং ক'রে এক লাফে প'ড়ে, ঊর্দ্ধশ্বাসে দে দৌড়! একেবারে তার বাড়ী না পৌঁছিয়ে সে একবারও থাম্‌ল না; ফিরেও তাকা'ল না।

এদিকে কাঠুরে আর কাঠুরেণীর ফূর্ত্তি দেখে কে! মাঝখান থেকে তাদের পাকা আম আর এক মণ কাঠ, দুইই লাভ হ'লো।

প্রবাল মাছ।

গতবারে প্রবালের কথা বল্‌তে গিয়ে প্রবাল দেশের মাছের কথা বলা হ'য়েছিল। এবারে কতগুলা প্রবাল মাছের রঙীন ছবি দেওয়া হ'ল। আমরা রঙীন প্রাণীর কথা বল্‌তে হ'লে সাধারণত পাখী বা প্রজাপতির কথা ভাবি। রঙীন মাছ বল্‌লে বড় জোর লাল মাছ বা হল্‌দে মাছের কথা মনে হয়। কিন্তু এই ছবি দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পার্‌বে যে, মাছেরও রঙের বাহার বড় কম নয়। যে জন্তু যেমন জায়গায় থাকে তার গায়ের রং অনেক সময় সেই রকমের হ'য়ে আসে—যেমন শীতের দেশের অনেক জন্তুর রং বরফের মত সাদা—মরু-ভূমির অনেক জন্তু ধূলার মত ধূসর। প্রবাল মাছের রংও তার দেশেরই উপযুক্ত।

যে কয়টা মাছের ছবি দেওয়া হ'ল সেগুলা ছাড়াও আরও অনেক রকমের রং বেরঙের প্রবাল মাছ দেখা যায়। আবার এদের অনেকগুলারই স্বভাব এমন অদ্ভুত, তাদের রং কখন যে কেমন দাঁড়ায় কিছু বোঝা যায় না। এক সাহেব একবার একটা মাছ ধর্‌লেন—তার গায়ের রং সবুজ, তার উপর সুন্দর হল্‌দে রঙের ডোরা। সেই মাছটাকে একটা সাদা টবের মধ্যে ছেড়ে দেওয়ামাত্র তার রং বদ্‌লিয়ে সমস্তটা গা হল্‌দে রঙে ঢেকে গেল, আর তার মধ্যে ছোট ছোট কাল রঙের অসংখ্য বিন্দু দেখা দিল! বাস্তবিক, যদি বহুরূপী কাউকে বল্‌তে হয়, তবে এদেরই বলা উচিত!

এদের আবার আর একটি বিদ্যা আছে, সেটি হ'চ্ছে পরস্পরের মধ্যে খাওয়া-খাওয়ি করা। ওর মধ্যে যারা একটু বড় তারা সব সময়ে ছোট মাছদের তাড়া ক'রে বেড়ায়। আর ছোট মাছদেরও নজর থাকে আরো ছোট মাছদের উপরে—তাদের দেখ্‌তে পেলেই তেড়ে গিল্‌তে যাবে। তাছাড়া শামুক গুগ্‌লি প্রবালকীট এসব খেতেও

অনেকেরই আপত্তি নাই। কিন্তু দেখ্‌তে খুব জমকাল হ'লেও এদের প্রায় সবগুলিই খেতে বিস্বাদ লাগে—এমন কি কোন কোনটা রীতিমত বিষাক্ত—বেশী খেলে মানুষ মারা যেতে পারে!

ছবির মাঝামাঝি যে একটা অদ্ভুত মাছ আছে, তার পিঠের কাঁটাগুলো একবার দেখ। যদি কখন প্রবাল দ্বীপে যাও, আর এই মাছ দেখ্‌তে পাও, তবে সুবিধা পেলেও তাকে ধর্‌তে যেও না। কারণ তার ঐ কাঁটার মধ্যে সাঙ্ঘাতিক বিষ—সে একবার কাঁটা বিঁধাতে পার্‌লে তোমায় যন্ত্রণায় অস্থির ক'রে তুল্‌বে আর সেই কাঁটার ঘা শুকাতে হয়ত তিন মাস লাগ্‌বে!

ছবির নীচের দিকে যে একটা অদ্ভুত গোলগোছের মাছ দেখ্‌ছ, সেটার চালচলন ভারি আশ্চর্য্য রকমের। তাকে যদি তাড়া কর সে একদৌড়ে জলের উপর এসে তারপর এম্‌নি থতমত খেয়ে যাবে যে আর তার ছুটবার কথা মনে থাক্‌বে না। তখন সে জোরে নিশ্বাস নিতে নিতে ফুটবলের ব্লাডারের মত ফুলে গোল হ'য়ে জলের উপর ভাস্‌তে থাক্‌বে!

এই রকম কত যে প্রবাল মাছ দেখা যায় তার বর্ণনা ক'রে কত বড় বড় পুঁথি লেখা হ'য়েছে। হাজার রকম মাছ, তার হাজার রকম রং—কোনটার মুখ ভরা দাঁত, কোনটার একহাত লম্বা লেজ, কোনটার পিঠ ভরা কাঁটা—রাগ্‌লে পরে সজারুর মত খাড়া হ'য়ে ওঠে!

কাপিওলানি।

প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যখানে হাওয়াই দ্বীপ আছে, তোমরা ভূগোলে হয় ত প'ড়ে থাক্‌বে। এই দ্বীপের মত এমন সুন্দর স্থান পৃথিবীতে খুব কমই আছে। চারিদিকে প্রবালের চড়া তার মধ্যখানে প্রকাণ্ড পাহাড়। সমুদ্রে বহুদূর থেকে তার দুই চূড়া দেখা যায়। চূড়া দুটি প্রায় আড়াই মাইল উঁচু; একটির মাথা সব সময়ে বরফে সাদা হ'য়ে থাকে—আর একটি ভূতের মত কালো 'কিলাউয়া' পাহাড়—তার মাথার উপর সারাদিন ধোঁয়ার মত মেঘ জমে থাকে—সন্ধ্যার পর সেই মেঘকে আগুনের মত লাল হ'য়ে জ্বল্‌তে দেখা যায়। পাহাড়ের ভিতরটা যেন একটা ফুটন্ত কড়া—তার মধ্যে জ্বলন্ত পাথর গ'লে তরল হ'য়ে দিনরাত টগবগ ক'রে ফুট্‌ছে—তার চারদিকে

পোড়াপাথরের প্রকাণ্ড উঁচু দেয়াল। সেই দেয়ালের উপর চড়্‌লে পাহাড়ের ভিতরকার অগ্নিকাণ্ড স্পষ্ট দেখা যায়। সেই আগুন থেকে যে ধোঁয়া ওঠে—ঠাণ্ডা বাতাসে সেই ধোঁয়া জ'মে পাহাড়ের গায়ে সুতোর মত ঝুল্‌তে থাকে। সেই দেশের লোকেরা তাকে বলে "পেলের চুল"। আগে তাদের বিশ্বাস ছিল যে পাহাড়ের মধ্যে পেলে নামে এক ভীষণমূর্ত্তি দেবী থাকেন, তিনি প্রতিদিন আগুনে স্নান করেন। যখন পাহাড় ফেটে আগুন বেরোত আর সেই আগুন যখন সমুদ্রে প'ড়ে শোঁ শোঁ শব্দে ধোঁয়া ছড়াত—তারা ভাবত, পেলে রাগ ক'রেছেন। তখন তারা ঢাক ঢোল বাজিয়ে নানা রকমে পূজো দিয়ে দেবীকে শান্ত কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ত। মেয়েরা কখনও পাহাড়ের দিকেও যেত না—তা'হলে দেবী নাকি রাগ ক'রে সকলের সর্ব্বনাশ কর্‌বেন।

তারপর যখন সাহেবেরা সেই দ্বীপে যাতায়াত আরম্ভ কর্‌লেন আর হাওয়াইয়ের লোকেরা ক্রমে লেখপড়া শিখ্‌তে লাগ্‌ল, তখন তাদের সে অদ্ভুত বিশ্বাস ঘুচে গেল। কেউ কেউ সাহস ক'রে বল্‌তে লাগ্‌ল "ওটা কোন ভূতুড়ে কাণ্ড নয়। ওরকম আরো কত জায়গায় হ'য়ে থাকে, সেখানে ত কেউ পূজো টুজো দেয় না"। কিন্তু দ্বীপের বুড়োরা আর পুরোহিতেরা ভারি ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁরা বল্‌তে লাগ্‌লেন "খবরদার! খবরদার! দেবীকে চটিও না। পাহাড়ের আগায় চ'ড়ে দেখ দেখি, দেবী আছেন কিনা ভাল ক'রেই টের পাবে"। যখনই পাহাড়ের মধ্যে গুম্‌গুম্ শব্দ হ'ত তাঁরা বল্‌তেন, "ওই শোন দেবী রাগ ক'রেছেন! বাপুহে, আমরা বুড়ো হ'য়েছি—আজন্ম দেখে আস্‌ছি, দেবীর নিয়ম না মান্‌লে আর সময়মত পূজোটি না দিলে দেবী তোমাদের কাউকে আস্ত রাখ্‌বেন না"। তাই শুনে আবার সকলের মনে কেমন একটা ভয় হ'ত।

এর মধ্যে কোথা থেকে এক জংলি মেয়ে এসে বল্ল "আমি তোমাদের পেলে টেলে কিচ্ছু মানি না; আমাকে দেখাতে পার"? পুরোহিতেরা বল্লেন "দেখাব কি ক'রে? তিনি থাকেন ঐ পাহাড়ের মধ্যে! সেখানে আমরাই যেতে পারি না, তুমি মেয়ে মানুষ, তুমি গেলে কি আর রক্ষা আছে!" সেই মেয়ে বড় কম নয়—তার নাম কাপিওলানি—সে জেদ্ ধ'রে বস্‌ল, সে পাহাড়ের উপর চড়্‌বেই। সকলে মিলে তাকে কত বারণ কর্‌ল, কত ভয় দেখাল, কতরকমে বাধা দিতে চেষ্টা কর্‌ল—কিন্তু সে কোন কথা শুন্‌ল না। তার কিছু দিন আগে কয়েকজন লোক পাহাড়ের গায়ে চড়্‌তে গিয়ে মারা গিয়েছিল। কাপিওলানি বল্ল "তারা গরম ধোঁয়া লেগে ম'রেছিল—আমি খুব সাবধানে যাব"।

এম্নিভাবে, সকলের কথা অগ্রাহ্য ক'রে, কাপিওলানি সেই পাহাড়ে উঠ্তে গেল। সে কি যেমনতেমন ওঠা! একে উঁচু পাহাড় তায় অজানা পথ, কত জায়গায় পিছল, কত জায়গায় খাড়া হ'য়ে উঠেছে। কোথাও ঠাণ্ডা বাতাসে হাড় জ'মে যায়—কোথাও গরম পাথরে পায় ফোস্কা প'ড়ে যায়। চারিদিকে গুম্ গুম্ শব্দ, পায়ের তলার মাটি থেকে থেকে কেঁপে ওঠে। কিন্তু কাপিওলানি তাতেও ভয় পেল না। পুরোহিতেরা চীৎকার ক'রে গাল দিতে লাগ্লেন—বল্লেন, "এই দুষ্টু মেয়েটা নিজেত মর্বেই—ওর জন্যে দেবীর শাপে আমরা সবাই মর্ব"।

কাপিওলানি ততক্ষণে পাহাড়ের চূড়োর কাছে গিয়েছে। গরমে তার গা ঝল্সে যাচ্ছে—কিন্তু সে একটিবার পাহাড়ের ভিতরে উঁকি না মেরে ছাড়্বে না। পাহাড়ের মুখের কাছে গিয়ে সে ভয়ে ভয়ে তার মধ্যে উঁকি মেরে দেখ্ল ফুটন্ত আগুন সমুদ্রের ঢেউয়ের মত ফুলে ফুলে উঠ্ছে আর তার মধ্য থেকে বড় বড় বুদ্বুদ উঠে ভয়ানক শব্দে চারিদিকে ফেটে পড়্ছে। তখন সে চীৎকার ক'রে বল্ল "কোথায়? এতদিন যে আমাদের মিথ্যা ভয় দেখিয়েছে সেই পেলে কোথায়? যদি সে সত্য সত্যই থাকে তবে সে আমাকে মারুক দেখি!" পাহাড়ের চারিদিক থেকে গুম্ গুম্ শব্দে তার কথার প্রতিধ্বনি হ'তে লাগ্ল কিন্তু পেলের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। তখন কাপিও-লানির আনন্দ দেখে কে? সে তখনি পাহাড় থেকে নীচে নেমে আস্ল আর সকলকে ব'লে দিল "ওখানে ভূত বা দেবতা কিছু নাই, তোমরা অনর্থক ভয় পেওনা"।

সেই থেকে লোকের ভয় এম্নি ভেঙ্গে গেল যে পেলের কথা আর কেউ বিশ্বাসই করে না। এখনও সে দেশে গেলে কাপিওলানির কথা শুন্তে পাবে।

বোকা বংশী।

বংশীধরের বুদ্ধি বাঁকা। সহজ কথার অর্থ বুঝে না। সে একবার মামাবাড়ী গিয়াছিল; মামা তাহাকে একখানা চাদর দিলেন—চাদরখানা সে কোথায় ফেলিয়া আসিল। তাহার মা বলিলেন, "ওরে বোকা, চাদরটাকে গায়ে জড়িয়ে আন্লিনে কেন?"

তারপর একবার কে তাহাকে একখানা ছাতা দিল। সে ছাতাটিকে বাঁকাইয়া ভাঙিয়া গায়ে জড়াইয়া বাড়ী আসিল। মা বলিলেন, "হায় হায়, ছাতাটা এমন ক'রে নষ্ট কর্লি—ওটা মাথায় দিয়ে আন্তে হয় তাও জানিস্‌নে?"

ইহার পর সে কোথায় একটা ঠেলাগাড়ী পাইয়া, সেটাকে মাথায় চাপাইয়া বাড়ী আনিল। মা বলিলেন, "একটা দড়ি দিয়ে টেনে আন্‌লেই পার্‌তি—খামখা মাথায় ক'রে ব'য়ে মর্‌লি কেন?"

এবারে সে একটা মাছ পাইয়া তাহাতে দড়ি বাঁধিয়া হিড়্‌হিড়্ করিয়া টানিতে লাগিল। যত রাজ্যের চিল্ কাক কুকুর আর বেড়াল মাছটাকে কামড়াইয়া ঠোকরাইয়া তাহার আর বেশী কিছু বাকী রাখিল না। মাছের দুর্দ্দশা দেখিয়া মা বলিলেন, "ওটাকে কাগজে বেঁধে সুতো দিয়ে ঝুলিয়ে আন্‌লেই পার্‌তি!"

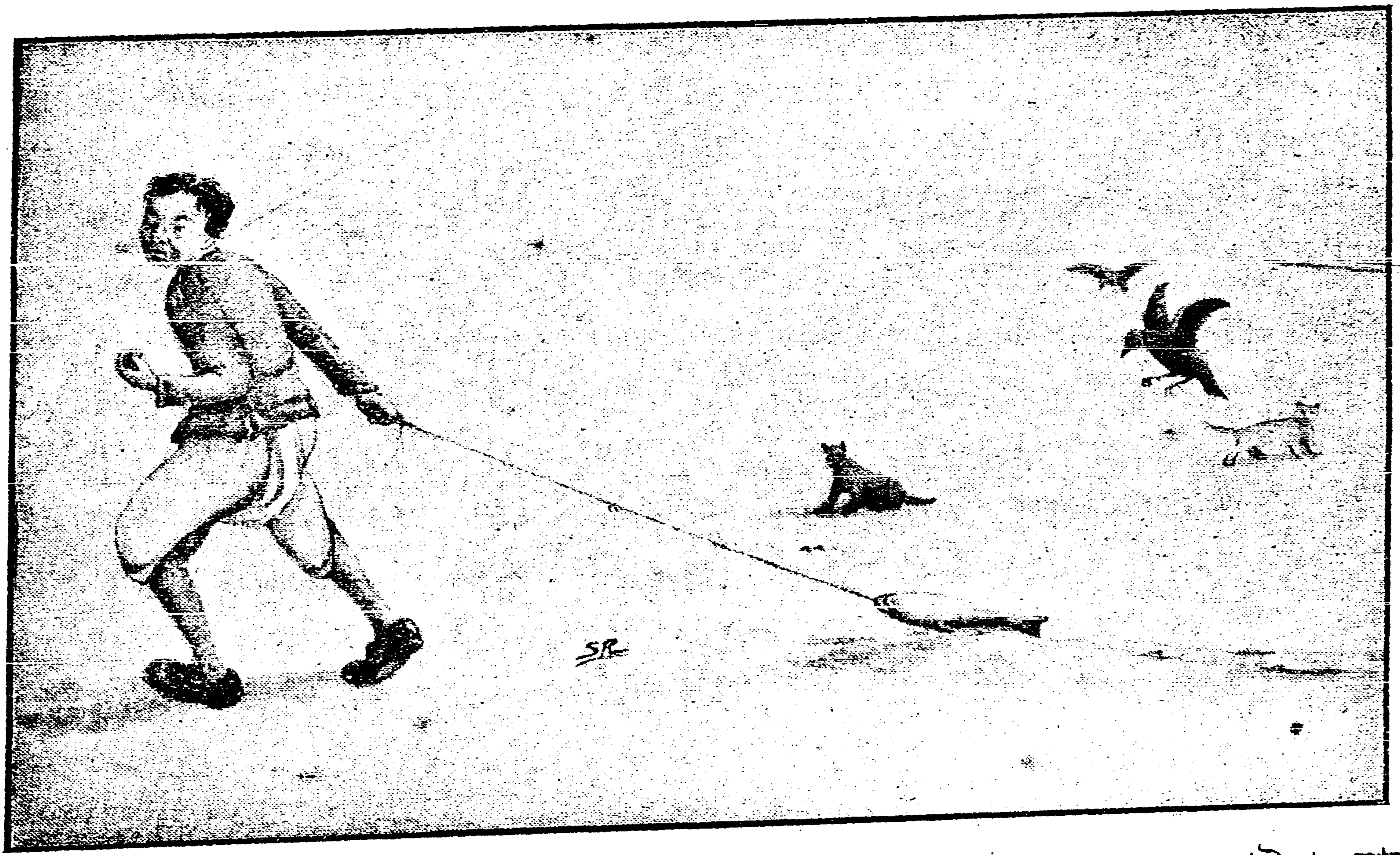

পরদিন বংশী একটা প্রকাণ্ড কাগজের পোঁট্‌লা, মোটা সুতায় ঝুলাইয়া বাড়ী আসিল। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওটাতে কি?" বংশী বুক ফুলাইয়া বলিল, "খাতা সেলাই কর্‌ব, ছুঁচ এনেছি।" মা বল্‌লেন, "তারই জন্য এত কাণ্ড? পকেটে ক'রে আন্‌লেই পার্‌তি।"

এ কথার ফল হইল এই যে, বংশী আরেকদিন যখন বাড়ী আসিল, তার জামার মধ্যে এক-পকেট ঝোলা গুড়! মা বলিলেন, "হায় হায়, গুড় আন্‌বি তা একটা ভাঁড়ও পেলি না?"

বেচারা কি আর করে? মাষ্টার মহাশয় যেদিন তাহাকে একটা বই দিলেন সে তাহার জন্য কুমারের বাড়ী গিয়া, প্রকাণ্ড এক ভাঁড় লইয়া আসিল। মা বলিলেন, "আবার ভাঁড় কেন? বগলে ক'রে আন্‌লেই পার্‌তি!" তার পরদিন সে একটা সাদা ইঁদুর বগলে পুরিয়া বাড়ী আনিয়া দেখে, ইঁদুরটা দম আটকাইয়া মরিয়া গিয়াছে! মাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "একটা ঝুড়িতে ক'রে সাবধানে ব'য়ে আনা উচিত ছিল।"

তারপর বেচারা শ্বশুরবাড়ী গেল আর দুদিন বাদে এক প্রকাণ্ড ঝুড়ি কাঁধে লইয়া বাড়ী ফিরিল। বাড়ীর দরজায় আসিয়াই সে "উঃ—বেজায় ভারি" বলিয়া ঝুড়িটা দুম্ করিয়া ফেলিয়া দিল—আর অম্‌নি ঝুড়ির মধ্যে কে যেন হাঁউমাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। মা বলিলেন, "ও কিরে?" বংশী বিকট মুখ করিয়া বলিল, "বউটা বেজায় ভারি!"

সন্দেশের হিসাব।

এই চৈত্র সংখ্যায় সন্দেশের তিন বৎসর পূর্ণ হ'ল। সময়ের হিসাবে তিন বৎসর কিছু বেশী নয়—এর মধ্যে ৩৬ সংখ্যা মাত্র সন্দেশ বেরিয়েছে। সুতরাং এর মধ্যে বিশেষ আশ্চর্য্য কিছুই নাই। কিন্তু যদি হিসাব ক'রে দেখি এই সামান্য ব্যাপারটিকেও নেহাৎ সামান্য বোধ হয় না।

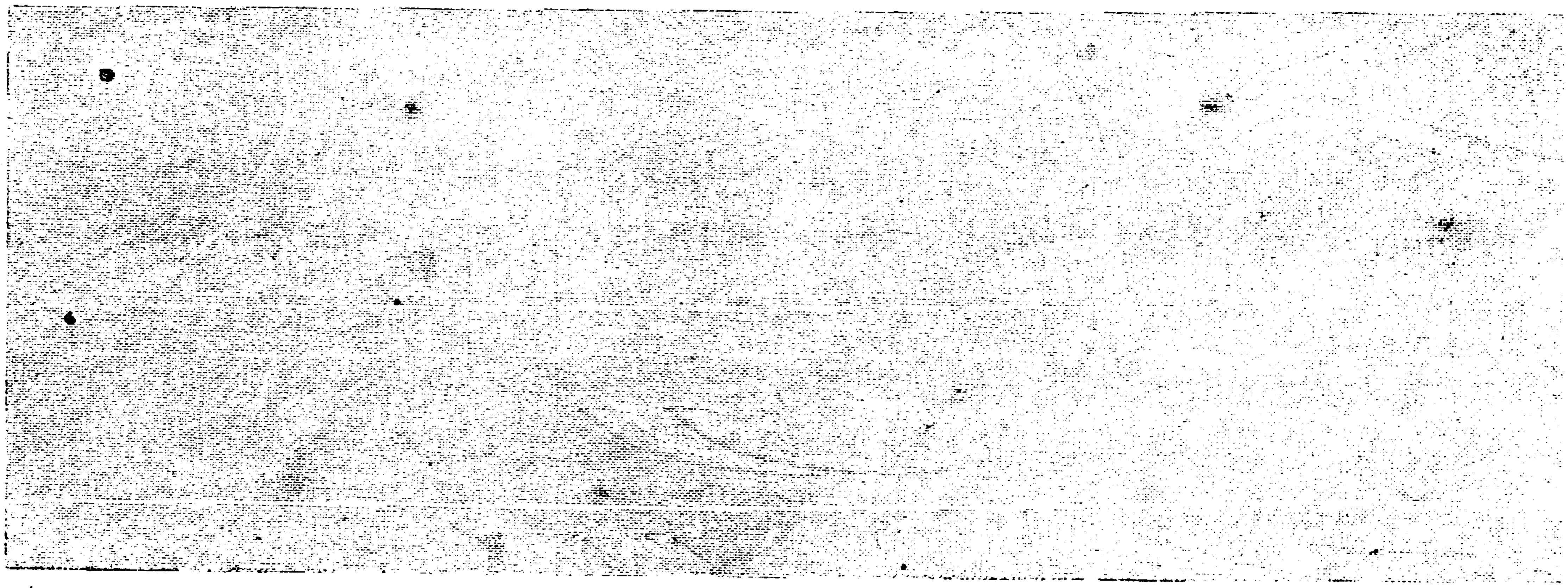

এই জায়গাটার মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ ৮ হাজার ছোট বিন্দু আছে।

এই তিন বছরে সন্দেশ ছাপা হ'য়েছে সবশুদ্ধ প্রায় এক লক্ষ আট হাজার (আগের পৃষ্ঠার ছবিখানা দেখ)। প্রত্যেক খানি সন্দেশে বিজ্ঞাপন বাদে ৩২ পৃষ্ঠা কাগজ থাকে—সুতরাং সবশুদ্ধ পৃষ্ঠা হয় প্রায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ!

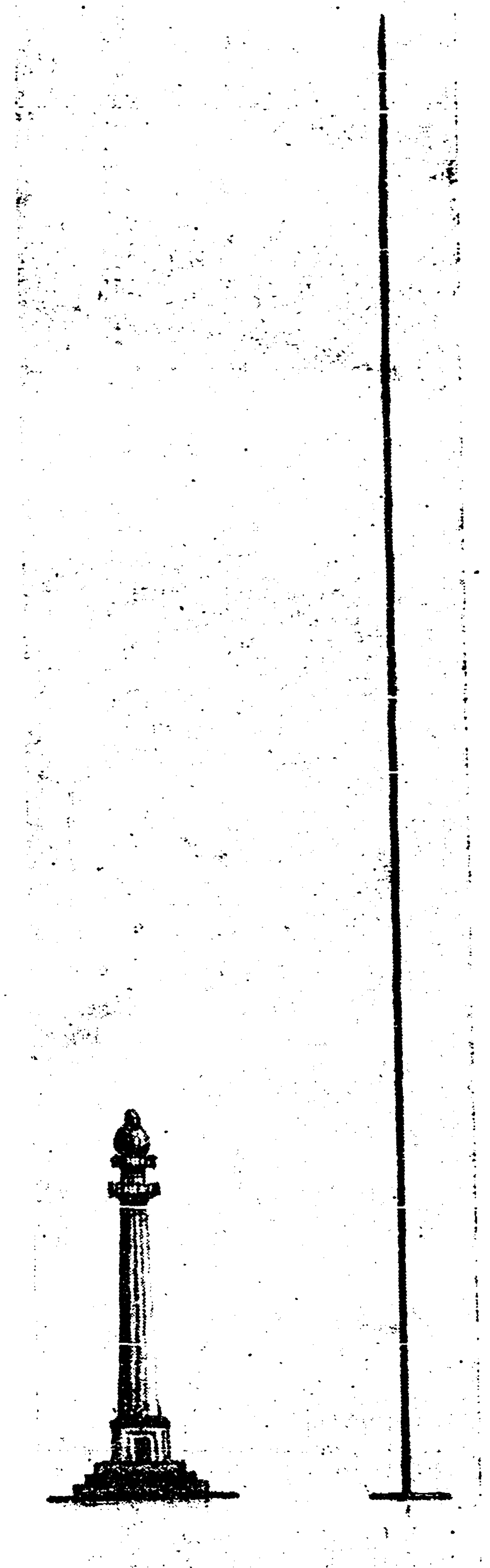

১ লক্ষ ৮ হাজার সন্দেশের স্তম্ভের পাশে কলিকাতার মনুমেণ্ট।

এতগুলি সন্দেশ যদি একত্রে ওজন করা হয় তবে প্রায় ২১৫ মণ ওজন হয়—অর্থাৎ তোমাদের প্রায় দুশ' জনের সমান।

সন্দেশগুলি যদি একটার উপর একটা উঁচু থাক্ ক'রে সাজান যেত তবে প্রায় ৭০০ ফুট উঁচু একটা স্তম্ভ হ'ত—কল্‌কাতার মনুমেণ্টের চার গুণ! যদি উপরে উপরে না রেখে লম্বালম্বি সার বেঁধে বসাতে তবে সে সার কল্‌কাতা থেকে বারাকপুর অবধি (প্রায় ১৭ মাইল) লম্বা হ'ত!

যদি প্রত্যেকটি পাতা আল্‌গা ক'রে ঐ রকম পরপর বসান যেত, তা দিয়ে এখান থেকে প্রায় নেপাল বা বর্ম্মা পর্য্যন্ত লম্বা লাইন ফেলা যেত!

এই পঁয়ত্রিশ লক্ষ পৃষ্ঠায় যত অক্ষর আছে সব যদি এক লাইনে সার দিয়ে গাঁথা যেত, তাহ'লে সেই লাইন ধ'রে স্বচ্ছন্দে বিলাত চ'লে যেতে পারতে।

এতগুলি ছেঁড়া পাতা জুড়ে যদি চাঁদোয়া তৈরী করা যেত, তবে সেই চাঁদোয়ার নীচে অন্তত আড়াই লক্ষ লোক অনায়াসে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পার্‌ত।

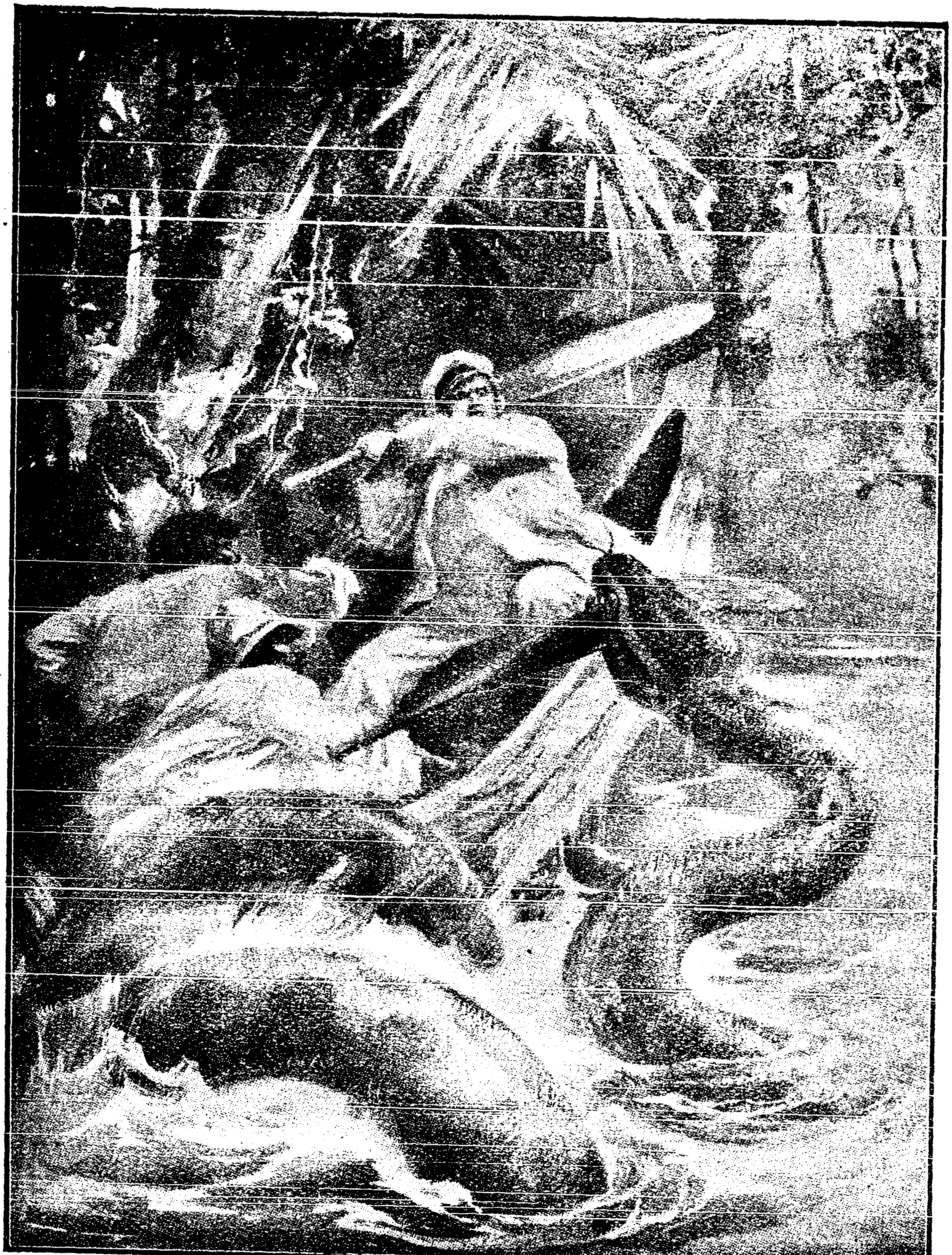

আনাকোণ্ডা অজগরের আক্রমণ।

অজগর।

"অ'য়ে অজগর"! ছেলেবেলায় অক্ষর চিন্‌তে গিয়ে আমরা গোড়াতেই ঐ অজগরটাকে চিনতে শিখেছি। আলিপুরের চিড়িয়াখানায় যদি অজগর দেখ্‌তে যাও দেখ্‌বে অত্যন্ত নিরীহ ভালমানুষ গোছের মস্ত একটা সাপ চুপ্‌চাপ প'ড়ে আছে কিম্বা আস্তে আস্তে উঠবার চেষ্টা কর্‌ছে। তা দেখে যদি মনে কর ওর স্বভাবটাই বুঝি ঐ রকম ঠাণ্ডা, তাহ'লে ভারি ভুল বোঝা হবে। আসলে, জন্তুটা একটু অলস গোছের, বেশী নড়াচড়া পছন্দ করে না—কিন্তু শিকার সাম্‌নে পেলে তখন তার আর এক রকম মূর্ত্তি বেরোয়।

অজগরের শিকারধরা একটা দেখবার মত জিনিষ। একটা ছোট খাট অজগরের মাথার ঢুঁ খেলে অনেক বড় বড় জন্তু পর্য্যন্ত কাবু হয়। তার উপর অজগরের মুখের হাঁ' খানা এক সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার! কাণের পিছন পর্য্যন্ত তার মুখ—তার ভিতর ছয় সারি দাঁত—সেই প্রকাণ্ড মুখ বিকট রকম ফাঁক ক'রে সে তীরের মত ছট্‌কে এসে শিকারকে কাম্‌ড়ে ধরে। এক কামড়ের বেশী দুই কামড় দেবার তার দরকার হয় না। আর একবার কাম্‌ড়ে ধর্‌লে কোনমতেই আর ছাড়াবার যো নেই।

তার উপর অজগরের এক বদ্‌ স্বভাব আছে—শিকারকে জড়িয়ে ধ'রে হঠাৎ নিজের শরীরটা গুটিয়ে ফেলা। একবার স্পেন দেশে এক সার্কাসওয়ালা একটা অজগর নিয়ে তামাসা দেখাচ্ছিল। অজগরটা তার গায়ে পাক দিয়ে খেলা কর্‌তে কর্‌তে হঠাৎ ভয় পেয়ে শরীর গুটিয়ে ফেল্‌ল—আর লোকটাও তখনি ম'রে পড়ে গেল। ঐ এক চাপেই তার শরীরের প্রায় আশি জায়গার হাড় ভেঙে গিয়েছিল। অথচ এই সাপটা মোটে হাত দশেক লম্বা ছিল—এক একটা বড় অজগর বিশ পঁচিশ হাত অথবা তারও বেশী লম্বা হয়!

দেখ্‌তে দেখ্‌তে সে তার শিকারকে কাবু করে ফেলে। প্রথমেই এক ছোবলে, একসঙ্গে খটাং ক'রে ছয়পাটি দাঁতের কামড়—আর সেই সঙ্গে সঙ্গেই শিকারকে পাক দিয়ে ধরা! তার পর হঠাৎ শরীর গুটিয়ে তার হাড় গোড় ভেঙ্গে টুক্‌রো ক'রে দেওয়া। এ সমস্ত লিখ্‌তে যত সময় লাগে কাজে তার একশো ভাগের এক ভাগও লাগে না। এই দেখ্‌ছ একটা জন্তু দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে—এক সেকেণ্ডের মধ্যেই দেখ্‌বে সে থেৎলা হ'য়ে সাপের মুখে ঢুক্‌ছে।

ডাঙ্গায় অজগরকে যদি আগে থেকে দেখ্‌তে পাও, তবে তার কাছ থেকে পালান কিছু মুস্কিল নয়, কিন্তু সে যদি জলের মধ্যে তোমায় তাড়া করে, তবেই মুস্কিল। দক্ষিণ আমেরিকায় আনাকোণ্ডা ব'লে একরকম অজগর আছে, সে জলে থাকে। সাধারণ অজগরের চাইতে সে অনেক লম্বা ও মোটা—তা' ছাড়া, তার গায়ের জোরও অনেক বেশী। তার উপর তার মেজাজটি এম্‌নি যে দূর থেকে মানুষকে তাড়া ক'রে আসে। এমনও শোনা গেছে, যে সে তিন চার জন লোককে একসঙ্গে আক্রমণ ক'রে তাদের নৌকোটৌকো উল্টিয়ে দিয়েছে—হয়ত দুএকটাকে মেরেও ফেলেছে। সে দেশের লোকে এই আনাকোণ্ডাকে যেমন ভয় ক'রে এমন আর কিছুকেই নয়। নদীতে যদি আনাকোণ্ডা দেখা দেয়, সব লোকে নৌকাটৌকা ফেলে সে নদী ছেড়ে পালাবে।

জেনে রাখ।

১। আমরা যা'কে 'লেড পেন্সিল' ('লেড' মানে সীসা) বলি, তার মধ্যে মোটেই সীসা থাকে না। কয়লা জাতীয় এক রকম জিনিষ দিয়ে তার শিষ তৈয়ারী হয়।

২। সাপেরা গাছের ডালে পাক দিয়ে দিয়ে ওঠে না;—ছবিতে কিন্তু সচরাচর সেই রকমই আঁকা হয়। তারা মাটির উপর যেমন ভাবে চলে, গাছের ডালেও তেম্‌নি ভাবে চল্‌তে থাকে।

৩। তিমিকে আমরা 'মাছ' বলি, কিন্তু তিমি এক রকম জন্তু। তিমির ছোট ছানারা অন্যান্য জন্তুর মত মায়ের দুধ খায়। চিংড়িকেও মাছ বলা চলে না—বরং তাকে পোকামাকড়ের মধ্যে ফেলা যেতে পারে।

৪। আমরা যে সব ছোট ছোট মাছি দেখ্‌তে পাই তারা বড় মাছির ছোট ছানা নয়। ডিম থেকে তারা যত বড় বের হয়, তত বড়ই তারা বরাবর থাকে।

৫। জল যখন ফুট্‌তে থাকে তখন তার থেকে যে ভাপ উঠ্‌তে দেখা যায়, সেটা বাষ্প বা ষ্টীম নয়। বাষ্প জমে ছোট ছোট জলের কণা হয় ব'লেই ভাপটা দেখ্‌তে পাওয়া যায়;—আসলে বাষ্পটা বাতাসের মত জিনিষ, চোখে দেখা যায় না।

৬। গরু কখনও মাথা নীচু করে কাউকে তাড়া করে না ;—ছবিতে কিন্তু প্রায়ই সেই রকম আঁকা হয়। তাড়া কর্‌বার সময় তারা মাথাটাকে উঁচুই রাখে!

৭। এক জাতীয় প্রজাপতির ডিম থেকে রেশমের পোকার জন্ম হয়। ঐ পোকা নিজের শরীরের লালা দিয়ে সূতা কেটে নিজেরই চারদিকে এক রকম খোসার মত তৈয়ারী করে। সেই খোসাটা থেকেই রেশমের সূতা হয়। তাকে গরম জলে সিদ্ধ করে, পোকা মেরে, তা'থেকে সূতা বের করে নেওয়া হয়। বেশী দিন খোসাটাকে রেখে দিলে পোকাটার নানা রকম পরিবর্ত্তন হয়ে সেটা আবার প্রজাপতি হয়ে বেরিয়ে উড়ে চলে যায়।

৮। আমরা যে সব 'টিন' ব্যবহার করি সে সব টিন ধাতুর তৈরী নয়। লোহার উপর টিনের পাতলা কলাই ক'রে সে সব টিন তৈয়ারী করা হয়ে থাকে।

৯। সূর্য্যমুখী ফুল যে কেবল সূর্য্যের দিকেই ফিরে থাকে তা' নয়। অনেক সময়ই অন্য দিকে ফিরে থাকে।

১০। অনেকের ধারণা, যে উটের কুঁজের মধ্যে জল থাকে। সেটা কিন্তু কেবল চর্ব্বিতে ভরা।

১১। বেড়ালেরা রাত্রে বেশী ভাল দেখ্‌তে পায় এ ধারণা ভুল। রাত্রে তারা আমাদের চেয়ে অনেক ভাল দেখ্‌তে পায় বটে, কিন্তু দিনে আরও ভাল দেখ্‌তে পায়।

মানুষের বাসা।

যেমন "নানা দেশের নানা বুলি"—তেমনি নানাজাতীয় লোকের ঘর বাড়ীর কায়দাও নানারকম। এই আমাদের দেশেই দেখ না, বড় বড় দালানের কথা ছেড়ে দিলেও, বাঁশ, খড়, খোলা, কাদা এই সব দিয়ে লোকে যে বাড়ী বানায়, তাও এক এক জায়গায় এক এক ধরণের। উত্তর মেরুর কাছে এস্কিমোরা বরফের চাক্‌তি কেটে তা দিয়ে গোল গম্বুজের মত বাড়ী বানায়। মেসোপেটোমিয়ায় যেখানে ইংরেজ সৈন্য তুর্কীদের সঙ্গে লড়্‌তে গিয়েছে, সেখানে এক রকম অদ্ভুত বাড়ী দেখা যায়—সেগুলা শুধু কাঁচা ইঁটের তৈরী, দেখ্‌তে ঠিক চালের গোলার মত—এক সঙ্গে বিশ পঁচিশটি! আফ্রিকায়

কঙ্গো দেশের নিগ্রোরা উঁচু উঁচু চূড়োর মত বাড়ী বানায়, তার মালমশলা শুধু গাছের ডাল পাতা আর কাদা। আবার পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এমন সব বেদে' জাত দেখ্‌তে পাওয়া যায়, যাদের আদবেই কোন ঘরবাড়ী নেই—বারোমাস যখন যেখানে থাকে, তাঁবু ফেলে দিন কাটায়!

এমন সময় ছিল যখন মানুষে বাড়ী বানাতে শেখেনি—তখন সে হিংস্র জন্তুর ভয়ে জঙ্গলের গাছে বা পাহাড়ের গুহায় লুকিয়ে থাক্‌ত। থাক্‌তই বা বলি কেন? এখনও

এমন লোক দেখা যায় যারা ঐ রকম ভাবে বাসা বেঁধে থাকে। নিউ গিনির অসভ্য লোকেরা এখনও গাছের আগায় বাঁশ আর শুক্‌না পাতার ঘর বেঁধে তার মধ্যে থাকে। বাড়ীতে ঢুক্‌তে হ'লে মই বেয়ে উঠ্‌তে হয়। বাড়ী সাজাবার জন্য তারা বাঁশের খুঁটির উপরে বা বাড়ীর চালায় কড়ি, শামুক, হাড়ের মালা প্রভৃতি সাজিয়ে রাখে—আর যদি লড়াই ক'রে শত্রুর মাথা কেটে আন্‌তে পারে তবেত কথাই নেই—সেই খুলিটাকে তারা সকলের উপরে ঝুলিয়ে দেয়!

মানুষ যে এক সময়ে পাহাড়ের গুহায় থাক্‌ত আর সেইখানে থাক্‌তেই যে সে আগুন ব্যবহার করতে শিখেছিল, তার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। এখনও পৃথিবীর নানা জায়গায় এমন সব লোক দেখা যায় যারা পাহাড়ের গায়ে গর্ত্ত ক'রে তার মধ্যে থাক্‌তে ভালবাসে। ফ্রান্সে এ রকম লোক অনেক পাওয়া যায়। আফ্রিকার ম্যাপে সাহারা মরুভূমির উত্তরে টিউনিস্ ব'লে একটা জায়গা দেখ্‌বে, সেখানে এক রকম অদ্ভুত লোক আছে, তারা মাটির মধ্যে গর্ত্ত

খুঁড়ে তার মধ্যে বাস করে! তাদের বাড়ীতে দরজা জানলা কিছু নাই—শুধু মাটির মধ্যে প্রকাণ্ড পাতকূয়ার মত এক গর্ত্ত! তারই ভেতরে পায়রার খোপের মত খোপ কেটে তারা "ঘর" বানায়। খোপের মধ্যে সুড়ঙ্গ কেটে তারা যাওয়া আসার পথ ক'রে নেয়।

আমেরিকায় কলরেডো প্রদেশে একটা পাহাড়ের গর্ত্তের মধ্যে বহুকালের পুরানো এক আশ্চর্য্য সহর পাওয়া গিয়াছে। সহরে এখন লোকজন কিছু নাই—ঘরবড়ীও

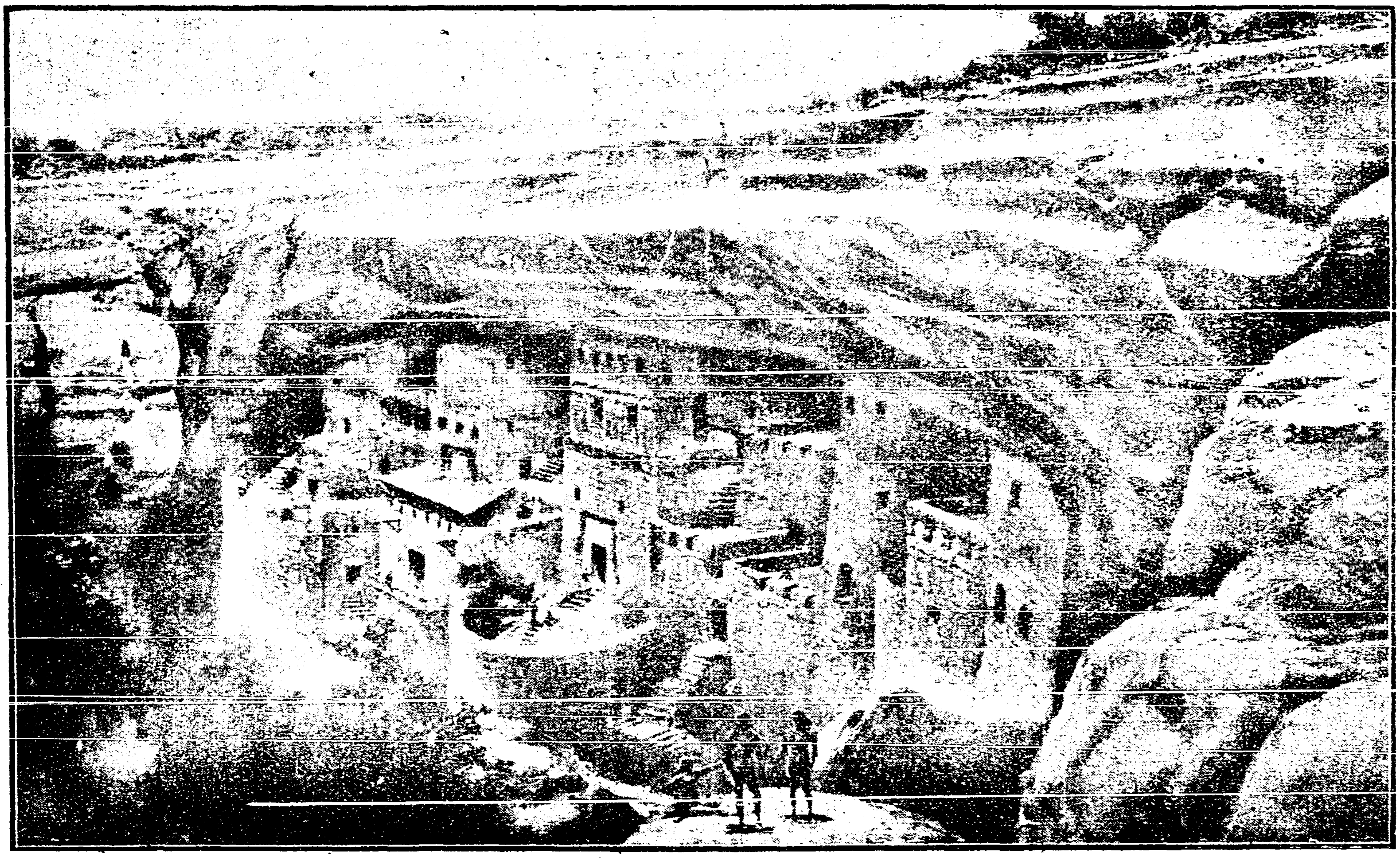

অনেক ভেঙেচুরে গিয়েছে। কিন্তু ভেতরের বন্দোবস্ত দেখে বোধ হয়, কোন যোদ্ধা জাতি ঐ সহর বানিয়েছিল। সমস্ত সহরটা দুর্গের মত মজবুৎ ক'রে তৈরী। তার তিন দিকে খাড়া পাহাড়—সামনের দিক ঢালু হ'য়ে নেমে গেছে—একটি সরু রাস্তা ছাড়া শত্রু আসবার পথ নাই। সহরের মধ্যে কতগুলো প্রকাণ্ড ঘরে শুধু খাবার মজুত ক'রে রাখা হ'ত—যাতে শত্রু এসে অনেক দিন ধ'রে পথঘাট আট্‌কে রাখ্‌লেও খাওয়ার কোন অসুবিধা না হয়। এমন দুর্গ পেয়েও তারা এ জায়গা ছেড়ে গেল কেন, আর কোথায় গেল, ভাব্‌লে আশ্চর্য্য বোধ হয়।

আর এক রকম বাড়ীর কথা ব'লে এবারের মত শেষ করি। পৃথিবীর প্রায় সব জায়গায়ই এমন এক রকমের লোক দেখা যায় তারা বারো মাস জলে থাকে। নৌকায় ঘোরা, নৌকায় থাকা, নৌকায় খাওয়া, নৌকায় শোয়া! সখ ক'রে বা চাকরির জন্য অনেক লোকে জাহাজে ঘোরে ফেরে কিন্তু এদের নৌকা ছাড়া আর ঘর নাই। বর্ম্মার কাছে শান্ দেশের নৌকাওয়ালা লোকের একটা ছবি দিলাম। ছবিতে দুজন লোক তাদের "বাড়ী" নিয়ে একটা ভয়ানক পাহাড়ে নদী পার হ'চ্ছে। আর কোন লোক অমন নৌকো নিয়ে ওরকম স্রোতের মধ্যে যেতে সাহস পেত কি না সন্দেহ।

গল্পস্বল্প।

আমরা ঘরে ব'সে খবরের কাগজে প্রতিদিন যুদ্ধের সংবাদ পড়ি আর যুদ্ধ সম্বন্ধে কত রকমের আলোচনা করি। কিন্তু শুধু বর্ণনা প'ড়ে যুদ্ধ জিনিষটা সম্বন্ধে কোন আন্দাজ হয় না। যখন দুশো কামান একসঙ্গে গোলা ছুঁড়তে থাকে তখন যে কিরকম কাণ্ডটা হয়, তার অনেক বর্ণনা আমরা শুনেছি। তখন চারিদিকের মাটি কাঁপতে থাকে, কাণে একেবারে তালা লেগে যায়—প্রাণপণে চেঁচালেও কোন কথা শোনা যায় না—মনে হয় আকাশ ফেটে ক্রমাগত বাজ পড়ছে, কিছুতেই তাকে থামান যাচ্ছে না। শব্দটা যেন হাতুড়ির মত সমস্ত শরীরে ঘা মারতে থাকে। কিন্তু এত কথা বললেও কিছুই বোঝান হয় না—তবুও খালি মনে হয়, "না জানি সে কি ভয়ানক ব্যাপার!"

যাঁরা যুদ্ধে গিয়েছেন তাঁরা, কামানের লড়াইটা শুনতে কি রকম, সেটা নানারকম বর্ণনা দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা ক'রেছেন। একজন বলেছেন—"মাথার উপর দিয়ে গোলাগুলো ছুটে যাচ্ছে—মনে হয় যেন একটা দৈত্যের হাঁপানির শব্দ আকাশের চারিদিকে ঠিক্‌রে পড়ছে।" কেউ বলেছেন, "মনে হয় যেন আকাশটা সহস্র মাথায় ফণা ধ'রে শোঁ শোঁ শব্দে চীৎকার ক'রে আস্‌ছে।" "এঞ্জিনশুদ্ধ ট্রেইন যেন ভয়ানক বেগে শূন্য দিয়ে পাগলের মত ছুটে যাচ্ছে।" আর একটু দূরে থেকে শুনলে মনে হয়, "যেন একটা প্রকাণ্ড সিঁড়ি বেয়ে সাংঘাতিক একটা ঢাক হুড় হুড় ক'রে গড়িয়ে পড়ছে আর ধাপে ধাপে বেজে উঠ্‌ছে!"

শব্দ আবার এক রকম নয়। কামান ছুঁড়বার সময় তোপের শব্দ, তারপর শূন্যে গোলা ছুটবার শোঁ শোঁ শব্দ, তারপর গোলা ফাট্‌বার শব্দ। এক রকম গোলা আছে তাকে বলে "শেল্"। শেল ফাটবার ধরণটা যেন হাজার ব্যাঙের সবকটা ঢোলে হঠাৎ ধড়াম্ ক'রে চাঁটি পড়ল—আর সেই সঙ্গে হুড়মুড় ক'রে ঘর বাড়ী ভেঙ্গে ইঁট পাথরের বৃষ্টি! শুধু শব্দেরই ধাক্কায় যেন মানুষকে উল্টে ফেলতে চায়! আরেকরকম গোলার নাম "শ্রাপ্‌নেল্"—এগুলি ফাটবার সময় চারিদিকে গুলি ছিটায়। শ্রাপ্‌নেলের আওয়াজ "যেন হাজার গণ্ডা কাঠের আঁটি এক সঙ্গে মট্ ক'রে ভেঙে যাওয়ার মত।

আজকাল যুদ্ধে এরোপ্লেন, 'এয়ার শিপ্' প্রভৃতির খুব ব্যবহার চলে। উড়বার সময় এই সব যন্ত্রে খট্-খট্-খট্-খট্ ক'রে ভয়ানক আওয়াজ হয়। যখন অনেকগুলা

এরোপ্লেন মিলে আকাশে উড়্‌তে থাকে—তখন সেই শব্দ শোনায় যেন এক সঙ্গে হাজার হাজার চীনে পট্‌কা ছোটাচ্ছে। জার্ম্মানরা যে বেলুন-জাহাজ ব্যবহার করে তার নাম জেপেলিন তা তোমরা, নিশ্চয়ই জান। বোল্‌তা বা ভ্রমর খেপে গেলে যেরকম ভন্-ন্-ন্-ন্ ক'রে শব্দ ক'রে জেপেলিনের আওয়াজটা অনেকটাও সেই ধরণের। নিস্তব্ধ রাতে অনেক দূর থেকে সেই আওয়াজ শুনে লোকে বুঝ্‌তে পারে 'জেপেলিন আস্‌ছে'। প্যারি সহরে ফরাসিরা জাহাজের চোঙার মত প্রকাণ্ড উঁচু কতগুলা কল বসিয়েছে তার কাজ হ'চ্ছ আকাশের শব্দ শোনা। সহরের সমস্ত হট্টগোলের উপরে সেই কল সব সময়ে আকাশে "কাণ" পেতে থাকে! চোঙার নীচে মাটির তলায় একটা ঘর আছে। আকাশের কোন দিক থেকে টুঁ শব্দটি হ'লেই সে ঘরের লোকেরা শুন্‌তে পায়। তারা এ বিষয়ে একেবারে ওস্তাদ শব্দ শুন্‌বামাত্র ব'লে দেয় এটা কিসের শব্দ।

নূতন ধাঁধা।

১। পা দেখি তার সবার আগে, কোথায়রে তার মাথা ?
কেবল দেখি ঠ্যাঙের সাথে হাড্ডি আছে গাঁথা !
সাম্‌নে পিছে পাড়ের বাহার শুন্‌তে লাগে ধাঁধা,
হরেক দেশে দেখ্‌বে তারে পাথর দিয়ে বাঁধা।

২। তিনটি অক্ষরে নাম, বুদ্ধি খরধার
মুড়োবাদে গুণে দেখি লক্ষরূপ তার।
শেষ ছাড়ি উচ্চে বাস মাথার উপরে
আদি অন্তে মিলে আহা কত মধু ধরে !